গল্পসমগ্র

চতুর্থ খণ্ড

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

নিবেদন

এই খণ্ডে মুদ্রিত গল্পগুলির রচনাকাল ১৩৬৩ সালের পূর্বে। সব গল্পের রচনা
নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হয়নি। যে সংকলন-গ্রন্থে ঐ গল্পগুলি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়
গ্রন্থের প্রকাশকাল গল্পের শেষে উল্লিখিত হয়েছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

গল্পসমগ্র

নীলরক্ত

রাত নেহাত কম নয়—প্রায় সাড়ে বারোটা, হঠাৎ সাত নম্বর ফ্ল্যাটের গণেশবাবুর ঘর হইতে একটা তুমুল গোলমাল উঠিল। প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করি নাই, কারণ ঊনিশটি ফ্ল্যাট সম্বলিত এই বিরাটকায় প্রাসাদটির গহ্বরে যে ঊনিশটি পরিবার বাস করেন—তাঁহাদের আর যাই হোক উদারতার অপরাধে অপরাধী করা যায় না।

অতএব গোলমাল শুনিয়া কৌতূহলী হইবার অভ্যাস আর নাই।

বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে চটি জোড়াটা পায়ে গলাইয়া কাটিয়া পড়ি।

কিন্তু এত রাত্রে হঠাৎ "ষোলোই আগষ্টের" অভিনয় সুরু হইয়া যাইবার উদাহরণ বেশী নাই, একমাত্র শশধরবাবুর ঘরে ছাড়া। বৌদি বলেন—'শশধর বাবু মাতাল, তাই—', দাদা বলেন—'বাজে কথা! এক অফিসে কাজ করছি বিশ বছর ধরে, মাতাল হ'লে আমি জানি না? গিন্নীটা পাগল—।' আমি অবশ্য পাগল আর মাতালে প্রভেদ ধরিতে পারি না।

প্রকৃত ঘটনা যাই হোক, মাঝে মাঝে হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া সেই দাম্পত্য কলহের আদ্যন্ত শুনিতে হয় আমাদের।

কিন্তু গণেশবাবুর স্ত্রী তো আমি অনুপস্থিত বলিয়াই জানি।

কয়েকদিন আগেই যেন ভদ্রমহিলাকে ট্রাঙ্ক বিছানা ও ছেলে মেয়েদের লইয়া গাড়ি চড়িতে দেখিয়াছি। তবে? গলাটা শোনা যাইতেছে গণেশবাবুরই বেশি, অতএব একপক্ষ তিনিই, কিন্তু অপর পক্ষ কে? একা গণেশবাবু এতোক্ষণ চালাইতেছেন কিসের শক্তিতে! কাহার প্রেরণায়?

নাঃ, কোলাহলটা ক্রমশঃই উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে যে! 'খুন করলে', 'পুলিশে দেবো', 'দেখে নেবো', 'বাবারে', 'মারে' প্রভৃতি অনেক ভালো ভালো কথা কানে আসে। উঠিব নাকি? ব্যাপার কি?

এই সব চেঁচামেচি কেলেঙ্কারী দেখিলে আমার আবার মাথা ঘোরে। 'কাপুরুষ' বলিয়া ধিক্কার দিতে চান দিন—সত্য কথাই বলিতেছি।

উঠি উঠি করিয়াও থাকিয়া গেলাম।

ঝড়ের বেশ ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। যাক্ পুলিশ ডাকার প্রয়োজন সত্যই ঘটে নাই এও ভালো। আশঙ্কায় কণ্টকিত হইতেছিলাম—কখন পুলিশ আসিয়া সজোরে দোরে ধাক্কা দেয়। বিচার বিবেচনার বালাই তো আর নাই, আমাকেই ধরিয়া চালান দিতে পারে।

পুলিশের না হোক, ধাক্কা পড়িল।

সজোরে নয়—সরবে।

—ঠাকুরপো, ঘুমোচ্ছো নাকি?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া দিই।—কি ব্যাপার বৌদি?

—ব্যাপার তো কুরুক্ষেত্তর! কিন্তু তুমি কি কুম্ভকর্ণ ঠাকুরপো?

—অপরাধ?

—বলো কি, এঁ্যা! ধন্যবাদ বাবা, কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণে। 'মহাপুরুষ' নাম দিয়েছি কি সাধে? এই ধুন্ধুমার কাণ্ড হ'য়ে গেল, আর তুমি কিছু টের পাও নি? গণেশবাবু তো খুন হয়ে যাচ্ছিলেন!

'যাচ্ছিলেন?'

শুনিয়া তবু আশ্বস্ত হই। মনের ভাব প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করি না—যাচ্ছিলেন? যান নি তো? ঈশ্বর অনুগ্রহ করেছেন, কিন্তু হত্যাকারী কে? আপাতত তো উনি এখন বিপত্নীক? চমকো না—টেম্পোরারি তো বটে? রাত-দুপুরে খুনোখুনি কার সঙ্গে?

—আচ্ছা ঠাকুরপো, এই বুঝি তোমাদের মনোভাব? খুনোখুনি করতেই আছি আমরা? তাই বিয়ে করো না, কেমন? খুন করতে বসেছিলেন কে জানো? ললিতবাবুর মেয়ে সরমা!

ঔদাসীন্য বজায় রাখা কঠিন হইতেছে।

—ললিতবাবুর মেয়ে? গনেশবাবুকে খুন করতে গিয়েছিল? তার মানে?

—মানে আর কি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন সুন্দরী!

—চুরি? ললিতবাবুর মেয়ে? গণেশবাবুর ঘরে?

—হঁ্যা গো-হঁ্যা। মেয়েটি তো চোরের অগ্রগণ্য, কে না জানে এ কথা? তুমি যেমন চোখ বুজে পৃথিবীতে চরে বেড়াও! ওর ভয়ে পকেটে পয়সা রেখে স্বস্তি পায় না লোকে, সুবিধে পেলেই টাকাটা সিকেটা সরাবে।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটাইয়া বলি—রোসো, আমাকে বুঝতে দাও, গণেশবাবু তো ঘরেই ছিলেন?

আহা তা তো ছিলেন। ভেবেছে মিনসে ঘুমোচ্ছে, গিয়েছে চুপি চুপি।

বলা বাহুল্য ভাষা সম্বন্ধে কোনো কুসংস্কার বৌদির নাই, বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করতে তিনি আধুনিক পৌরাণিক সর্ববিধ ভাষাই প্রয়োগ করেন।

—এ পর্যন্ত তো বুঝলাম। তারপর? বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছিল, না কি গলা টিপে ধরেছিল?

বৌদি বিরক্ত হইয়া উঠেন—আহা তা' কেন? চুপি চুপি দেরাজটি খুলছিল, গণেশবাবু টের পেয়ে যেই না উঠে চেপে ধরেছেন, আর টেবিল থেকে ভারি কাঁসার গেলাসটা ধাঁই করে বসিয়ে দিয়েছে কপালে! উঃ সে কী রক্তারক্তি কাণ্ড! ননীর মা'র ভাইপো এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল! বাবা, মেয়েমানুষ এতোবড় দজ্জাল!

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলি—এ ত' তোমরা এক তরফাই শুনেছ? এমনও তো হ'তে পারে—গণেশবাবুই কোনো কু-মতলবে—

—আহা পারবে না কেন? হ'তে সবই পারে। ও মুখপোড়াকেও আমি ভাল বলি না, কিন্তু মনে রেখো ঘরটা ললিতবাবুদের নয়—গণেশবাবুর!

তা' বটে! কথাটা মিথ্যা নয়। মুখ্যু বলিয়া কি লজিক বোঝেন না বৌদি?

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া বলি—ধরা পড়ে কি করলো মেয়েটা ?

—আ ছি ছি ! তার কথা আর বলো না ভাই । প্রথমটা খুব তেজ দেখিয়ে 'বেশ করেছি', 'খুব করেছি', 'ছোটলোক চামার', 'শয়তান'—এই সব চোটপাট করছিল, তারপর সে বুনো ঘোড়ার মতো ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল, নড়লো না গো ! এই লোকে লোকারণ্য, দৃকপাত নেই । শেষে বাপ এসে প্রায় মারতে মারতে টেনে নিয়ে গেল !

পাশের ঘর হইতে দাদার কাশির আওয়াজ আসিতেছে ।

ঠিক কাশি নয়—কাশির ভান ! অর্থাৎ তিনি যে জাগিয়া আছেন এবং বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন সে সম্বন্ধে অবহিত করিয়া দেওয়া বৌদিকে ।—

কার্য কারণের নিয়মানুসারে বৌদির উৎসাহদীপ্তি কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসে । বাকি বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া সরিয়া পড়েন ।

—ঘুমোও তুমি ! বকবক ক'রে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করিয়ে দিলাম—ভদ্রতার এই কথাটুকু উচ্চারণ করিয়া তিনি তো যান, কিন্তু ঘুম সহজে আসিতে চায় না । বহুবার দেখিয়াছি ললিতবাবুর মেয়েকে···সিঁড়িতে ওঠানামা করিতে, দালানে বারান্দায়, কিন্তু কথা কহিতে দেখি নাই বড়ো একটা । ছোট করিয়া চুল কাটা, উদ্ধত ভঙ্গী, দীর্ঘাঙ্গী সেই মেয়েটাকে যতবারই মনে করিতে চেষ্টা করি—বৌদির বর্ণনার সঙ্গে মিলাইতে পারি না ।

বৌদির অভিযোগটা কি সত্য হওয়া সম্ভব ?

চোরের মতো কুণ্ঠিত সন্তর্পিত ভাব কোথায় ?

কিন্তু—

নিজেই কি আমি কিছুদিন যাবৎ পকেটের ওজন সম্বন্ধে ধাঁধায় পড়িতেছি না ? অন্যমনস্ক প্রকৃতি বলিয়া একটা বদনাম আমার আছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এমন ঘন ঘন ঘটিতে সুরু করিয়াছে যে—আমার প্রকৃতিকেও নাড়া দিয়াছে ।

অথচ আমার অজ্ঞাতসারে আমার পকেটের ওজন-হ্রাসের সংবাদ একবার বৌদির কানে উঠিলে বাড়ির ঝিটাকে নাস্তানাবুদ হইতে হইবে এই আশঙ্কায় কথাটি কহি নাই ।

তবে কি সরমাই ?···

এতো অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব ?

মনটায় যতোই অস্বস্তি থাক চুপচাপই থাকি ।

দিন কাটে······

তেমনি খাটো চুল উড়াইয়া উদ্ধত মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি মেয়েটাকে, তেমনি মাঝে মাঝে পকেটের পয়সা গোলমাল হইতে থাকে । অথচ সাবধান হইবার উৎসাহ খুঁজিয়া পাই না ।

হঠাৎ একদিন—

গণেশবাবুর মতো আমিও হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিলাম!

লাস্ট শো-তে সিনেমা দেখিয়া ফিরিয়াছি—ঘরে ঢুকিয়া সুইচ্টা জ্বালিতেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম!

খোলা সুটকেসের সামনে সরমা।

'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' কথার অর্থ এতো গভীরভাবে অনুভব করিয়াছি কবে?

—আলো নিভোন, আলো নিভোন বলছি—

চাপা তীক্ষ্ণস্বরে হুকুমের সুর!

—আলো নিভাবো কেন?—অনেক কষ্টে উচ্চারণ করি—পালাও তুমি। শিগ্গির পালাও!

—কেন পালাবো?

কণ্ঠস্বর মুখের গড়নের মতই উদ্ধত।

বিরক্তভাবে বলি—পালাবে না তো কি গেলাস ছুঁড়ে মারবে?

—ওঃ গণেশবাবুর খোঁটা দেওয়া হ'চ্ছে? সে ছোটলোকটাকে বেশ করেছি মেরেছি। মারবোই তো। দরকার হ'লে থান ইঁট ছুঁড়েও মারতে পারি আমি তা জানেন?

—জানলাম! কিন্তু আমার সুটকেস নিয়ে তোমার কি দরকার জানতে পারলে ভালো হয়!

সত্য কথা বলতে কি—খোলা সুটকেসের সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াও, মারাত্মক একটা চোর দেখিয়াছি এমন অনুভূতি আসে না।

সশব্দে ডালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিয়া আসে সরমা। উগ্র স্বরে বলে—থাক্ থাক্, আর সুটকেসের বড়াই করতে হবে না। মিথ্যে খাটুনি সার! ছাই আছে সুটকেসে, উনুনের পাঁশ আছে।

ভারি কৌতুক অনুভব করি।

চুরি করিতে আসিয়া এমন স্টেজ ফ্রী! চুরির যোগ্য বস্তু নাই বলিয়া গৃহস্থকে ধিক্কার! মজা মন্দ নয়!

হয় তো—চোর যদি ললিতবাবুর কন্যা না হইয়া পুত্র হইত, এমন কৌতুক বোধ করিতাম না। তরুণী নারীর মোহময় প্রভাব—অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কেউ দেখিয়া ফেলার আগে সরমাকে সরানো দরকার এ চৈতন্য থাকিলেও নিছক্ কথা কহিবার লোভেই কথা কই—এইমাত্র যে আমার ঘরে সিঁদ কাটিতে আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে হাসির কথা কহিতেও বাধে না। হাসিয়া বলি, সত্যি ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে বটে, উচিত ছিল সুটকেসে কিছু রেখে দেওয়া; কি বলো? কিন্তু এ কী বিশ্রী অভ্যাস তোমার? না ব'লে ক'য়ে নেওয়া—

সরমা রুদ্ধস্বরে কহিল—কেন হবে না বিশ্রী অভ্যাস? কেউ কি ইচ্ছে ক'রে দেবে এক পয়সা?

—বাঃ তাই বা দেবে কেন লোকে? শুধু শুধু কে কাকে দেয়?

সরমা আমার কথায় উত্তেজিত হইয়া ওঠে—জানি জানি কেউ কিছু দেয় না শুধু শুধু। তাহ'লে কি করবো আমরা শুনি? না খেয়ে মরবো?···বাবা

ভাড়া দিতে পারে না ব'লে বাড়িওলার ছেলে কী যাচ্ছেতাই অপমান করছে রোজ, দেখতে পান না ?

গম্ভীরভাবে বলি—সে তোমার বাবা বুঝবেন !

—'বাবা বুঝবেন'—আহা কী বুঝমান বাবা আমার—সরমা ভেংচাইয়া ওঠে—বাবার বোধশক্তি সব আছে যে ! মদ খেয়ে পড়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা !

তীব্র উত্তর এবারে আমিই দিই—তাই বুঝি তুমি সুসন্তানের মতো উপার্জন ক'রে মদের পয়সা যোগান দাও ? তা পথটা মন্দ নয়—খাটুনি নেই !

হঠাৎ যেন ফাটিয়া পড়ে সরমা—তাছাড়া আর কি করবো ? আমি কি লেখাপড়া শিখেছি যে চাকরি ক'রে টাকা আনবো ? ছোটলোক গণেশবাবুটা যা বলে তাই শুনলেই বুঝি ভালো হয় আপনাদের ?

গণেশবাবু কি বলেন তা অবশ্য আমি জানি না, তবে অনুমান একটা করিয়াছিলাম। সেই রাত্রেই করিয়াছি।

নীরস গম্ভীরভাবে বলি—গণেশবাবু কি বলেন—তা জানবার সখ আমার নেই ! তবে চুরি ক'রে বাপের মদের পয়সা যোগান দেওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। ওকে বীরত্ব বলে না।

—কে বলেছে বীরত্ব ? কে বলেছে বাহাদুরী ?—সরমা যেন মরীয়া হইয়া ওঠে—আপনি ভদ্দরলোক, এই বাড়ির মধ্যে সবাইয়ের থেকে ভালো আপনি, তবু এইরকম বলছেন ? তবু এমনি অবুঝ ? বুঝতে পারেন না—পয়সা না পেলে ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেয় বাবা ! মারতে মারতে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় গণেশবাবুর ঘরে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করিয়া বসিল মেয়েটা।

কথা শেষ করিবার আগেই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল আমার পাতা বিছানাটার উপর !···

বুঝুন আমার অবস্থা !

টানিয়া তুলিবার উপায় নাই, অথচ কে কোনদিক হইতে দেখিবে তার ঠিক নাই, করি কি ?

কেবলমাত্র পয়সা চুরি করিবার জন্যই সরমা আমার ঘরে আসিয়াছে এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ?

নিজেই সরিয়া পড়িব ?

কিন্তু কোন্ চুলোয় ?

দ্বিতীয় ঘরখানিতে অনেক আগেই খিল পড়িয়াছে। পথে বাহির হইবার উপায় নাই, গেটে তালা পড়িয়াছে !

শুধু বোকার মতো দাঁড়াইয়া থাকিব ?

বাধ্য হইয়াই বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া বলি—এই শুনছো—তুমি কিন্তু পালাও লক্ষ্মীটি ! ভারি বিশ্রী হচ্ছে এটা। এই নাও যা টাকা আছে আমার কাছে, নিয়ে চলে যাও, দোহাই তোমার !

—চাই না টাকা—ছাই টাকা ! কতো টাকা দেবেন আপনি ? কতো দিতে

পারবেন ? ক'দিন চলবে ?

অপরাধীর মতোই নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করি।

—কিন্তু আমি আর কি করবো ?

—আপনিই সব পারেন ! আপনি আমায় এ দুর্গতি থেকে বাঁচান—দুটি পায়ে পড়ি আপনার। আর পারছি না আমি।

ওঠে না, মুখ তোলে না—উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়াই কথা কয়টা উচ্চারণ করে সরমা !

ক্রন্দনরতা তরুণীকে নিজের শয্যায় দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে !··· চারিদিকের নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনায় গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে। এখন আর উদ্ধত বলিয়া বোধ হয় না, চোর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না !···শোওয়ার ভঙ্গীটি কি মনোরম !

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদার দৃশ্যটি যেন উপভোগ করি···অবাক হই···দেখিতে দেখিতে নেশা লাগে যেন।···

—ওঃ তাই বলি—এতো রাত্তিরে একলা একলা ঠাকুরপোর এতো কথা কেন ? তাই বলো ? একলা নয় 'দোকলা' !

পিঠের মধ্যে কেমন একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া গেল !

বৌদি আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছেন।

—তা' ভালো—সরমার আমাদের সব রকম চুরির বিদ্যেই জানা আছে দেখছি। কি বলো ঠাকুরপো ! নেহাত ছিঁচ্কে চোর নয়, এ্যাঁ ?

কথা কহিবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও স্বর বাহির হয় না।

বৌদি একাই একশ'—তিনিই কথা চালাইয়া যান—মহাপুরুষদেরও তাহ'লে মতিভ্রম হয় ? এ্যাঁ ? কিন্তু ছি ছি ঠাকুরপো, ডুবলে ডুবলে—আঘাটায় ডুবতে গেলে ?··যাক—দোরটা একটু ভেজিয়ে দিয়ে মান-অভিমানের পালাটা সাঙ্গ করো ঠাকুরপো ! পাঁচজনে দেখতে পেলে—তোমার না হো'ক আমাদের গায়ে ধুলো দেবে। যাই বাবা, তোমার দাদা আমাকে সুদ্ধু এ অবস্থায় দেখলে আর মুখ দেখবেন না আমার !

এই মুহূর্তেই বাঁচাইতে পারি সরমাকে !

রক্ষা করিতে পারি চরম অসম্মানের হাত হইতে···পরম দুর্গতির পথ হইতে। বৌদির সামনেই অনায়াস মহিমায় ওর মাথায় হাত রাখিয়া বলিতে পারি—'ওঠো সরমা লজ্জা কি ? ভালোই হ'লো যে বৌদি জানলেন। এসো আমরা দুজনে একসঙ্গে ওঁর আশীর্বাদ চেয়ে নিই'—বলিবার মতো এমন ভালো ভালো কথা অনেক আছে বাংলা ভাষায়।

শরণার্থীকে রক্ষা করিতে মিথ্যা বলাও অশাস্ত্রীয় নয়—কিন্তু বলা কি এতো সোজা ?

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দুর্বিপাকে এই ভেড়ার খোঁয়াড়ে আশ্রয় লইতে

হইয়াছে বলিয়াই তো আর রক্তটা লাল হইয়া যায় নাই আমাদের? তাই ভালো ভালো কথার মোহ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিতে বৌদির পিছন পিছন বাহির হইয়া আসি। নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে বলি—তুমি কি ক্ষেপে গেলে বৌদি? ওটাকে আমি—

সোনালী মেঘ

সমীর শুয়েছিল বিছানায়।

শুয়েই থাকে সে, এগারো মাস ধ'রে শুয়ে আছে ওই বিছানাটায়, একই জায়গায়।

চৌকিটা একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁসে পাতা। এখান থেকে আকাশ দেখতে পাওয়া যায় না।

যে জানালাটা সামনে পড়ে, তার থেকে বাইরে তাকালে চোখে পড়বে মজুমদারদের বিরাট বাড়িখানার পিছনের দেয়ালের একাংশ। সেকেলে আমলের ছোট ছোট ইঁটে গাঁথা নোনাধরা দেয়াল, চুনবালির আস্তরণ কোনোকালে ছিল এখন আর বিশ্বাস করা কঠিন।

গাঁথুনির ফাঁকে-ফাঁকে এখানে ওখানে গজিয়েছে অশ্বত্থের চারা।

এখন ওদের কেউ গ্রাহ্য করে না, উদাসীনভাবে তাকিয়ে দেখে—শ্যামল কয়েকখানি পাতার নিচে নিচে কোন ফাঁকে জন্ম নিচ্ছে আরো কোমল আরো উজ্জ্বল নতুন পাতার দল।

কে সন্দেহ করবে ওই সবুজ শোভার মধ্যে লুকানো আছে ধ্বংসের বীজ! কে বিশ্বাস করবে এই বিরাট অট্টালিকাকে ভূমিসাৎ করবার শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে ওর ওই শিশুদেহের অন্তরালে!

বহুবার দেখেছে মানুষ, বারে বারে ঠকেছে, তবু উদাসীন অবহেলায় তাকিয়ে দেখে—দেয়ালের গাঁথুনিতে ফাটল ধরিয়ে গজিয়ে ওটা কচিপাতা দু'খানাকে।

হয়তো বা তাকিয়ে দেখেও না।

মজুমদাররাও এখন তাকিয়ে দেখছে না, নয়তো বা যখন তাকিয়ে দেখেছে ভেবেছে 'গাছ ক'টা কেটে ফেলা দরকার'। যেমন ভেবেছিল সমীরের মা বাপ বছর দেড়েক আগে।

"ছেলেটাকে একবার ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার"— একথা অনেকবার ভেবেছে ওর মা বিরজা, আর বাবা সুধাংশুমোহন। যতোবরাই ওরা লক্ষ্য করেছে ছেলেটা কেমন অস্বাভাবিকভাবে পা টেনে টেনে হাঁটছে, উঠতে-বসতে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করছে, ততোবারই এ সাধুসংকল্প জেগেছে ওদের মনে।

"না না অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়, ভালো একটা ডাক্তার দেখানো উচিত। পড়ে গেলো না, হোঁচট খেলো না, শুধু শুধু ছ'মাস ধরে পায়ে একটা ব্যথা আটকে

থাকবে—একি আশ্চর্য কথা!" ছ'মাস ধরে এই ধরনের অনেক কথা অনেক সময় বলাবলি করেছে ওরা দুই স্বামী স্ত্রী, কিন্তু সন্দেহ করেনি—এটা মারাত্মক কিছু সন্দেহ করেনি এই বলিষ্ঠ কিশোর দেহকে ভূমিসাৎ করবার ভূমিকা নিয়ে এসেছে—তুচ্ছ ওই ব্যথাটুকু। তাই, ভালো ডাক্তার দেখানোটা আর হয়ে ওঠেনি। গ্রামে তো আর তেমন ডাক্তার নেই। যেতে হবে সদরে। সুবিধে হবে তবে তো?

তোড়জোড় করে সদরে যাবে,—শুধু একটা কাজ সেরে আসতে হলেই বা মজুরি পোষাবে কেন? একটা বন্ধকী জমির বাকী সুদ না কি ছাই তার জন্যে পরামর্শ করবার আছে যোগীন উকিলের সঙ্গে, গায়ের একখানা র‍্যাপার কেনবার ইচ্ছে সুধাংশুর অনেকদিন থেকে—এখানকার 'হেটোমার্কা' সুতি র‍্যাপার নয়, সত্যিকার পশমের র‍্যাপার; জোড়াদুই কাপড়েরও দরকার—বিরজার আর নিজের। সমীরের একজোড়া জুতো, যেতেই যদি হয় সদরে, সেখান থেকে কেন ভালো।

এতোগুলো 'ভালো' ইচ্ছেকে কার্যকরী করতে হলে যে ভালো জিনিসটার দরকার, সেটা বড়ো একটা একসঙ্গে বেশী থাকে না। কাজেকাজেই 'তা না না না' করতে করতে ছ'মাস কেটে গেছে। পায়ের ব্যথা বেড়েই চলেছে। সংসারের কাজ নির্ভুলভাবে সেরে সময় পেলে, বিরজা কোন কোন দিন একটু কর্পূর তেল মালিশ করে দিয়েছে ছেলের পায়ে, কোনদিন বা বলেছে—"হেরিকেনের মাথায় কাপড়ের পুঁটুলি তাতিয়ে তাতিয়ে একটু সেঁক দে দিকিন খোকা, আরাম পাবি।"

'সমীর' এতো বড়ো নামটা তার বলতে ভালো লাগে না, 'খোকাই' সুবিধে। নামটা বিরজার পছন্দও নয়। নিজেদের রাখাও নয় নামটা। ওই মজুমদারদের ছোট ছেলে জিতেন, ছেলেবেলায় যে বিশেষ প্রিয় ছিলো বিরজার, দিনের বেশীর-ভাগটা কাটতো বিরজার কাছে, তারই পছন্দ করা নাম।

এরা ঠিক করেছিল 'হিমাংশু'। সুধাংশুর ছেলে হিমাংশু ছাড়া আর কি হবে? এই তো বিধি নামকরণের। জিতেন—যদিও মস্ত একটা মাতব্বর লোক নয়, তবু বিরজার ওপর স্নেহের দাবিতেই একেবারে নাকচ করে দিয়েছিল নামটা। বলেছিল—আরে ছ্যাঃ! ওসব নাম আবার এখন চলে না কি নতুন কাকীমা? বড় সেকেলে হয়ে গেছে, নেহাতই যদি মিলিয়ে নাম রাখতে হয়, বরং 'শুভ্রাংশু' চলতে পারে।

'শুভ্রাংশু'কে আবার বিরজা একদম বাতিল করে দিল। ছেলের নাম উচ্চারণ করতে হলে যে দাঁত কটা ভাঙতে হবে, এ তার পছন্দ নয়।

অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে এই নামটি নির্বাচন করে দিয়েছিল জিতেন। বারে বারে আর 'না' করতে পারেনি বিরজা, তবে ডাকনামটা 'খোকা'ই বাহাল আছে। যাক্, সে সব কথা তো যোলো বছর আগের। আলোচ্য ঘটনাটা বছর দেড়েকের।

সদরে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আবার সঙ্কল্পটা বজায় থাকলেও—কর্তব্যের নেহাত ত্রুটি করেনি সুধাংশু, কবরেজ মশাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে

দেখিয়েছে ছেলেকে।

"ধমকের চোটে অর্ধেক রাগ সারাতে পারি"—এমনি একটা আত্মগরিমা আছে শিরিষ কবরেজের।...তাই দেখেই একচোট ধমক দেন—"হবে না ব্যথা? হনুমানের মতন গাছের ডগায় ডগায় ঝুলগে যা আরো? সেরে যাবে ব্যথা। দু'বার আছাড় খেলে ব্যথার বাবা সারে, বুঝলি?"

সুধাংশু কুণ্ঠিত ভাবে বলতে চেষ্টা করেছিল—"এর মধ্যে তো—প'ড়েটড়ে কই যায়নি কবরেজ মশাই। খামোকা শুধু শুধুই—"

"খামোকা শুধু শুধুই"—হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন শিরিষ কবরেজ—"বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিও না সুধাংশু, শুধু শুধু পায়ে ব্যথা! ছোঁড়াগুলোকে তো চেননা তুমি, সেরেফ এক একটি হনুমান। গাছের ডগাতেই বাসা ওদের। 'কেষ্টো' প্যায়রাগুলো ডাঁসাতে দেয় না হে, খেয়ে খেয়ে গাছ সাফ করে ছাড়ে! ওই প্যায়রা গাছ থেকে আছাড় খেয়ে যদি হাড় মচকে না থাকে তো আমার নাম বদলে রেখো। একেবারে মোক্ষম মচকেছে দেখতে পাচ্ছি।"

সমীরও এই অন্যায় অপবাদে আপত্তি করেছিল, কিন্তু শিরিষ কবরেজ শুনলে তো?

নুন, চুন, সোরা, তেঁতুল ছাই পাঁশ সবকিছু মিশিয়ে একটা প্রলেপের ব্যবস্থা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি—আর এক প্রস্থ ধমক দিয়ে।

*　　　*　　　*

বলাবাহুল্য শিরিষ কবরেজের মুখ রাখতে পারেনি সমীর। না ওষুধ, না ধমক, কোনোটাই কার্যকরী হলো না। বেড়েই যেতে লাগলো।

এরপর—এগারো মাস আগে সমীর যখন সেই তুচ্ছ পায়ের ব্যথা উপলক্ষ করে বিছানা নিলে, তখন শিরিষ কবরেজ আবার দেখলেন।

রুগীর কাছে এসেই দেখতে হলো।

এবার আর ধমক দিলেন না. গম্ভীরভাবে বললেন—"বাতের উপক্রম দেখছি।"

পাড়ার হিতৈষী গিন্নীরা শুনে চটলেন—"ভীমরতি হয়েছে বুড়োর। এই কচিছেলের নাকি বাতের উপক্রম! কিছু না, 'শিরটান'। বেকায়দায় কখন খ্যাঁচ করে লেগেছে—"

পাড়ার গিন্নীদের কথা সবটা না হলেও—কিছুটা ঠিক বলা যায়। 'বেকায়দায় খ্যাঁচ করে টান' তার সত্য পড়েছিল, কিন্তু পায়ে নয় কপালে। বিধাতা-পুরুষের কলমটা যখন চলতে শুরু করেছিল—'ষেটেরা পুজোর' রাত্রে। কলমের সেই বেকায়দা আঁচড়ের ফল ভুগছে সমীর, ষোলো থেকে সতরো বছর বয়েস পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থেকে।

এরপর আর সমীরকে সদরে নিয়ে যাবার অবস্থা রইল না।

চলতেই পারে না, যাবে কি করে?

অথচ ডাক্তারকে নিয়ে আসবে—এমন অবস্থা সুধাংশুর নয়। কাপড়, র‍্যাপার,

আর জুতো কেনবার টাকা, খানিকটা জমতে জমতে ভেস্তে যায়। শেষ অবধি ও চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে সুধাংশু।

তবে—মিথ্যে বলবো না—এরমধ্যে 'ভালো' না হোক (ঈশ্বর জানেন 'মন্দ' কিনা) চিকিৎসা অনেক করিয়েছে সে। অনেক রকম।…শেকড় বাকড়, মাদুলী কবচ, সাধু ফকির, একটার পর একটা। যে যা বলছে।

প্রত্যেকবারেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সমীর, এইবার বুঝি লাগলো—এইবার গুণ ধরলো ওষুধের।…এতদিনে ঘুচবে বন্দীদশা, এবছরে পারবে ম্যাট্রিকটা দিতে।

পুরনো পড়ে যায় ওষুধ, অরুচি এসে যায় বিন্দার একঘেয়ে ব্যবস্থা করতে করতে। ছেড়ে দেওয়া হয় সেটা, আবার দু'দশদিন বাদে ধরা হয় অন্য আর একটা।

আবার দিন গুণতে থাকে সমীর, মনে মনে হিসেব করে আগামী পরীক্ষার তারিখ। প্রথম প্রথম আসতো স্কুলের বন্ধুরা, গল্প করতো—স্কুলের আর খেলার মাঠের।……হতাশ হয়ে বলতো—"তোর কি হলো ভাই? পুজোর ছুটি এসে গেল, কতো কি মজা হবে—কি যে শুধু শুধু বিছানায় পড়ে রইলি।"

ছলছল চোখে ম্লান হাসি হেসেছে সমীর।

ধীরে ধীরে থেমে এলো তাদের আসা-যাওয়া। কেউ পরীক্ষা দিলে, কেউ দিলে না। কেউ পাস করলে, কেউ ফেল। সবাই নিজের তালে ব্যস্ত।…কে আর কতোদিন মনে করে রাখবে—বেচারা সমীর বেরোতে পারে না, পারে না হাঁটতে। কে বুঝতে পারবে বাইরের জগতের একটুখানি হাওয়া বয়ে নিয়ে গেলে কতো ধন্য হয়ে যাবে সমীর।

দলের মধ্যে থেকে একা সমীরের ফাঁকটা বুজে গেল কোন্ ফাঁকে, ওদের খেয়াল রইল না। দলহারা সমীরের মনে স্থায়ী হয়ে রইল সমস্ত দলের বিরাট ফাঁকটা।

মজুমদার বাড়ির পিছনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে সমীর, বাড়িটার সামনের দরজাটা কিরকম দেখতে ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ফাটলে গজানো অশ্বথ চারাটায় গজালো আর ক'খানা নতুন পাতা।

এগারো মাস ধরে এই একই দৃশ্য দেখেছে সমীর, বাইরের জগতের আর কোনো ছবি ওর চোখে পড়েনি।…চৌকিটাকে ঘরের এপাশে টেনে এনে পাতলে দেখতে পেতো ওই মজুমদারদেরই বারবাড়িটার উঠোনটা। নামে উঠোন, মাঠ বললেও চলে। আগে যখন ওরা দেশের বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে যায়নি, তখন এই উঠোনে পুজোর সময় চারদিন ধরে চলতো যাত্রাগান, ম্যাজিক। কালীপুজোর রাত্রে—কালীকীর্তন আর কবির লড়াই। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়তো ওই উঠোনে।

এখন অবশ্য ভাঙা পাঁচিলের সুযোগ পেয়ে চরতে আসে রাজ্যের গরু বাছুরের দল, রাখালগুলো ঘুমোয় একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে।

তবু—সে দৃশ্যেরও তো পরিবর্তন আছে।

দেখতে পাওয়া যায় সজীব প্রাণীর নড়া-চড়া। দেখতে পাওয়া যায়—অনেকখানিটা সবুজ।······ঘরের এপাশের জানলা দিয়ে দেখা যায় আকাশ। আকাশ নয়—উইয়ে খাওয়া আমকাঠের ফ্রেমে আঁটা আকাশের ছবি একটুকরো। তবু সেই টুকরোর গায়েও তো দেখা যায় নানা রঙের খেলা, দেখা যায় চলমান মেঘ।···সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে—এই এঁদোপড়া একতলার ঘরখানাও যখন হঠাৎ একটা সোনালী আলোয় ভরে ওঠে, ঘরের তুচ্ছ জিনিসগুলো কেমন যেন সুশ্রী লাগে, অস্বাভাবিক ফর্সা দেখায় বিরজার শীর্ণ মুখখানা, তখন সমস্ত প্রাণটা যেন আছাড় খেতে চায় সমীরের—ওই সোনা ঝরানো আকাশটাকে একবারে চোখ দিয়ে দেখতে।···আলো মিলিয়ে যায় নিমিষেই। ঘরটা—সেই হঠাৎ আলোর মতোই হঠাৎ অন্ধকারে ডুবে যায়। অন্ধকারাহত বন্দীআত্মা ব্যাকুল আবেগে মুক্তি পেতে চায়। মুক্তি পেতে চায় শুধু ঘরখানা থেকে নয়, বুঝি বা দেহের পিঞ্জর থেকেও!

ব্যস্—আর তো কিছু রইল না। আজকের মতো বাইরের সমস্ত সমারোহ শেষ হয়ে গেলো।

এর পরের জন্য তোলা আছে—ফাটা চিমনিতে কাগজমারা ভূষোপড়া লণ্ঠনটা, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত বিরজার কাতরোক্তি আর হা-হুতাশ, সুধাংশুর বিরস বিষণ্ণ মুখ।···আর আছে আকর্ষণ-লেশহীন অরুচিকর রাত্রির আহার্য।

খাবার দেখলে—রসনা বিদ্রোহ করে ওঠে, কিন্তু বিরজাই বা কোথায় পাবে এর চাইতে ভালো!

চৌকিটা এদিকে টেনে আনার অসুবিধে অনেক।···আচমকা বৃষ্টি এলে ছাট লাগবে রোগীর গায়ে, কোন্ ফাঁকে লেগে যাবে বেশী হাওয়া, বিরজার চলা-ফেরার কষ্ট হবে—শোবার জায়গা থাকবে না মেঝেয়।

সমীর আকাশ দেখতে পাবে বলে—এতগুলো বড়ো বড়ো অসুবিধে ঘটানো হবে, এমন অদ্ভুত কথা ভাবতেই পারে না বিরজা আর সুধাংশু।

আকাশে আবার দেখবার কি আছে?

আকাশ দেখবার জন্যে কে কখন ঊর্ধ্বপানে চেয়ে বসে থাকে?

আকাশের বদলে আর একটা জিনিস কিছু পেলেও বর্তে যেতো সমীর, কিন্তু তাই বা কোথায়? বই! কিন্তু বই কোথায় পাবে সুধাংশু? কোথা থেকে যোগাড় করবে? সারা গ্রামটা ঝাঁট দিলেও স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া আর কিছু বেরোবে কি না সন্দেহ। তাও তো—এখান ওখান থেকে এনে দিল কতগুলো—রামায়ণ, মহাভারত, চাঁদসদাগর যাত্রাগানের পালা, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ আরো কি কি যেন।···ছেলে যদি দুদিনে একট আস্ত বই শেষ করে ফেলে, কি করবে সুধাংশু?

এখন ইচ্ছে—একটা খবরের কাগজের। তাও আবার জেলার কাগজ নয়, কলকাতার। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমীর এতো শিখলোই বা কি করে? সুধাংশু

অবশ্য তাও দিতে অরাজী নয়, কিন্তু কলকাতার কাগজের গ্রাহক হতে হলে যে কি করতে হয় সুধাংশু কি জানে ছাই ?

কি নাম, কি ঠিকানা ?...স্কুলের হেডমাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করে আসবার কথা ছিল আজ। মাসে চার পাঁচটা টাকা যাবে—যাক্ ! কষ্ট করে চালিয়ে নেবে সুধাংশু। ইস্কুলের মাইনেও তো লাগতো।

খুব উৎফুল্ল হয়ে ঢুকলো সুধাংশু। আজকাল আর এমন স্ফূর্তিভাব দেখতে পাওয়া যায় না তার।

—কাগজের ঠিক করেছো বাবা ?

একটু উৎফুল্ল সমীরকেও দেখাচ্ছে !

ঠিক ? কিসের ঠিক ? ও—তোর সেই কাগজের ? তার জন্যে আর ভাবতে হবে না, একেবারে টাটকা কলকাতাটাকেই হাতে করে নিয়ে এলাম দেখ্। তাকিয়ে আছিস যে ফ্যালফ্যাল করে ? কে এসেছে বল দিকিন ? পারলি না তো ? জিতু এসেছে কলকাতা থেকে, তোর জিতেনদা।

—জিতেনদা ? জিতেনদা এসেছেন ?

উৎসাহে চকচক করে ওঠে শীর্ণ রুগ্ন মুখ।

—তবে আর বলছি কি ? যাচ্ছিলাম ইস্কুলের দিকে, পথে দেখা ! একলাই এসেছে। এই বাড়িঘর একবার দেখতে এলো। বললে—"মিস্তিরি লাগাবো বাড়িতে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর ফেলে রাখা উচিত নয়।" পয়সা তো বহুত করেছে এখন ? তিন ভাই সমান, এক একটি কেষ্ট বিষ্টু। সেই আমাদের জিতু ! কী চেহারা ! রাস্তা দিয়ে আসছে যেন একটা সাহেব।...দেখতে ইচ্ছে করছে না ? এই এলো বলে—তোর মার সঙ্গে কথা কইছে—উঃ কী ভালোই বাসতো আগে ! তোকে তো কোলে পিঠে করে মানুষই করেছে বলতে গেলে। বড়লোকের ছেলে হলেও চাল নেই—এখন চলে গিয়ে আর...এই যে জিতু, এসো বাবা।

জিতেন ঢুকলো ঘরে, পিছন পিছন বিরজাও।

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখছে সমীর...কী অদ্ভুত ভালো দেখতে হয়েছে জিতু ! এতো লম্বা। এতো ফর্সা ! এতো সুন্দর পোশাক ! এ কি সেই জিতু ? ছেলেবেলা যার কোলে পিঠে উঠেছে সমীর ? যে জিতুদা পাখি পোষার জন্যে খাঁচা তৈরি করে দিয়েছিল সমীরকে, ঘুড়ির জন্যে লাটাই। পুজোর সময় যাত্রাগানের রাত্রে ঘুমন্ত সমীরকে ডেকে নিয়ে যেতো বাড়ি থেকে, প্রসাদ বিতরণের সময় সমীরের দিকে লক্ষ্যটা রাখতো বিশেষ করে।

সেই জিতুদা !

কি চমৎকার কথাবার্তা হয়েছে জিতুর।

গলার আওয়াজেই যেন হেসে উঠলো ঘর। এতো পরিষ্কার এতো চটপটে

কথা এ গ্রামের কারুর আছে নাকি ?

—কি রে, তুই নাকি ঠ্যাং ভেঙে বিছানায় পড়ে আছিস যতো ইচ্ছে ?

বহুদিন পরে সমীরের মুখে হাসি ফোটে—ভাঙলাম আবার কই ?

—ওই হলো। নিজে কি আর ভেঙেছিস হাতুড়ী ঠুকে! স্বপ্নের ঘোরে মল্লযুদ্ধ করেছিলি বোধ হয় কোনো পালোয়ানের সঙ্গে, দিয়েছে ল্যাং মেরে ঠ্যাং ভেঙে।

হা হা করে হেসে ওঠে সকলে, সমীরও।

—তা'পর ? পরীক্ষে টরীক্ষে দিসনি তো ?

—কই আর দিতে পারলো বাবা—সুধাংশু উত্তর দেয়—যে বছর দেবে—

—থাক থাক, আপনি আর ছেলের দোষ ঢাকবেন না কাকাবাবু আসল কথা শুনবেন ? সারা বছর আড্ডা দিয়ে বেড়িয়েছে, বইয়ের পাতা খোলেনি, পরীক্ষার আগে ভয় ঢুকেছে প্রাণে, ব্যস—অমনি পায়ের ব্যথার ছুতো! দিব্যি আরামসে শুয়ে থাকি বাবা!

জিতু প্রত্যেক কথায় হাসাবে লোককে।

ঘরের হাওয়া কী হালকা লাগছে! মনে হচ্ছে যেন খোলা আকাশের নিচে রয়েছে সমীর।

—তোমার এই ছেলেটির চালাকী আমি ঘোচাচ্ছি নতুনকাকীমা, অসুখ না হাতী! আরে বাবা একবার 'এক্সরে' করলেই তো ধরা পড়বে কি হয়েছে পায়ে! বেরিয়ে যাবে ফাঁকি!

—সে তো বুঝি বাবা—সুধাংশু উত্তর দেয়—কিন্তু আমাদের কাছে তো ওসব আকাশকুসুম। একটা ভালো ডাক্তার দেখানো তাই হয়ে উঠলো না এতোদিনে।

এবার একটু গম্ভীর হয় জিতু—তা অবশ্য দেখালেও পারতেন, কিছু না হোক, মনের নিশ্চিন্ততার জন্যে। তা ভালো না হোক মন্দ কেউ দেখছে তো ?

এবার কথা কয় বিরজা—নিয়ম করে আর কে দেখছে ? ওই, যে যখন যা বলছে করছি, এখন তো সবাই বলছে—হাড়ে নাকি ঘুণ ধরেছে।

—লোকের তো আর বলতে পয়সা লাগে না—ধমক দিয়ে ওঠে জিতেন—হাড়ে ঘুণ ধরেছে! বললেই হলো সাপ ব্যাঙ্ একটা কিছু! এ যেন তোমার আমকাঠের জানলা তাই ঘুণ ধরেছে! জন্মে শুনিনি এমন কথা! ও যা হয়েছে আমি বুঝেছি, বিশেষ কিছুই না, কলকাতায় এ রোগ খুব হচ্ছে আজকাল, তেমনি নতুন নতুন ইনজেক্‌শনও উঠেছে, একেবারে অব্যর্থ। গোটাকতক দিলেই ব্যস, উঠে গিয়ে হাডুডু খেলবি।

আনন্দে উৎসাহে বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করে ওঠে সমীরের, জ্বলজ্বল করে ওঠে রুগ্ন শ্রীহীন মুখ।

আসবে এমন দিন!

সমীর আবার পৃথিবীর মাটিতে পা দেবে, ছুটোছুটি খেলা করবে!

—সত্যি জিতুদা ? আছে এমন ওষুধ ?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি ? খুব ওস্তাদ ছেলে তো তুই। পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা চব্বিশ ঘণ্টা মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে নেড়া হয়ে যাচ্ছে কেন তা হলে ? তোর তো কিছুই হয়নি, সত্যিকার ভীষণ ভীষণ অসুখেরও এমন সব ইনজেক্‌শন বেরিয়েছে শুনলে হাঁ হয়ে যাবি।

—কলকাতায় ছাড়া পাওয়া যায় না জিতুদা ?

আগ্রহে আর আশঙ্কায় গলাটা কেমন ধরে আসে যেন।

—তা অবিশ্যি যায় না। তাতে কি, এইতো কালই চলে যাচ্ছি আমি ? গিয়েই তোর সব ব্যবস্থা করছি। এতোদিন কি জানি ছাই তুই এই রকম ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছিস ! বিজ্ঞানের কতো উন্নতি হয়েছে খবর রাখিস কিছু ? এই তো যুদ্ধের সময় বোমায় হাত পা উড়ে যাওয়া লোকেরা সব এখন ফুটবল খেলছে, মটর গাড়ি চালাচ্ছে। তোর পা আমি দিচ্ছি ঠিক করে।

—সত্যি বাবা—হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বিরজা—একটু চেষ্টা করে দেখবে ছেলেটার জন্যে ? ও তোমার ছোটো ভাইয়ের মতো—

—আঃ কী জ্বালা ! কান্না শুরু করে দিলে কেন ? ও আমার ছোট ভাইযের মতন কি বড়দাদার মতন তা আর বোঝাতে হবে না আমাকে। তুমিই ভুলে গিয়েছ আমায়। নইলে—এতোদিনের মধ্যে একটা চিঠি দিতেও পারতে।

অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে বিরজা।

সত্যিই তো, জিতু যে তাদের কতো আপনার সেটা আগে ভাবা উচিত ছিল। সমীরকে তো জিতুই একরকম মানুষ করেছে। বড় লোকের ছেলে বটে, কখনো চাল অহঙ্কার ছিল না।

এরপর আরো দুএকটা কথায় সমীব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বিরজা ওঠে জিতেনের খাবার ব্যবস্থা করতে। সুধাংশুকেও চোখ টেপে, ব্যবস্থা তো একলা হয় না।

সুধাংশু উঠতে উঠতে বলে—ভালোকথা, তোর ওই কাগজের কথা জেনে নে জিতুদার কাছে—

—কাগজ কি ?

—খবরের কাগজ জিতুদা ?···সারাদিন চুপ করে শুয়ে থাকি, এতো ইচ্ছে করে বই পড়ি, কিন্তু কোথায় পাবো ? শহরে কতো কি আছে, এখানে তো একটা লাইব্রেরী টাইব্রেরী কিছুই নেই ছাই ! তাই ভাবি রোজ যদি একটা—খবরের কাগজ পাই—ভালো কাগজ।

—এই কথা ! এর আবার জানার কি আছেরে হাঁদা ? গ্রাহক হলেই হলো।

—তা'তো জানি, কিন্তু—কোথায় লিখতে হয়—কোন্ কাগজটা ভালো কিছুই জানিনে যে—সমীর অপ্রতিভ ভাবে হাসে।

—আচ্ছা ! আচ্ছা ! ঠিক আছে, বেশী আর কিছু জানতে হবে না তোকে, কাগজ পেলেই তো হলো তোর ? কি চাস ? আনন্দবাজার ? যুগান্তর ?

কম্পিত কণ্ঠে সমীর বলে—তুমিই বলো না !

—বেশ আমিই দেবো অখন একটা ঠিক করে। তোর নামেই আসবে, কেমন ? বেশ মজা লাগবে। তা শুধু কাগজ কেন ? মাসিক পত্র-টত্রও তো দু'একটা পড়তে পারিস।

সমীর ম্লান হাসে ! কথা কয় না।

পড়তে পারবে না কেন, পড়বার জন্যেই তো পাগল সে। কিন্তু পেতে পারার প্রশ্ন একটা আছে তো।

জিতু বলে চলে—আচ্ছা রোস, খান দু'তিন পত্রিকারও গ্রাহক করে দেবো তোকে, তোদের বয়সের মতো—মানে কিশোর পত্রিকা যে কতো উঠেছে আজকাল।

—সে যে অনেক টাকার ব্যাপার জিতুদা—

সমীর হতাশ হয়ে নিশ্বাস ফেলে।

—বটে ? খুব যে বিজ্ঞ হয়েছিস ? আবার টাকার ভাবনাও ভাবতে শিখেছেন বাবু। পাকামী। ···গিয়েই অর্ডার দিয়ে দেবো, নিশ্চিন্দি থাক।

—জিতুদা !

কৃতজ্ঞতায় দুই চোখ ছল ছল করে আসে সমীরের।

স্বয়ং ভগবান কি জিতুদা মূর্তি ধরে ছলনা করতে এলেন !

জিতু ওর মুখপানে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে !

আহা ! সেই খোকা ! নধরকান্তি ছেলেটি ! নতুন কাকীমার একটিমাত্র সন্তান। কি হাল হয়েছে তার ! কি যে হয়েছে ওর, জিতেনের সে আর বুঝতে বাকী নেই। কিন্তু এখনো চেষ্টা করলে কি হয় না ? প্রতীকারের বাইরে চলে গেছে একেবারে ? এই কি সম্ভব ? ভগবান কি নেই ? এমনি করে ঘরে ঘরে অকালে শুকিয়ে যাবে আমাদের দেশের তরুণ প্রাণগুলি ? কেউ ভাববে না তাদের কথা ? কেউ দেখবে না তাকিয়ে ? এই অক্ষম, অসহায়, অজ্ঞতা আর অভাবে নিষ্পেষিত মানুষগুলোর জন্যে কারুর কোন দায়িত্ব নেই ? ···প্রত্যেকটি কৃতিলোক পারে না একটা করে মানুষের ভার নিতে ? —আইনের দায়ে নয়—মানবতার দায়ে !

কেন জিতুই কি পারে না, এই নিরুপায় হতভাগ্যকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে আনবার চেষ্টা করতে ? কতো অর্থ অপচয় হয় তার হাতে, কতো উড়ে যায় অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতায়। তার একাংশ খরচ করলেও উচিত মতো চিকিৎসা হতে পারে ছেলেটার। ফিরে পেতে পারে নতুন তাজা জীবন !

স্নেহের করুণায় সারা হৃদয় ছলছল করে ওঠে জিতুর।

মুখে কিন্তু সে তেমনি হৈ হৈ করেই কথা কয়—বই পড়তে খুব ভালবাসিস বুঝি ? কি কি পড়েছিস ?

সমীর লজ্জিত মুখে বলে—কি বা আছে এখানে ! রামায়ণ, মহাভারত, দুর্গেশনন্দিনী আর আনন্দমঠ।

চাঁদসদাগরের পালাগানের কথাটা আর উল্লেখ করে না।

জিতু হতবুদ্ধি হয়ে বলে—শুধু এই ? সে কি রে ?

বইয়ের অভাবে বইপড়া হয় না, এটা কি আবার একটা কথা নাকি !

কলকাতার সমৃদ্ধজীবনে অভ্যস্ত জিতু, অভাবের স্বরূপটা দেখে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না! পারবেই বা কি করে? ছাপার কাগজে মোড়া কলকাতা শহরের বাসিন্দা যে সে! যেখানে জল-স্থল আকাশ অন্তরীক্ষ সবাই অহরহ ছাপার অক্ষরের ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আসছে চোখে খোঁচা মারতে। যেখানে নিষ্ঠা-সহকারে সরস্বতীপুজো পালন করতে হলে চোখে রুমাল বেঁধে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই, সেখানের লোক কি করে বিশ্বাস করবে ছাপার অক্ষরের একটি লাইনের জন্যে কতো লালায়িত হয়ে থাকে একটি তৃষিত প্রাণ!

চোখটা জ্বালা করে ওঠে জিতুর, আর হাসিখুসির ঠাট বজায় রাখতে পারে না। যেন, সকরুণ মমতায় বলে—তুই আর গোটা চার পাঁচ দিন চুপ করে থাক সমীর, কলকাতায় পৌঁছেই আমার প্রথম কাজ হবে তোর বইয়ের সুরাহা করা, তারপর চিকিৎসার। তোদের যুগ্যি কতো বই যে আমাদের বাড়িতেই পড়ে রয়েছে, তার সংখ্যা নেই। দাদার ছেলেমেয়েরা, বোধহয় প্রত্যেক পুজোয় পুজোবার্ষিকীই কেনে আট দশটা। আর তেমনি সব ডাকাত তো। সারা বাড়িতে ছড়ানো আছে সেই বস্তা বস্তা বই। আলমারীতে তুলতে জানে না। পড়ছে, ছিঁড়ছে, ফেলে দিচ্ছে, আবার কিনছে। সুবিধে থাকলে একেবারে বস্তা করে পাঠিয়ে দিতাম তোকে। যাক্, কিছু কিছু করে পার্শেল করবো মাঝে মাঝে, কি বলিস?

বলবে আর কি সমীর! কিছু বলবার ক্ষমতা কি তার আছে আর -
চোখের কোল দিয়ে উপচে পড়ে এক ঝলক আবেগ-তপ্ত অশ্রু।

খেতে বসে ধীরে ধীরে কথাটা ব্যক্ত করে জিতেন।

—রোগটা সত্যিই শক্ত কাকাবাবু। লোকে যা বলেছে নেহাত মিথ্যে নয়। এ একরকম হাড়ে ঘুণ ধরাই। যাক্, ভাববেন না, খুব ভালো চিকিৎসা হয়েছে আজকাল, সেরে যাবে কিছুদিনের মধ্যে!···ঠিক সেরে যাবে। আমি গিয়েই ব্যবস্থা করবো।

পাতের কাছে দুধের বাটিটা বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়ে বিরজা। চোখের জল না সামলালে চলছে না আর।

—ভগবানের আশীর্বাদের মতো তুমি এসে পড়লে জিতু, তোমাকে আর কি আশীর্বাদ করবো বাবা! দীর্ঘজীবী হও, নীরোগ হও, এই প্রার্থনা।

পরদিন চলে যায় জিতু। আশ্বাস দিয়ে যায় অনেক।

দীর্ঘকাল পরে নিতাই স্যাকরার তাসের আড্ডায় গিয়ে বসে সুধাংশু, বিরজা বসে বহুদিন পরে অসমাপ্ত কাঁথাখানি নিয়ে সেলাই করতে।···আর কি? সব তো ঠিক হয়ে গেছে।

বাড়ির আবহাওয়ায় যেন বাজছে কিসের আগমনী সুর।

যেন সমীর ভালো হয়ে গেছে। যেন ওদের জীবনে আর কিছু ভাববার নেই, দুশ্চিন্তা করবার নেই। অনেক দিনের বুকচাপা পাথরখানা বুক থেকে

সরে গেছে বুঝি বা!

আর সমীর?

হাত দিয়ে যদি দিনগুলো ঠেলে দেওয়া যেত!

বস্তা বস্তা বই! কি রকম দেখতে লাগে সে দৃশ্য! হায় ভগবান—সমীরের যদি ডানা থাকতো!

ওষুধ···ইনজেক্শন···ডাক্তার···বৈজ্ঞানিক···খেলার মাঠ···ম্যাটি্রক পরীক্ষা···এসব শব্দগুলো কি অর্থহীন? মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেন? ভালো করে ভাববার শক্তি নেই বলে?

বইয়ের পার্শেল? গ্রাহক নম্বর লেখা কিশোর পত্রিকা? সমীরের নাম লেখা খবরের কাগজের মোড়ক?···এসেছিল নাকি? পাঁচ দিন—ছ'দিন—পঁচিশ দিন—ছাব্বিশ দিন—পাঁচ মাস ছ'মাস—আরো পরে? নাঃ! আসেনি কিছু তো!···আর কতো প্রতীক্ষা করা যায়? এগারো মাসের সঙ্গে আরো সাত মাস যোগ করলে কতো হয় সেইটাই এখন হিসেব করে সমীর···ম্যাটি্রক পরীক্ষার তারিখের কথা আর মনে পড়ে না।

অনেক বলে কয়ে ঘরের এপাশে চৌকিটা আনিয়েছে সমীর। সারাদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক্ হয়ে।···কতো রঙের বৈচিত্র্য! কি রকম ক্ষণস্থায়ী! এই ভরে যাচ্ছে সোনালী আলোয়, তখুনি নামছে অন্ধকার! ভোরের সোনালী মায়া মুহূর্তে প্রখর হয়ে উঠছে।

পিয়নের পদশব্দের আশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকবার ধৃষ্টতা আর নেই, কল্পনায় সম্ভব অসম্ভব সর্ববিধ বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে করে, আর সেটা মিটে যাবার মেয়াদ দিয়ে দিয়েও দিনের হিসেব আর মিলিয়ে উঠতে পারে না এখন!···তবু—বাইরের দরজার কড়া নড়লেই প্রাণটা ছ্যাৎ করে ওঠে। হঠাৎ যদি ভারী ভারী গলায় বলে ওঠে কেউ—"সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কে আছেন? সই করে নিতে হবে, পার্শেল আছে"—কি করবে সমীর? কি করে বইবে সেই সৌভাগ্যের ভার?

ডাকঘরে গিয়ে খোঁজ নিতে নিতে এলে গেছে সুধাংশু, তবু এখনো পথে ঘাটে বিপিনের সাথে দেখা হয়ে গেলে প্রশ্ন করে—চিঠি আছে না কি বিপিন? কিম্বা কোনো পার্শেল টার্শেল?

বিপিন কখনো ঘাড় নেড়ে চলে যায়, কখনো ঠাট্টা করে—"পার্শেল একটা এবার আমিই আপনার নামে পাঠাবো বাঁড়ুয্যে মশাই, একটা না এলে দেখছি চলছে না আপনার।"

বিরজার সেই কাঁথাখানা খানিকটা এগিয়ে আবার তোলা আছে সাঙায়। আজকাল আবার ছুঁচে সুতো পরাতে পারে না সহজে। চোখটা কেমন ধোঁয়া

ধোঁয়া লাগে।

মজুমদার বাড়ি মিস্তিরি লাগবার কথা ছিল। আলোর সেই কণিকাটুকুর দিকে এখনো তাকিয়ে থাকে বিরজা!

কিন্তু জিতুই কি মিথ্যাবাদী?

সবটাই তার অভিনয়?

তাই বা বলা যায় কি করে? আকাশ কি মিথ্যাবাদী? সোনালী মেঘ কি তার অভিনয়? মেঘই তো শুধু চলমান নয়? মানুষও যে প্রতিনিয়ত চলছে। অহরহ রং বদলাচ্ছে তার ঘটনার ধাক্কায়, পারিপার্শ্বিকতার আলোকে!

সোনালী রং টুকুই বা স্থায়ীত্বের দাবী করবে কেন?

না, জিতুকে আমরা দোষ দিতে পারি না। ভেবে দেখলেই ধরা পড়বে—প্রত্যেকের মনের আকাশেই এরকম অসংখ্য সদিচ্ছার রঙিন মেঘ বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে ঘটনাচক্রের প্রখর তাপে, অকারণ আলস্যের কুয়াশায়।

তবু তো জিতু খেতে, শুতে, বেড়াতে, কাজ করতে অনেক বার অনেক সময় ভেবেছে—"কী বিশ্রী দেরি হয়ে যাচ্ছে—ছি ছি! নাঃ এইবার সত্যিই কিছু করা দরকার।···অন্ততঃ খুব কতকগুলো বই পার্শেল করে পাঠিয়ে দিলেও হয় বেচারাকে—গোটাকতক টাকা জমা দিয়ে এলেই হয় একখানা খবরের কাগজের অফিসে—"

মানবতা

প্রবাদ আছে—একাগ্র সাধক দাবা খেলোয়াড় 'আড়াইচালে'র মহামুহূর্তে নিজের ঘরের চালে আগুন লাগার সংবাদে প্রশ্ন করে—'কাদের আগুন?'

কথাটা বাড়াবাড়ি!

নরেশ সিংহীর বাড়ির এই দাবার আড্ডায় একনিষ্ঠ সাধকের অভাব নেই, তবু এতো বড়ো জমাটি আড্ডাটা মুহূর্তে ভেঙে পড়লো প্রতিবেশী, ঘরের আগুনের আভাসে।

খেলাটা দু'জনের, আড্ডাটা অনেকজনের। দু'জন বাদে সকলেই দর্শক বটে, তবে আগ্রহ, উৎকণ্ঠা, আপশোষ, অভিনিবেশ—কোনটাই মূল খেলোয়াড়দের থেকে কম নয় কারুর। তবু,—

প্রত্যেকেই চমকে স্তব্ধ হয়ে গেলো—'আই-সি-এস'-এর বাড়ির নিদারুণ সংবাদবাহী আর্তনাদের আঘাতে!

বুক ফাটা আর্তনাদ!

বুঝতে ভুল হয় না কারুর। সামনের বাড়ির আলোকোজ্জ্বল তিনতলার জানলার দিকে উর্ধ্বমুখে তাকিয়ে প্রত্যেকেই 'হায়' 'হায়' করে উঠলো।

—যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেলো! এতো কাণ্ড, এতো কারখানা, শেষ পর্যন্ত

গেলোই ছেলেটা !

শুধু বিধু মাস্টারের মুখে কথা নেই। একবার মাত্র 'ঈস্' করে, দুই হাতে দুই রগ চেপে ধরে স্তম্ভিত হয়েই রইলেন বিধু মাস্টার।

সবাই এক পাড়ার বাসিন্দা না হলেও নরেশ সিংহীর সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে এ পাড়ার সঙ্গে একাত্মবোধ আছে।

'আই-সি-এস্'-এর বাড়ির খবরও অজানা নয় কারুর।

—উঃ ছেলেটার জন্যে কী অসম্ভব সম্ভবই না করেছেন ভদ্রলোক !

—সে কথা বলতে ! দু'হাতে পয়সা বৃষ্টি করেছেন একেবারে !

—সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করানো—আমাদের দেখাতো এই একটিই কেস।

—তা'র পরিণাম শেষ অবধি এই ! হুঁ ! একেই বলে নিয়তি ! পয়সা দিয়ে প্রাণ কিনতে পারলে রাজা-রাজড়ারা অমর হয়েই থাকতো !

—তবু ভগবানের অবিচারই বলবো ! এতোটা চেষ্টার একটা পুরস্কার নেই ?

—এইটিই কোলের ছেলে ছিলো না ?

—হ্যাঁ ! আর কী ছেলে ! যেন রাজপুত্তুর !···আশ্চর্য, ওই রকম ঘরেও এই রোগ ! অথচ আমাদের ধারণা—দারিদ্র্যে, অযত্নে, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবেই বুঝি—

—কিছুই কিছু নয় রে দাদা, সবই বিধাতার বিধান ! যার ভাগ্যে যখন যা লেখা থাকে !

মন্তব্যের ওপর মন্তব্য !

আফশোষটা মাঝে মাঝে উঠে আসে উদাস দার্শনিকতার কোঠায়।

শুধু বিধু মাস্টার ক্ষুব্ধ হৃদয়-বেদনা ব্যক্ত করেন—দুই হাতে দুই রগ চেপে ধরে বসে, থেকে থেকে এক একটা 'ঈ-স্' শব্দে।

মানুষের মানবতা তো এইটুকুই !

অপরের বেদনাকে নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করে নেওয়া !

'আই-সি-এস্' এদের কেউ নয়, প্রত্যক্ষ আলাপও নেই কারুর সঙ্গে। বরং উন্নাসিক বলে বরাবর পাড়ায় অখ্যাতি আছে।

কিন্তু সে কথা আজকের জন্যে নয়।

দুঃখের দিনে, শোকের দিনে, বিপদের দিনে, একে অপরের দোষ-ত্রুটি মনে রাখবে, মানুষ কি এমন নিকৃষ্ট জীব ?

সদ্য পুত্রহারা জননীর দুরন্ত আর্তনাদ তখন বিলাপের রূপ নিয়েছে !

অন্তহীন অনুযোগ !

বুদ্ধিহীন আবেদন !

নিষ্করুণ বিধাতার নিষ্ঠুর নিয়মকে অভিশাপে জর্জরিত করার সঙ্গে

সঙ্গেই, করুণাময় বিধাতার কাছে সকাতর অনুনয়ে অসম্ভবের প্রার্থনা। ভাষা বোঝা যায় না, শুধু অনুমান করা যায়।

নিত্য পরিচিত বলেই যায়।

—এই একটা সময়—সিংহীকর্তা ক্ষোভের হাসি মিশিয়ে বলেন—যখন ফ্যাসান-ট্যাসান সব উপে যায়!…জানি তো 'আই-সি-এস্' গিন্নীকে, মাপা-জোপা হাসি, কাটা-ছাঁটা বুলি, সরু সরু ফল্‌স গলায় কথা, সভ্য ভব্য মার্জিত!…আর এখন দেখো—সেই পেটেন্ট বাঙালী মেয়ের ধাঁচ্! সেই আছড়াপিছড়ি কান্না!

—আরে ভাই, পুত্রশোকের কাছে আবার ফ্যাসান!

*   *   *   *

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা!

যেন 'আই-সি-এস্' গিন্নীর এই শোচনীয় দুর্বলতাটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার জিনিস!

—আচ্ছা ছেলেটা তিনতলার ঘরে থাকতো না?

—ইদানীং তাই থাকতো।

—কান্নাটা কিন্তু নীচের তলা থেকে উঠছে মনে হচ্ছে।

—খুবই স্বাভাবিক! ভদ্রমহিলাকে ঘর থেকে সরিয়ে এনেছে বোধহয়।

—দরজায় গাড়ির বাড়াবাড়ি বিশেষ দেখছি না কেন? বড়লোকের শোক তো সমারোহের ব্যাপার!

—এসে যাবে।… ফোনে ফোনে খবর রাষ্ট্র হচ্ছে এখন, এই আর কি! আর একটু বসলেই দেখতে পাবে, লোকে-লোকারণ্য, ফুলের ঘটা।

—তিনতলার জানলায় কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন কিন্তু…মানে, একটি মহিলা।

—আত্মীয়া-টাত্মীয়া হবে কেউ।

হঠাৎ থেমে গেলো কান্নাটা।

কে যেন আচমকা এসে মুখর শোকের গলাটা টিপে ধরলো।

—ভদ্রমহিলা বোধহয় ফেন্ট হয়ে গেলেন!

—এতোক্ষণ যে হননি এই আশ্চর্যি!

—নাঃ, ভারী দুঃখের ব্যাপারটা ঘটে গেলো! আহা!…কে ওখানে? মনোহর? কি চাস?

—রাতটার মতন ছুটি দিতে হবে বাবু!

—কেন? কেন হে বাপু? আবার আজকে রামলীলা আছে বুঝি কোথাও?

—না বাবু, মুড়িওলি কুসুমের ছেলেটা মারা গেলো—এই মাত্তর। শ্মশানে যেতে হবে।

—অ্যাঁ! মুড়িওলি কুসুমের ছেলে! হরি বলো!…তাই নাকি? ও—!… হয়েছিলো কি?

—আর কি বাবু, কাল রোগ !

—কাঁদছিলো কে ? কুসুম নাকি ?

—তা'ছাড়া আর কে ? ছেলে আর মা বৈ তো ত্রিজগতে কেউ নেই ওদের !

—আচ্ছা—হ্যাঁরে, মিত্তির সাহেবের বাড়ির খবর জানিস ?

—ওর আর খবর কি বাবু, ছেলেটা শুষছে, বাবুরা খাচ্ছে মাখছে, টি-পার্টি করছে, আর সায়েব ডাক্তার আনছে।

—আচ্ছা ! আচ্ছা ! কোথায় যাচ্ছিলি যা। খুব লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোদের আজকাল।

—হবে না কেন বাবু, বড় লোকের রীত-চরিত্তির দেখেই হয়।...পুত্তুর শোকে অধীর হয়ে কাঁদছিলো মাগী, সায়েববাড়ির দরোয়ান এসে ধম্‌কে থামিয়ে দিয়ে গেলো ! বলে কিনা—ছেলের 'ভারী অসুখ', কান্না শুনে গিন্নীর বুক ধড়ফড় করছে ! অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

—খুব অন্যায় বলেনি ! মুমূর্ষু ছেলের মা !...তা'ছাড়া রোগীর পক্ষেও একটা ব্যাড্‌ এফেক্ট ! বলি যাচ্ছিস তো, কাল সকালে ঠিক সময় আসবি ?

উত্তর না দিয়েই চলে গেছে মনোহর !

* * * *

মিনিট খানেক স্তব্ধতা ! আশাভঙ্গের ক্ষোভটা সামলে নিতে যে সময়টুকু লাগে।

—ব্যাপারটা তা'হলে এই !...আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছিলো—মিসেস মিত্তিরের মতন মহিলা, এরকম 'রাফ্‌'ভাবে কান্নাকাটি !...

—তোমার চাকর যে ভয় জন্মিয়ে দিলো হে সিংহী, মুড়িফুড়ি খাওয়া হয়, ওই মাগীর কাছ থেকে কিনে এনে নাকি ?

—খোদা জানেন ! আমার মালিক তো ওই মনোহর।...ওদের কি আর এ সম্বন্ধে কোনো সেন্‌স্‌ আছে ?

—থাকলে কি আর এইভাবে দেশে রোগ বিস্তার করে ? এদের মতো অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকেই তো উচ্ছন্ন দিলো দেশটা ! হয়তো—এইসব রুগীকে নিয়ে এক বিছানায় শুচ্ছে, এক বাসনে খাচ্ছে ! ওদের রোগ হবে না তো হবে কার ? বেঁচে যে থাকে কি করে—এই আশ্চর্য !

—যাক্‌ গে ভাই যেতে দাও। হবে নাকি আর এক হাত ?

—সাজাও—বেশ মেরে এনেছিলাম তখন চৌধুরীকে। সব গোলমাল করে দিলো মাগী !...আমাদের এই হতচ্ছাড়া দেশের মতন শোক জাহির করবার এমন বীভৎস প্রথা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই !...চৌধুরী উঠছো ?...তা'হলে ?...মাস্টার, বসবে নাকি ?

এতোক্ষণ পরে বিধু মাস্টার রগ থেকে হাত সরান। তাচ্ছিল্যসূচক একটা হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন—আরে ধুত্তোর ! আজ আর জমবে না। মেজাজ-ফেজাজ বিলকুল খারাপ করে দিয়েছে, অমন জমাটি খেলাটা ভেস্তে গেলো !

বিধু মাস্টারের একার নয়—

প্রত্যেকের মনেই আর একটা 'জমাটি খেলা ভেস্তে যাওয়া' গোছ ফাঁকা ফাঁকা ভাব।

মিসেস মিত্তিরের জায়গায় মুড়িওয়ালি কুসুম! ধেৎ!

যেন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!

দরদী মানব হৃদয় তো অপরকে 'আহা' করবার জন্যেই 'মুখিয়ে' থাকে, কিন্তু সুযোগটা পাওয়া চাই তো? অট্টালিকাখানায় আগুন ধরে গেলে যেমন আশ মিটিয়ে 'আহা' করা যায়, চালা ঘরখানার জন্যে তেমন হবে? 'আহা'-র বাজে খরচ কে করতে চায়?

স্বজাতি

এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে চট করে ছোট বৌয়ের স্নোর শিশিটা খুলে এক খাবলা তুলে নিলো মেজবৌ শিবানী। এটা হচ্ছে সংগ্রহ, এর ঘরে দাঁড়িয়ে মুখে ঘষা চলবে না। চলে যেতে হবে ছাতের সিঁড়িতে কি পশ্চিমের বারান্দায়, নিদেন পক্ষে বাথরুমে। কিন্তু এতো লুকোচুরিতেই কি স্বস্তি আছে? কি করে যে ধরে ফেলে ওরা! রগড়ে রগড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেও ধরে।

যেই ওদের সামনে যাবে, ঠিক দেখবে, তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁকা বাঁকা হাসছে—আর নিজেদের মধ্যে কেমন একটা ইশারা চালাচ্ছে—বড়জা, ছোটজা, আর বিধবা ননদ কনক।

স্নো পাউডার মাখা যে শিবানীর পক্ষে বে-আইনি, অনধিকার চর্চা, তা' কি আর নিজে জানে না সে? কতোদিন ভাবে—দূর ছাই দরকার নেই আর, পোড়ার মুখ পুড়ে থাকাই ভালো। কিন্তু পারে না, কিছুতেও লোভ সামলাতে পারে না। রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে এসে সেই ঘামঘাম তেলতেলে মুখখানা নিয়ে পাঁচজনের সামনে বেড়াতে কি বিশ্রীই যে লাগে। তাই সুবিধে পেলেই এঘর ওঘর থেকে সংগ্রহ করে নেয় পাউডার স্নো, যখন যা জোটে। বাড়ির লোকও অবিশ্যি চালাক হয়ে গেছে, ওই লোভনীয় বস্তুগুলোকে নিত্যি নতুন জায়গায় বদলে রাখে, নয়তো চাবির ভেতর তুলে ফেলে। তবে অসাবধান বলে কথা। —আজকাল আবার ছোটবৌয়ের বছর আষ্টেকের মেয়েটা শিখেছে মুখের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে, অসাবধানতাটা তারই বেশী। নিজস্ব একটা থাকলে এ চৌর্যবৃত্তির দরকার হয় না।

তুচ্ছ বস্তু!

অথচ এই তুচ্ছ বস্তুটাই শিবানীর কাছে কী দুর্লভ! সংসারে এমন উদার ব্যক্তি কেউ নেই যে, শিবানীর এই মর্মান্তিক অভাবটা বোঝে। নিজের মা রয়েছে তার, পুজোর সময় যাহোক একখানা শাড়ীও তো পাঠায় আঁচলে সিঁদুর ঠেকিয়ে! দু'একটা প্রসাধনসামগ্রী পাঠালেই কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

তা' নয়, মাও কঠোর দৃষ্টি হানবে মেয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতাটুকুর দিকে।

কবে যেন একদিন এইটুকু ধরে ফেলে মেয়ের মুখের জন্যে চুনকালির ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

সত্যিই তো স্বামী যার নিরুদ্দেশ, তার মুখে চুনকালি ছাড়া আর কি বা মানায়?

কিন্তু নির্বোধ শিবানী কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলেই দৈবাৎ কোনদিন অহেতুক একখানা ফর্সা কাপড় পাট ভেঙে পরতে নেই তাকে, তেলচিটে মুখখানায় লাগাতে নেই একটু সাবান স্নো, আর্শির সামনে দাঁড়াতে নেই দু'মিনিট।

অন্ধকারে ছাতে, আন্দাজে আন্দাজে মুখটা মেজে ঘষে, চুলে একটু হাত বুলিয়ে অনেকক্ষণ আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে শিবানী। ধরো এমন যদি হয় হঠাৎ 'একজন' রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ঠিক এবাড়ির দরজায় এসেই ওপর দিকে মুখ তুলে চায়, আর সঙ্গে সঙ্গে শিবানী ছাত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তায়। লোকটা পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠে, ছেলেমানুষের মতো আছড়া-আছড়ি করে, শিবানীকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু কোথায় শাবানী? শিবানীর নিথর দেহটাবেই শুধু পায় সে।

সেই হতভাগ্য লোকটা অবশ্য শিবানীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী।

হাড়ে হাড়ে বুঝবে সে, শিবানী এমন সস্তা বস্তু নয় যে, অবহেলায় ফেলে চলে গিয়ে, বারো বছর পরে এসেও আবার তাকে ঠিকমত পাওয়া যাবে।

চোখের সামনে মরে গিয়ে উদাসীন স্বামীকে জব্দ করবার আরো নানা ছবি, নানা দৃশ্য কল্পনা করতে থাকে শিবানী।

আবার—এও ভাবে এক একসময়. দূর ছাই, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের জীবনটাকে বরবাদ দিয়ে লাভ কি? মরে গিয়ে তো দেখতে আসতে পারবে না সে, বারো বছর পরে ফিরে এসে মানুষটা "কূলে এসে তরী ডোবার" মতো শোচনীয় মর্মবেদনায় সত্যি আছড়া-আছড়ি করছে কি না।

তার চাইতে—যদি ছাত থেকে নিচে নেমেই হঠাৎ দেখে, সোরগোল পড়ে গেছে বাড়িতে! দীর্ঘকালের হারানো মানিকটিকে ঘিরে আনন্দোচ্ছ্বাসের বান ডেকেছে, লেগেছে প্রশ্নের ঢেউ। মৃদু মৃদু হেসে নবাগত ব্যক্তি সকলের সব কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করছে, আর অন্যমনস্কের ভাবে এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছে।...বোকার মতো তো বলতে পারে না—"সবাইকে দেখছি, কিন্তু কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না কেন?"...তাকাচ্ছে আর ভাবছে "তাইতো—সে মানুষটা গেলো কোথায়? তাকে কেন দেখছি না এই আনন্দের হাটে!"

শিবানী নামতে নামতে থমকে দাঁড়াবে, চোখোচোখি হয়ে যাবে দু'জনের। নতুন করে হবে শুভদৃষ্টি!

শিবানী ভুলে যাবে ঘোমটা টেনে দিতে, ভূপতি ভুলে যাবে অন্যের কথার উত্তর দিতে। তারপর আকস্মিক আনন্দের ধাক্কায় চৈতন্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে শিবানী।...অবশ্য সে চৈতন্য ফিরে পেতে দেরি হবে না। 'স্বামীর স্নেহস্নিগ্ধ

স্পর্শ পেয়ে ধীরে ধীরে'—ইত্যাদি।

কি যেন একখানা বইতে ঠিক এই রকমটি পড়েছিলো শিবানী।

বইতে যা অনায়াসে ঘটে যায়, জীবনে তা মাথা খুঁড়ে ফেললেও ঘটতে পারে না কেন?

কিন্তু একেবারেই যে ঘটে না, তাই বা বলা যায় কি করে!

ভূপতির গৃহত্যাগটাই তো তাই।

বেকার যুবক রোজগারী দাদার কাছে ভাতের খোঁটা খেয়ে—"যদি কখনো মানুষ হই তো গৃহে ফিরিব" লিখে রেখে বাড়ি ছাড়লো, এ ঘটনা তো একাধিকবার পড়েছে শিবানী—গল্পে উপন্যাসে।

সে গল্পের পরবর্তী কাহিনী অবশ্য শুধু 'মানুষ' নয়; 'অতিমানুষ' হয়ে ওঠবার চমকপ্রদ কাহিনী। কিন্তু সেটুকু আর মিললো কই? অমানুষ ভূপতি কোনোদিন আর ফিরলো না! নিজস্ব বেকার মূর্তি নিয়েও না।

প্রথম কিছুদিন সবাই বলেছিলো—'হুঃ রাগ দেখিয়ে বাড়ি ছাড়লেন বাবু! আচ্ছা, জগৎটা দু'দিন ঘুরে আসুন, বুঝুন, কতো ধানে কতো চাল! বাড়া ভাত নিয়ে কে বসে আছে রাস্তায়? ফিরে আসতে পথ পাবেন না বাছাধন।'

সে ভবিষ্যৎবাণী যখন বিফল হলো, 'দুদিনটা' অনেক দিনে গিয়ে ঠেকলো, তখন কিছুদিন ধরে চলতে লাগলো খবরের কাগজের মাধ্যমে আবেদন নিবেদন।

'কেটে কুচি কুচি করলে রাগ যায় না'—এই মনোভাব নিয়ে ভূপতির দাদা বাঙলা ইংরাজী দু'টো ভাষার মারফত নানা কাগজে মনোবেদনা জানাতে লাগলেন—"ভূপতি, ফিরে এসো। আমি অনুতপ্ত, কেউ কিছু বলবে না। তোমার প্রস্থানে মেজবৌমা শয্যাগত, যদি শেষ দেখা দেখতে চাও শীঘ্র এসো। টাকার প্রয়োজন থাকলে ঠিকানা জানাও, অবিলম্বে পাঠাচ্ছি।"

'পতিবিরহে শয্যালীনা মেজবৌমা' বিপুলগোষ্ঠীর রান্নাবান্না সেরে এসে দুপুরবেলা বসতো কাগজগুলো নিয়ে। কে যেন কোন্ ফাঁকে রেখে যেতো তার ঘরে। সে যেন না ভাবে, কিছুই করা হচ্ছে না তার স্বামীর জন্যে।

নিরুদ্দেশের কলম থেকে চোখ চলে যেতো শিবানীর কর্মখালির কলমে। সম্ভব অসম্ভব সবগুলো দেখতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আর মনে মনে হিসেব করতো—'অনুতপ্ত দাদার' এ আবেদন যদি ভূপতির চোখে পড়ে, কর্মখালিগুলোও পড়বে না কি? তবে? ভালোমন্দ যাই হোক একটা যোগাড় করে নিয়ে অনায়াসেই তো বড়োমুখে আবার সে ফিরতে পারে বাড়িতে?

'মেজবৌমার সঙ্গে শেষ দেখার' আবেদনটাও যখন ব্যর্থ হলো, তখন ঘরের লোক রেখে-ঢেকে বলতে লাগলো "নিশ্চয় 'সন্ন্যাস'"! বাইরের লোক বিনা দ্বিধায় বলতে লাগলো "নিশ্চয় অপঘাত"!…অতএব পয়সা খরচ করে খোঁজাখুঁজি করবার মানে হয় না কিছু আর।

ভূপতির বড়ো থালাখানায় ভাত খেতে লাগলো—একটু বড়ো হয়ে ওঠা ভাশুরপো বলাই, ভূপতির ছেঁড়া ছাতাটা বৃষ্টির দিনে ব্যবহার করতে দেওয়া হলো—চাকর সতীশকে।

একাকিনী শিবানীকে আগলাতে কনক কিছুদিন নিজের চিলেকোঠার একফালি ঘরটুকু ছেড়ে নেমে ভূপতির ঘরে এসে শুয়েছিল, নানা সুবিধে অসুবিধেয় শিবানীই শেষ পর্যন্ত উঠে গেছে কনকের আস্তানায়।

বাড়তি একখানা ঘর না হলে অচল হয়ে উঠেছিলো বড়ো জায়ের। ছেলেরা বড়ো হয়েছে, জামাই আসে যখন তখন।

ভূপতি থাকলে এ সমস্যার কি সমাধান হতো তাই মাঝে মাঝে ভাবে শিবানী। শুধু ভূপতির জামাকাপড়গুলো শিবানীর সম্পত্তি হিসেবে আছে এখনো। ওর সাবেক ঘরের খাটের তলায় রয়ে গেছে ট্রাঙ্কটা। 'কেউ যে টেনে বার করে ফেলে দেয়নি' এটা তাদের মহত্ত্বই মনে করে শিবানী। প্রায়ই তো ভাশুরঝি গীতা বলে "তোমাদের জামাই এসে তোমাদের বাড়ি শোবে কি? যা মশা! খাটের তলায় অতো জিনিস বোঝাই থাকলে মশা হবে না? আমার শ্বশুরবাড়িতে ওটি হবার জো নেই। খাট চৌকীর তলা দু'বেলা মোছা চাই।"

ছাতে ঘুরতে ঘুরতে শিবানীর কি সময়ের জ্ঞান ছিলো না? কমক্ষণ তো যায়নি। নিচে যে কতো মন্তব্য হয়ে গেছে তার সম্বন্ধে কে জানে।

নিতান্ত অন্যমনস্ক চিত্তে নেমে আসতে আসতে অবাক্ হয়ে দেখে সত্যিই সোরগোল পড়ে গেছে বাড়িতে। দালানের, সিঁড়ির, খাবার ঘরের তিনটে আলোই জ্বলছে একসঙ্গে, ধবধব করছে বাড়িটা কোলাহলে মুখরিত।

না ভূপতি নয়, ভাশুরঝি গীতা বেড়াতে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, তিন ছেলেমেয়ে আর বর নিয়ে। খাবার ঘরে বসেছে চা জলখাবারের পাট। হাসি গল্পের ছটায় উথলে উঠেছে বাড়ি।

মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিবানী। চট্ করে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হয় না। কী অজ্ঞান হয়েছিলো সে এতোক্ষণ! ওরা এসেছে—নিশ্চয় দু'দণ্ড বসে তবে খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে, সে তো কম সময় নয়? কে চা-টা তৈরি করলো? ছোটবৌয়ের কোলের ছেলের সর্দিজ্বর, সে তো দু'দিন কুটোটি ভাঙছে না সংসারের। অবশ্যই ঠাকুরঝির ঘাড়ে পড়েছে।...হায় হায়, কী দুর্মতি হয়েছিলো শিবানীর! আশ্চর্য! নিচেকার এতো গোলমাল, তার ছিটে বিন্দু কি ছাতে পৌঁছতে নেই? হয়তো বা ছাতে ঠিকই পৌঁছেছিল, পৌঁছয়নি শিবানীর কানে।

গীতার গলাটা যেমন শানানো তেমনি চড়া, দূরে থেকেও প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। সিঁড়ির মাঝখানের চৌতারায় বসে পড়েছে শিবানী, আর শুনতে পাচ্ছে—ছুরির মতো কেটে কেটে উচ্চারণ করছে গীতা—"খুব নিন্দে

করছিলেন আমার পিসশাশুড়ী, অবাক্ হয়ে বললেন—'হ্যাঁ বৌমা, তোমার খুড়ীরও কিছু আক্কেল নেই? ভিটের অকল্যাণ হয় ওতে। মাছ-ফাছ খাচ্ছেন তো ছিঃ-ছিঃ!'

খুড়ীর আক্কেল!

স্পষ্ট একটা হাসির ঢেউ খেলে গেলো ঘরে।

—আক্কেলওয়ালীর আক্কেল দেখছিস তো? তিনঘণ্টা ছাতে গিয়ে বসে আছেন!

স্বরটা চাপা; তবে নিতান্ত পরিচিত বলেই ধরা যায় বিধবা ননদ কনকের।

আবার গীতার স্পষ্টস্বর—পিসশাশুড়ী ত বলছিলেন—বারো বচ্ছর হয়ে গেলে বৈধব্য নেওয়াই বিধি। আর সত্যি এও বলি, এখনো কি তোমরা আশা করছো? বেঁচে থাকলে কি আর এতোকাল ধরে এমনই রাগ পুষে বসে থাকতেন মেজকাকা, যে এক আঁচড় চিঠি পর্যন্ত দিতেন না?

চিঠির আশা তো প্রতিমুহূর্তেই করে শিবানী। একযুগ ধরে অহরহই করছে। পিয়নের আসার সময়গুলো মুখস্থ হয়ে গেছে তার। কিন্তু চিঠি আসে না বলেই মানুষটা আর কোনোদিনই আসবে না এমন ভয়াবহ আশংকা তো করেনি একদিনও! এই এতোক্ষণ ধরে তার আসার কথাই তো ভাবছিলো।

কি বিশ্রী কথাগুলো গীতার।

গীতার মার কথাগুলোও এমন কিছু সুশ্রী নয়। তিনিও মেয়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন—মনে মনে আর কে না জানছে? তা' ওর যদি নিজের হুঁশ না থাকে, মুখের ওপর বলবে কে? মাছ ছাড়বে মেজবৌ! হুঃ। ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা লোভ ওইটিতে!...শুধু মাছ? ডিম পিঁয়াজ কি না খাচ্ছে?

'ছি-ছি-ছি!...'

এবারে ঘরে একটা 'ছি-ছি'র ঢেউ খেলে যায়।

এতো স্পষ্ট 'ছি-ছি' ভাব বোধকরি এর আগে কারো মনে আসেনি, গীতার পিসশাশুড়ীর জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চোখ ফুটলো বলেই অনেক দিনের জমানো ধিক্কার একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো।

কথার জের টানেন বড়ো জা—খাওয়া, পরা, কিসে লোভ নেই? ফুলকাটা ছিটের ব্লাউজগুলো দিব্যি পরছে! শুধু তাই? বুড়েমোগীর এখনো এমন প্রবৃত্তি, চুরি চামারি করে মুখে পাউডার ঘষে মরেন!...কিসের সুখে ফিট্‌ফাট হয়ে বেড়াবার সাধ হয় প্রাণে, তাও জানি না।...এই তো কনক, সেই বাইশ বছর বয়েস থেকে এক বস্ত্র সার করে বসে আছে, কেউ কখনো বলতে পারবে না একখানা সাবান নিয়ে মুখে বুলিয়েছে কোনদিন! চোখের ওপর এমন দৃষ্টান্ত দেখেও—

শিবানী অবাক্ হয়ে ভাবে কনকের সঙ্গে ওর তুলনা কেন? কনকের না হয় মাখতে নেই, বিধবা মানুষ। শিবানীকেও ওরা একেবারে কনকের পর্যায়ে ফেলছে

কেন ? কনকের মত সাজ করে বেড়াবে নাকি শিবানী ? আর হঠাৎ যখন ভূপতি এসে হাজির হবে ? বলবে কি ?···এমন তো হতে পারে দরজা খুলে দিতে শিবানীই ছুটে যাবে, কে না কে ভেবে !···

বড়ো জা কথার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন—যাই ভাগ্যিস দেবতার মতন ভাশুর পেয়েছিল তাই তরে গেলো ! এখনো পর্যন্ত আমার সঙ্গে সমান করে চ্যাটালো চ্যাটালো পাড়ের মিহি মিহি শাড়িগুলো যোগাচ্ছেন ! ছিঁড়তে না ছিঁড়তে সেমিজ জামা, দেখিস তো ? তা' এমন আক্কেল নেই যে বলবে– "ও সবে আর দরকার নেই আমার। কেন মিথ্যে এতো খরচ—"

সিঁড়িতে বসে থেকে থেকে সিমেণ্টের মেঝের সঙ্গে যেন পুঁতে যাচ্ছিলো শিবানী, পাথর হয়ে যাচ্ছিলো। তবু শেষের কথাটায় চমকে ওঠে।

দরকার নেই !

সেমিজ ব্লাউজেও আর দরকার নেই তার ! এমনিতেই তো দশ হাত শাড়ির আঁচলের 'খাটো'তে খাটো হয়ে থাকে মনটা, রোগা পাতলা ছোট বৌয়ের, আটচল্লিশ ইঞ্চি বহর এগার হাত শাড়ির আঁচলটা নিয়ে হিমশিম খাওয়া দেখে হিংসেয় গা জ্বলে যায়। এর পরে আবার আড়ে দীর্ঘে এতোখানি দেহটা নিয়ে, হাড়গিলে কনকের মতো খালি গায়ে আঁচল জড়িয়ে বেড়াতে হবে—ভাশুর, দেওর, চাকরবাকর সকলের সামনে ?

ভাশুরের 'দেবত্বের' সুযোগ নিয়ে তা'হলে এতোদিন অনেক কিছু বাড়ী প্রাপ্য আদায় করেছে শিবানী ?

শুধু সাবান স্নো নয়, সেমিজ ব্লাউজও তার অনধিকারচর্চা ?

স্পষ্ট এতো কথা ভাবতে পারে না বোকা শিবানী, নিরুপায় একটা আক্রোশে চোখে জল এসে যায় হঠাৎ। বোকা বলেই জানে না, ন্যায্যমত দেবার লোক না থাকলে খাওয়াটাই অনধিকার-চর্চা, তা পরা ! সেটা তো দ্বিতীয় প্রয়োজন।

ভাশুর 'দেবতা' বৈ কি ! কে করে এতো ?

কী সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলাবলি করছে ওরা ?

কার কথা বলছে ?

এ আলোচনায় শিবানীর কোনো যোগ আছে ?

—মেজকাকা গেছেন বারো বছরের বেশী হয়ে গেছে বোধ হয় তাই না মা ? আমি তো তখন সবে ক্লাস 'এইটে' না 'নাইনে' পড়ি।

—না, না, বারো বছর হয়ে যায়নি এখনো—এই সামনের পুজো গেলে পুরবে। মনে মনে বোধ হয় কি একটা মেয়েলি হিসেব করে নিয়ে কনক বলে—হ্যাঁ, বেশ মনে আছে কাত্তিকের প্রথমে দিকে। চোত, পোষ, ভাদ্দর, কাত্তিককে যে 'অগস্ত্য মাস' বলে, তা মিথ্যে নয়। অগস্ত্যযাত্রাই হলো।······তুমি তখন সবে আঁতুড় থেকে উঠেছো, না বড়ো বৌ ? কানাই হলো তো সেবার ? এই

ভালো চাকরিটা হলো ছোড়দার।...

কানাইয়ের জন্মতারিখ, ছোটকর্তা বিভূতির নতুন চাকরি, কনকের জ্যেঠশ্বশুর মবার অশৌচ ইত্যাদি অনেকগুলো খুচরো সংখ্যা নিয়ে অঙ্ক কষে ভূপতির গৃহত্যাগের নীট্ তারিখটা আবিষ্কার করতে বসে ওরা।

কিছুক্ষণ ধরেই চালায় অংকটা।

হতবুদ্ধি শিবানী আড়ালে বসে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

দুই আর দুইয়ে চার না করে, দেড় আর আড়াইয়ের যোগফলে চারকে দাঁড় করাবার মানেটা কি?

ওরা কি পাগল?

বাঙলার সাতচল্লিশ সালের তেসরা কার্তিক শুক্করবার; কোজাগরীর আগের দিন।...এই তো!

এমন পরিষ্কার মার্কামারা দিনটাকে ঠিক করতে সবাই মিলে গলদঘর্ম হচ্ছে! শিবানী ওখানে থাকলে কথা পড়তেই যে বলে দিতো। কিন্তু শিবানীর পা দুটো কে বেঁধে রেখেছে? কিছুতেই যেন উঠে যেতে পারছে না!

গীতার চড়া গলাও একটু খাটো হয়ে যায়—পিসশাশুড়ীই বলছিলেন—তোমাদের কুলগুরুকে বরং আনাও একদিন, দীক্ষা দেবার ছুতোয় ও কাজটাও সারা হয়ে যাক।

—দেখি তাই!...তুই শুধু চা মিষ্টি খেয়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরবি, শাশুড়ী খোঁটা দেবে দেখিস। এতো করে বললাম খাওয়া দাওয়া করে যাবি, তা' এসেই 'যাই যাই' করছিস।

—বাবা, আসা কি হয়ে ওঠে? কতো কাঠখড় পুড়িয়ে তবে এইটুকু ছুটি।...এ আর তোমাদের বাড়ির বৌদের আয়েস নয়! কার ছেলের একটু সর্দি হয়েছে, তিনি আর ঘর থেকে বেরোবেন না, কার গরম লাগছে—তিনি তিন ঘণ্টা ধরে গায়ে ছাতের হাওয়া লাগাচ্ছেন। বাব্ বাঃ।

কতোই বা বয়েস গীতার, কথা কয় এতো পাকা পাকা!

অতঃপর গীতার ছেলেদের হৈ চৈ ওঠে, সেই ফাঁকে নেমে আসে শিবানী।

গীতা আধাআধি নিচু হয়ে একটা নমস্কারের মতো করে বলে—কি গো মেজখুড়ী? দর্শন মিললো তা'হলে? আমি তো ভাবছিলাম আজ আর সে সৌভাগ্য হলো না, চলেই যাচ্ছিলাম।...ঘুম দিচ্ছিলে নাকি ছাতের হাওয়ায়?

শিবানী অস্ফুটে একটু যা বলে, সেটা ঘুমের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে ঠিক বোঝা যায় না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গীতা আর একটা অদ্ভুত কথা বলে বসে—তুমি মেজখুড়ী মনে কোরো না কিছু, খুব সেরেছো আজকাল। এই তো মাস দুই আগেও

এসেছিলাম, আজ তার থেকে ঢের 'ইয়ে' দেখছি। মুখের রঙটা পর্যন্ত ধবধবে ফরসা হয়ে গেছে।

কে জানে এটা গীতার একটা 'চাল' কি না। স্নো-পাউডারের ইতিহাস শোনার অভিব্যক্তি।

অবিশ্যি বলতে বাধাই বা কি? বেওয়ারিস শিবানীকে 'মোটা হয়েছে' বলে খুঁড়লে কিছু আর পাপে ডুববে না গীতা। নজর লেগে শিবানীও ক্ষয়ে যাবে না।

শিবানীর উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করে না গীতা। বলা নিয়ে কথা। কাউকে কিছু বলবার সুযোগ পেলে কখনো সে সুযোগ নষ্ট করে না সে। বলে নিয়েই এগিয়ে যায় পিসির দিকে, পায়ের ধুলো নিয়ে নিচুগলায় বলে—চললাম বাপু। আমার পিসশাশুড়ীর কথাটা মনে রেখো। অবশ্যি তোমাদের প্রাণে তো লাগবেই. নতুন করে শোক জেগে উঠবে। কিন্তু, বাবা ছোটকাকার কল্যাণটাও তো দেখা উচিত?···বারো বছর পার হয়ে গেলে. আর কিছুতেই সংসারে এইসব অনাচার করতে দেওয়া ঠিক নয়।

গীতা চলে গেলে ছোটবৌ, বড়োবৌ আর কনকের মধ্যে চলে ইশারা আর ফিসফিস।

—'ঠিক নয়', তা কি আর আমরা জানি না? কথাটা তোলে কে?

ছোটবৌ একটু উঁচু স্টাইলের হাসি হেসে বলে—গীতা ঘরের মেয়ে, সাহস করে বললো তাই! শুধু ওর পিসশাশুড়ী কেন. একথা তো কচি ছেলেটাও জানে। আমার সেজমাসীও তো অবাক্ হয়ে বলছিলেন সেদিনকে—'হ্যাঁরে তোর সেই জা এখনো তোদের হেঁসেলে খাওয়া মাখা করে?' নিয়মিত দুবেলা টকটকে করে সিঁদুর পর্যন্ত পরা চাই শুনে তো হেসেই খুন।

বড়োবৌয়ের বাপের বাড়ির দিকেও কাদের কে যেন "সোয়ামী বেবাগী" হয়ে যাওয়ার ছুতোয় 'জন্ম এয়ো' থেকে গেছলো, সেই হাস্যকর কাহিনীর ইতিবৃত্তটা আলোচিত হয়, হেসে খুন হবার সুযোগ এরাও পায় একবার।

অবশেষে—কুলগুরু ডেকে এনে বর্তমান সমস্যার সমাধানটাই সাব্যস্ত হয়।

যেন অনেকদিন ধরে সবাইকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে এসেছে শিবানী, আর নয়। আর বোকা থাকতে রাজী নয় কেউ। শুধু এখনো সাব্যস্ত হয় না ঠিক করে কোন্ তারিখে বাড়ি ছেড়েছে ভূপতি। তিথি নক্ষত্র ধরে শ্রাদ্ধপিণ্ড দিতে হবে তো তার? সেইটাই শাস্ত্রবিধি। বৈধব্যব্রতেরও অনুষ্ঠান আছে বৌক।

ফস্ করে শিবানীকেই একদিন জিজ্ঞেস করে বসলো কনক—গলাটা ভার ভার আর চোখটা ছলছল করে—মেজদা কতোদিন হলো গেছে মেজবৌ?

সাল তারিখ তিথি সবই তো শিবানীর চোখের ওপর জ্বল জ্বল করছে, তবু অমন বিমূঢ় ভাবে বললো কেন—কি জানি ঠাকুরঝি, ঠিক মনে করতে পারছি না তো।

কে জানে কি ভেবে বললো।

হয়তো কিছু ভেবেই বলেনি, অকস্মাৎ উদ্যত আক্রমণের সামনে আত্মরক্ষার

সহজাত বুদ্ধিতে বলে ফেলেছে মাত্র।

ও উঠে যেতেই কনক প্রায় সশব্দ মন্তব্য করে—'তা মনে থাকবে কেন? নি-রোজগেরে লোকটা, গেছে না বালাই গেছে। ভাশুরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তোমার তো চলছে ঠিকই! নিজের খাওয়া মাখা টিপ কাজল পরাটি বজায় থাকলেই হলো!'

*   *   *   *

'বজায় থাকলেই হলো' না হয় শিবানীর ইচ্ছে বুঝলাম, কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধিমান সংসারী ব্যক্তিরা বজায় থাকতে দেবে কেন? ভগবান যাকে মেরেছেন, মানুষ তাকে আশকারা দেবে না কি? সে যদি ধৃষ্টতার বশে রূপ রস আলো বাতাসের দিকে তার লোভের হাত বাড়ায়, সেই হাত মুচড়ে ভেঙে দেবে না নীতি নিয়মানুগত সুস্থ জীবেরা? সব সময় না হোক, কোনো কোনো সময় শাস্ত্রবাক্য মানতে হবে বৈ কি!

পিসি মাসীর শাস্ত্রে নয় বাবা, সত্যিকার শাস্ত্রে আছে, যুগ পূর্ণ হলে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত গণ্য করা বিধি। আইন পর্যন্ত সে শাস্ত্র মেনে চলে। সাল তারিখের হিসেব বেরোয়, কিছু কাঠখড় পুড়িয়ে।

সামনের কোজাগরীতে যুগ পূর্ণ হবে।

কুলগুরুকে ডাকিয়ে এনে 'মারণ-যজ্ঞে'র বিধিব্যবস্থা নেওয়া হয়। শিবানীর মন্ত্রদীক্ষাটাও হয়ে যাক ওই সঙ্গে। অদীক্ষিত শরীর প্রেতাত্মার সমান বৈ তো নয়।

বড়ো কর্তা হাতে করে আনতে চান না, ছোট দেওরকে দিয়ে একজোড়া ধোয়া থান আনিয়ে রাখেন বড়োবৌ, আর কোজাগরের আগের দিন ঘটা করে আনান বড়ো একখানা মাছের ল্যাজা। কনক আবার আলাদা করে নিজের পয়সা দিয়ে আনায় ভেট্‌কী মাছের পেটি আর মৌরলা চুনো।

জিনিসগুলো নাকি শিবানীর বড়ো বেশী প্রিয়। জন্মের শোধ আশা মিটিয়ে নিক। শিবানী যে ভাবে, কনক তাকে ভালোবাসে না, কত ভুল ধারণা সেটা।

পরিপাটি করে বেড়ে ভাতের কাঁসিটা শিবানীর সামনে বসিয়ে দিয়ে ছোটবৌ একটি নিশ্বাস ফেলে বলে—তিনটি জায়ে এক সঙ্গে খেতে বসতাম, মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে যাবে!

কনক থানের আঁচলটা তুলে চোখের কোণে ঘষে।

বড়ো জা একটা খেদ-সূচক ধ্বনি করে বললেন—শাস্ত্রপালার ব্যাপার, না মেনে তো উপায় নেই। আবার দেখো—বিশ বছর পরে নিরুদ্দেশ মানুষ ফিরে এসেছে, এমন গল্পও শুনেছি।

গল্পে কি না শোনা যায়?

গল্পের গরু যে গাছে ওঠে! গোয়ালের গরু পারে তাই? না লোকে সেই ম্যাজিক দেখবার আশা করবে?

রাতটা পোহায়—

সৌভাগ্যবতীদের চোখে দেখা নিষেধ। কনক একাই যায় মেজবৌকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে। শাস্ত্রীয় যাবতীয় দুঃসহ কর্তব্য সেরে বাড়ি ফিরে দরজার গোড়া থেকেই ডুকরে ওঠে—লক্ষ্মীপুজোর দিন, আজ ঘরের লক্ষ্মীর কি অলক্ষ্মীবেশ করে আনলাম আমি গো!···আমার কপালে এতো সাজাও লিখেছিলো ভগবান!···

চীৎকারটা একটা ওয়ার্নিংও বটে।

গাড়ির শব্দে কৌতূহলী ছোটবৌ পাছে ভুলে বেরিয়ে আসে ছুটে পুটে।

দূরাগত সংগীতের মতো বড়োবৌয়ের মৃদুকণ্ঠের করুণ বিলাপধ্বনি বাতাসে ভেসে আসে। বহুদিন বিস্মৃত 'মেজ ঠাকুরপো'কে উদ্দেশ করে করেই বোধকরি এই বিলাপবাণী।

হয়তো বা অদেখা ভাশুরের নবমৃত্যুশোকে ছোটবৌও আঁচলে চোখ মুছছে, শুধু শিবানীর চোখেই জলবিন্দু নেই।

ওরা যে বলে 'কাষ্ঠ কঠিন', মিথ্যে বলে না।

স্বামীর সমস্ত চিহ্ন ধুয়ে মুছে বিসর্জন দিয়ে এলি তো! চোখে এক ফোঁটা জল পড়ে না? ছিঃ!

জব্দ হবার মেয়ে নয়!

যা স্বভাব, হয়তো বা অদূরভবিষ্যতে আবারও পাঁচজনের সামনে মুখ দেখাতে হলেই ঘামঘাম তেলতেলে মুখখানা থানের আঁচলের কোণটা দিয়েও রগড়ে মুছে চকচকে করতে বসবে!···বিশ্বাস কি!

এখন তো—শুকনো দুটো চোখে আগাগোড়া এমন বোকার মতো ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, যেন চোখের সামনে কি একটা দুর্বোধ্য থিয়েটারই দেখছে! দেখলে গা জ্বলে যায় কি না!

পাখীর বাসা

সকলকে একটি লিনেন সার্ট, মটমটে এক প্যাণ্ট, তার সঙ্গে পালিশ করা একজোড়া বাবুলী চপ্পল! আর কি চাই? এর বেশী আর কি দরকার?

একবার কোনপ্রকারে এইটুকু জোগাড় করে ফেলতে পারলেই বেশ কিছুদিন মানমর্যাদা বজায় রেখে চলে যায়। এছাড়া অবিশ্যি আর একটা জিনিস লাগে, সে হচ্ছে চুলের কায়দা, তা সে তো বিনা খরচেই হয়।

কাচানো বা ইস্ত্রী করার জন্যেও ধোবার মুখাপেক্ষী হবার দরকার নেই, ওটা আজকাল গেরস্থ লোকে সহজ করে নিয়েছে। শিখে নিয়েছে বিদ্যেটা।

ওই বিদ্যের জোরেই শক্তিপদ একটা স্যুটের ওপর দিয়ে বছর দেড়েক ধরে বাবুয়ানা চালাচ্ছে। অবিশ্যি রোজ নয়, সপ্তাহে একদিন ওর বাবুগিরি।

শহরতলীর এই 'পাখীর বাসা' থেকে প্রত্যেক রবিবারে রবিবারে ও চলে যায় কলকাতায়। সেখানে নাকি ওর বড় মানুষ মামা মিস্টার এম. এন. ঘোষের বাড়ি।

নামের আগে এখনো মিস্টার ব্যবহার করেন, সোজা বড়লোক নয় তা হ'লে। শক্তিপদর সহকর্মী পাড়ায় যারা থাকে, ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকিয়ে দেখে শক্তিপদকে —যখন সে লকলকে লিনেন সার্টের সঙ্গে মটমটে প্যাণ্ট পরে মস্‌মসিয়ে পাড়ার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যায়! মামার কথা সকলেই জানে, আর অত বড়লোক মামা যে গেঞ্জিকলের মজুর শক্তিপদকে ভাগ্নে বলে স্বীকার করেন, শুধু স্বীকার করা নয়—সপ্তাহান্তে হা পিত্যেশ করে বসে থাকেন তাকে দেখবার জন্যে, এইতেই তাজ্জব বনে যায় তারা।

অবিশ্যি অমন মামা থাকতে এমন অবস্থা কেন শক্তিপদর, সে প্রশ্ন প্রথম প্রথম উঠেছে, কিন্তু শক্তিপদর লুকোছাপা নেই, 'ঢাক-ঢাক, গুড়-গুড়' নেই। ও স্পষ্টই স্বীকার করেছে, মামা মামী 'চক্ষের মণি' করলে কি হবে, মামাতো ভাইরা একটু 'ইয়ে'র চক্ষে দেখে। তা দোষও দেওয়া যায় না তাদের, তারা হ'ল সব এক একটি কেষ্ট বিষ্টু।

এম. এ. পাশের নীচে কেউ নেই, মামাতো বোন পর্যন্ত বি. এ. পাশ। তারা নন্ ম্যাট্রিক শক্তিপদকে হতজ্ঞান না করে কি করবে?

সেই জন্যেই নিজের বিদ্যের উপযুক্ত কাজ বেছে নিয়েছে শক্তিপদ; তবে বুড়োবুড়ি যে ক'দিন আছে হপ্তায় হপ্তায় না গিয়ে পারে না।

আগে শক্তিপদ কাজ করতো গেঞ্জিকলে, খেতো ওখানেরই 'পাইস্ হোটেলে', আর থাকতো একটা মুদির দোকানে। আপাততঃ কিছুকাল ধরে সহকর্মী বন্ধু রাধানাথের সংসারে পেইং গেস্ট হয়ে আছে।

রাধানাথ ওইখানকারই ছেলে, তার রীতিমত সংসার আছে, মা বোন ছোট দুই ভাই। এতগুলো লোকের পক্ষে বাড়িটুকু যথেষ্ট নয়, নেহাৎই এককোঠা এক দালান।

তবু ওরই মধ্যে সে দালানের একটু কোণ ঘিরে বন্ধুকে ঠাঁই দিয়েছে। নিজের ঠাঁইয়ের অভাব বলেই বোধ হয় বন্ধুকে ঠাঁই দেওয়া সহজ হয়েছে! প্রাচুর্য থাকলে হতো কি না সন্দেহ।

'সুবিধে'র আস্বাদ যারা জেনেছে, তারাই 'অসুবিধে'র ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। আর অসুবিধেই যাদের সঙ্গের সাথী, জীবনে যারা জানলো না সুবিধের চেহারাটা কি, তাদের ভয়টা কি? রাধানাথের 'মোজেক' করা বাথরুমের ভাগ নেবে না শক্তিপদ, নেবে না খাবার পাতের মাখন সন্দেশের ভাগ।

রাধানাথ রাস্তার কলে গিয়ে চান করে, শক্তিপদও তাই করবে, রাধানাথ ভোরবেলা আখের গুড় দিয়ে বাসি-রুটি খেয়ে কাজে ছোটে, শক্তিপদও তাই ছুটবে, রাধানাথ খেটে খুটে এসে চটা-ওঠা এনামেলের গ্লাসে চা নিয়ে বসে, শক্তিপদও তাই বসবে, তবে আর ভাবনার কি আছে?

শক্তিপদ বড়লোকের ভাগ্নে?

তাতে কি ? তার জন্যে তো শক্তিপদ চালিয়াৎ নয়। শুধু বড়মানুষ মামার বাড়ি যাবার সময় সৌষ্ঠবযুক্ত হয়ে না গেলে নিজেরও লজ্জা, তাঁদেরও লজ্জা। তাই এই সাজ-সজ্জা।

নইলে এমন অমায়িক ছেলে হয় না।

রাধানাথের মা বলেন—ছেলে নয় তো, হীরের টুকরো !

রাধানাথের বোন অবশ্য অন্য কথা বলে।

তা' সে নেপথ্যে বলে। সে অনেক রকম কথা জানে।· তার সখও অনেক। নিজেদের বাড়ির এই "পাখীর বাসা" নামও তার দেওয়া।···একটা কাগজে বড় বড় করে 'পাখীর বাসা' লিখে দেওয়ালে সেঁটে রেখেছে।

সন্ধ্যার পরে রাস্তার দিকের দেড় হাত চওড়া রোয়াকে সঙ্গীতের জলসা বসে। রাধানাথ একটা ভাঙা হারমোনিয়ম নিয়ে গান গায়, শক্তিপদ একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেক্‌চি বাজিয়ে তাল দেয়। ·একটি একটি করে এসে জোটে পানু, মানিকলাল· সুধীর। কোনদিন খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যায়, কোনদিন ওরই মধ্যে একটু জুৎবরাত করে বসে।

অনেক দিন থেকে ইচ্ছে এক জোড়া বাঁয়া তবলা কেনে, সে আর কুলিয়ে উঠছে না। সাংঘাতিক দাম হয়ে গেছে যে আজকাল। কারণ গান বাজনার চাষটা আজকাল খুব জোর হচ্ছে তো, আর তবলাটা যেন রীতিমত জাতে উঠে পড়েছে। মামার কাছে চাইলে অবশ্যি একজোড়া বাঁয়া তবলার দাম কিছুই নয়, কিন্তু ওইটি শক্তিপদর ধাতে সয় না। ওই চাওয়া ! বরং নিজের কতো কষ্টের টাকা, তাই থেকেই এটা ওটা নিয়ে যায় উপহার হিসেবে। হেয় হবে কেন ?

মাঝে মাঝে যেদিন বাইরের লোক থাকে না, রাধানাথের বোন কানন রোয়াকের ভিতর দিকে ঘরের চৌকাঠে বসে। বসে থাকতে থাকতে শক্তিপদর তবলা পিটোনোর বহরে হেসে খুন হয়।· হাসতে হাসতে বলে—ও শক্তিদা, একটু আস্তে ! গরীবের ডাল সেদ্ধ হয় ওতে। ফুটো হয়ে গেলে কালকে স্রেফ ভাতে ভাত।

'ভাতে ভাত' মোটে খেতে পারে না শক্তিপদ, তাই ওইটিই কাননের তাকে ক্ষ্যাপানোর অস্ত্র। তা ছাড়া এর চাইতে উচ্চাঙ্গের পরিহাসবাণী শিখলোই বা কবে সে ?

ঘাটতি যে এদের সব দিকেই !

বিদ্যেয় ঘাটতি, বুদ্ধিতে ঘাটতি, শিক্ষায় ঘাটতি, ভাঁড়ারে ঘাটতি। সেই জন্যেই হয়তো বিধাতা-পুরুষ ওদের হৃদয়ের দিকে কিছু বাড়তি রেখেছেন। নইলে ব্যালেন্স ঠিক থাকবে কি করে ? নইলে বাড়তিদের সঙ্গে পাশাপাশি জায়গা নিয়ে টিঁকে থাকতো কি করে ? বিশ্বের বাজারের দাঁড়িপাল্লায় যে হাস্যকর ভাবে হালকা হয়ে উঠে পড়তো !

রাধানাথের মা-টি বড় ভালমানুষ, বোন কানন কিন্তু ঠিক মায়ের উল্টো। 'দজ্জাল' বললেই ঠিক বলা হয় ওকে। বাড়তি একটা লোককে সখ করে বাড়িতে ডেকে এনে রাধানাথ যে তার খাটুনী চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এ কথা

সে অহরহ সাড়ম্বরে ঘোষণা করে। আবার ইচ্ছে করে খাটতেও ছাড়ে না। মনে হয় বাড়তি লোকটার জন্যে আরও চারগুণ খাটলেও বুঝি ক্লান্তি আসবে না তার!

নইলে—শক্তিপদর জামা সাবান দিয়ে দেওয়ার, রান্নার মাঝখানে ইস্ত্রী তাতিয়ে নেওয়ার, কি এতো গরজ তার?

রাধানাথ মাঝে মাঝে মুখরা বোনের মুখের জন্য ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু যখন দেখে শক্তিপদ সে বাক্যবাণ প্রসন্ন মনে নিচ্ছে, তখন স্বস্তি পায়।

গানের আসর থামলে কাননই আগে উঠে পড়ে। এবেলা রান্নাবান্নার ভার তারই ওপর। এরা ওঠবার আগেই তাড়াতাড়ি জায়গা করে খেতে দেয়।

খেতে বসে শক্তিপদ গলা ছেড়ে বলে—রান্না হচ্ছে আজকাল চমৎকার! ভাগ্যিস সকালবেলাটা মাসীমার হাতে হাঁড়ির ভার, তাই কোনরকমে বেঁচে থাকা!

কানন রান্নাঘর থেকে খরখর করে ওঠে—কুমড়ো আর কচু দিয়ে লোকেদের বৌয়েরা এসে কি কোর্মাকারি রাঁধবে দেখবো! হুঃ!

শক্তিপদ সেই কুমড়ো কচুর ঘণ্ট দিয়েই অম্লানবদনে খান-দশেক রুটি সেঁটে বলে—পড়লো কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে! আমি তো কাউকে ডেকেডুকে কিছু বলিনি।

কানন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

—গায়ের চামড়া যার গণ্ডারের নয়, তার গায়ে কথা শুধু যে বাজে তা' নয়, ফোস্কা পড়ায়, বুঝলেন মশাই! ডেকে না বললেই কি বোঝা যায় না? আমি ছাড়া আর আছে কে?

রাধানাথ আগে আগে এ ধরনের কথায় একটু হকচকিয়ে যেত। বোন তার মুখরা সত্যি, কিন্তু একটা বাইরের লোকের কাছেও একটু সমীহ করবে না? এখন সয়ে গেছে, এখন হাস্যবদনে এ কৌতুক উপভোগ করে।

কিন্তু রাধানাথ আঁচাতে গেলে শক্তি যে কথাটা বলে সেটা গলা খাটো করে বলে। বলে, যখন তখন লোককে বউ তুলে খোঁটা দেবার মানে?

কাননও গলা খাটো করে ভেঙিয়ে বলে, পড়লো কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে! আমি তো কাউকে ডেকে হেঁকে বলিনি।

হুঁ—রাধানাথের আসার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে নেয় শক্তিপদ—এর উত্তর তোলা রইল।···কই কানন, উনুনের আঁচ রাখো নি? হায় হায়! আমার যে একটু দরকার ছিল!

বলা বাহুল্য শেষের কথাটা আবার বেশ চড়া গলায় উচ্চারিত হয়।

কাননও চড়া গলায় বলে—আপনার তো দরকারের মধ্যে ইস্ত্রী তাতানো? সে কাজ মিটে গেছে।

—মিটে গেছে, তার মানে?

—তার মানে ইস্ত্রী করে রাখা আছে।

—এতো কষ্ট করতে তো কেউ কাউকে বলে নি!

—আমি কারুর বলার তোয়াক্কা রাখি না, যা করি নিজের খুশিতে করি।

শক্তিপদ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, রাধানাথ এসে তাড়া দেয়—কি এখনো কোঁদল চলছে ? ভোরবেলা উঠতে হবে না ?

—রাধু তো বেশ বলছিস ? কাল বারটা কি ?

—ও হো হো—রাধানাথ হেসে ওঠে, রবিবারটা ভুলে যাচ্ছি, আরে !

জোরালো বা ঘোরালো ভাষা এদের নেই, তা বলে সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার প্রকাশ নেই তা নয়। এমনি জোলো জোলো আর সাধারণ সাধারণ কথা হ'লেও মনে করে বেশ মজার কথা বলা হ'ল। মজাটা এইখানেই।

রবিবার সকাল থেকে মামার বাড়ি যাবার তোড়জোড় চলে। আগে সকালের দিকেই রওনা দিত, আজকাল কেন কে জানে কেমন যেন গড়িয়ে যায়। সেই খাওয়া দাওয়ার সময় এসে যায়, কাজেই দুটো খেয়ে একটু জিরিয়ে তারপরে যাওয়া।

তবে সকাল থেকে জুতোয় কালি পড়ে, মাথায় সাবান পড়ে, দাড়িতে ক্ষুর পড়ে।

বেরোবার সময় কানন একটা পানের খিলি নিয়ে এসে বললো—সাহেবের পান খাওয়া চলবে ?

—পান ? শক্তিপদর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—পান কোথা পেলে ?

পানের মতো বিলাসিতার এ বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ।

একমাত্র চায়েরই সর্বত্র অবাধ গতি। 'বাকিংহাম্ প্যালেস' থেকে বঙ্কু হাড়ির গাছতলার সংসারে পর্যন্ত চায়ের প্রবেশাধিকার। কিন্তু পানের তেমন নয়।

কানন পানটা হাতে দিতে দিতে বলে—পেয়েছি কোথাও।· তারপর বড় লোক মামার বাড়ি চললেন ?

শক্তিপদ বললো—ওই বুড়ো বুড়ি যতক্ষণ! তারপর কে কার দোরে পা ফেলতে যাচ্ছে।

—বেশ চমৎকার দেখায় কিন্তু আপনাকে স্যুট পরলে।

—দেখাবে না কেন ? চেহারাটা কি খাবাপ ?

—ওঃ ভারী তো চেহারা তার আবার গুমোর !

—গুমোর করবার মতো জিনিস থাকলেই গুমোর করে লোকে।

—যান, একটু মুখ বদলে আসুন। মামার বাড়ির হালুইকর বামুনের রান্না খেয়ে এসে তাই এখানের রান্নার এত নিন্দে !

—হয়েছে ঝগড়া থামাও। যাচ্ছি তা'হলে ?

—যাচ্ছি বলতে নেই, বলতে হয় আসছি।

মটমটে জামা প্যাণ্ট পরে, পালিশ করা জুতোর মস্‌মস্ শব্দ তুলে মামার

বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয় শক্তিপদ। পিছনে রোয়াকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখতে থাকে কানন।

এক সময় মা ঘর থেকে ডাকে—কানন!

মনে হয় কানন শুনতে পেলো না, কিন্তু একটু পরে আবার ঢুকেও যায়।

মা বলে—বাইরের দাওয়ায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়েছিলি কেন?

—হাঁ ক'রে আবার কি? একবার একটু হাঁফ ফেলতেও দোষ আছে না কি? গরুও তো একবার গোয়াল থেকে বেরোয়?

মা থতমত খেয়ে বলে—রাগ করছিস, পাড়ার পাঁচজনে পাছে কিছু বলে, তাই সামলে মরি!

যার যা সামলানোর দরকার!

ওদিকে শক্তিপদ তার ফর্সা স্যুটটি অতি কষ্টে সামলেসুমলে গোয়াবাগানের একটি বস্তির সামনে এসে দাঁড়ালো।

বস্তির সামনেই রাস্তার কল।

কলের আশেপাশে জনারণ্য। রমণীর সংখ্যাই অবশ্য তুলনায় অনেক বেশি। শক্তিপদ এসে দাঁড়াতেই একটি মেয়ে একজন বর্ষীয়সীকে উদ্দেশ ক'রে আস্তে আস্তে সম্ভ্রমের সুরে বলে—এই যে দাশুর মা, তোমার ভাগ্নে এসেছে!

দাশুর মা আধ বালতি জল না হতেই বালতিটাকে টেনে তুলে সবে এসে স্নেহবিগলিত স্বরে বলে—এই যে বাবা এসেছো? চলো। ভাল আছ তো?

শক্তিপদ ওর সঙ্গে সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলে—আছি একরকম। তারপর তুমি ভাল আছো তো? মামা?

—তোমার মামার কথা আর বলো না বাবা! আবার সেই হাঁপানি চাগিয়েছে।

তক্তাপোষের পাশে একটা প্যাকিংবাক্স উপুড় ক'রে রাখা। এইটিই শক্তিপদর জন্য নির্দিষ্ট রাজাসন।

মস্ত বড় চাকরে ভাগ্নে, কোথাকার কোন গেঞ্জিকলের নাকি ম্যানেজার, যে "লোক" দু'ঘণ্টার জন্যে সরে নড়ে এলে কলের কাজ বানচাল হয়ে যায়, সেই ভাগ্নে ফি হপ্তায় পাঁচ ঘণ্টার জন্যে সরে নড়ে আসে মামা মামীকে দেখবার জন্যে, এ কি সোজা কথা?

মামা মামী ভাগনের এই মহানুভবতায় বিগলিত!

তা ছাড়া যখনই আসে, রুগ্ন মামা খাবে বলে সন্দেশ, বেদানা, ন্যাসপাতি, কমলালেবু ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে আসে!—আবার মাঝে মাঝে—'মামার কি ভাল লাগবে না লাগবে জেনে বুঝে কিনে দিও মামী'—বলে নগদ টাকাও কিছু দেয়।

মামা ভয়ানক মানী লোক, ভাঙে তো মচকায় না। অনেক দুঃখে নামতে

নামতে একেবারে এই বস্তিতে এসেছে, জীবনযাত্রার মান অনেক খাটো করেছে, কিন্তু মানে খাটো হয় নি ! আর্থিক সাহায্য হিসেবে দিতে চাইলে সে ভাগ্নের টাকা পত্রপাঠ ফেরত দিতো, কিন্তু শক্তিপদর এতটা অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন ঠেলতে পারে না।

তা' মামা এমন মানী বলেই তো শক্তিপদ এমন নির্ভয়ে আসতে পারে, নইলে 'বড় চাকরে'র পক্ষে গরীব আত্মীয়ের বাড়ি আসা কি সহজ সাহসের ব্যাপার ?

মামা জিজ্ঞেস করে—তোদের কলের কাজটাজ কেমন চলছে ?

শক্তিপদ নড়েচড়ে টাইট হয়ে বসে বলে—তা আজকাল বরং ভালই চলছে, ধর্মঘটের হিড়িকটা তেমন নেই, সুতোও পাওয়া যাচ্ছে যথেষ্ট। আগের চাইতে মাল অনেক বেশী ছাড়তে পারা যাচ্ছে।

মামা এই ঘরে নিতান্তই বেমানান এই চকচকে স্যুটপরা সুকান্তি মূর্তিটির পানে তাকিয়ে স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলে—তা'হলে আজকাল খাটুনি তেমন নেই কেমন ? বিনা উপদ্রবে মিল চলছে যখন—

—খাটুনি ?—শক্তিপদ একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে—খাটুনির কথা আর জিজ্ঞেস কোরোনা মামা ! এই—হপ্তায় একদিন এসে মামীর হাতে খেয়ে যাই, তাই দেহটা টিঁকে আছে। ····আগাগোড়া তদারকী সবই তো আমার ঘাড়ে।

মামী ঘরে ছিল না, এইবার একটি সত্যিকার ডিস পেয়ালায় চা এনে সামনে ধরে বলে—চায়ের সঙ্গে দু'খানা পাঁপর ভাজা খাবে বাবা ?

শক্তিপদ হাঁ হাঁ করে ওঠে—না মামী, না ! তুমি একটু বোসো স্বস্তি হয়ে।

মামী মনে মনে হাসে।—স্বস্তি ! যতক্ষণ না এই রাজ-অতিথিটিকে খাইয়ে দাইয়ে পাঠিয়ে দিতে পারবে ততক্ষণ কি তার স্বস্তি আছে না কি ?

কিন্তু এই অস্বস্তির মধ্যে আনন্দ আছে, গৌরব আছে। এর জন্যে বস্তির আর সকলে কত সমীহ করে !

ওপাশের ঘরের সৌখিন বউ চাঁপা চায়ের পেয়ালা দেয়, হয়তো বা চা করেও দেয়। এপাশের মোটাগিন্নী রান্নার সাহায্য করে দিয়ে যায়, মামীর উনুনের আঁচ ভাল না হ'লে আপনার জ্বলন্ত উনুনটা গামছায় ধরে এ ঘরে দিয়ে যায়।

ওদের মাত্র দুই বুড়োবুড়ির সংসার, কত জিনিসের অভাব ! ভাগ্নে এলেই সকলে খোঁজ নেয় কিছু লাগবে কি না। কর্তার ভয়ে সামনা-সামনি কিছু নেবার উপায় নেই, মামী লুকিয়ে চুরিয়ে নেয়। হ'ল না হয় কারুর ঘর থেকে এক টুকরো আদা কি দু'টো পিঁয়াজ, হ'ল দুটো কাঁচালঙ্কা কি এক চিমটে পাঁচফোড়ন।

শক্তিপদ বলে—লুচিফুচি করতে যেও না মামী, রুটি কর রুটি। তোমার হাতের রুটি, তার স্বাদই আলাদা। আর আমার রাঁধুনী ব্যাটার হাতে লুচিও ঘুঁটে হয়ে দাঁড়ায়। লুচিতে অরুচি ধরিয়ে দিয়েছে হতভাগা।

শুনে মামী সারদার বুকটা করকর করে।

কত পয়সা খরচ করে, তবু ভাল খাওয়া হয় না ছেলেটার! কর্তার এক অদ্ভুত জেদ! ছেলেপিলে সব গেছে, দুই বুড়োবুড়ি গিয়ে পড়ে থাকলেই হয় ভাগ্নের কাছে। মানুষ কি এমন থাকে না? তা' ছাড়া—অমন ভাগ্নে!

শক্তিপদ নিজে একটা মানুষের জন্যে যা খরচ করে সারা হয়, তার অর্ধেক খরচে তিনটে মানুষের চালিয়ে দিতে পারতো সারদা! অথচ খাওয়াদাওয়াও ভাল হতো! ওই—ওই জেদেই সর্বনাশ করেছে!

রুটি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, পিঁয়াজ দিয়ে সাঁতলানো একটু মুসুর ডাল। তারিয়ে তারিয়ে খায় শক্তিপদ, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের রাঁধুনীটার শত ব্যাখ্যানা করে।

মামীর হাত পা কামড়ানি আসে, মামার মনটা স্নেহে ছলছল করে।

কথায় কথায় রাত হয়ে যায়, শক্তিপদ উঠে পড়ে। দেড়ঘণ্টা বাসে যেতে হবে তো?

চলে যাবার সময় মামী বস্তির গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তার কলের সামনে এসে দাঁড়ায়। এঘর ওঘর থেকে অনেকেই বেরিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি মারে। প্রতি হপ্তায় দেখে, তবু কারুর কৌতূহলের শেষ নেই!

লক্‌লকে লিনেন সার্ট, মট্‌মটে স্যুট, আর কাবুলী চপ্পল অন্তর্হিত হ'লে মামীর কাছে এসে ভীড় করে ওরা।

মোটাগিন্নী বলে—আজকের বাজারে এমন ছেলে দেখা যায় না! গরীব বাপ মা'কেই লোকে পোঁছে না—আর এ তো মামা মামী—

ললিতের মা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—ধন্যি বলি ভাই তোমার কর্তার খোটকে! রাজার হালে থাকতে পেতে!

সারদা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে— কপাল আমার! ওই খোটের জন্যেই তো আজ এমন হাল!

রাত্রে বাইরের দরজায় প্রায়শঃই কানন দাঁড়িয়ে থাকে, কারণ শক্তিপদ না থাকলে গানের আসর বসে না। এক সপ্তাহের ক্লান্তি রাধানাথের চোখে এসে ভর করে। মায়ের রুগ্ন ধরনের শরীর, সন্ধ্যে থেকেই তো সে বিছানায়!

কানন বলে— হ'ল রাজভোগ খেয়ে আসা?

—হ'ল।

—যাক বাবা, আজ রাত্রের মতো কচু কুমড়োর দায় থেকে নিশ্চিন্তি!

—হয়েছে, খুব কথা হয়েছে! এখন সরো দিকিন, ঢুকতে দাও। রাধানাথের অর্ধেক রাত তো?

—ও বাবা, তা আর বলতে!

—তোমার চক্ষে বুঝি ঘুম নেই? কি[illegible]ন গান গায় তোমার দাদা? 'আঁখি হ'তে নিলো ঘুম হরি, কে নিলো হরি'—

—আঃ ! চাপা গলায় বকে উঠে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় কানন ।

এমনি করে চলে—দিনের পর দিন ! রাধানাথ আর তার মা কি একটা ক্ষীণ আশা মনে মনে পোষণ করে কে জানে ! হয়তো সেই জন্যেই মেয়ের বিয়ের তেমন চেষ্টাও করে না । ··· কিন্তু শক্তিপদ যখন রুক্ষ চুলে ব্যাক্‌ব্রাশ করে ইস্ত্রী করা স্যুট পরে বেরিয়ে যায়, তখন তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে দু'জনেরই যেন একটা হতাশ নিঃশ্বাস পড়ে ।

ওকে কি বাঁধা যাবে ?

শক্তিপদ অবিশ্যি যখন তখন বলে—আমি বাবা গরীবই আছি গরীবই থাকবো ! ভেক্‌ নইলে ভিখ মেলে না, তাই সভ্যভব্য হয়ে যাওয়া । নইলে মামাতো ভাইরা গেঞ্জি কলের কুলি বলে নাক সিঁটকোবে হয়তো !

তবু—তবু যেন সন্দেহ রয়ে যায় !

কিন্তু একদিন ওদের পাখির বাসায় এলো ঝড় ! সন্ধ্যার পরে যেমন গানের আসর বসে তেমনি বসেছে । ঘরের চৌকাঠের ভিতরে কানন আছে বসে ।

শক্তিপদ মহোৎসাহে ডেক্‌চি বাজাচ্ছে, এমন সময় সামনে একটা সাইকেল রিক্সা এসে দাঁড়ালো ।···তার মধ্যে একটা ট্রাঙ্ক একটা বিছানা, আর বালতি বাসন গোছের দু' একটা কি !

চেনা রিক্সাওয়ালা, এই অঞ্চলেই ওর বাসা ।

সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাছে এসে বলে—এই দেখুন তো রাধানাথবাবু, এই মেয়েছেলেটি কাকে খুঁজে বেড়াচ্চেন ?··আমায় বললেন—এখানে যে গেঞ্জিকল আছে, তার ম্যানেজারের বাড়ি যাবো ।···যতো বোঝাই, ম্যানেজার এখানে কোথা ? সে কলকাতায় থাকে, মটরে চড়ে আসে যায়, সে কথা কে শোনে··· সেই এক জেদ—নাম শক্তিপদ দাস, গেঞ্জিকলের ম্যানেজার, ইনি নাকি তাঁর মামী ।···আমাদের শক্তিবাবু নয়তো ?

শক্তিপদ ডেক্‌চিতে হাত দিয়ে বজ্রাহতের মত তাকিয়ে থাকে ।

রাধানাথ শশব্যস্তে উঠে বলে—মামী ? শক্তিপদর মামী ?

কাননও অজ্ঞাতসারে রোয়াক থেকে নেমে ফুটপাতে দাঁড়িয়েছে ।

রাধানাথ ফিসফিস করে বলে—ব্যাপার কি শক্তিপদ ? উঁকি দিয়ে দেখ তো কে ? ম্যানেজারের মামী শক্তিপদকে খুঁজবে কেন ?

খুঁজবে কেন, সে উত্তর কে দেবে ?

শক্তিপদর কি কথা কইবারই শক্তি আছে ?

তবু উঠতে হয়, রাধানাথের ঠেলায় রিক্সাখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, আর ওকে দেখার সঙ্গেসঙ্গেই মামী চীৎকার করে ওঠে—ওরে শক্তি বাবারে, তোর মামা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন রে !

উত্তাল তরঙ্গ কিছুটা শান্ত হ'লে মামীকে রোয়াকে তোলা হয় ।

হাত ধরে তোলে কানন। কাননের মা উদ্‌ভ্রান্তের মতো রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকে।···জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে রিক্সাখানা ছেড়ে দেওয়া হয়।

মামী এতোক্ষণে একটু স্থির হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধস্বরে বলে- এমন অখাদ্য জায়গায় তুমি আড্ডা দিতে এসেছো বাবা? সারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছি আমি!···মুখপোড়া রিক্সাওলা বলে কিনা ম্যানেজার আবার কে? সে এখানে থাকে টাকে না।··· শক্তিপদ দাস বলে একজনকে চিনি, রাধানাথের বাড়ি থাকে, সে তো কলের মজুর।···শোন দিকি কথা? চলো বাবা চলো, তোমার বাড়িতে।···মানী লোক কখনো তো নুইয়ে ডুব দেননি, মরণকালে বলে গেলেন, চলে যেও শক্তির কাছে! আমাদের বস্তির একটি ছেলে সঙ্গে করে এনে বাস থেকে রিক্সায় তুলে দিয়ে পালালো, বলে—বড়লোকের বাড়ি যেতে পারবো না।

শক্তির মুখে তবু কথা নেই। সেই যে ঘাড় হেঁট করে থাকে, মুখই তোলে না। মামার শোকটা তার বড্ডই লাগলো বুঝি!

কানন বলে—আচ্ছা মামীমা, আপনি এখন এখানে একটু বিশ্রাম করুন, তারপর ঠিক জায়গায় যাবেন।

মামী সন্দিগ্ধভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন—না বাছা, এখানে আর বিশ্রাম টিশ্রাম দরকার নেই। দুঃখী মানুষ আমরা, আমাদের আবার বিশ্রাম! ···শক্তি, চলো বাবা, বাড়ি চলো।

এবারে শক্তিপদ মুখ তোলে।

পরিষ্কার ঠাণ্ডা গলায় বলে—আর কোথাও কোনো বাড়ি আমার নেই মামী! এই আমার আশ্রয়। এরা দয়া করে একটু আশ্রয় দিয়েছেন তাই এখানে আছি। রিক্সাওয়ালা তোমায় ঠিকই বলেছে, শক্তিপদ দাস কলের কুলিই!

অনেক ঝড়ের পর যখন চারিদিক শান্ত হয়েছে···মামী আশ্রয় পেয়েছেন কাননের মায়ের বিছানায়, আর মামীর জিনিসপত্রগুলো জায়গা পেয়েছে চৌকির তলায়, তখন খানচারেক বাতাসা আর একঘটি জল নিয়ে শক্তিপদর বিছানার শিওরে এসে দাঁড়ালো কানন।

শক্তিপদর মামা মরেছে, অশৌচ! খায়নি কিছু। সকালে চান করে তবে খাবে।

—জল একটু খাও, শক্তিদা!

শক্তি শুয়েছিলো, ধড়মড় করে উঠে বলে—এখনো তুমি আমার মুখ দেখছো কানন?

কানন মৃদু হেসে বলে—কেন, মুখটা কি অপরাধ করলো?

—এতবড়ো হতভাগা মিথ্যেবাদীর মুখ দেখলে পাপ হয় কানন! আমাকে তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত।

কানন এবারে প্রায় শব্দ করে হেসে উঠে বলে—মুখ্যু মেয়েমানুষের কি অতো উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকে শক্তিদা? সে জ্ঞান থাকলে তো অনেক আগেই

ঘেন্না হওয়া উচিত ছিলো!

—আগে? আগে তো তুমি—

—অনেক আগেই বুঝে ফেলেছিলাম শক্তিদা! মেয়েমানুষ যতোই মুখ্যু হোক, তাকে ঠকানো বড়ো শক্ত। সে সব জেনে বুঝেও চুপ করে থাকে কেন জানো? পাছে তার পাখীর বাসাটুকু ভেঙে যায়!

শক্তিপদ বিহ্বলভাবে বলে—সব বুঝে ফেলেছিলে?

—স—ব!

—তবু তুমি—

তবু আমি—বলে মুখ তুলে হঠাৎ একটু অন্য ধরনের হাসি হাসে কানন। যে হাসির সঙ্গে মুখ্যু বিদ্বানের কোন তফাৎ নেই।

আগুনের শেষ

সেলস্‌ম্যান ছোকরা যেন ধৈর্যের পরীক্ষায় জীবনপণ করেছে।

তা নইলে—সতরঞ্চের ওপর ছড়ানো শ' আড়াই শাড়ির ঘাড়ে আরো খান তিরিশেক শাড়ির একটা বস্তা এনে নামিয়ে দেয়?

শাড়ির সেই বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে যে মহিলাটি সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে বসেছিলেন, তিনি নতুন এই আক্রমণে দিশেহারা হয়ে উঠলেন কিনা ঈশ্বর জানেন, বাইরের ভাবটা কিন্তু অটলই রইলো।

মুখের চেহারায় বরাবর একটা নাসিকাকুঞ্চিত ভাব বজায় রেখে চাঁপাবকলি আঙুলের ডগা দিয়ে প্রত্যেকখানি শাড়ি পরীক্ষা করে চলেছেন তিনি—বোটানির ছাত্রের অসীম অধ্যবসায় আর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

আশ্চর্য! এই দুশো আশীখানা শাড়ির মধ্যে একখানাও কি ঠিক পছন্দসই থাকতে নেই? যাদের নির্দেশে এসব মাল তৈরি হয—মাথাগুলো তাদের এতো মোটা হয় কেন!

একজোড়া আটপৌরে তাঁতের শাড়ি কিনতে এসে কি পরিশ্রম!

রংটা হৃদয়গ্রাহী হয় তো—পাড়টা বেমানান, পাড়টা চোখে লাগে তো—রংটা অচল! এ দুটোতে যদি বা কোনো গতিকে সামঞ্জস্য বিধান হয়, জমিটা ফেল্ করে স্পর্শসুখ পরীক্ষায়!

এ ছাড়া—আঁচলার কম বেশি, ইঞ্চির তারতম্য, এসব ছোটোখাটো অসুবিধেগুলোও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

ছেলেদের 'কনে' পছন্দ, আর মেয়েদের শাড়ি কেনা, দু'টোই প্রায় এক! তফাৎ শুধু ছেলেরা বাছাই করে জীবনে একবার, মেয়েরা জীবনভোর।

প্রত্যেকখানি একবার করে এবং কয়েকখানি বারবার দেখার পর—নাঃ কোনটাই চললো না দেখছি—বলে ভ্যানিটি ব্যাগটি বাগিয়ে ধরে মহারাণীর ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ান দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মহিলা।

কিন্তু সেল্স্‌ম্যান ছোকরা কি মরিয়া হয়ে উঠেছে ?

এখনো সে মুখে যে হাসিটি ফুটিয়ে রেখেছে, সে কি নিছক ব্যবসাদারী সৌজন্যের হাসি ? না ভেতরের অসহ্য জ্বালাটা ফুটে উঠেছে হিংস্র হাসির মুঠিতে ?

—দয়া করে দাঁড়ান আর একটু—দ্রুত পদক্ষেপে আলমারী থেকে বিশেষ আর একটি বস্তা বার করে এনে ধপাস্‌ করে সামনে ফেলে দেয় ছোকরা।

মহিলার গমনোন্মুখ গতিকে অগ্রাহ্য করে দড়ির বাঁধন খুলতে খুলতে বলে —এবারে বুঝেছি কি ধরনের জিনিষ ইউজ্‌ করা অভ্যাস আপনাদের। আগের গুলো দেখানোই ভুল হয়েছে আমার ! ও শাড়ি আপনাদের জন্যে নয়। এইবার দেখুন দিকি…নয়নমনস্নিগ্ধকর একখানি চমৎকার শাড়ি তুলে ধ'রে ছোকরা কথা শেষ করে—এ যদি পছন্দ না হয়, তা'হলে বুঝবো শাড়ি কেনার ইচ্ছাই নেই আপনার।

আঁতে ঘা দিয়ে কথা !

সত্যিই এ শাড়ির খুঁৎ খুঁজে বার করা শক্ত ! জমির আভিজাত্যে, পাড়ের অভিনবত্বে, রঙের ঔজ্জ্বল্যে, এবং রং পাড় আঁচলা সব কিছুর বিন্যাস কৌশলে অনবদ্য !

কিন্তু একে কি আটপৌরে শাড়ি বলা চলে ?

ভদ্রমহিলা উদাসীন গাম্ভীর্যের সুরে নিমপাতার আমেজ মিশিয়ে বলেন—থাক্‌ থাক্‌ ও আর দেখাতে হবে না, আমি তো আগেই বলেছি রাফ ইউজের জন্য—

—তা'তে কি। নিয়ে যান না—ব্যবহার করে দেখুন কি রকম টেঁকসই জিনিষ। নিয়ে যান দু'পীস…আরও একটা ডিসেন্ট রং আছে—বলে বস্তার নিচের দিক থেকে আর একখানা শাড়ি নিয়ে টানাটানি করে জীবনপণকারী ছেলেটা।

—থাক্‌ না, মিছে কষ্ট করছেন কেন ? দামটা শুনি আগে—

—দামটা—অবিশ্যি আপনার কিছু বেশী পড়বে, বত্রিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে। কিন্তু জিনিষ তেমনি সরেস পাচ্ছেন।

একমুখ হাসি নিয়ে অবলীলাক্রমে কথাটা উচ্চারণ করে যায় ছোকরা, যেন মারাত্মক কিছুই বলছে না, যেন আটপৌরে একজোড়া শাড়ির জন্যে সত্তর টাকা খরচ করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যদি মালটা সরেস পাওয়া যায়।

হিংস্র প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া আর কি বলা যায় একে ? তা' নয়তো নেওয়া হয়েই গিয়েছে ধরে নিয়ে প্যাকেট করতে বসে বাছাই শাড়ি দু'খানা ?

—কি আশ্চর্য, বাঁধছেন কেন ?…কুইনিন ট্যাবলেট হাতে ম্যালেরিয়া রোগীর মুখশ্রী নকল করে সুন্দরী ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন—নেবো তা' তো বলিনি আপনাকে ?

—নেবেন না—সে আলাদা কথা, নিলে ভাল করতেন। দেখালাম তো পনেরো বিশ টাকার কাপড়, কিছুতেই চোখে ধরলো না আপনার—গম্ভীরভাবে

কথা কটা বলে এতোক্ষণ পরে ছোকরা খদ্দেরের ওপর থেকে সমস্ত মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে পাশের সহকারীর সঙ্গে কথা সুরু করে।

—কী অদ্ভুত অধ্যবসায়!

বেঞ্চির একেবারে কোণে একটু পিছন দিকে বসে যে ভদ্রলোক নিঃশব্দ বিস্ময়ে বহুক্ষণ ধরে এই নির্বাচন পর্ব লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর কণ্ঠ হতে এই অস্ফুট মন্তব্যটি বার হয়।

ভদ্রমহিলা চমকে মুখ ফিরিয়েই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—কতো সহজে রিজেক্ট করতে পারো তোমরা—অবাক্ হয়ে তাই দেখছি!

প্রায় তেমনি মৃদু কণ্ঠেই দ্বিতীয় মন্তব্যটা উচ্চারিত হলো।

—নেবার উপযুক্ত না হলে রিজেক্ট করা ছাড়া উপায় কি—বলেই দ্রুতগতিতে দোকান থেকে নেমে পড়েন ভদ্রমহিলা।

এ ভদ্রলোক ব্যস্তবাগীশের ভূমিকায় দোকানীকে উদ্দেশ করে তাড়াতাড়ি বলেন—ও মশাই শুনছেন—ওই শাড়িখানা দেখান দিকি, বেশ ভালোই মনে হলো—

—কোন্ খানা?—ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে দ্বিতীয় খদ্দেরের দিকে মন দেয়।

—ওই যে এখুনি যেখানা রাখলেন।…বলুন তো বিয়েতে উপহার দেওয়া চলে?

—বিয়েতে? নিশ্চয়। এ শাড়ি উপহারের জন্যেই খুব চলছে আজকাল। পড়তে পাচ্ছে না। ফ্যান্সি জিনিষ, অথচ—

তার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বলে ওঠেন—আচ্ছা বাঁধুন, বাঁধুন, কতো বলছিলেন যেন—ছত্রিশ না?—এই ধরুন।

চারখানা নোট এগিয়ে ধরেন ভদ্রলোক।

ফেরত টাকাটা নিতে যা দেরী, পরক্ষণেই হাওয়া!—সেল্‌স্‌ম্যান ছোকরা মুচকে হাসে। দোকানে বসে বসেই কতো সংসারলীলা দেখছে! কর্তার ধমকে গিন্নীর অভিমান, গিন্নীর 'দাবড়ানিতে' কর্তা ম্রিয়মাণ, নতুন বরের লোক দেখানো প্রেম, তরুণী প্রেয়সীর হাড়জ্বালানো আদিখ্যেতা, অনেক কিছুই চোখে পড়ে।—কম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো না!

বেশ বোঝা যাচ্ছে আজকের এটি স্রেফ্ মান অভিমানের পালা।

গিন্নী তো গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলেন, মান ভাঙ্গাতে দামী শাড়িখানাই নিতে হলো কর্তাকে। শাড়ির দাম টাম নিয়েই বোধহয় বচসা হয়ে গেছে বাড়িতে। চক্ষুলজ্জা ঢাকতে কর্তা একটা 'বিয়ের উপহারের' ছুতো করলেন আর কি!

একটু বেশী দীর্ঘাঙ্গী বলেই তবু কোনো গতিকে কাছ পর্যন্ত পৌঁছনো গেলো। জনারণ্যে হারিয়ে যাবার মেয়ে নয়, অনেকদূর থেকে চোখে পড়ে।

খুব খানিকটা পা চালিয়ে পাশাপাশি হয়ে পড়ে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে সুরেশ্বর বলে—কে তোমাকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামতে বলেছে? মহিলাদের

এতো তাড়াতাড়ি রাস্তা হাঁটা অশোভন।

চিত্রা দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে—রাস্তার মাঝখানে মহিলার অনুসরণ করাটা খুব শোভন কেমন?

—কে কার অনুসরণ করেছে, সেটা কি বাইরের লোকের চোখে চট্ করে ধরা পড়ে?—কিন্তু এতো নিষ্ঠুরতা কেন? দু'একটা কথা কইলে কি সমস্ত মহিমা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার?

—দরকারই বা কি?

—কিছু না এমনি। হঠাৎ দোকানে উঠে চমকে গেলাম। তারপর অবাক হয়ে দেখছি বসে বসে—তোমার চমৎকার সুন্দর নিষ্ঠুরতা! কতোটুকু ত্রুটির জন্যে কতো সহজে বাতিল করে দিতে পারো!

—ত্রুটি ত্রুটিই। তার সঙ্গে আপোস করা আমার দ্বারা হয় না।

—তা' জানি। আচ্ছা ও কথা থাক। বাড়ি ফিরছো?

—হ্যাঁ।—আবার চলতে সুরু করে চিত্রা।···চলতে চলতে বলে—কেন, যেতে চাও?

—অতো দুঃসাহস নেই। কতোদিন আছো এ পাড়ায়?

—অনেক দিন।···আর কি কি জানতে চাও? ক'টি ছেলে মেয়ে? স্বামীর অবস্থা কেমন? দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছে তো? এখনো—কোনো অবসর মুহূর্তে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে কিনা?—এই সব তো?···কৌতূহল মিটিয়ে দিচ্ছি—ছেলে মেয়ে তিনটি, স্বামীর অবস্থা—

—থাক্ চিত্রা, তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানবার কৌতূহল আমার নেই। শুধু হঠাৎ দেখতে পেয়ে কথা কইবার লোভটা দমন করতে পারলাম না তাই।··· আচ্ছা চললাম।

ঘুড়ির সুতো ততক্ষণই ছাড়তে হয়, যতক্ষণ হাওয়ার টানটা জোর থাকে। হাওয়ার টান আলগা হয়ে এলেই সুতো গুটিয়ে নেওয়া দরকার। গমনোন্মুখ সুরেশ্বরের কাপড়ের প্যাকেট্‌ধরা হাতটার ওপর চাঁপার কলি আঙ্গুলের ছোট্ট একটু টোকা পড়ে।···সুতো গুটিয়ে নেওয়ার কৌশল।

—থাক্, যথেষ্ট রাগ প্রকাশ হয়েছে? চলো দিকি, বাড়ি গিয়ে বসা যাক্। পথে দাঁড়িয়ে কথা কইবার কোনো মানে হয় না।

সুরেশ্বর মৃদু হেসে বলে—মানে তো কিছুরই হয় না। বাড়ি গিয়ে বসবারই বা কি মানে আছে? পথের দেখা পথে ফুরোলেই তো ভালো।

—আচ্ছা খুব কবিত্ব হয়েছে। আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল না থাক্, তোমার সম্বন্ধে আমার অসীম কৌতূহল। চলো—শুনি গে—তোমার ক'টি ছেলে মেয়ে, বৌ সুন্দরী কিনা, এখনো সেই কাজটাই করছো কি না, কলকাতায় এলে কতোদিন পরে, আসার কারণটা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যস!

ইঞ্জিনের পিছনে মালগাড়ির মতো দিব্যি চললো সুরেশ্বর! কেন, ওর কি

উচিত ছিলো না উদাসীন অবহেলায় আপত্তি করা ? অনায়াসেই তো বলতে পারতো—থাক আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহলের প্রয়োজন কি ?···বলতে পারতো—তোমার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে পেয়ে কৃতার্থ হবো, এ দুরাশা নিয়ে তো তোমার সঙ্গ ধরিনি।

নাঃ! পুরুষের হৃদয়ে এতো দুর্জয় অভিমান থাকে না, যাতে কোনো লাভের অঙ্ক লোকসানের খাতায় জমা হতে পারে।

অতএব কিছু পরেই—

চিত্রার বসবার ঘরে গুছিয়ে বসে চা খেতে দেখা গেলো সুরেশ্বরকে। দেখা গেলো—চিত্রার বরের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করতে। চিত্রার তিন বছরের মেয়ের মুখে ইংরিজি গান শুনে সুরেশ্বরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও শুনলাম, অবহিত হয়ে শুনতে দেখলাম চিত্রার সাত বছরের ছেলের অশেষ বিদ্যাবত্তার ইতিবৃত্ত।

কোনো কিছুর ত্রুটি দেখলাম না।

আবার, সুরেশ্বর যে এই আটবছর পরে ভাগ্নীর বিয়ে উপলক্ষে কলকাতায় এসেছে, সুরেশ্বরের ভাগ্যে যে এখনো মা ষষ্ঠির কৃপা জোটেনি, ওর বৌকে আর কে কি বলে কে জানে—সুরেশ্বর তো সুন্দরীই দেখে, ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই চিত্রার জানা হয়ে গেলো সহজেই।

এর পরই হয়তো চিত্রা বলতো—বৌকে নিয়ে এসো একদিন—

হয়তো সুরেশ্বর রাজী হতো।

ছন্দভঙ্গ হলো চিত্রার তিন বছরের মেয়ে শানুর এক কীর্তিতে। কোন্ ফাঁকে সে সুরেশ্বরের পাশ থেকে কাপড়ের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে গেছে কে জানে!··ব্রাউন পেপারের সেই খামটাকে হঠাৎ টুপি বানাবার সাধ হলো কেন তার—তাই বা কে জানে! মোটকথা সহসা দেখা গেলো—আবরণমুক্ত শাড়িখানা টেবিলের ওপর পড়ে প্রখর বিদ্যুতালোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্লজ্জ হাসি হাস্‌ছে।

হাস্‌ছিলো হাস্‌তো, কিছুই এসে যেতোনা, যদি চিত্রা সে হাসিকে আমল না দিয়ে নিজের সেই পেটেণ্ট বাঁকা হাসিটি হেসে বলতো—আমার রিজেক্ট মালটাই নিলে শেষ পর্যন্ত ?

ছন্দভঙ্গ হতো না—যদি সুরেশ্বর কৌতুকহাসি হেসে উত্তর দিতো—হতভাগ্যের ভাগ্যে আর কি জুটবে ?···তারপর নেমে আসতো গেরস্থালী কথায়। ভাগ্নীকে দেওয়া যায় কিনা শাড়িটা, বিয়েতে আজকাল কী চলে আর না চলে, কতো চাহিদাই বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন, ইত্যাদি।

শাড়িখানা গুছিয়ে মুড়ে নিয়ে সুরেশ্বর উঠতো, গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আসতো চিত্রা। বলতো—অনেকদিন পরে দেখা হয়ে ভারী খুসি হওয়া গেলো।

ফেরার পথে রাস্তায় যেতে যেতে সুরেশ্বর ভাবতো—চিত্রার ছোট মেয়ে-ছেলের হাতে কিছু খেলনা কিনে দিলে ভালো দেখাতো! বড্ডো আকস্মিক

আসা হয়ে গেলো। আর কোনোদিন যদি সুবিধে করে আসা হয়, নিশ্চয় আনতে হবে খেয়াল করে।

অনেকদিন আগে নিভে যাওয়া আগুনের ভস্মস্তূপের অন্তরালে কোথাও কোনোখানে যদি আত্মগোপন করে থাকতো এতোটুকু অগ্নিকণিকা, সৌজন্যের এই স্নিগ্ধ বারি সিঞ্চনে চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতো সেটুকু।

যা হয় সচবাচর! এখানে ওখানে—যা হচ্ছে যখন তখন।

আগামীকাল সুতিশাড়িখানা বদলে ওই দামের মধ্যেই সস্তাগোছের একখানা ক্রেপ্ বেনারসী নিয়ে যাবার সময় সুরেশ্বর ভেবে পেতো না ধাঁ করে ওই শাড়িখানাই কিনে বসেছিলো কি ভেবে? অসম্ভব কোনো আশায় নয় তো?

বিয়েবাড়িব গোলমালে দ্বিতীয়বার আর যাওয়া হয়ে উঠতো না। ছুটি ফুরিয়ে যেতো।…কর্মস্থলে ফিরে পনেরো দিনের জমানো কাজ উদ্ধার করতে নিজের নামটাই ভুলতে বসতো, তা' চিত্রা!

এইটাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু অস্বাভাবিক করে তুললো চিত্রাই।

বিদ্যুতালোকিত শাড়িটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তীব্র প্রশ্ন করে উঠলো—এর মানে?

কৌতুকের বদলে অপ্রতিভ হাসি হেসে সুরেশ্বর বললো—কি হলো?

—পয়সার অভাবে কিনতে পারিনি আমি? তাই করুণায় বিগলিত হয়ে প্রেজেন্ট করতে এসেছো? আজকাল অনেক পয়সা হয়েছে তোমার, না?

সুরেশ্বরও কঠিন হয়ে ওঠে, শাড়িখানা গুটিয়ে তুলে নিয়ে ব্যঙ্গ হাসির হাসির সঙ্গে বলে—হঠাৎ তোমাকে প্রেজেন্ট করতে যাবো একথা ভাবলে যে? এমন অসম্ভব ধারণার হেতু?

আরক্ত মুখখানা পাঙাশমূর্তি হয়ে যায়। বাঁকা হাসি নয়, টেনে আনা হাসি হেসে চিত্রা বলে—তবু ভালো। পুরুষমানুষের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটাই বড়ো বেশি চোখে পড়ে কিনা, তাই আশঙ্কা হচ্ছিলো।

সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে উঠে বলে—নিজের সম্বন্ধে প্রাধান্যবোধটা বড়ো বেশী থাকলেই আশঙ্কাটা তাদের প্রবল হয়, চিত্রা! 'ওই বুঝি অপমান হয়ে গেলো'—এই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে থাকতে কাঁটার স্বভাবধর্মটাই তাদের স্বভাবগত হয়ে যায়, অন্যকে বিদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না।

আগুনের মতো রাঙামুখ থেকে উত্তর আসে—প্রাধান্যবোধটা কি অকারণেই জন্মায় সুরেশ্বর? কারণ কিছু থাকে বৈকি।…কিন্তু ছিলো তাই রক্ষে, না থাকলে হয়তো বা—আচ্ছা থাক্, রাত হয়ে যাচ্ছে তোমার।

সুরেশ্বর তিক্তহাসি হেসে বলে—অর্থাৎ—'বিদায় হও' এই তো? তথাস্তু। দয়া করে নিজে ডেকে এনেছিলে এইটুকুই যা সান্ত্বনা। তার জন্যে ধন্যবাদ।

সুরেশ্বরের ছায়া মিলিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত গেটের রেলিঙ

ধরে দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রা।···ঘটনাটা কি ঘটে গেল ভাবতে চেষ্টা করে।···শাড়িখানা দেখেই হঠাৎ মাথার মধ্যে অমন আগুন জ্বলে উঠলো কেন? যার জন্যে পাগলের মতো অমন একটা প্রশ্ন করে নিজেকে খেলো করে বসলো! সত্যিই তো—খামোকা সুরেশ্বর তা'কে সামান্য একটা শাড়িই বা উপহার দিতে আসবে কেন? কোন সাহসেই বা আসবে?

পথে যেতে যেতে সুরেশ্বরের ইচ্ছে হয় নিজেকে ধরে চাবুক মারে।

অমন সুন্দর অনুকূল অবস্থাটাকে অতো বিশ্রী ভাবে মোড় ঘুরিয়ে ফেলবার সমস্ত বোকামীটাই তো তার। অকারণ বিরক্তি প্রকাশ, ওটা তো চিত্রার চিরদিনের স্বভাব। সে বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করে অনায়াসেই তো সুরেশ্বর পরিহাসের ভঙ্গীতে বলতে পারতো—'উপহার নয় দেবী, দীনভক্তের পূজো উপাচার'। নিশ্চয় কৃত্রিম বিরক্তির মেঘ কেটে গিয়ে আলো ফুটে উঠতো সে মুখে।

দেওয়া উচিত কি না, দিতে পারা সম্ভব কি না, দেবার অনুকূল আবহাওয়া তৈরি করা যাবে কি না, এসব কোনো কিছুই না ভেবেও চিত্রার কথা মনে করেই তো চট্ করে কিনে বসেছিলো শাড়িখানা? ·আবহাওয়াটাও তো প্রায় তৈরি হয়ে এসেছিলো, সমস্ত নষ্ট হয়ে গেলো সুরেশ্বরের বোকামিতে! যেখানে মলয় বাতাস বইতে পারতো, সেখানে জ্বলে উঠলো আগুন!

কেন এমন হয়?

বারে বারেই কেন ঘটনাস্রোত সুরেশ্বরের হাত ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে যায়?

* * * *

কেন যায়—সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, সুরেশ্বর! চিন্তাভঙ্গীও সকলের সমান নয়।

হয়তো—তোমার আজকের এই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসার উত্তরে একথা বললে ভালো শোনাতো—'আগুন জিনিষটা এমনি যে, নিভে যাওয়া ভস্মস্তূপের নিচে যদি কোথাও কোনোখানে স্ফুলিঙ্গমাত্র অবশিষ্ট থাকে, বাতাস পেলেই সে আত্মপ্রকাশ করে বসে। আর আগুনের স্বধর্মই তো দহন!'

কিন্তু তা' না করে বলবো—আগুনের কথা রেখে দাও বাপু, ও জিনিষ অতো সস্তা নয়! রাত্তির দিন জ্বালানি জোগান দিয়ে তাই বড়ো টিকিয়ে রাখা যায়? কোন্ ফাঁকে নিভে বসে থাকে!·· সেই আগুনকে আবিষ্কার করতে চাইছো নিভে যাওয়া ভস্মস্তূপ থেকে?···পাগল আর কা'কে বলে?

আসল কথা—তোমার সামনে নিজের দৈন্যটা প্রকাশ হয়ে পর্যন্ত মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিলো চিত্রার, তাই তোমাকে বাড়ি এনে আপ্যায়িত করবার ছুতোয় দেখিয়ে বাঁচছিলো নিজের সাজানো ঘর, সুপুরুষ বর, গুণবান ছেলে মেয়ে।···তোমার হাতে শাড়ি দেখে আগুন জ্বলে উঠলো সেই খাটো হয়ে যাবার আশঙ্কাতেই! চিত্রার নাগালের বাইরের জিনিষটা তোমার নাগালে আসবে কেন?

আর তোমার ?

ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ অমন বেকুবের মতো অতোগুলো টাকা খরচ করে ফেলে বুকের ভেতরটা সমানেই খচ্ খচ্ করছিলো তোমার। দেখেছি তো—চিত্রার বরের সঙ্গে আলাপ করবার সময়, আর চিত্রার মেয়ের গানের প্রশংসা করবার সময় তোমার ফাঁকা ফাঁকা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। খরচটা সামলে নেবার একটা ছুতো পেয়ে বর্তে গেলে তুমি !

তুমি যদি বলো···

কাল সকালে উঠে তুমি ভাববে—'জীবনটা কি অদ্ভুত অর্থহীন'···আর চিত্রা ভাববে—'জীবনের সমস্ত অর্থ হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলো'—তা'হলে মাথা নেড়ে বলবো—তা আর নয় ? কাল সকালে—তুমি ভাববে—খুব রক্ষে হয়েছে বাবা ! কী বোকামিটাই করে বসছিলাম, আর একটু হলেই অতোগুলো টাকা—

চিত্রা ভাববে—দূরছাই কী বোকামিটাই করে বসলাম ! ও রকম না হ'লে শাড়িখানা বরকে দেখানোও যেতো !

চিত্রার মতো মেয়ের আকর্ষণ যে কোনোদিনই ফুরোয় না, বারো বছর পরেও সমান তাজা থাকে, এ বিজ্ঞাপনটা বরের কাছে জাহির করতে পারাও তো কম গৌরবের নয়।

এখন তুমিই বুঝে দেখো সুরেশ্বর, কোনটা মিলে যায় ! জিগ্যেস করে দেখো তোমার মনকে !

বিঘ্ন

পাশের ফ্ল্যাটের অবাঙালী ছোকরা তিনটি উঠে গিয়ে একটি বাঙালী পরিবার আসায় এত খুশী লাগল যে, ইচ্ছে হল হরির লুঠ দিই।

শুনে যদি কেউ ভেবে বসেন, আমার চিত্ত একেবারে প্রাদেশিকতার বিষে পরিপূর্ণ, তাহলে ভুল ভাববেন। ছোকরা তিনটি যদি অবাঙালী না হয়ে বাঙালীই হত, শুধু বাঙালী কেন, আমার জ্ঞাতি কুটুম্বর ছেলেও হত, তাহলেও তারা উঠে গেলে যে আমার প্রাণে এই রকম হরিভক্তিই চেগে উঠত সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এ-গল্প তাদের গল্প নয়। কাজেই তাদের কথা এখানে তুলছি না। তুলতে গেলে জ্ঞানকাণ্ড হারিয়ে বসতে পারি। 'পারি' নয়, হারিয়ে বসবই।

শুধু এইটুকু মাত্র বলে রাখি, তারা থাকাকালীন অবস্থায় প্রায়ই আমার প্রাণে 'খুন করে ফাঁসি যাবার' সদিচ্ছা জেগে উঠত।

সে জায়গায় ছোট্ট একটি বাঙালী পরিবার ! যেন জ্বলন্ত আগুনে বরফ জল।

রোগাপাতলা ফর্সা ধবধবে একটি বৌ, তার মোটাসোটা কালোকোলো একটি স্বামী, আর তাদের না-রোগা না-মোটা, না-ফর্সা না-কালো একটি ছেলে।

শুধু এই ! আনন্দের আতিশয্যে ওরা আসামাত্রই দালানের মাঝখানের দরজাটা —যেটা এযাবৎ কোন দিনই খোলা হয় নি—খুলে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম, নিজের হাতে চা করে পাঠিয়ে দিলাম, এবং ছোট ছেলেটির জন্যে দুধভাত অথবা রুটি, যা কিছুর প্রয়োজন হবে, আমার সংসার থেকে পাওয়া যাবে এ আশ্বাস দিয়ে রাখলাম ।

তা কৃতজ্ঞতো বোধ আছে বৌটির । বরং একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। সেই সাধারণ ভদ্রতাটুকুকে আমার মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা বলে ধরে নিয়ে এমন সাধুবাদ দিতে শুরু করল যে পালিয়ে আসতে পথ পাই না ।

হায় ! সেদিন যদি স্বপ্নেও আশঙ্কা করতাম, সেই নিরীহ চেহারার জীবটি ক্রমশঃ আমার পক্ষে এমনই মারাত্মক হয়ে উঠবে যে, অহরহই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে হবে, তাহলে কি দালানের মাঝখানের ওই দোরটা খুলে সেই সামান্য ভদ্রতাটুকু করতে যেতাম ?

দরজা পশ্চিমমুখো, কিন্তু এখন চব্বিশ ঘণ্টা মনে হয়, নিজের হাতে নিজের দক্ষিণ দরজা খুলেছি সেদিন ।

একবার খুলে দেওয়া দরজা কি আর বন্ধ করা যায় ? যায় না ! তাই জন্যেই না জীবনের সব ক্ষেত্রে, বন্ধ দরজা খুলে দিতে গেলে বিচার-বিবেচনার আর অন্ত থাকে না ।

যে দরজা নিজে হাতে খুলে দিয়েছিলাম, নিজে হাতে সে আর বন্ধ করতে পারি নি । ওদের দিকে একটা ছিটকিনি আছে, বাড়ির কর্তা মাঝে মাঝে লাগিয়ে দেন সেটা, কিন্তু তাতে আর কতটুকু রক্ষে হয় ? সে ত সমুদ্রে বালির বাঁধ !

আতঙ্ক ! আতঙ্ক ! সারাদিন আতঙ্কের বিভীষিকা । ওই বুঝি সেই ছিট-কিনিটুকু খোলার শব্দ ! তার পরই দেখা যাবে একখানি রঙিন শাড়ির আঁচল আর সেই রোগা মুখের এক গাল হাসি ।

কি ? শুনে মুস্কিলে পড়ছেন, মারাত্মক বস্তুর সঙ্গে 'এক গাল হাসি' ঠিক ম্যানেজ করতে পারছেন না ? পারবেন, শেষ অবধি শুনলেই পারবেন ।

আসলে ত মেয়েটি পাড়া-কুঁদুলেও নয় বা মুখরা মেজাজী, দজ্জাল জাঁহা-বেজেও নয় । মেয়েটি শুধু আমার গুণগ্রাহী । সাংঘাতিক রকমের গুণগ্রাহী আর সেই হচ্ছে আমার মৃত্যুবাণ !

প্রথম দিনের কথা মনে আছে । সেটা বোধ হয় ওরা আসার দিন চার পাঁচ পরের কথা ! বৌটি অর্থাৎ অনিলা আমার কাছে এসে আরক্তমুখে এবং প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'দিদি, একটা কথা শুধোব, মনে কিছু নেবেন না ?'

হেসে বললাম, 'মনে নেবার মত হলে নিশ্চয়ই নেব ।'

'যাঃ ! দিদি তামাশা করছেন ! শুধোচ্ছি আপনার নামটি কি ?'

বাল্যকাল পার করে আসার পর এ প্রশ্ন আর কেউ করেছে বলে মনে পড়ল না । আরও হেসে বলি, 'কেন, হঠাৎ নামের কি দরকার পড়ল ?'

'আছে দরকার, বলুন না ?'

বললাম নাম।

অনিলা একটু চমকে বলল, 'তবে তা আমার ভাই যা বলেছে ঠিক। আপনি বই লেখেন!'

বললাম, 'তোমার ভাই কোথা থেকে জানল?'

'জানে, ওরা পুরুষ বেটাছেলে, কত খবর রাখে। কাল এসে আমার সঙ্গে মহা তর্ক। ও বলে—আর আমি বিশ্বাস করি না। তর্ক থামে না।'

আমি বলি, 'তা অবিশ্বাসের কি আছে? বই-টই তো মানুষেই লেখে? না কি বাঘ-ভালুকে লেখে?'

অনিলা বিপন্ন মুখে বলে, 'কথাটা অবিশ্যি বলেছেন ঠিক, কিন্তু আমার মনে কেমন বিশ্বাস ধরে নি। ভাইয়ের সঙ্গে যে কতক্ষণ মিছে তর্ক করলাম। বলি—ধেৎ ঠিক আমাদের মত কুটনো কুটছেন, রান্না করছেন, রুটি বেলছেন, বই লিখলেই হল? তোর যত বাজে কথা!'

হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। শেষ পর্যন্ত হেসেই বলি, 'তা তোমার কি ধারণা লেখিকার বাড়ির লোকেরা কাঁচা মাংস খায়?'

শুনে হেসেই কুটিকুটি। যেন আর কেউ কখনও এমন অপূর্ব পরিহাস-রস পরিবেশন করতে পারে না।

সেই থেকে শুরু। হয়তো সকালের সময়ে সংসারের কাজ নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, অনিলা এসে হাজির।

'দিদি, আপনার কিছু সাহায্য করে দেব?'

যদিও সে সময়টাতে সাহায্য পেলে বর্তে যাবারই কথা, তবু সঙ্গত অসঙ্গত বলেও একটা কথা আছে ত? অবাক হয়ে বলি, 'সে কি অনিলা, তোমার ঘরের কাজকর্ম দেখবে কে?'

অনিলা অগ্রাহ্য ভরে বলে, 'ও করবে অখন। চাল ডাল মাপ করে রেখে এসেছি, কুকারে চাপিয়ে দেবে।'

'কি যে বল! যাও পালাও, পাগলামি কোর না', বলে ভাগাতে চেষ্টা করি, কিন্তু অনিলা না-ছোড়!

'দিদি! আলু কটা ছাড়িয়ে রাখি না?'

'কি মুস্কিল! কেন বল ত? নিজের সংসার ফেলে—'

'আপনার সময়ের কত মূল্য দিদি, তার কাছে আমাদের তুলনা? আপনি কত বড় কাজ করেন—'

বলি,—'রক্ষে কর অনিলা, সকাল বেলা পাগলামি জুড়ে দিও না।'

অনিলা আরও অভিভূত হয় এবং বেশ ভাল বাঙলায় আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, বিনয়ই মহতের লক্ষণ। জলজ্যান্ত একটা লেখিকা খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, একেবারে নেহাৎ সাধারণ সব কাজ করছে; এমন অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ হল একটা দিক।

কিন্তু মারাত্মক দিকটার কথা বলি।

কাগজ-কলমের ধারে কাছে গিয়েছি কি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করব পিছন থেকে াড়ের কাছে একটি উষ্ণ নিশ্বাস।

'দিদি লিখছেন?'

এ বাহুল্য প্রশ্নের উত্তর হয় না, কাজেই একটু হাসি। ভাবি, ভাগ্যিস জগতে এই সৌজন্যসূচক হাসিটুকু ছিল! নইলে মানুষের কি দুর্দশাই হত!

পুজো-আর্চায় যেমন গঙ্গা হচ্ছেন সর্ব উপচারময়ী, লোকব্যবহারে তেমনি হাসিই হচ্ছে সর্বভাবময়ী।...সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, বিনয়ে-সৌজন্যে, ভদ্রতায় মূঢ়তায় হাসিই আমাদের সম্বল। কারও কোন প্রশ্ন, উত্তরের উপযুক্ত া হলে অথবা উপযুক্ত উত্তর না জোগালে ওই এক টুকরো হাসিই আমাদের ক্ষা করে। কাজেই হাসি ছাড়া করব কি।

'দিদি!'

মুখ তুলে তাকাই।

'কি লিখছেন?'

'এই যা হোক কিছু।'

'এ লেখা ছাপা হবে?'

'তা হবে বৈকি।'

'কোন্ কাগজে ছাপা হবে?'

কাগজটার নাম করি।

একটি অভিভূত নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়—'ভাইকে বলব একটা কিনে মানতে।'

লেখাটা বিশেষ তাড়াতাড়ি দরকার, ভদ্রতা রক্ষা করতে গেলে সম্পাদকের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় না। কাজেই জলজ্যান্ত একটা মানুষের উপস্থিতি প্রায় অস্বীকার করে খাতায় মনসংযোগ করি। কিন্তু বলেছি তো, সমুদ্রে বালির াঁধ!

'দিদি!...এই যে এত কথা হুস হুস করে লিখে যাচ্ছেন, এ সবই আপনার ানের মধ্যে উদয় হচ্ছে? আগে থেকে মুখস্থ সেই কিছু?'

এ প্রশ্নের পরও বসে বসে 'হুস হুস' করে লেখা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় ক না জানি না, আমার তো হয় না।

হতাশ হাসি হেসে কলমটা নামিয়ে রেখে বলি, 'বই-টই তো প্রায়ই পড় দেখি, এমন ছেলেমানুষের মত কথা বল কেন? মুখস্থ করে লিখলে আর নিজের লেখা কি হল?'

কুণ্ঠিত একটু হেসে মুখ নিচু করে।

'বই তো পড়ি দিদি, পড়তে ভালও বাসি, কিন্তু 'ও' বলে আমার মাথার মধ্যে নাকি কিছু ঢোকে না। আমি বলি হবে বা! কিন্তু আপনার ওই যে কি বই নিয়ে গেলাম সেদিন, "রাতচরা" না কি, ওইটা খুব মন দিয়ে পড়েছি দিদি। 'ও' বলে, দিদির বই বলে তিনবার করে পড়তে হবে নাকি? আমি আপনাকে

ভালবাসি বলে ভারি ঠাট্টা করে দিদি!···আমি খুব তর্ক করি। বলি, এ ভালবাসা আলাদা জিনিস, তুমি বুঝবে না।'

সত্যি বলতে কি, এমন একটা আলাদা জাতের প্রেমের পরিচয় পেয়ে তখনকার মত মন্দ লাগে না।···স্তুতি জিনিসটা এমনই মজার। অগত্যা সে বেলাটা বরবাদ যায়।

কিন্তু একদিন ত নয়, দিনের পর দিন। ক্রমশঃ উত্যক্ত হয়ে উঠি; অস্থির হয়ে উঠি। যে লেখার জন্যে আমাকে এত ভক্তি সেই লেখাই আমার মাথায় উঠিয়ে দিতে বসেছে সে খেয়াল নেই।

লিখতে বসলেই ঘাড়ের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস। অন্যমনস্কতার ভান করে পার পাওয়া যাবে না, একটু পরেই মৃদু কুণ্ঠিত একটি প্রশ্ন শুনতে পাব।

'দিদি লিখছেন?'

অতঃপর প্রশ্নের শরজালের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বাড়িতে যিনি একজন আমার বিশেষ হিতৈষী আছেন তিনি বলেন, 'এ সব তোমার ইচ্ছাকৃত অসুবিধা ঘটানো। বুদ্ধি-সুদ্ধির তো বালাই দেখি না মেয়েটার, ওর সঙ্গে অত ভদ্রতা করতে যাও কেন? ওতেই প্রশ্রয় পেয়ে যায়। ওর সঙ্গে ভদ্রতা করতে গিয়ে যে তোমার সম্পাদকদের কাছে 'অভদ্র' নাম কিনতে বসেছ।'

অভিযোগ মিথ্যা নয়। কিন্তু কি যে করি!

একদিন ঘরে খিল দিয়ে লিখতে বসলাম, দেখি বারান্দার ওদিক দিয়ে ঘুরে বাথরুমে যাবার প্যাসেজটায় দাঁড়িয়ে আছে জানলার শিক ধরে।

না দেখার ভান করে কতক্ষণ থাকা যায়? অগত্যাই বলতে হয়, 'কি অনিলা, কিছু বলবে?'

'না দিদি! আপনাকে দেখছি! আপনি যখন লেখেন আমি হাঁ করে আপনার মুখপানে তাকিয়ে থাকি। এত ভাল লাগে!······আপনিই মানুষ দিদি।······আর কি মিথ্যে মানুষই হয়েছি আমরা! আমাদের বেঁচে থাকা—মা বসুমতীর চারটি ধান-চাল ধ্বংস করতে পড়ে থাকা!'

এরপর আর দোরে খিল দিয়ে বসে থাকা সম্ভব? আমার দ্বারা তো সম্ভব নয়। দোর খুলে ডাকতে হয়, অনেক বাক্য-ব্যয় করে বোঝাতে চেষ্টা করতে হয়, মানুষ কিছুতেই মিথ্যে হয়ে যায় না। কত রকমের কাজ আছে জগতে, সবাই কি সব কাজ পারে? কেউ এটা পারে ওটা পারে না, কেউ ওটা পারে এটা পারে পারে না, এই আর কি!···এই যে তুমি কী সুন্দর উল্ বুনতে পার, আমি পারি না!'

শুনে সেই হাসি।

হেসে খান খান। 'দিদি এত মজার মজার কথা বলতে পারেন! কিসের সঙ্গে কি, পান্তাভাতে ঘি—!'······

সেদিনটাও বরবাদ।

অথচ সত্যিই আর চালানো যাচ্ছে না। সত্যিই বাইরের লোকের কাছে 'অভদ্র' হয়ে দাঁড়াচ্ছি।

কিন্তু সকাল নেই সন্ধ্যা নেই দিন দুপুরে তো কথাই নেই, আমাকে একবার বসতে দেখলেই হল। সেই মৃদু উষ্ণ নিশ্বাস, সেই সলজ্জ হাসি আর সেই কুণ্ঠিত নিবেদিত ডাক 'দিদি'!

এদিকে লেখার গাদা জমে আছে, ওদিকে পুজোর বাড়তি লেখা এসে পড়ছে, অথচ লেখবার অবসর কিছুতেই পাচ্ছি না।

স্পষ্ট করে বলতে শুরু করি 'ভীষণ কাজ জমে আছে অনিলা, গল্পে গল্পে ভাই কিছু হবে না, পালাও তুমি।'

অনিলা পূজা নিবেদনের বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'লিখুন না দিদি। আমি আপনাকে কিচ্ছু ব্যস্ত করব না। একটি পাশে চুপ মেরে বসে থাকব।'

বিরক্তিতে রাগে হাড় পর্যন্ত জ্বলে যায়। সত্যি বলতে কি, ক্রমশ ভদ্রতাবোধও লুপ্ত হতে বসেছে। তবু জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলি, 'চুপ করে বসে থেকে সময় নষ্ট করে কি হবে? তার চেয়ে খানিক ঘুমিয়ে নাও গে না!'

অনিলা ম্লান হাসি হেসে বলে, 'আমাদের জীবন তো ঘুমিয়েই কাটল দিদি, জ্ঞানদৃষ্টি আর খুলল কই?'

বুঝুন! কথাগুলি কি অজ্ঞানের মত! পণ্ডিতের মত কথা আর বুদ্ধুর মত ব্যবহার!

আবার যেদিন মোটেই আমল দিই না, কিছুতেই খাতা থেকে মুখ তুলি না, সেদিন খানিকটা ঘোরাঘুরি করে চলে গিয়ে একটু পরেই নতুন উদ্যমে আসে ছেলে নিয়ে।

'এই দেখেন দিদি, মাসীর কাছে যাব বলে বায়না লাগিয়েছে! যত বোঝাই তোর মাসী কি যে সে, তার কত কাজ, এখন গিয়ে কাজে বাগড়া দিতে নেই মানিক, সেকথা কে শোনে! নিন এখন কি করবেন করুন?'

বলে যেন মস্ত কৌতুক করেছে এইভাবে হাসতে থাকে।

ছেলেটির মুখ দেখে বোঝা যায় এসব ষড়যন্ত্রের কোন ধারই সে ধারে না।

আমার হিতৈষী বন্ধু ওর নাম রেখেছেন—'বিঘ্নস্বরূপিণী দেবী'। ওর ছায়া দেখলেই বলেন, 'ওই দেখো এলেন তোমার 'বিঘ্নস্বরূপিণী'। উঃ, তোমরা মেয়েরা এদিকে প্রত্যেক বিষয়ে এত অসহিষ্ণু, অথচ কি করে যে এই বিরক্তিকর ব্যাপার সহ্য কর! এ আমাদের হলে কোন কালে ঠিক করে দিতাম। তাও যদি বুঝতাম একটু বুদ্ধিওলা জীব।'

হেসে ফেলে প্রশ্ন করি, 'বুদ্ধিওলা জীবের পক্ষে এই ব্যবহারটা করা সম্ভব?'

অনিলার ভক্তির বাড়াবাড়িতে নানা কারণেই অস্বস্তি আমার।

ওকে অনেক সময় বোঝাতে চেষ্টা করি, 'দেখ বাপু, খাতা কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করি বলেই যে আমারই জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে তা ভেব না। এমন কিছু লিখি না আমি। গোটা কতক গল্প উপন্যাস, ও চেষ্টা করলে সবাই লিখতে পারে।'

কিন্তু বুঝছে কে?

এ কথাটাকেও আমার রসিকতা মনে করেই এক চোট হেসে নেয় সে। আবার বলে, 'তাই জন্যেই তো এতো করে আপনার হাওয়া গায়ে লাগাচ্ছি দিদি, যাতে আসছে জন্মে একটু গুণ ধরতে পারি।'

এমনি করে আমার দিনের সমস্ত অবসর আর বিশ্রাম নিহত হচ্ছে।

শুধু একটি কথার জন্যে।

স্পষ্ট করে একবার বলতে পারলেই হয়, 'তোমার জন্যে বাপু আমার অসুবিধে হচ্ছে।'···কিন্তু তাই কি বলা যায়? হিতৈষী বন্ধু বলেন, 'না যায় তো মর!'

তা প্রায় মরতেই বসেছি। সর্বদা আতঙ্ক ওই বুঝি ছিটকিনির শব্দ। ওই বুঝি আমার কাজের সাহায্য করতে আসছে, ওই বুঝি লেখার ব্যাঘাত ঘটাতে আসছে।

দুটোই সমান অসহ্য!

ওদিকে ওর সংসারে বিশৃঙ্খলার সংবাদ কানে আসে। কালোকালো মোটা-সোটা ভদ্রলোক আমার কান বাঁচাবার চেষ্টা না করে সভ্য ভাষায় যা বলেন, তার মর্মার্থ অসাধু ভাষায় এই দাঁড়ায়, আমি লিখিয়ে পড়িয়ে বিদুষী আছি, বেশ আছি, অন্যের ঘরের বৌকে ধিঙ্গি করে তুলছি কোন আক্কেলে? তাদের ঘরে সময়ে রান্না হয় না, সময়ে ছেলের খাওয়া হয় না, অথচ আমি দিব্যি তার স্ত্রীকে বেগার খাটিয়ে নিচ্ছি!

স্পষ্ট এই ভাষা নয় বটে, তবে অপরের মনের চেহারাটা স্পষ্ট দেখে ফেলবার একটা আর্শী আমার কাছে আছে কি না।

অনিলাকে এ সম্বন্ধে কঠোরভাবে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু গায়েও মাখে না। স্বচ্ছন্দে হেসে বলে, 'পুরুষ মানুষের কথা ছেড়ে দিন দিদি, হিংসুটের জাত।···এই যে আমি আপনাকে একটু ভালবাসি, তাতেই হিংসেয় ফেটে মরে।·· বলে কিনা তোমার 'দিদির নেশা' যেন মাতালের মদের নেশা। শুনুন তো দিদি অভাব্যি কথা?···এই যে আমার শাশুড়ীকে দেখেছি তিন ঘণ্টা পুজোর ঘরে বসে থাকে, সে কি মদের নেশায়?'

আর কি বলব! বলবার কিছু রাখছে?

মাঝে মাঝে এক একদিন বাড়ি থাকে না অনিলা, কাছেই কোথায় পিসীর বাড়ি নাকি যায়।

সেদিন মহোৎসব।

মনে হয় একদিনে সব জমানো কাজ উদ্ধার করে ফেলি। কিন্তু পরদিন তার শোধ নেয়।· ছেলেটাকে নিয়ে এসে প্রায় এখানেই পড়ে থাকে।

আবার নিতান্ত উঠে যাবার সময় বলে যাওয়াই চাই, 'দিদির কত সময় নষ্ট করলাম!···আজ আর কিচ্ছু লেখাটেখা হল না আপনার। আমাদের মত সস্তার সময় তো আপনার না, কত দামী সময়।···যখনই ভাবি তখনই অবাক লাগে।

…আপনার সময় নষ্ট করে কত পাপ হচ্ছে আমার।’

শুনুন! জ্ঞানপাপী আর কাকে বলে।

একদিন পিসির বাড়ির থেকে এসে এক নতুন উপদ্রব! সেই প্রথমদিনের মত আরক্ত মুখ, রুদ্ধ কণ্ঠ। ‘দিদি। আপনি রেডিওতে গল্প বলেন?’

অগ্রাহ্যভাব দেখিয়ে বলি, ‘বলি তো কি হয়েছে তাতে?’

কিছুক্ষণ আর কথা জোগায় না অনিলার। খানিক পরে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, ‘আর এই বসে বসে মোচা কুটছেন?’

—কি মুস্কিল! মোচা কুটব না? রেডিওতে আবার কে না যাচ্ছে আজকাল!…আর যদিই কেউ না যেত, মোচার সঙ্গে কি?

‘কিন্তু, কেমন করে বলেন দিদি?’

‘এই যেমন করে তোমার সঙ্গে গল্প করছি?’

‘আপনার ভয় লাগে না?’

কই না তো!’

আর একটা গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, ‘আপনিই ধন্য দিদি!’

রেডিওর খবরের পর দেবত্বের আর এক ধাপ ওপরে উঠেছি!…নেহাৎ লোক-লজ্জায় না বাধলে বোধ হয় অনিলা নিত্য আমাকে ফুলচন্দন দিতে আসত।

এ বিপজ্জনক অবস্থা আর কতদিন সহ্য করা যাবে ঈশ্বর জানেন। কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ওরা যেন উঠে যায়। তার বদলে আবার আমার সেই অবাঙালী পড়শীরা আসুক! তাও ভাল।

কিভাবে আমার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে, সেকথা বন্ধুবান্ধবের কাছে গল্প করি। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না! আমার সমস্তটা দিন যে আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে থাকে এটা যেন একটা হাসির কথা! তারা পরামর্শ দেয় —একটু অগ্রাহ্য ভাব দেখালেই হয়। কিন্তু কোন ‘ভাবই’ যে বোঝে না, নিজ-ভাবেই যে থাকে, তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি?

অতএব আমার অবস্থা যথাপূর্বং তথা পরং! সেই ঈষদুষ্ণ নিশ্বাস…সেই মৃদুকুণ্ঠিত ‘দিদি’ ডাক, সেই সম্ভ্রমে বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টি।…সেই একটু কাজ করে দিতে পারলে কৃত-কৃতার্থ ভাব।

গৃহকর্তাকে তাড়না করছি··বাসা বদলের জন্য।

ভক্তের হাত এড়িয়ে মুক্ত হতে না পারলে আর আমার ইহকালও নেই পর-কালও নেই।

কিন্তু এতটা অস্বাভাবিক অবস্থা সত্যিই চিরদিন চলে না। একটা কোন আঘাতে সেটা মোচড় খায়!

নিত্য নিয়মে ‘বিঘ্নস্বরূপিণী দেবী’ ছায়াস্বরূপিণী হয়ে আমার কাছে বসে থাকে, নিত্য নিয়মে ও চলে গেলেই আমি বলতে থাকি, ‘কি জ্বালাই হয়েছে বাবা! আর তো পারা যায় না…পাগল-টাগল হয়ে যাব এবার। ওরা তো যাবে

না···চল আমরাই অন্য কোথাও উঠে যাই···আমার লেখিকা নাম তো ঘুচে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি ··।' নিত্য নিয়মে গৃহকর্তা আমার ভদ্রতা ও চক্ষু-লজ্জাকে ব্যঙ্গ করে শানানো শানানো বুলি প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে থেকেই হঠাৎ এ।-দিন পালা বদলাল।

ও-বাড়ির কর্তার বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন। ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে। অতএব অনিলা মনের আনন্দে রাত দশটা পর্যন্ত এ-বাড়িতে আসন গেড়ে বসে আছে, এবং বারবার কৌতুক-হাস্যের সঙ্গে ব্যক্ত করছে, কর্তার এমন নেমন্তন্ন রোজ হলে মন্দ হয় না।

এ-বাড়ির কর্তা-নামধারী ভদ্রলোকটিরও যে সুখদুঃখবোধ থাকতে পারে, স সম্বন্ধে অবশ্য কোন দুশ্চিন্তা নেই অনিলার। মনে মনে প্রমাদ গণছি! কি দুর্মতিতে হঠাৎ মনে হল এমন একটা কিছু ঘটে না, যাতে আমার বাড়ি আসা ও বন্ধ হয়।

ঠিক এমনি সময় ও-বাড়িতে একটা তুমুল চিৎকার। আধ-ঘুমন্ত ছেলেটার কান্না এবং তার পিতৃদেবের ধমকের ঐক্যতান বাদন।

'এই সর্বনাশ! ওরা এসে পড়েছে।' বলে অনিলা উঠে যায়। পরক্ষণেই একটা চাপা ক্রুদ্ধ স্বর কানে আসে।···হয়তো···বেশি রাত্রি বলেই আসে। হয়তো এটা নতুন নয়—হয়তো এমনই হয়—দিনের বেলার অনেক গোলমালে চাপা পড়ে যায়···কানে আসে—'এইবার একদিন মার খেলে তবে তুমি জব্দ হবে। ওরা তোমাকে বড্ড ভালবাসে তাই যাও—না?···নির্বোধ ইডিয়ট? ওরা তোমায় কত অগ্রাহ্য করে সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি ঘটে আছে?· কাল থেকে খবরদার যদি যাবে—'

চোখ-মুখ আগুন করে চুপ করে শুনি। লোকটা অমার্জিত, তবু মনে মনেও সম্পূর্ণ অপরাধী করতে পারি না। ওর অভিযোগ তো মিথ্যে নয়।

বিরক্ত হই, অসহিষ্ণু হই, এসব তো মিথ্যে নয়। অগ্রাহ্য? তাও করি বৈ কি!

পরদিন সকাল থেকে আর আসে না অনিলা। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে ভাবি, যাক্‌গে—ভালই হল! অতিষ্ঠ হয়েই তো উঠেছিলাম, এ বরং রেহাই পেলাম।

দুপুরবেলা সংসারের পালা মিটিয়ে তোড়জোড় করে লিখতে বসি।···কাল আমার সন্ধ্যাবেলাটাও হত্যা করে গেছে অনিলা, বিশেষ একটা তাগাদার লেখা পড়ে রয়েছে। লিখতে বসেছি, মনটাও একটু বসিয়েছি···হঠাৎ ঘাড়ের কাছে··· উষ্ণ নিশ্বাস!

চমকে মুখ তুলে দেখি অনিলা।

সলজ্জ-কুণ্ঠিত মুখে একটু ক্লিষ্ট হাসি। 'দিদি? খুব লিখতে শুরু করে দিয়েছেন, না? মনে ভাবছেন আজ আর অনিলা জ্বালাতে এল না, কেমন?'

ওর রোগা মুখটা আরও রোগা, এবং ফ্যাকাশে রঙটা আরও ফ্যাকাশে

দেখাচ্ছিল, তবু হঠাৎ কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায় !

রাগ সামলাতে পারি না ওর নির্লজ্জতা দেখে। এ কী নেশা ? মদের নেশার সঙ্গে তুলনা করা তো অসঙ্গত হয় না। কি যে হয়। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে বসি, 'সত্যিই আমার কাজের বিশেষ ক্ষতি হয় অনিলা। তুমি আর এস না।'

একটু থতমত খেয়ে ও আবার হেসে ফেলে। বলে, 'ঈস, দিদি, বড্ড তামাশা করছেন যে !'

আমি একই স্বরে বলি, 'তামাশার কিছু নেই অনিলা ! আমি তো তোমার সমবয়সী নই, সব সময় এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না ! এতে তোমারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি।'

অবোধ পশুও কখনও কখনও মর্মাহত হয় বৈ কি! অনিলা একটু সরে গিয়ে বলে, 'আমার লাভ ক্ষতি আপনি বুঝবেন না দিদি। একটা জানোয়ারের সঙ্গে বাস করি—আপনার কাছে এসে স্বর্গবাস হয়। যাক্, আপনার যদি ক্ষতি হয় আর আসব না, বেশ।'

ধীরে ধীরে চলে যায়।

মরচে-ধরা ছিটকিনিটা বন্ধ হবার একটা ক্যাঁচ-ক্যোঁচ শব্দ হয়।

নিজের হাতে খোলা দরজা নিজের হাতে বন্ধ করলাম আমি ! কিন্তু আমিই কি ? ছিটকিনিটা তো ওদিকে। তা এদিকে থাকলে আমিই দিতাম না কি ?

ওর মধ্যে মানসম্ভ্রম জ্ঞান না থাকতে পারে, আমার তো আছে। একটা বুদ্ধিহীন ভালবাসার খাতিরে তাকে তো বিসর্জন দিতে পারি না !

কি বলছেন আপনারা ? ওই কালো মোটা তুচ্ছ লোকটার কথা অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে পারতাম ?

তাই কি পারা যায় ? 'কথা' যে অগ্নিদেবতার কন্যা। ওর মধ্যেও যে আগুনের ঝলসানি, গায়ে লাগলে জ্বালা করে ফোস্কা পড়ে।

এরপর বেশ চিন্তিন্ত হয়েই নিজের কাজকর্ম করতে পারব আশা করছিলাম। কিন্তু বিঘ্ন কাটছে না ! খাতা কলম নিয়ে বসলেই যেন সেই ঘাড়ের কাছে একটা উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ পাই।

চমকে মুখ তুলে দেখি। কই ? সেই রোগা মুখের একগাল হাসিটা তো নেই ? কিন্তু ঘাড়টায় ওরকম অস্বস্তি হয় কেন ?

ঘাড়ে ভূত-টুত চেপে আছে নাকি ?···কিছুই লেখা হয় না ? হতাশ হয়ে কলম নামিয়ে রেখে বসে বসে ভাবি। বিঘ্নর অভাবটাও একটা বিঘ্ন না কি ?

অ্যাক্সিডেণ্ট

ব্যস, নিতে যা দেরী ! ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই খতম ! পুতুলের পুতুল-জন্ম শেষ হ'লো ! সকাল থেকে হঠাৎ দেখতে পাওয়া অবধি ওই পুতুলটার জন্যে বায়না নিয়েছিলো ফুলটুসি, না নেওয়া অবধি সে বায়না সে থামায় নি।

অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন সরস্বতী, দিয়েছিলেন অনেক প্রতিশ্রুতি, রবিবার ফুলটুসির দাদুকে দিয়ে ওই 'পচা পুরনো বিচ্ছিরি' পুতুলটার বদলে 'হাজার হাজার গুণ ভালো' পুতুল কিনে দেবেন, এ আশ্বাস বার বার শুনিয়েছিলেন, কিন্তু নাঃ, কোনো ফল হয়নি তাতে।

ছেলেভোলানো কথায় ভুলবে, ফুলটুসি এমন পাত্রী নয়। যুদ্ধোত্তর যুগের মেয়ে ও, সম্পূর্ণ বাস্তববাদী। ওর মতে—'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকী খাতা শূন্য থাক!' তা'ছাড়া তার নিজের হাতের 'আবদার' রূপ অমোঘ আগ্নেয়াস্ত্রের দুর্বার শক্তি সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন সে। মনে জানে, রবিবার এলে সেই 'হাজার হাজার গুণ ভালো' পুতুলটাও করায়ত্ত করা হয়তো অসম্ভব হবে না, যদি সে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করা যায়। তবে এখন এটা ছাড়া কেন?

তাছাড়া—বলতে গেলে পুতুলটা ওর নিজের আবিষ্কার। সে হিসেবে ওর দাবী রয়েছে।

যতোবার মামার বাড়ি এসেছে ফুলটুসি, দেখেছে দিদিমার খাটের তলায় একটা পাতলা লম্বা ধরনের বাক্স আছে ভিতর দিকে ঠেলা।…ধূলিধূসরিত বিবর্ণ সেই বাক্সটাকে দেখে খুব একটা লোভনীয় মনে হবার কোন কারণ নেই, তবু ফুলটুসি যতোবার আসে, দেখা যায় যেন ওইটার ওপরই প্রাণ পড়ে আছে ওর।

—দিদিমা, ওই বাক্সটা বার করো!

শুনে সরস্বতী যেন ভয়ে পাথর হয়ে গেছেন এই ভাবে বলেন—ওই বাক্সটা বার করবো! বলিস কি রে? মুখে আনিসনি অমন কথা! বাবাঃ শুনেই আমার ভয় করছে!

—কেন, ভয় করবে কেন? ফুলটুসি জেরা করেছে—এতো বড়ো মেয়ের আবার ভয় করে নাকি?

—করে না? বলিস কি? ওর মধ্যে কি আছে জানিস না তো?

—কি আছে?

—'পান্তো ভূতের জ্যান্ত ছানা'।…

একটু থতমত খেয়ে গেছে ফুলটুসি।

অবিশ্বাস আর বিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থা, তবু তখনকার মতো নিবৃত্ত করা গেছে তাকে।

ফুলটুসির অসাক্ষাতে একসময় বাক্সটাকে আর একটু ভিতরে ঠেলে রেখেছেন সরস্বতী, যদি চোখের আড়ালে গেলে মনের আড়ালে চলে যায়।

কিন্তু না, তা যায়নি।

ফুলটুসির চিত্তজগৎ থেকে নড়াতে পারেন নি সেই বাক্সকে।…ফুলটুসি তেমন হালকা মেয়ে নয়। ওই ধূলিধূসর আবরণের মধ্যে কী অনন্ত রহস্য লুকোনো আছে তা' না দেখে ওর শান্তি কোথায়?

বড়োরা যা বলে তা'তে ঠিক বিশ্বাস করা শক্ত, কারণ ফুলটুসি তার চারটি

বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছে—সত্যিকথা কদাচই বলে বড়োরা !···তাছাড়া 'পান্তো-ভূতের জ্যান্ত ছানা'ই যদি হবে, কেন থাকবে না তার নড়নচড়ন ক্ষমতা ?

কাজেই একদিন ফুলটুসি মরীয়া হয়ে লেগে গেলো রহস্য উদ্ঘাটনে। সকলের অগোচরে খাটের তলায় ঢুকে উবুড় হয়ে পড়ে আস্তে আস্তে সেই 'অসীম-রহস্যের অবগুণ্ঠন' উন্মোচন করে দেখে ফেললো কি আছে তা'তে।

ডালা তোলবার সময়ে যে তার বুক থরথর করেছে, হাত পা কেঁপেছে, আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু পরক্ষণেই সে তার সেই বিখ্যাত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো—দিদা মিথ্যুক বদমাইস! পুতুল লুকিয়ে রেখে ভূত বলেছে। আমি নেবো, আমি পুতুল নেবো। আমি পেয়েছি।

ওর চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ফুলটুসির মা ছুটে এলো, এলেন সরস্বতী। আর ঘরে এসে দেখলেন খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসা দু'খানি ছোটো ছোটো পা —বিশুদ্ধ বাঙলায় যাকে দাপাদাপি বলে—তাই করছে, আর খাটের তলা থেকে এক সানুনাসিক চীৎকারে ধ্বনিত হচ্ছে—আমি পুতুল নেবো, ওই বড়ো মেম-পুতুলটা নেবো, আমি পেয়েছি।

ফুলটুসির মা বলে—নিবি তো নিবি, আগে আয়! মাথা ঠুকে মরবি যে। · পুতুলটা সম্বন্ধে তার নিজেরও বাল্যকালে কিছু দুর্বলতা ছিলো, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্বলতা দেখেছে সরস্বতীরই, তাই কখনো সাহস করে খেলতে চায়নি। কিন্তু এখনকার কথা স্বতন্ত্র, এ হলো—নাতনীর আবদার! ···মনে মনে সে স্থির নিশ্চিত যে সরস্বতী ওটার স্বত্ব ত্যাগ করবেন এতোদিনে।

মুখে মাথায় ঝুল, নাকের আগায় ধুলো, ফুলটুসি বেরিয়ে এলো বাক্সটা টানতে টানতে, এবং আর একবার তারস্বরে ঘোষণা করলো—দিদা মিথ্যুক! নিজে খেলবে বলে লুকিয়ে রেখেছে! এতোবড়ো ধাড়ী মেয়ে পুতুল খেলবে!

সরস্বতী অবাক ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা কী কাণ্ড! ভূতটা পুতুল হয়ে গেছে, আর ফুলটুসি ভূত হয়ে গেছে!

ফুলটুসি ভূত!

চমকে বললে সে—কই ?

—দেখগে যা আর্শিতে।

—ওঃ ধুলো! যাক গে—ফ্রকের কোণটা তুলে নাক ঘসতে ঘসতে ফুলটুসি আত্মস্থ ভাবে বলে—মেম পুতুলটা আমার মেয়ে!

সরস্বতীর মুখ শুকোলো—যে বেয়াড়া আবদারে মেয়ে, দেখা যাচ্ছে না নিয়ে ছাড়বে না, কিন্তু নিলে কি আর রাখবে! অথচ পুতুলটার উপর আজও যে কী অদ্ভুত দুর্বলতা আছে তাঁর!

অতএব প্রথমটা চললো প্রবোধ পর্ব। পুতুলটা যে কতো বিচ্ছিরি, পুরনো, ধুলো মাখা, সে বিষয়ে নাতনীকে সচেতন করে দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন সরস্বতী। তাতে কাজ না হওয়ায় শুরু হলো প্রতিশ্রুতি পর্ব! কিন্তু না,

কিছুতেই কিছু না, ফুলটুসি 'ভবী'র দ্বিতীয় সংস্করণ।

সে শুধু এক নাগাড়ে ঘোষণা করছে—আমি পুতুল নেবো! আমি বড়ো মেম পুতুল নেবো। আমি পেয়েছি।

কতোক্ষণ আর যুঝতে পারা যায় দিদিমা হয়ে নাতনীর সঙ্গে? যুদ্ধের উপলক্ষটা যখন এমন হাস্যকর!

ওদিকে নিজের মেয়ের মুখের ভাব ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসছে, এ সরস্বতীর চোখ এড়ায়নি। আর কতোক্ষণ সে ক্ষমা করবে চল্লিশোত্তীর্ণা জননীর "শৈশবের স্মৃতির" প্রতি এই শৈশবোচিত আসক্তিকে?

তবু সরস্বতী আপাতরক্ষা হিসেবে বলেছিলেন—আচ্ছা, নিও, আগে ওর ধুলো ঝেড়ে দিই।

এবং কি ভেবে কে জানে এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গিয়েছিলো ফুলটুসি, একবার শুধু দিদিমাকে সত্যে-বন্দী করিয়ে নিয়ে "লুকিয়ে রাখবে না তো আবার? দেবে?"

—নারে বাপু দেখ না, ওকে নতুন জামা পরিয়ে দেবো!

—কখন?

—এই যখন তোর দাদু আপিসে চলে যাবেন, আর মামাবাবু কলেজে, সে—ই তখন।

আচ্ছা তথাস্তু।

'সেই-তখন' মধ্যাহ্নের সেই স্তব্ধ নির্জনতায় যখন ফুলটুসিকে ওর মা মেরে ধরে ঘুম পাড়িয়েছে, সত্যিই পুতুলটা নিয়ে বসেছিলেন সরস্বতী। নিয়ে বসেছিলেন ছুঁচ সুতো কাঁচি, লেস আর সাটিনের টুকরো ছাঁট!···

বহুদিনের জীর্ণ মলিন রং-জ্বলে-যাওয়া ছিটের ফ্রকটার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে পুতুলটাকে দিলেন নতুন রূপসজ্জা!

আশ্চর্য, ভোলেননি তো এখনো? এই ছেলেমানুষী কাজ?

দিব্যি চটপট তৈরি করে ফেললেন পুতুলজনোচিত সৌখিন ফ্রকটি, লেস্ আর সাটিনের সমন্বয়ে। টুপীটা পর্যন্ত বদলে দিলেন, দেখলে আর সহসা পুরনো জিনিস বলে মনে হচ্ছে না।

সেকালের জিনিস—সত্যিকার ভালো জিনিস, এখনো তার কলকব্জা ঠিক আছে, এখনো তাকে শুইয়ে দিলে চোখ বোজে, বসালে চোখ খোলে।

নিস্তব্ধ দুপুরের একটা মাদকতা আছে।

হঠাৎ যদি কোনোদিন এমন হয় যে বাড়ির আর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা আছে অনুপস্থিত, তখন একা বসে কোনো কাজ করতে গেলে, হঠাৎ এক সময় যেন মনটা যায় হারিয়ে, যেন কাল-সমুদ্রের অনেকখানিটা অতিক্রম ক'রে আর কোনো পারে গিয়ে পৌঁছয়! কি আছে সেখানে?···কি নেই?

* * *

হ্যাঁ, ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পুতুলটার ইতিহাস।

অনেক দুঃখের, অনেক লজ্জার আর অনেক আনন্দেরও।···

··· ··· ···

স্কুলেয় প্রাইজের দিন দুই বোনে ফিরলো, বীণাপাণি আর সরস্বতী!

বীণাপাণির হাতে একটি মনোমুগ্ধকর 'ডল্', সরস্বতীর হাত শূন্য। সরস্বতী প্রাইজ পায়নি! সে ফেল হয়েছে।

দিদির গৌরবে গৌরবান্বিত হ'বার জন্যে মনে মনে অনেক চেষ্টা করেছিলো সরস্বতী, দিদি শুধু একটিবার তা'র পুতুলটাতে হাত দিতে দিলেই ধন্য হয়ে যাবে, এই ছিল বাসনা, কিন্তু কী অদ্ভুত নিষ্ঠুরতাই করেছিলো সেদিন দিদি! ···সরস্বতী যেই একবার হাত ঠেকিয়েছে, বীণাপাণি বাঘিনীর মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুতুলটাকে ছিনিয়ে নিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলে উঠ্‌লো—নিজে প্রাইজ পায়নি, আবার পরের জিনিসে হাত! 'ফেল হয়ে বাড়ি যায়, ব্যাঙ্ পুড়িয়ে ভাত খায়'! লজ্জা নেই বেহায়া!

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি সুদ্ধু সকলেই যেন এক সুরে গান গেয়ে উঠলো—'লজ্জা নেই! লজ্জা নেই! ফেল হয়ে লজ্জা নেই!'

সরস্বতীর যে মাত্র আট বছর বয়েস, সে কথা যেন ভুলেই গেলো সকলে। মা বাবা, বড়দা ছোড়দা—কে নয়?

কেউ একবার তাকিয়ে দেখলো না তার মনের দিকে। তার না পাওয়ার বেদনার উপর চাপিয়ে দিলো ব্যঙ্গের জ্বালা! ভাবলো না আট বছরের মেয়েরও অপমানবোধ থাকে।

··· ··· ···

পরে ভেবে দেখেছেন সরস্বতী, সবটাই হয়তো তাদের ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতা নয়, নয় মমতার অভাব, অভাব হচ্ছে 'বোধে'র। সে যুগে ছোট ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' বলে ধর্তব্য করার রীতি ছিলো না! একথা ভাববার অভ্যাস ছিলো না তাদেরও মন আছে। যদিও নিতান্ত নাবালকদের কাছ থেকেও আশা করা হ'তো নম্রতার, বাধ্যতার, কর্তব্যবোধের। আশা করা হতো তাদের কাছ থেকে, লজ্জা সরম, জ্ঞানের।

যাক্ এ যুগ তা'র শোধ দিচ্ছে।

সরস্বতীর কঠিন পণ সে কিছুতেই কাঁদবে না আর তার অভিভাবক মণ্ডলীরও বোধ করি দ্বিগুণ পণ তাকে কাঁদিয়েই ছাড়বেন।

—"যাও সমস্ত দিন খেলে বেড়াও গে! বই খাতায় হাত নেই, খালি খেলা, আর খেলা, নাও এখন গোল্লা খাও।"

বললেন বড়দা।

সেই কথারই জের টানলো ছোড়দা—"আহা বলতে পারছো না বড়দা, অনেক দিন রসগোল্লা খায়নি, তাই ইস্কুলের দিদিমণিদের কাছে গোল্লা খাবার জন্যে আর্জি করেছিলো।

বরং তিরস্কার সহ্য হয় তো—সহ্য হয় না ব্যঙ্গ।

কিন্তু সেইতেই যেন তাদের যতো স্ফূর্তি।

ছোটছেলেরা পাখীর পায়ে দড়ি বেঁধে দিয়ে অথবা কুকুরের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে যে স্ফূর্তি পায়, বোধ করি সেই জাতের স্ফূর্তি।...হয়তো অত্যাচারেরও একটা নেশা আছে, করতে করতে বেড়ে যায়। একজন অত্যাচার করছে দেখলে করতে ইচ্ছে করে।

ফেল করার জন্যে ধিক্কার দিয়ে দিয়ে, আর তা'র 'সরস্বতী' নামের প্রতি কটাক্ষপাত করে করে শেষ অবধি তাকে কাঁদানো হলো।

তবু আর সকলের তো এক সময়ে শেষ হলো, কিন্তু ছোড়দার যেন আর শেষ হ'তে চায় না। তার 'রায়' অনুযায়ী সরস্বতীকে নিজের গালে চড় মারতে হলো, নিজের কান নিজে মলতে হলো, মেপে তিন হাত নাকে খৎ দিতে হলো, এবং এক ঘণ্টা ধরে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকতে হলো।

ছোড়দাকে তখন 'পিশাচ' ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি সরস্বতী। কিন্তু কিছু পরে ঘটনার মোড় বদলে গিয়েছিলো।...কেঁদে কেঁদে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া সরস্বতীর পরদিন সকালে উঠে সেই ছোড়দাকেই দেবতা মনে হয়েছিলো।

কিন্তু সে দেবতার আসন কি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?...সেখানে নেই কোনো প্রত্যাশা?

নাঃ কথাটা এখন উচ্চারণ করাও হাস্যকর।

শালা ভগ্নিপতির তুচ্ছ বচসাকে অবলম্বন করে বহুদিন থেকে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেছে ভাই বোনের মধ্যে।

কিন্তু সে ছিলো অন্য রকম দিন।

সরস্বতীর জীবনের সেই এক স্মরণীয় দিন। জীবনে কি সেই আনন্দ আর এসেছে?...জীবনে তেমন অনুভূতি কবার আসে?

হ্যাঁ, সেদিনে মাঝরাতে যখন খিদের জ্বালায় ঘুমটা ভেঙে গেছে, মনে হলো সারা শরীরটা যেন একটা অদ্ভুত রকমের হালকা হয়ে গেছে।...সন্ধ্যার ঘটনাটা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না, শুধু অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ছে কখন কি যেন একটা ঘটে ছিলো। হাত সরাতে হাতের কাছে কিসের যেন একটা স্পর্শ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলো সরস্বতী।

এ কি, দিদির পুতুলটা সরস্বতীর বিছানায়!

এ কি অবাক ব্যাপার! খানিকটা দূরে দিদি ঘুমোচ্ছে অকাতরে। কখন রাখলো এখানে?

—মা!

মা জেগেই ছিলেন, বললেন—কি রে, খাবি কিছু? মার কণ্ঠে একটু মমতার সুর, যেমন সুর দিনের বেলায় সচরাচর শোনা যায় না।

—জল খাবো।

মা শুধুই জল দিলেন না, তার সঙ্গে কি যেন খাবারও দিলেন। আর যেই খাওয়া হলো, মা একটা আলো উঁচু করে ধরে হেসে বললেন—দেখেছিস তোর ছোড়দার কাণ্ড! শাস্তি দিয়ে মন কেমন করেছে, তাই নিজের জমানো পয়সা

দিয়ে পুতুল কিনে এনে লুকিয়ে তোর বিছানায় রেখে গেছে।…বীণার প্রাইজের পুতুলের চেয়ে এটা আরো অনেক ভালো আর বড়ো দেখেছিস? ওমা…ওমা ওকি? কি হলো? কান্নার কি হলো?

আর কি হলো।

মানুষের হৃদয়হীনতার পরিচয়ে যতোটা যা না হয়েছিলো, হলো মানুষের হৃদয়মাহাত্ম্যের পরিচয় পেয়ে।…ছোড়দা! সেই ছোড়দা! যে ছোড়দাকে 'পিশাচ' নামে অভিহিত করতে করতে ঘুমিয়েছিলো সরস্বতী।

অনেক দিনের অনেক চেষ্টার ফসল, তিল তিল করে জমানো সঞ্চয়টুকু ক্ষয় করে সরস্বতীর জন্যে পুতুল কিনে এনেছে ছোড়দা! এতেও যদি ডুকরে কেঁদে না উঠবে, তবে আর কাঁদবে কিসে!

এই সেই পুতুল।

সকালে উঠেই পুতুলটাকে বুকে চেপে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত চিত্ত নিয়ে ছুটে গিয়েছিলো ছোড়দার কাছে।

—ছোড়দা, তুমি আমার জন্যে পুতুলটা এনে রেখেছিলে?

—আমি!

ছোড়দা হেসে হেসে বলেছিলো—আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই তোর জন্যে পুতুল এনে রাখবো!

যাক, সরস্বতী এতো বোকা নয় যে এই অস্বীকৃতিকে সত্যি বলে বিশ্বাস করবে! অতএব হৃদয় রাজ্যে পূজার বেদী পাকা হয়ে গেলো।

তার পর থেকে সরস্বতী যা হয়ে উঠলো তা'র জন্যে ওর নতুন নামকরণ হলো 'পৌত্তলিক'। সরস্বতী আছে পুতুল নেই এমন দেখা যায় না। পুতুলটাই যেন তার ধ্যান জ্ঞান পূজো জপ।…তাকে সাজাচ্ছে গোছাচ্ছে, শোয়াচ্ছে বসাচ্ছে, কিছু না হোক শুধু বিভোর হয়ে দেখছে সামনে বসে থেকে।

খেটে খুটে পাশ করে বীণা যা পেলো, সরস্বতী ফাঁকি দিয়ে তার চাইতে ভালো জিনিস লাভ করলো বলে বীণাপাণির আর গাত্রদাহের অবধি ছিলো না। সরস্বতীকে বহুবার বহু প্রলোভন দেখিয়ে 'বদলে নেবার' প্রস্তাব করতেও ছাড়েনি সে। কিন্তু পেরে ওঠেনি! কিছুতেই পারেনি তাকে নরম করতে।

পুতুলটা যে সরস্বতীর প্রাণ!

ছোটো সরস্বতী বড়ো হয়েছে, বিয়ে হয়ে অন্য পরিবারভুক্ত হয়ে গিয়েছে, দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে পেয়েছে এখানকার এই গৃহিণী মূর্তিতে প্রোমোশান। তবু তার সেই প্রাণের পুতুলটি ভেসে যায়নি কালের স্রোতে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি সময়ের ঝড়ে…শুধু আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছিলো বিস্মৃতির ধুলোর তলায়।

আজ আবার সে ধুলো ঝেড়ে, তাকে নতুন সাজে সাজালেন সরস্বতী।… তারপর নিতান্ত নিরুপায় চিত্তেই ফুলটুসির হাতে তুলে দিয়ে বললেন—দেখো, যেন ভেঙে ফেলো না। জানো তো আমার ছোট্টবেলার জিনিস!

সেটা বোধহয় ঘণ্টা দুই তিনের কথা।

আর এখন কি কাজে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দোতলায় এসে দেখলেন

পুতুলের পুতুল-জন্ম শেষ হয়ে গেছে !

স্তম্ভিত বিস্ময়ে মিনিট খানেক শুধু তাকিয়ে থাকলেন সরস্বতী। এতো শীগগির !—কিন্তু এ কী ! এ কী বিধ্বস্ত মূর্তি। এটা কি করে হলো ! পড়ে ভেঙে যাওয়া নয়, মনে হচ্ছে কে যেন ইচ্ছে করে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলেছে।

ছোড়দার দেওয়া পুতুল !

সকলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা সরস্বতীর একটুখানি শৈশব !

মেয়ে মাকে অমন বিদ্যুতাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘটনাস্থলে উঁকি মারলো, এবং বোধকরি নিতান্তই চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজের মেয়ের উদ্দেশে হাঁক পাড়লো—ফুলটুসি, এ কী হয়েছে ? একখানি ভাঙলি পুতুলটাকে ? বাবা বাবা, কী দস্যি মেয়ে, নেবার জন্যে এতো অস্থিরপনা, নিলি আর শেষ করলি !—এক দণ্ডে এমন গুঁড়ো করলি কি করে শুনি ?

ফুলটুসি তখন অন্য খেলায় ব্যাপৃত, সেখান থেকেই অগ্রাহ্যভরে উত্তর দিলো—বাঃ ওর ওপর দিয়ে যে মোটরগাড়ি চলে গেছে ! ওকে নিয়ে অ্যাক্সিডেণ্ট খেলা খেলছিলাম কিনা !

অ্যাক্সিডেণ্ট !

ওঃ তাই বটে !—একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে সরে যান সরস্বতী।—ঠিক খেলাই খেলেছে মেয়েটা। শিশু আর দেবতা একই পর্যায়ের কি না ! একই রকম নিষ্করুণ উদাসীন !

ভাগ্যদেবতাও মাঝে মাঝে এমনি নিরঙ্কুশ নির্মমতায় 'অ্যাকসিডেণ্ট অ্যাকসিডেণ্ট' খেলা খেলেন না কি ? যে খেলায় মনের মণিকোঠায় লুকিয়ে রাখা অনেকদিনের সঞ্চিত প্রাণের পুতুল এক মুহূর্তে বিধ্বস্ত হয়ে যায় ?

ভগবান আছেন

এই সকাল বেলাতেও মেয়েটা দিব্যি সহজ ভাবে খেলেছে, গান গেয়েছে, ঘুরে বেড়িয়েছে, পাঁচ ছ' বছরের হাসি খুসি চঞ্চল মেয়ে যেমন করে থাকে। তখন বোঝাই যায় নি শরীব খারাপ।

ভাত খাবার আগে হঠাৎ বুঝি গাটা একটু গরম ঠেকেছে, অমনি তার মা কি না তাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে রুগী বানিয়ে দিলো ?

অবাক হয়ে গেলেন নিভাননী।

কাঁচ ছেলের জ্বর, যতোক্ষণ ঘুরে বেড়ায় ততোক্ষণই ভালো, জ্বরাসুর জব্দ করতে পারে না। শুয়েছে দেখলেই চেপে ধরে। এই সামান্য জ্ঞানটুকু নেই অলকার ?

শুধু তাই ?

স্কুলের গাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে এসেই বামুন ঠাকুরকে অর্ডার হলো—ডাব আনতে আর ছানার জল করে রাখতে ! এমন অনাসৃষ্টি ব্যাপার নিভাননী

জীবনে দেখেন নি! ফ্যাসানের কি একটু মাত্রা থাকাও উচিত নয়? ছেলেপুলের সামনে নাম করতে নেই এমন সব শক্ত অসুখ বিসুখেই ছানার জল খাওয়াতে হয়, এই তো নিভাননীর জানা।

ডাক্তারে যেই রুগীকে দুধের বদলে ছানার জলের ব্যবস্থা দিয়ে যেতো, সেই বোঝা যেতো রোগ সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ নিয়েছে। 'ছানার জল' নামটাই যেন অলক্ষুণে অপয়া। নিভাননী হাড়ে হাড়ে জানেন সেকথা।

তা'ছাড়া—সর্দি জ্বরে ডাব ছানার জলই কি খুব সুপথ্য? গা গরম হয়েছে, ভাতের বদলে দুটো শুকনো মুড়ি খাক, না হয়তো দু'খানা গরম জিলিপি আর এক গেলাস গরম দুধ খাক, আহার ওষুধ দুইই হবে।

এমন ইচ্ছে মতন খাবার জোটেই বা কতো জনের? কতো ঘরে ছেলেপুলে এক ফোঁটা দুধ পায় না, এক টুকরো মিশ্রী পায় না।—

কী কষ্টেই নিভাননী ছেলেপুলে মানুষ করেছেন?

কমগুলি ছেলেমেয়ে নয়, নিজের চারটি, আর মৃতা ননদের তিনটি। কষ্টই করলেন, সার্থক হলো না। নেমকহারামী করে চলে গেলো প্রায় সকলেই। যাক সে আক্ষেপও এখন চাপা পড়ে গেছে। যা দুঃসহ ছিলো, তা' সহজে সয়ে গেলো, যা মুখে আনা অসম্ভব ছিলো, তা' অপরের গল্পের মতো অনায়াসে বলা সম্ভব হয়ে গেলো। এখন আর সে সব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন না নিভাননী। এখন সমস্ত প্রাণটা আবদ্ধ হয়ে আছে দেবু আর দেবুর দুটো মেয়ে ছেলের ওপর। কিন্তু তাই বলে তাঁদের নিয়ে অসঙ্গত বাড়াবাড়ি করতে হবে? নিভাননীর প্রকৃতিতেই নেই সে জিনিষ।

বামুনঠাকুরের মুখে বৌয়ের অর্ডার শুনে বিরক্ত হয়েই ওপরে উঠে এলেন নিভাননী।

বিনা ভূমিকাতেই বলে উঠলেন—বামুনঠাকুরকে ছানার জলের কথা কি বলেছো বৌমা?

বৌ অলকা পিছন ফিরে মেয়ের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছিলো, শাশুড়ীর কথায় মুখটা একটু ফিরিয়ে স্থির স্বরে প্রতিপ্রশ্ন করলো—হ্যাঁ ছানার জল করতে বলে এসেছি, বলা অন্যায় হয়েছে?

—'ন্যায়' অন্যায়ের কথাতো কিছু হচ্ছে না বাছা, অমন ভাবে কথা কও কেন?

—কি জানি, আপনার কাছে তো আমার সব কাজই অন্যায় হয়ে দাঁড়ায় দেখি, তাই জিগ্যেস করেছি।

—দেখো বৌমা, ভাবি তোমাদের কথায় থাকবো না, কিন্তু না থেকেও তো বাঁচি না। বাবলির অসুখে আমি কি করে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকি? বলছি—তোমাদের এ সব কি কায়দা? জ্বরে ছুঁয়েছে কি শক্ত অসুখের বায়নাক্কা নিতে হবে? ছানার জল খাবার কি দরকার?

অলকা শান্ত সুরে বলে—তা' হলে কি দেবো বলুন? চারটি পান্তা ভাত?

বৌয়ের বাক্যি যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

নিভাননী ছিট্‌কিটিয়ে উঠে বলেন—কথাগুলো একটু ভেবে চিন্তে বোলো বৌমা। পাগলও নই, ছন্নও নই যে, জ্বরো মেয়েকে পান্তা ভাতের ব্যবস্থা দেবো? কেন জগতে কি আর খেতে দেবার জিনিস নেই?

অলকা হাতের কাজ সারতে সারতেই বলে—থাকবে না কেন মা? জগৎ জুড়ে আছে। তবে কিনা জগৎ জোড়া খাবার জিনিসও যেমন আছে, জগৎ ভর্তি খাবার লোকও তেমনি আছে। আমার মেয়েটাকে না হয় আমার ইচ্ছের বশেই চালালাম। তাতে তো কারুর ক্ষতি নেই?

শুনে চমকে চুপ করে যান নিভাননী।

বাবলি অলকার মেয়ে! তাই বটে।

সত্যি, কেন বলতে যান তিনি। বলাটা যখন খাটে না, তখন না বলাই উচিত। দেবুর মেয়ে ভালো থাকুক, রোগে ভুগুক, তাতে নিভাননীর কি? নিভাননীর নিজের কোল থেকেই যে তিন তিনটে ছেলেমেয়ে চলে গেছে, কি করতে পেরেছেন? যদিও তখন বড়ো আপসোস হয়েছিলো! উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ভালোমত পথ্যির অভাবে প্রায় বেঘোরে গেলো ভেবে মাথা খুঁড়ে মরেছেন, কিন্তু এখন বুঝেছেন ও সবই নিয়তি।

নইলে পুরানো কথা মনে পড়লে কি ধৈয রাখা যায়? বুবুর অসুখে কবরেজ ছানার জলের ব্যবস্থা দেওয়ায় গোয়ালার কাছে দৈনিক আধপোয়া করে দুধের বরাদ্দ করেছিলেন নিভাননী। ··তা' সে বেশিদিন আর নিতে হয় নি।··· ···দুধের প্রয়োজন ফুরোলে গোয়ালাটা আর সে দুধের দাম নিতে চায় নি। গোয়ালার এই মহানুভবতার কাহিনী একদিন বৌয়ের কাছে গল্প করছিলেন নিভাননী, বৌ আর সমস্ত গল্প ফেলে আধ পোয়া দুধ বরাদ্দর গল্প শুনে হেসেই খুন!

এমন অপূর্ব কথা আর কখনো শোনে নি অলকা।

তবে? নিভাননীর ছেলেপুলে মানুষ করার সঙ্গে ওদের ছেলে মেয়ের যত্নর তুলনা?

তুলনা করে লাভ নেই, তুলনা করা শোভন নয়; তুলনা করা বোকামী। এতো বুঝে সুঝেও তুলনা করেন নিভাননী। করেন না, করে ফেলেন।

অবিরত মনের মধ্যে যে তর্কের ঝড় বইছে।

মুখে এক আধবার তার প্রকাশ হয়ে পড়বে বৈ কি?

বৌ খুব সভ্য ভদ্র মার্জিত। ঝগড়া করে না, কথা কাটাকাটি করে না, শাশুড়ীর ভুল ধারণা শুধরে দেবার চেষ্টা করে না, শুধু এই রকম এক আধটি কথা কয়।

যে কথার গুণ হচ্ছে কেটে কেটে নুন লাগানো! বৌ বরাবর তো ঘর করে নি নিভাননীর কাছে। এতোদিন পুণায় কাজ করেছে দেবু, বিয়ে করে পর্যন্ত বৌকে সেইখানেই নিয়ে গিয়েছিলো। কিছুদিন হলো কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছে।

আগে ছুটিছাটায় আসতো ঠিক বোঝা যেতো না, এখন প্রতি মুহূর্তেই

আঘাত প্রতিঘাত।

চলে যাচ্ছিলেন নিভাননী, আবার দাঁড়ালেন! নাঃ—তবু মেয়েটাকে একটু ভালো করে দেখে যাওয়া দরকার। তাঁর সাহায্য অলকা চায় না সত্যি, কিন্তু কর্তব্যের ত্রুটিটুকু ধরতে ছাড়বে না।

কাছে এসে বাবুলির কপালে হাত দিলেন। দিয়ে—বোধকরি রোগিণী এবং তার জননী দুজনকেই আশ্বাস দান হিসেবে বলেন—কই বৌমা, জ্বর তো বেশি নয়।

অলকা থার্মোমিটারটা ঝাড়তে ঝাড়তে ওঘর থেকে এঘরে আসছিলো, উত্তরে ঠাণ্ডাগলায় বললো—আমি তো বলিনি মা একশো ছয় জ্বর উঠেছে। কি হয়েছে না হয়েছে নিজেই দেখুন না হয়? থার্মোমিটার দিতে জানেন?

নিভাননী অবাক হয়ে গেলেন। অকারণে, আর এতো সহজে এতোখানি অপমান কি করে করে অলকা? আহতস্বরে বললেন—জ্বর দেখতেও জানি না? হঠাৎ জঙ্গল থেকে তোমাদের সহরে এসে পড়েছি—না কি ভাবো বলোতো?

—ভাবি না কিছুই। নিজে দেখলে হয়তো, বিশ্বাস হবে তাই বলছি।

অলকার কথা শুনে মনে হয় মেয়ের জ্বরটা খুব বেশি প্রমাণ হলেই যেন ও সুখী হয়। জ্বর দেখা তাপমান যন্ত্রটিকে আলোর দিকে ধরে চোখ কুঁচকে বলে—তিন পয়েণ্ট চার।

তিন! এতোটা উঠেছে! জলঘাঁটা ঠাণ্ডা হাতে ঠিক বুঝতে পারেননি নিভাননী। কিন্তু অলকার কি আক্কেল! মেয়ের সামনে ফট্ করে বলে বসলো?

নিভাননীরা কখনো রোগীর সামনে জ্বর বৃদ্ধির মাত্রাটা ঠিক মতো উচ্চারণ করতেন না। কিছুটা রেখে ঢেকে বলতেন।

নিভাননী চোখ টিপে ইসারা করে একটু চড়াগলায় প্রশ্ন করলেন—কতো বললে? একশো?

অলকা কিন্তু এ ইশারা গায়েও মাখলো না। স্বচ্ছন্দে উত্তর দিলো—তা'তো বলিনি। বললাম একশো তিন পয়েন্ট চার। ইচ্ছে করে ভুল শোনার কোনো মানে হয় না।

নিভাননীর মনে হলো কে যেন তাঁর গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিলো।

ধীরে ধীরে নেমে এলেন নীচে।

মনটা আহত অপমানে জ্বালা করছে। তবু—কর্তব্য চাড়া দিয়ে উঠলো মনে। নিজে খেতে বসার আগে একবার ওদের আমিষ রান্নাঘরে উঁকি মারতে গেলেন। নিজে খেতে বসবেন, কে জানে অলকা ভালো করে খাবে কিনা। মেয়েটা মুখের ভাত ফেলে শুতে গেলো। "বড়াভাজা খাবো" বলে একটু আগে ঠাকুরকে হুকুম করছিলো। সেই বড়াভাজা হলো, আর খেতে পেলো না বাছা। অলকা কি আর খেতে চাইবে? হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো!

নিভাননীরই যে একখানি ভাতের পাথর টেনে নিয়ে বসতে হবে মনে করে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যতোই অলকা অগ্রাহ্য করুক শাশুড়ীকে, তবু খাওয়া দাওয়ার সময়টা না দেখে কি নিভাননী থাকতে পারেন?

দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—অ ঠাকুর—তোমার মায়ের ভাত বেড়ে রাখো, মেয়ের অসুখ করেছে, নামতে দেরী হবে।

ঠাকুর কড়ায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলে—ঠিক আছে ঠাকুমা, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

হঠাৎ নিভাননী অকারণে রেগে ওঠেন। তিক্ত স্বরে বলেন—না তা ব্যস্ত হবো কেন? আমিও তোমাদের মতন মাইনে করা; কাজ-বোঝানো লোক কি না? তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবো।...তা'র মন প্রাণ ভালো নয়, দেখে শুনে খাওয়াতে হবে না?...কই দেখি কি মাছ রেখেছো বৌমার জন্যে?...ও কি, কুল্লে ওই একখানা?...কেন?

ঠাকুর কড়ায়ে জল ঢেলে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে—যেমন হুকুম হবে তাই করবো তো? এই তো—মা বলে গেলেন, ডিমের ঝাল করে রাখছি।

নিভাননী থতমত খেয়ে বলেন—বলে গেছে বৌমা? কখন আবার নীচে এলো সে?...জানি না বাবা।

নিজের ভাতের থালার সামনে বসে হঠাৎ দুই চোখ উপচে জল আসে নিভাননীর। আব অবাক লাগে বৌমার মনের ধরন দেখে। মুখের ভাত ফেলে জ্বর এলো মেয়েটার, আর মা এসে রুচিমাফিক খাওয়ার বায়না করে গেছে! কি জানি কি অদ্ভুত মন এদের।

কিন্তু নিভাননীব কি স্বস্তি আছে?

খানিক পরে আবার উঠে আসেন। নাতনীর কাছে একটু বসলে যদি বৌ খেতে যেতে সময় পায়।...ওমা উঠে গিয়ে অবাক। ঠাকুর দোতলায় টেবিলে ভাত ঢাকা দিয়ে গিয়েছিলো, বৌ খেতে বসেছে, আর কাছে দেবু বসে চা খাচ্ছে।

—দেবু কখন এলি?

অবাক হয়ে জিগ্যেস করেন নিভাননী।

দেবু তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলে—হ্যাঁ, একটু আগেই এলাম। বাব্‌লিটার জ্বর শুনলাম—

নিভাননী সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন—জ্বর তুই শুনলি কি করে?

—ওই যে ফোন করেছিলো—

—ফোন করেছিলো? বৌমা ফোন করেছিলো তোকে?

অলকা আপনমনে খেতেই থাকে।

দেবু বলে—হ্যাঁ একশো চারের ওপর জ্বরটা উঠেছিলো।...আমি একেবারে ডাক্তার সেনকে কল্ দিয়ে তবে এলাম।...এসে দেখছি জ্বরটা একটু নেমেছে।

নিভাননী ছেলের সামনে যেন একটু বুকের বল পান। অনুযোগের স্বরে বলেন—হ্যাগা বৌমা, এমন হয়েছে যে ওকে আপিস থেকে আনিয়েছো, আর আমি একটা মানুষ বাড়িতে রয়েছি, এতোটুকু জানাওনি?

এবার অলকা কথা বলে—আপনাকে জানালে লাভটা কি হতো? উপায় কিছু বার করতে পারতেন?

—তোমাদের ধরনে পারি না—নিভাননী রেগে ওঠেন—আমাদের ধরনে পারি

…কুঁজোর ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে দেবো, হুস্ হুস্ করে মাথায় বাতাস দেবো, হু হু করে জ্বর নেমে যাবে।

—তা'হলে তো ডাক্তার সেনকে কল্ দেওয়া ভারী ভুল হয়ে গেছে!

বলে মৃদু হেসে উঠে যায় অলকা।

মেয়ের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে দেবনাথ বলে—মার সঙ্গে ওভাবে কথা বলে লাভ কি? ওঁরা সেকেলে মানুষ, বোঝেন টোঝেন কম, চুপচাপ শুনে গেলেই তো হয়?

অলকা গম্ভীরভাবে বলে—বিরক্তিকর কথা শুনে বিরক্ত হবো না—এতো মহাপুরুষ যদি না হ'তে পারি করা যাবে কি বল?…ওপরে এতো মায়া দেখান, অথচ নাতি নাতনীর খাওয়া পরা, যা কিছু দেখেন, তাতেই তো বাড়াবাড়ি দেখে চমকে ওঠেন। রোগে একটু উচিত মতো পথ্যি দেবার হুকুম নেই।… "জ্বর এসেছে, ডাব ছানার জল কেন? মুড়ি দিতে পারো না?"—শুনলে যদি ভালো না লাগে আমার, কি কববে?

গুম্ হয়ে যায় দেবনাথ।

মায়ের ওপর রাগ করে, কি বৌয়ের ওপর বিরক্ত হয়ে, কে জানে।—

সন্ধ্যার পর ডাক্তার সেন এলেন।

সর্দিজ্বর, তা' হোক গোটাকতক পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়াই ভালো। অধিকন্তু ন দোষায়।

নিভাননী তখন সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ঠাকুরের চরণ তুলসী নিয়ে বাবলির মাথায় বুলিয়ে দিতে এসেছিলেন, দেবনাথ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিলো—"মা, ডাক্তার আসছেন!"

এ একটা ইসারা।

অর্থাৎ মা তুমি এখন প্রস্থান করো।

নিভাননীও ব্যস্তহাতে কটাচুলওয়ালা মাথার ওপর খানিকটা ঘোমটা টেনে সরে যান। দালানের জানলার ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখেন—আলোকোজ্জ্বল ঘরের মধ্যে অলকা বিছানায় বসে।

মাথায় কাপড় সে না থাকাই, ডাক্তারের সঙ্গে আর স্বামীর সঙ্গে কথা কইছে স্বচ্ছন্দ ভাবে, কৌতুকের কথায় হেসে উঠছে!

বড়ো ডাক্তার চলে গেলো!

পিছন পিছন দেবু নামলো।

একজোড়া ভারী জুতোর মস্ মস্ শব্দের পিছনে একজোড়া হালকা চটির শব্দ। যেন…বরদা তার বরাভয়কর বাণীর কাছে অসহায় জীবের সকাতর প্রার্থনার মৃদু বাণী।

এ রকম শব্দ শুনলেই বুকটা কেমন ছাঁৎ ছাঁৎ করে ওঠে। নিভাননী হরিনামের মালাগাছটা হাতে নিয়ে মনঃসংযোগের চেষ্টা করেন।

কিন্তু করতে পারেন না, কিছুক্ষণ পরেই আবার আর একজন ডাক্তার। এর মানে কি?

তবে তো ব্যাপার সোজা নয়। মালা কপালে ছুঁইয়ে উঠে পড়েন।

আবার দালানে দাঁড়িয়ে দেখেন।

এ ডাক্তার ইনজেক্‌সান দিলো বাব্‌লিকে। নাঃ নিশ্চয়ই। নিভাননীর ভাঙা কপাল আবার ভাঙবার জোগাড় হচ্ছে।

ডাক্তার চলে যেতেই নিভাননী ছেলের হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলে বল্লেন—তোরা কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছিস দেবু? আমার বাব্‌লির অসুখ কি বেশি?

—অসুখ বেশি হতে যাবে কেন? হাত ছাড়িয়ে নিল দেবু।

—তবে যে ফুঁড়ে ওষুধ দিলো? উপরি উপরি ডাক্তার এলো? তোরা আমায় চাপ্‌ছিস—নিশ্চয় অসুখ বেশি!

—যাতে বেশি হয়ে না ওঠে তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ব্যস্ত হচ্ছো কেন মিছিমিছি?…বলে পিছন ফেরে দেবু।

নিভাননী আশা করেছিলেন মেয়ের অসুখে বিমর্ষ দেবু মায়ের কাছে সহানুভূতির আশায় হয় তো একটু কাছাকাছি অন্তরঙ্গতায় এসে পড়বে। হয় তো কাতর হয়ে প্রশ্ন কববে—'মা কি হবে?'

"ভয় কি বাবা ভগবান আছেন" বলে ছেলেকে সস্নেহ সান্ত্বনা দেবেন নিভাননী।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন খটকা লেগে যায়। ভগবান কি সত্যিই আছেন?

তা' যদি থাকেন, তাহ'লে নিভাননীর তিন তিনটি মেয়েছেলে থাকলো না কেন?

কিন্তু আশ্চর্য! মনের মধ্যে এতো সংশয়, এতো অভিযোগ, তবু দুঃখের সময় বিপদের সময় বুকের মধ্যে কোথা থেকে যেন ভরসা জোগায়—'ভগবান আছেন'।

দেবনাথ নিজের কাজে চলে যাচ্ছিলো, নিভাননী আবার পিছু ডাকেন—অসুখটা কি বললো ডাক্তার?

—বলবার কি আছে? সাধারণ সর্দি জ্বর! কালই ছেড়ে যেতে পারে।

এর চাইতে আশ্বাসের বা আনন্দের কথা আর কি আছে? "সাধারণ জ্বর, কালই ছেড়ে যেতে পারে—" শুনে হরিলুঠ মানত করার মতো কথা। একথায় হঠাৎ এতো রাগ হয়ে যায় কেন নিভাননীর?

শুধু একটু সর্দি জ্বর? ছোট ছেলেপুলের যা সর্বদাই হয়ে থাকে! তার জন্যে এতো সমারোহ, এতো আড়ম্বর?

থাকতে পারলেন না নিভাননী, বলে ফেললেন। বলা সঙ্গত হচ্ছে না বুঝেও "আপনি মোড়লের" মতো বলে ফেললেন—তবে? তোদের কি সব তাতেই বাড়াবাড়ি দেবু? বৌয়ের পরামর্শ শুনে শুনে তুইও উচ্ছন্ন গেলি একেবারে। "শুনলো সাড়া কি নিলো পাড়া।"…মেয়েকে একবেলা একটু জ্বরে ছুঁয়েছে কি সাত রাজ্যের ডাক্তার এনে জড়ো করছিস? টাকা চারটি না হয় হয়েইছে, তাই বলে যেখেনে সেখেনে ছড়িয়ে ফেলে দিবি? উচিত অনুচিত দেখতে হবে না?

ঠিক এরকম না হলেও, এ ধরনের কথা তো বলেই থাকেন নিভাননী। কই দেবনাথ তো কখনো প্রতিবাদ করে না।

আজই হঠাৎ এতোবড় কথাটা বলে বসলো কেন?

আজকের সারাদিনের উদ্বেগ অশান্তি ইত্যাদির ফল, না অলকার দীর্ঘদিনের সাধনার ফল?

রূক্ষস্বরে বলে উঠে দেবনাথ—তা'হলে তোমার মতে উচিতটা কি মা? তোমাদের মতন, পয়সা খরচের ভয়ে ছেলে মেয়েকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে মরতে দেওয়াই উচিত কর্তব্য?

চমকে ওঠেন নিভাননী। বিস্ময়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—কী? কী বললি তুই? পয়সা খরচের ভয়ে বিনা চিকিচ্ছেয় ছেলে মেরে ফেলেছি! আমি? পয়সা খরচের ভয়ে? এই কথা তুই বললি আজ?

দেবু বেজার মুখে বলে—তুমি বলতে বাধ্য করলে মা।...তোমার কাছেই শোনা, নিজে মুখেই তুমি বলেছো—বুবুর অসুখে অঘোর কবরেজের দুটো হজমি বড়ি, তা'ও জোটেনি নিয়ম করে।...আমি না হয় ছিলাম না, চোখের আড়ালে গিয়ে বসেছিলাম। বাবা তো তখন ছিলেন?...অমলি জন্মের শোধ একটা ডালিম খেতে চেয়ে খেতে পায়নি, একথা সত্যি নয়?

দেবুই কি নিষ্ঠুর? অনেক দিন আগে মরে যাওয়া, ছোট্ট বোনটির কথা এভাবে তুলতে গিয়ে দুইচোখ তার অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে কেন তবে?...মমতা আছে। কিন্তু অবুঝকে মমতা করা কি নেহাৎ সহজ?

বিলেত যাবার আগে ছোট্ট বোনটিকে অনেক পুতুল খেলনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলো বেচারা, এসে আর দেখতে পায়নি অমলিকে। সেই দাগা সে ভুলতে চায়, মেয়ে যা চায় তাই দিয়ে।

সত্যিই প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে অমলা। নিভাননীই বলেছিলেন। বড়ো মর্মজ্বালায়...কৃতী পুত্রের কাছে বর্ণনা করেছিলেন এই করুণ কাহিনী। সে বর্ণনার মধ্যে দুঃখের চাইতে বেশি ছিলো জ্বালা, আক্ষেপের চাইতে বেশি ছিলো স্বামীর ওপর অভিযোগ। কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—দেবু যদি দেশের বাইরে গিয়ে না থাকতো, তা'হলে হয়তো অমলি বুবু পালাতে পারতো না।

হায়! নিজের নিক্ষিপ্ত শর যে এমন করে নিজের গায়ে এসে লাগবে সেকথা কি ভেবেছিলেন নিভাননী?

রাগে দুঃখে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে তাঁর।

অকথ্য বিস্ময়ে আবার বলে ওঠেন—তুই একথা বলছিস দেবু? বলতে তোর মুখে আটকালো না? সংসারের অমন হাড়ির হাল হয়েছিল কার জন্যে? তিনি তো রাজা উজির ছিলেন না যে, সহজে স্বচ্ছন্দে—ছেলেকে বিলেতে পাঠাবেন? সংসারকে নিংড়ে ছিবড়ে করে সব সারটুকু পাঠাতে হয়নি তোকে?

দেবনাথ উদ্ধত নয়, নিষ্ঠুরও নয়, তবু এতোখানি অপমান সেও গায়ে মেখে থাকে না, বলে—কাঙালের ঘোড়ারোগ হলে ওই রকমই হয় মা। এমন যাদের অবস্থা, ছেলেকে বিলেত পাঠাবার সাধই বা তাদের হয় কেন? আশ্চর্য, সে ঋণ

আ। আমার শোধও হচ্ছে না আজ পর্যন্ত!

নিভাননী মিনিট দুই অসাড়ের মতো তাকিয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে জপের মালাটা পেড়ে নেন।

চুপ করে বসে থাকাটা অস্বস্তিকর। লোকের চোখে পড়ে যেতে হয়, তার চাইতে এ একরকম সুবিধে। বসে থাকার একটা মানে দেখানো যায়।

দ্রুততালে ঘুরতে থাকে মালাটা। সংখ্যার ঠিকঠাক থাকে না।

"কাঙালের ঘোড়ারোগ"—তাই বটে। আর সে রোগ হয়েছিলো শুধু একা নিভাননীরই। বিলেত যাওয়ার কথায় দেবু 'অসম্ভব' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো, স্বামী শুধু লাঠালাঠি করতে বাকী রেখেছিলেন, তবু নিভাননী সংকল্পচ্যুত হননি। ছেলে কৃতী হয়ে ফিরুক আবার সব হবে।...স্বামীকে চুপ করিয়ে দেবার অস্ত্র ছিলো। তিনি যে তাঁর তিন তিনটে ভাগ্নে-ভাগ্নীকে খাওয়াচ্ছেন পরাচ্ছেন, ইস্কুলের মাইনে দিচ্ছেন, তা'তে খরচ হচ্ছে না? নিভাননীর ছেলে-মেয়ের ভাগ থেকে কাটাইতো যাচ্ছে সে খরচাটা? তবে নিভাননী কেন শোধ নেবেন না?

শোধ নেওয়া নিয়েই তো জগত। মায়ে একটা অবুঝ কথা বলে ফেললে ছেলে তার শোধ না নিয়ে ছাড়ে?

চোখ বুজে মালা ঘুরিয়ে যান নিভাননী।

তিনি স্বামীর ওপর শোধ নিয়েছিলেন, আজ ছেলে তাঁর ওপর শোধ নিলো।

কিন্তু—কিন্তু—এতো বড়ো অপমানের শেলটা যে মার বুকের ওপর বসিয়ে দিলি তুই, একবার ভাবলি না "ভগবান আছেন!...ভাবলি না তাঁর আসল নাম "দর্পহারী"।

ভালো চিকিৎসা করালেই যদি নিয়তির হাত এড়ানো যেতো, তা'হলে আর রাজারাজড়ার ঘরে যম মাথা গলাতে পারতো না।

পাঁচটা ডাক্তার এনে ফেললেই কি 'সাধারণ জ্বর' 'অসাধারণ' হয়ে উঠতে আটকার? তখন? কা'কে দোষ দিবি তখন? সন্তান-শোক যে কি জিনিস, তা যদি—

সহসা শিউরে উঠে 'ষাট ষাট' উচ্চারণ করে হাতের মালাটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরেন নিভাননী।...যেন পাহাড়ে রাস্তায় অন্যমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ গভীর খাদের দিকে নজর পড়ে গেছে। ভাগ্যিস পড়ে যাননি!—উঃ! ভগবান আছেন।

শোলার ফুল

মালাটায় হাত দিয়ে শিউরে হাত সরিয়ে নিলাম। শুকনো খড়খড়ে অদ্ভুত একটা রসশূন্যতা। মালাটা যেন প্রাণহীনতার আর রসহীনতার একটা কায়াময় রূপ। অথচ দূর থেকে ওর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়েই এতখানিটা এগিয়ে

এসেছিলাম।

এসেছি একটা মহিলা সমিতির শিল্প-প্রদর্শনীতে। করবী বলেছিল, "নিশ্চয় এসো, ওখানে আমার দেখা পাবে। আমি একটা মাটির পুতুলের স্টল খুলব।"

এসে দেখলাম করবী তখনো এসে উঠতে পারেনি, পরে আসবে। ততক্ষণে স্টল আগলাচ্ছে ওর ছোটবোন সুরভি। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "আপনি এসেছেন শক্তিদা, ভাল হয়েছে। সমিতির মেয়েদের কাজ দেখুন।"

পুতুলগুলোর থেকে দু' একটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, কালীঘাটের বেনে পুতুলের মতো ঢিবি ঢিবি পুতুল, তেমনি ঢিবি ঢিবি ঘোড়া, গরু, বেরাল ইত্যাদি। এসব নাকি আমাদের প্রাচীন শিল্পের অনুকৃতি। ভাল পরিকল্পনা, পুরনো ঐতিহ্যকে উদ্ধার করার চেষ্টা। একটা ঘোড়া তুলে নিয়ে বললাম, "কত দাম এর?"

শুনতে আশা করেছিলাম 'চার পয়সা', সুরভি অবজ্ঞার সুরে বলল, "ঘোড়া? ওগুলো আড়াই টাকা করে, এই 'শিম্পাঞ্জী পেপার-ওয়েট'গুলো হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। দশ টাকা জোড়া, শুধু একটা বিক্রি হবে না।"

মনে মনে বললাম, একটাও বিক্রি হবে না। মুখে বলতে হল, "তাই কখনো হয়? জোড়া ভাঙতে আছে? অমন কাজটি করো না। শিম্পাঞ্জীর অভিশাপ লাগবে।"

সুরভি তো হেসেই কুটি কুটি।

মনে মনে বলি—হে ঐতিহ্য, হে মৃত্তিকা, তুমি কল্পনার স্বর্গেই বিরাজ করো, আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ের খেলার রাজ্যে অক্ষয় হোক প্লাস্টিক।

সুরভি বলল, "শক্তিদা, দিদি না আসা পর্যন্ত তো স্টল ছেড়ে যেতে পারব না, তা নইলে আপনাকে সব দেখিয়ে দিতাম। ততক্ষণ আপনি দেখুন না ঘুরে ফিরে।"

বেচারী অবোধ কিশোরী, ভেবেছে পথপ্রদর্শকের সেই গুরুদায়িত্বভার ওর দিদি ওকে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারবে। ভাবি, স্টল ছেড়ে ওঠার আশা তুমি ছাড় সুরভি, তোমার দিদি অনেক বলে কয়ে নিমন্ত্রণ করে এনেছে আমাকে।

বলি, "আচ্ছা। তুমি নিজে কী কী করেছ পরে ভাল করে দেখতে হবে।"

ভাবী শালী, একটু পিঠ চাপড়ে রাখা ভাল।

প্রদর্শনীর মাঠের জমিটা কম নয়, খানিকটা তফাতে-তফাতে এক-একটি স্টল। কোনো বদান্য ব্যক্তির বদান্যতা আছে বোধ হয় এর মধ্যে। খরচ তো কম হয় না এসব ব্যাপারে।

ঘুরতে ঘুরতে শুধুই যে পা দুখানা ক্লান্ত হয়ে উঠল তা নয়, শিল্প-নিদর্শনের একঘেয়েমি দেখতে দেখতে চোখ দুটোও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হাতের কাজের মধ্যে না আছে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য, না আছে নতুন কোনো উদ্ভাবন। সেই এমব্রয়ডারি আর পশমের প্যাটার্ন, সেই ন্যাকড়ার পুতুল আর কাগজ-মণ্ডের খেলনা, সেই—কোথাও চামড়ার গায়ে কারুকার্যের নমুনা, কোথাও বা চারটি বাটিকের কাজের নমুনা। খেলনা-পুতুল, ভ্যানিটি-ব্যাগ, কুশন,

ওয়াড়. পর্দা, টেবলক্লথ—এই পর্যন্ত। সেলাইয়ের রাজ্যে শুধু ফ্রক আর সেমিজ-ব্লাউজ। কোট প্যাণ্ট শার্ট পাঞ্জাবির চিহ্নমাত্র নেই, যদিও স্টলটা কাটিংএর। সমিতিটা যে নির্ভেজাল নারীসমিতি, তাতে আর সন্দেহ রইল না। না কি পাঞ্জাবির বুক-পকেট সেলাই করতে করতে পাছে দৈবাৎ কোনো নারী-হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে তাই এই সতর্কতা ?

প্রায় সব কিছুই শিশু আর নারীর চিত্তহরণকারী বাহুল্য প্রয়োজনের শৌখিন মাল। কাঁচ পুঁতি রঙচঙের উজ্জ্বল সমারোহ। দেখতে দেখতে ভাবছি, নারী কেন এখনো নিজেকে শিশুর সমগোত্র করে রাখতে দ্বিধা করে না ? কেন কিছুতেই আপন গণ্ডি অতিক্রম করবার রুচি খুঁজে পায না ? কেন ত্যাগ করতে পারে না রঙের মোহ, বাইরের মোহ ?

আর শিল্পচর্চা মানেই কি শৌখিন শিল্পের চর্চা ? জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবার মতো প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ শিক্ষার চর্চা কই ? কই, কোথাও তো দেখছিনা একটু কার্পেণ্টারির নমুনা, কোনো বিভাগে দেখলাম না ছবি বাঁধানো হচ্ছে, কি ছাতা সারানো হচ্ছে, অথবা জুতো সেলাই হচ্ছে। মেয়েরা পাইলট হবে, ইঞ্জিনীয়ার হবে, কেন হবে না দপ্তরি, ছুতোর, মুচি ? কেন নেমে আসবে না কঠোর কর্মের ক্ষেত্রে ?

জীবনেব সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে না পারলে বিস্তৃতি কোথায় ? ব্যাপ্তি কোথায় ? ফুলদানীতে সাজানো তোড়ার মতো গুটি কয়েক ব্যতিক্রম দিয়ে সমাজ-জীবনের একটু শোভা বৃদ্ধি, অগ্রসর রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ দৃষ্টির নমুনাস্বরূপ কয়েকটা চোখ ধাঁধানো দৃশ্য, এইতেই সব হবে ? নীচের শিকড় যদি মাটির গভীরতায় না পৌঁছতে পারে, উপরের শাখায় ফুলের ঔজ্জ্বল্য কদিন স্থায়ী হবে ?

এই সব উচ্চাঙ্গের কথা ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল, দূরে একটা ছোট ছেলের হাতে একগোছা রজনীগন্ধার মালা। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল, হাতের ইশারায় ডাকলাম ছেলেটাকে। চাকর বা দারোয়ান কারো ছেলে বোধহয়। একজিবিশনের এলাকায় ঢুকে কিছু রোজগার করে নিতে চায় আর কি।

ছেলেটা কাছে আসতেই প্রশ্ন করলাম, "মালা কত করে রে ?"

ছেলেটা গোছার মধ্যে থেকে একগাছা আলাদা করতে করতে বলল, "দু আনা।"

বাতাসের চেয়ে দ্রুতগতি চিন্তা। ভাবলাম ভালই হল, সস্তায় কিস্তিমাত করা যাবে। করবীর কবরীতে জড়িয়ে দিয়ে বলব, 'এই আমার আজকের উপহার।' ফুল জিনিসটার মূল্যের দিক থেকে যতই কমতি থাক, উপহারের রাজ্যে তো অমূল্য। অন্তত ফুলের মালা উপহার পেয়ে কেউ তার আর্থিক মূল্যের হিসেব করে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসতে সাহস করবে না।

"ক'টা দেব বাবু ?" বলে ছেলেটা একগাছা মালা এগিয়ে ধরল। আর আমি হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে গিয়েই শিউরে হাত সরিয়ে নিলাম। শুকনো খড়খড়ে

যেন একটা মৃত্যুস্পর্শ, আর ওজন বলে কিছু নেই।

বললাম, "কিসের মালা রে?"

"আজ্ঞে বাবু শোলার।"

"শোলার!"

ওঃ তাই বটে! তাই এত হালকা। বস্তু যে কত অসার হতে পারে শোলা বোধ করি তার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু শোলার ফুলকে সত্যি ফুল ভেবে ভুল করার লজ্জা ঢাকতে ছেলেটাকে অকারণ ধমক দিয়ে বলি. "দু আনায় একটা না কি? দু' আনা জোড়া তাই বল।"

ভেবেছিলাম বুঝি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। তা' গেল না। করুণ বচনে বলল, "আজ্ঞে বাবু, কাজটা দেখুন। কী ফাইন কাজ!"

কথাটা মিথ্যে বলেনি। আশ্চর্য রকমের নিখুঁত হাত না পড়লে ধরবার উপায় নেই, সত্যি ফুল নয়। অথচ সে পক্ষে কী মারাত্মক রকমেয় সস্তা। কতটা পরিশ্রমের কতটুকু মূল্য।

বললাম, "আচ্ছা তা যেন হল, কিন্তু সুগন্ধ বার হচ্ছে কিসের রে।" ছেলেটা আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে উত্তর দিল, "সেণ্ট লাগিয়েছি বাবু!"

"তৈরি করেছে কে?"

"আমার ঠাকুর্দা। বুড়ো হয়েছে, নড়ে চড়ে কাজ করতে তো পারে না, নাকে চশমা লাগিয়ে ঘরে বসে ফুল তৈরি করে,—। প্রিতিমের কাজ, চাঁদমালা বিয়ের টোপর।...মালা নেবেন না বাবু?"

ক্ষণপূর্বের বিরূপতা স্মরণ করে বলি, "নাঃ, ও কি হবে? দূর থেকে ভাবলাম সত্যি মালা বেচছিস, তাই ডাকলাম। শোলার মালা—দূর।"

"তা' হোকনা বাবু, নিন না? ঘর সাজাবেন।"

ছেলেটার কণ্ঠে কাতর মিনতির সুর।

কি মনে হল, পকেট থেকে একটা সিকি বার করে বললাম, "মালা থাক, তুই এটা নে।"

ভেবেছিলাম আর একবার সেই আকর্ণবিশ্রান্ত হাসির আমদানি হবে, কিন্তু ধারণা বদলাল। ছেলেটা কেমন যেন রুষ্টভাবে বলল, "কেন?"

"নে না?"

"শুধু শুধু নেব কেন?"

"আহা মনে কর না এক জোড়া মালা আমি নিয়েছি।"

"আপনি নিলেন না, তবু মনে করব?"

"আরে বুঝতে পারছিস না—"

হঠাৎ পিছন থেকে করবীর উচ্ছল কণ্ঠ বেজে ওঠে, "বুঝতে পারবে কি করে? তোমার কথা বোঝা কি ওর কর্ম?...বাঃ কী চমৎকার মালাগুলো? কত করে রে?"

"দু আনা।"

"দু আনা? আচ্ছা দুটো দে।"

চট করে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলতে উদ্যত হয় করবী। আমি তাড়াতাড়ি হাতের সিকিটা ছেলেটার হাতে দিয়ে করবীকে উদ্দেশ করে বলি, "অধমের সিকিটা ধন্য হোক না?"

করবী কৌতুকের হাসি হেসে রহস্যময় ব্যঞ্জনায় বলে ওঠে, "শুধু সিকিটা? আমি তো ভাবছিলাম পুরোপুরি ষোলো আনাই ধন্য হয়ে যাবে।"

"তা ঠিক।"

"কি করছিলে? মালা কিনছিলে?"

ছেলেটা কেমন যেন অভিযোগের ভঙ্গীতে বলে, "কিনছিল না বাবু, শুধু শুধু দাম দিতে চাইছিল।"

শুনে করবী হেসে গড়িয়ে পড়ল।

"কিনছিল না, দাম দিতে চাইছিল? বলিস কি? জ্ঞান হয়ে অবধি অনেক রকম কথা শুনে আসছি, এমন অদ্ভুত কথা তো কখনো শুনিনি।"

বললাম, "অদ্ভুত আর কি? কেউবা না কিনেই মূল্য দেয়, কেউ বা বিনা মূল্যে কেনে, এই তো জগতের রীতি।"

ততক্ষণে করবী একগাছা মালা খোঁপায় আর একগাছা মালা হাতে জড়িয়ে নিয়েছে। দু'জনে পায়ে পায়ে এগোতে থাকি।

বললাম, "তুমি তো কই মালাটায় হাত দিয়ে চমকে উঠলে না?"

"চমকে উঠব? কেন?"

"আমি কিন্তু হাত দিয়েই শিউরে উঠেছিলাম।"

"সে আবার কি? হেতু?"

"হেতু হচ্ছে—সুকুমার স্নিগ্ধ সরস ভেবে হাত দিতে গিয়ে দেখলাম শুকনো খসখসে নিষ্প্রাণ।"

"ও মা কী কাণ্ড! সত্যি সত্যি ফুল ভেবেছিলে নাকি তুমি?"

"ভেবেছিলাম তো।"

করবী বাঁধনছাড়া হাসি হেসে ওঠে, "সাধে কি আর বলি, পুরুষ জাতটা একেবারে নীরেট।"

"কি করে বুঝব বল? হঠাৎ দেখলে ধরবার জো নেই যে? হুবহু রজনীগন্ধা! আশ্চর্য শিল্প বটে।"

"তুমি একটি আশ্চর্য বোকা! দেখনি নাকি কখনো?"

"হয়তো দেখেছি, আসল নকল ধরতে পারিনি, ভুলই করে এসেছি। কিন্তু দোহাই তোমার করবী, তোমার কবরীতে ওই নিষ্প্রাণ জিনিসটা লাগিও না।"

"তার মানে?"

"তোমার চুলে নকল ফুল আমার কেমন সহ্য হচ্ছে না।"

করবী হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে দাঁড়াল, একটু যেন অবাক হল, ভুরু বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল, "হঠাৎ আজ একথা বলছ যে? কত দিনই তো লাগাই।"

"শোলার ফুল লাগাও?"

"আহা শোলার না হোক প্লাস্টিকের। কোণের ওই ফটো-স্টুডিওর পাশের

দোকানটায় ঝুলিয়ে রাখে দেখনি কোনোদিন ? অবিকল বেল ফুলের মালার মত দেখতে সাদা প্লাস্টিকের মালা। খোঁপায় দেবার জন্যেই তৈরি ওগুলো। একটা কিনে রাখলে রোজরোজ খরচা করতে হয় না, ফুলের মালার কাজ করে।”

চুপ করে গেলাম।

কোন লজ্জায় আর বলি, করবী, আমি এমনই নীরেট যে তোমার খোঁপায় জড়ানো সেই মালার কৃত্রিমতা আমি কোনোদিনই ধরতে পারিনি। মাঝে মাঝে যখনই তোমাকে এই বিশেষ প্রসাধনটি করতে দেখেছি, এই ভেবে পুলকিত হয়েছি যে, আমার রুচির সঙ্গে তোমার রুচির মিল আছে। মেয়েদের রূপসজ্জার প্রসাধনে ফুল জিনিসটা যেন অপরিহার্য মনে হয় আমার।

হাতের মালাটা নাড়াচাড়া করতে করতে করবী বলে, “এটা সুরভির জন্যে কিনলাম।”

তবুও চুপ করেই হাঁটতে থাকি।

একটু চলেই ও বলল, “এমন ঠাণ্ডা মেরে গেলে যে ? কথা বলছ না কেন ?”

সামলে নিলাম নিজেকে। হেসে বললাম, “কী হবে শুনিয়া সখি বাহিরের কথা—”

“ওঃ কবিত্ব ! এই ভিড়ের মধ্যে কি আর অন্তরের কথার অবকাশ আছে ?”

“ভিড়ের মধ্যেই তো সব থেকে নির্জনতা। কারো সন্দেহ-দৃষ্টি পড়ে না।”

“তা বটে। নেহাত মন্দ ভিড় হয়নি, কি বলো ? উঃ, এই এককুড়িবিশনের জন্যে কম খাটতে হয়েছে ! চল না—সব দেখাই তোমাকে।”

“সব দেখা হয়ে গেছে।”

“হয়ে গেছে ? কতক্ষণ এসেছ ?”

“অনেকক্ষণ। ছটায় আসতে বলেছিলে তুমি।”

করবী আপসোসের সুরে বলে, “তা ঠিক—আমারই যে ভীষণ দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা এসো একটু চা খাওয়াই।”

বললাম, “সুরভি কিন্তু তোমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে।”

“ও—তাই তো। বেশ, ওকে একবার বলে আসি। পুতুলগুলো দেখেছ ?”

“হুঁ ! পুতুল-গিন্নী, শিম্পাঞ্জী-দম্পতি, ষষ্ঠীর বেরাল, সত্যপীরের ঘোড়া—সব দেখেছি।”

করবী হেসে ওঠে, “এত কথাও জোগায় তোমার। কী ফাইন হয়েছে বল দেখি ? ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে, বুঝলে মশাই ? ঠিক সেকেলে পুতুলের মত হয়নি ? কিছু কিছু ডাইস আমি করে দিয়েছি।”

কথা কইতে কইতে এসে পড়লাম এদিকে, কিন্তু ভারী কুণ্ঠিত লাগছে। এখানে এসে মনে হচ্ছে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি, রাজ্যটা একেবারে প্রমীলার। পুরুষের সংখ্যা বিরল বললেই হয়। একটি পুরুষ তো দশটি নারী ও শিশু।

বললাম, “পালাই করবী, বড় অস্বস্তি লাগছে।”

“অস্বস্তি ?” করবী যেন শক্ খেল, “এত কৌশল করে তোমাকে আনলাম

—গাজে'নদের তীক্ষ্ম দৃষ্টির বাইরে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করবার সুযোগ পাব বলে, আর অস্বস্তি হচ্ছে তোমার ?"

"মানে কি জানো, বড্ড মহিলা-সমাগম হচ্ছে—"

"হচ্ছে তার কি ? পুরুষের প্রবেশ নিষেধ নেই যখন, তখন ভয়টা কি ?"

"ভয় কে বলল ? অস্বস্তি—"

"তা অস্বস্তি মানেই ভয়। আমার সমস্ত বান্ধবীরা উৎসুক হয়ে রয়েছে তোমাকে দেখবে বলে, আর তুমি পালাবে ?"

"আমাকে দেখবে ? কী সর্বনাশ ! বল কি ? সব্বাইকে বলে রেখেছ নাকি ?"

করবী পরম আত্মস্থ ভাবে বলে, "নিশ্চয় ! বলব না ? কি নিধিটি আবিষ্কার করেছি, দেখাব না ওদের ?"

গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলি, "দেখতে টিকিট ধার্য করেছ বোধ হয় ?"

"অতটা নয়—" হাসতে থাকে করবী. "শুধু কৌতুহল মিটিয়ে দেওয়া, আর ওদের একটু ঈর্ষা বৃদ্ধি করানো।"

কথায় কথায় এসে পড়লাম সুরভির সামনে, আর দিদিকে দেখেই সুরভি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে, "দিদি ভীষণ একটা দাঁও মারা গেছে।"

"কি ব্যাপার ?"

সহাস্য প্রশ্ন করে দিদি।

"একজন মেম ঘোরাঘুরি করছিল, দেখেছ ?"

"দেখিনি। কেন, তাকে কিছু গছাতে পেরেছিস বুঝি ?"

সুরভি মাথা দুলিয়ে বলে, "হুঁ উ—উ ! শুধু গছানো ? হি হি হি !"

"হেসেই মরছিস যে ? হল কি ?"

"সে এসে তো পুতুল দেখে একেবারে মোহিত। বলে—এই হচ্ছে আসল ইণ্ডিয়ান আর্ট। আমিও লম্বা এক জোরালো লেক্‌চার ঝাড়লাম ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করে। শুনে তো বেদম খুশী। শিগগির দেশে ফিরবে, তাই খাঁটি ভারতীয় শিল্পের নমুনা কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায়। এগুলো আবার আমাদের মেয়েদের হাতের কাজ শুনে মূর্ছা যায় আর কি !"

করবী ওর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলে ওঠে, "আরে বাবা, কিনল কিছু ?"

"কিছু মানে ? অনেক কিছু। দু' জোড়া পেপার-ওয়েট, চারটে ঘোড়া, দুটো সাঁওতালী পুতুল, একটা ঘট, একটা সরা।"

উজ্জ্বল দেখায় সুরভির চোখ, আরো উজ্জ্বল দেখায় তার দিদির।

"ভাল ভাল। তুই তো তাহলে অনেক কাজ এগিয়ে ফেলেছিস।…দেখেছ সুরভির ক্যাপাসিটি ?"

আমি বিমুগ্ধ হয়ে দুই বোনের সদালাপ শুনছিলাম, করবীর কথায় সচকিত হয়ে হেসে বললাম,—"তা তো দেখছি। ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে।"

"তবু তো আসল বাহাদুরির খবর শোনেননি এখনো ?"…আর একপালা

হি হি করে হেসে নিয়ে সুরভি দম খেয়ে বলে, "কত দামে বেচেছি বলুন দিকি ?"

আমি কিছু বলার আগেই করবী উগ্র কৌতূহলে বলে···"কত রে, কত ?"

সুরভি উৎফুল্ল মুখে কথার সঙ্গে হাসির রেশ মিশিয়ে আঙুল গুনে গুনে বলতে থাকে, "ঘট আর সরা পাঁচ টাকা, সাঁওতালী পুতুল তিন টাকা হিসেবে তিন চারে বারো টাকা, ঘোড়াগুলো চার টাকা করে, আর—আর পেপার-ওয়েটগুলো—" আর একবার হাসির উচ্ছ্বাস সামলে উচ্চারণ করে সুরভি, "কুড়ি টাকা করে জোড়া।"

করবী বিস্ময়ে আনন্দে উচ্চারণ করে, "অ্যাঁ !"

সুরভি দিদির সুরের অনুকরণে বলে, "হ্যাঁ ! বিশ্বাস না হয় দেখ।"

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে এক গোছা নোট দেখায় সুরভি।

করবী খপ্ করে নোট ক'খানা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে একবার গুনে নিজের ভ্যানিটি-ব্যাগে পুরে বলে, "বোকার মত সমিতিকে আর সবটা দেবার দরকার নেই। তুই ওদের হিসেবটা ঠিক বুঝিয়ে মেমো করে রেখে দে। আর এই নে তোর পুরস্কার।" নিজের হাতে জড়ানো শোলার মালাটা করবী পরম পুলকে বোনের গলায় পরিয়ে দিল।

"আরে ব্বাস ! এটা কোথায় পেলে ? বেশ তো।"

"বেশ বলেই তো দেখেই নিয়ে নিলাম। তা তোর একটা জয়মাল্য পাওয়াই উচিত ছিল। কী বল তুমি, উচিত ছিল না ?"

মৃদু হেসে বললাম, "নিশ্চয় উচিত ছিল। উপযুক্ত পুরস্কার হাতে-হাতেই পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি এবার পালাই করবী।"

"আঃ কী খালি পালাই-পালাই করছ ? বললাম যে চা খাওয়াব।"

"মোটে ইচ্ছে করছে না।"

"তোমার চা খেতে ইচ্ছে করছে না ! এ যে ভূতের মুখে রামনাম ! চলো চলো। সুরভি, আর একটু বসবে—"

আমাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই নিয়ে চলে করবী।

"চায়ের স্টল কে দিয়েছে জানো ? আমাদের মালতীদি। মজাটা দেখবে না ?"

"আর দেখবার দরকার কি ? কত কি তো দেখা হল।"

করবী দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "তোমার হল কি বল তো ? তরুণীর অরণ্যে এসে দিশেহারা হয়ে নতুন কারো প্রেমে পড়লে না তো ?"

"কি জানি, তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না। বোধ হয় মাথা ধরেছে।"

"মাই গড্ ! মাথা ধরেছে আর চা ছেড়ে পালাচ্ছ ? চা তো মাথা ধরার মহৌষধ।···আমার বান্ধবীরা হাঁ করে আছে তোমাকে দেখবার জন্যে, তুমি পালালে আমার অপদস্থ হবার আর কী বাকি থাকবে ? ওরা বললে, আধঘণ্টা আটকে রাখতে পারলি না, তবে সারাজীবন আটকে রাখবি কি করে ?"

তাই বটে ! এত দূর তো ভেবে দেখিনি। করবীর মুখরক্ষা করতে অগত্যা চায়ের দোকানে গিয়েও বসতে হয়। শুধু বসতেই হয় না, চা খেতে হয়, ডালমুট খেতে হয়, করবীর সহপাঠিনীদের অনেক মুখর প্রশ্নের উত্তরে দিতে হয়, অনেক

বোকা-বোকা রসিকতার অত্যাচার সহ্য করতে হয়, অবশেষে ছুটি মেলে।

আমার উপর যে করবীর কতটা আধিপত্য আছে সেটা বোঝাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না করবী। শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে গেট অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল।

পথে বেরিয়ে ইচ্ছে হল খানিকটা হাঁটি। চট করে আর ট্রাম-বাসের কবলে আত্মসমর্পণ করতে মন চাইল না।...রাত নেহাত মন্দ হয়নি, পথচারীর সংখ্যা কিছুটা হালকা হয়ে এসেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিয়ে হাঁটতে বেশ লাগছিল।

চলছি, হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কানের কাছে এক প্রচণ্ড হাঁক পড়ল, "ফুল চাই—ফুল। ...বেলফুল, মল্লিকা ফুল, রজনীগন্ধা ফু-উ-ল! ফুল চাই—ফুল।"

পাশের রাস্তা থেকে আচমকা বেরিয়ে এসেছে লোকটা।

আবার রজনীগন্ধা! বিধাতার কৌতুক না কি।

"মালা নেবেন বাবু? ভাল মালা?"

দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করলাম, "সত্যি ফুলের?"

"আজ্ঞে কি বলছেন বাবু?"

"কিছু না। মালার দরকার নেই তাই বলছি।"

তাড়াতাড়ি পা চালাই, পাছে লোকটা আবার অনুরোধ করবার সুযোগ পায়।

আতঙ্ক হয়ে গেছে, ফুলেই আতঙ্ক হয়ে গেছে।

কে জানে যদি হাত দিয়ে শিউরে উঠতে হয়; যদি দেখি, পাপড়িগুলো আশ্চর্য রকমের রসহীন আর গন্ধটা সেণ্টের।

ঈজিচেয়ার

রাজ্য সরকারের সাহসী পরিকল্পনায় পাহাড় কেটে গড়ে উঠছে নতুন শহর জঙ্গলের বুক চিরে চিরে তৈরি হচ্ছে মানুষের এগিয়ে যাবার রাস্তা।

চির-রহস্যময় অন্ধকার অরণ্যানীর রহস্য বিদীর্ণ করে দিচ্ছে বুলডোজারের হিংস্র দাঁত, দৈত্যের দেহ নিয়ে একটানা গর্জন করতে করতে ট্রাক্টরের দল ঘুরে মরছে নির্দিষ্ট সীমারেখায়।

পৃথিবীর যেখানে হয়তো কোনোদিন মানুষের পা পড়েনি, সেখানে মানুষের রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রোদ্দুরে গলে জল হয়ে! মানুষ? না মানুষের মতো দেখতে অন্য কোনো প্রাণী?

ওরা—ওই মানুষের মতো দেখতে প্রাণীগুলো—যারা সভ্যতার আদিযুগ থেকে রোদ্দুরে রক্ত গলিয়ে গলিয়ে পাহাড় কেটেছে, মাটি খুঁড়েছে, পাথর জুড়ে জুড়ে কেল্লা বানিয়েছে, তারা আজও রয়েছে, কিন্তু তাদের ভূমিকাটা যেন নগণ্য হয়ে গেছে।

কুৎসিতদর্শন বিশাল বিশাল এই যন্ত্রগুলোর পায়ের কাছে বড় বেশি ছোটো দেখাচ্ছে ওদের। ওরা আর কোদালের ছন্দে গান গায় না, যন্ত্রের গর্জনে ওদের গান চাপা পড়ে গেছে। যন্ত্র ওদের গৌরব কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে আত্মতৃপ্তি। আত্মতৃপ্তি বেড়েছে দত্ত সাহেবের দলের। যারা নিজেদেরকে বিধাতার চাইতে কম ভাবে না।

সহকারী চীফ ইঞ্জিনীয়ার দত্ত সাহেব।

এই শহর পরিকল্পনার ভার নিয়েছেন তিনি। কাজে গাফিলতি নেই, নিয়মিত তদারকিতে আসেন, কড়া নজর দেন সব দিকে।

এ সময়টা অধস্তন যাঁরা যাঁরা থাকেন, সবাই সন্ত্রস্ত। এঁরা সারাক্ষণ হাত কচলাবেন, প্রতি কথায় 'হেঁ হেঁ' করবেন, উপদেশ শোনবার আগেই 'ইয়েস স্যার' বলে ঘাড় কাত করবেন, আর দত্ত সাহেবের গাড়ির ধুলো মিলোতে না মিলোতে যে আলোচনা শুরু করবেন, সেটা আর যাই হোক, তাঁর প্রতি প্রীতিসূচক নয়।

প্রীতিতে উথলে ওঠবার কথাও নয়, লোকটা যে ওদের যথেষ্ট অসুবিধে ঘটাচ্ছে। ওপরওলার যদি কর্মশক্তি অফুরন্ত হয়, আর নীতিজ্ঞান টনটনে থাকে, তাহলে নিম্নতনদের কম অসুবিধে?

লোকটাকে ওরা ঠিক ভয়ও করে না, করে করুণা। যেখানে চোখের এতটুকু ইসারায় হাজার হাজার টাকা পকেটে উঠতে পারে, এক টুকরো কাগজের গায়ে একটা স্বাক্ষর বসালেই হাওয়ার গায়ে লাখ লাখ টাকার হিসেব লেখা হয়ে যায়, সেখানে যদি লোকটা সারা মাস অসুরের মতো খেটে শুধু মাইনের টাকাটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তার ওপর করুণা ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে?

কিছু সপ্রশংস পিঠ-চাপড়ানি, কিছু মৃদু তিরস্কার, কিছুটা ধমক চমক, আর বেশ কিছুটা উপদেশ বর্ষণের শেষে আবার মোটরের ধুলো উড়ল।

এ তল্লাট থেকে আর এক তল্লাটে।

লাখ লাখ লোক গৃহহারা হয়ে এসেছে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজতে। তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতেই না এত কাণ্ড কারখানা! তা আশ্রয়ের আশ্বাস তারা পাচ্ছে।

জুতোর দোকানের শেলফে সাজানো শূন্য জুতোর বাক্সগুলোর মতো এক মাপের আর এক ধাঁচের অজস্র বাড়ি তৈরি হচ্ছে তাদের জন্যে, ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি। ভেতর বার দুইয়ের ছক অভিন্ন। একটা বাড়িতে বাস করলেই সব বাড়িগুলোয় বাস করার আস্বাদ পাওয়া যাবে।

এই বেশ, এই চমৎকার!

পড়শীর বাড়ি সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল থাকবে না, থাকবে না কোনো মোহ। নিজের পরিকল্পনাকে বিকশিত করে তুলে পড়শীর ঈর্ষার পাত্র হবারও ভয় নেই। গজ ফুট ইঞ্চি মেপে ভাগ।

ফিরতে সন্ধ্যে হলো।

বালি-ওড়া রাস্তায় মোটর উড়ে চলেছে! ধু ধু রাস্তায় একটা জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ড্রাইভারের হাতে চাকাটা যেন স্থির হয়ে রয়েছে। পিছনের সীটে দত্ত সাহেব শিথিল ভঙ্গীতে বসে। একি সেই দত্ত সাহেব, নিজেকে যিনি বিধাতার সমকক্ষ মনে করেন? এ যেন আলাদা আর কেউ, অধস্তনেরা দেখলে 'দত্ত সাহেব' বলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমি চলেছি দত্ত সাহেবের সঙ্গে। চেষ্টা করছি চিনে ফেলতে, কি জানি কতোটুকু চিনব। আমার ভরসার মধ্যে আমাকে কেউ দেখতে পায় না, আমার কাছে রয়েছে অদৃশ্য হবার মন্ত্র। এই মন্ত্রের বলে আমার গতি অনাহত। কাজেই দত্ত সাহেবের সঙ্গে দত্ত সাহেবের অন্তঃপুরে ঢুকে যেতে বাধল না আমার।

কিন্তু—অন্তঃপুর বলতে কি সত্যিই কিছু আছে দত্ত সাহেবের? যেখানটা হতে পারত মিসেস দত্তর রাজত্ব?

না, মিসেস দত্তর রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা নেই! তিনি অসুস্থ, তিনি 'বেচারী'!

সারাদিনটা প্রায় শুয়েই কাটে তাঁর। হৃদ্‌রোগের রোগী, বেশী ওঠা-বসা চলা-ফেরা ডাক্তারের নিষেধ।

ডাক্তারের এ-নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলেন মিসেস দত্ত। অভিমান করেন, অভিযোগ করেন, এরকম জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার সত্যিই কোনো অর্থ আছে কি না, এ প্রশ্ন তোলেন।

আবার যখন ডাক্তার নিজেই বলেন, মাঝে মাঝে একটু ব্যায়ামের দরকার, একটু চলাফেরা, বাগানের মধ্যেই গজ-কয়েক করে হাঁটা, কি হলো সামান্য কিছু সাংসারিক কাজ—যেমন ফলের প্লেটের আপেলটা ছাড়ানো বা চায়ের টেবিলে চাটুকু ঢালা—এমনি টুকিটাকি,—তখন—

তখন ডাক্তারের এই নির্দেশ শুনে মিসেস দত্ত তাঁর দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ড নিয়েও কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়েন।

তিনি করবেন ওই সব? তা হলেই হয়েছে!

বেচারা দত্ত সাহেব বিপত্নীক হয়ে পড়ুন, এই তাহলে ডাক্তারের অভিলাষ?

নাঃ এমন অভিলাষ ডাক্তারের হতে যাবে কেন? পাগল! দত্ত সাহেবের বাড়িটা যে তাঁর একখানি বড় সড়ো তালুক! চট করে বিপত্নীক হয়ে পড়বেন, দত্ত সাহেবের জন্মপত্রিকায় এমন কথা আছে, সেও আমি বিশ্বাস করব না। এ সংসারের একমাত্র লক্ষ্য বাড়ির গৃহিণীকে বাঁচিয়ে রাখা। একমাত্র সাধনা গৃহিণীকে আরাম দেওয়া।

অবিশ্যি 'সংসার' বলতে আর কি? প্রধান সদস্য দত্ত সাহেব বাদে সবই তো চাকর-বাকরের দল! হৃদ্‌রোগগ্রস্ত স্ত্রী নিয়ে দীর্ঘ পনের বছর ধরে নিষ্ফল দাম্পত্যজীবনের ভার বহন করে আসছেন দত্ত সাহেব।

চাকর-বাকরের দল সর্বদা তটস্থ মেম-সাহেবের যাতে না অসুবিধে হয়।

কলিং বেল টিপে ডেকে হুকুম করবার ক্ষমতাও যার সব সময় থাকে না, তার জন্যে সন্ত্রস্ত না থাকলে যে মানবিকতার ত্রুটি হয়। দৃঢ় হুকুম দেওয়া আছে দত্ত সাহেবের।

যখন যা দরকার, কখনো যা দরকার হতে পারে, কোনোকালে যা দরকার হওয়া সম্ভব, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি হাতের কাছে মজুত রাখা আছে।

আর আছে প্রসাধনকলার বহু মাল-মশলা। না দেখলে বোঝা যায় না, শুধু মুখের মেক-আপটুকু করতে এতো জিনিসও লাগে। এসব জিনিস সংগ্রহ করা চাকর-বাকরের পক্ষে সম্ভব নয়, দত্ত সাহেবও আনাড়ি, তিনি টাকা দিয়ে খালাস, এ ভার উদ্দালকের।

কিন্তু উদ্দালক কে?

উদ্দালক ভৌমিক! এ সংসারের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক? কি সুবাদে এখানে আছে সে?

আমিও বুঝতে পারি না, অথচ দেখছি তো অনেক দিন।

সাটিনের বালিশে মাথা ডোবানো, মাথার দু'পাশে দুটো দীর্ঘ পুষ্ট বেণী ছড়িয়ে পড়েছে বিছানায়,...পায়ের ওপর পাতলা একটা চাদর ঢাকা!

মিসেস দত্ত ক্লান্তস্বরে বললেন, "উদ্দালক, আমার জন্যে তোমার একটু বেড়াতে যাওয়া হয় না, এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা ঘরের মধ্যে বসে থেকে কত কষ্ট হয় তোমার!"

খাটের কাছাকাছি ঈজিচেয়ারে উদ্দালক বসে। হাতে একখানা বিলিতী নভেল, তবে পাতার হিসেব করলে দেখা যাবে, ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পাতা দেড়েক পড়া হয়েছে।

মিসেস দত্তর ক্লান্ত স্বর এমনি মাঝে মাঝেই ধ্বনিত হচ্ছে কি না!

উদ্দালক বই মুড়ে চোখ তুলে শুধু বললে, "কষ্ট?"

"ও মা, কষ্ট নয়?" মিসেস দত্তর কণ্ঠে অবোধ প্রশ্নের সুর, "দিনের পর দিন এমনি একটা আধমরা মানুষকে আগলে বসে থাকা, এ কি সোজা কষ্ট? সত্যি আমি কি স্বার্থপর উদ্দালক!"

"স্বার্থপর? তা হবে—" উদ্দালক একটা হাই তুলে বলল, "তাহলে বলতে হয়, এই স্বার্থপরতাটুকুই তোমার সৌন্দর্য!"

"এমন সুন্দর সুন্দর মিথ্যে কথা বলতে পার তুমি ভেবে অবাক লাগে। এমন কথা এত চট্ করে জোগাও কোথা থেকে?"

"খুঁজে জোগাড় করতে হয় না বলে।"

"ওটা বাজে কথা! সত্যি, শুধু ভদ্রতার দায়ে, শুধু চক্ষুলজ্জায় পড়ে তোমার কতো ক্ষতিই করলে উদ্দালক! কী একখানা ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট ছিলে তুমি, কত উন্নতির সম্ভাবনা ছিল তোমার জীবনে, সবই গেল।"

"কি গেল, আর কি থাকল, তার হিসেব কি সব সময় খাতা-কলমের হিসেবে ধরা যায় আরতি?"

"আঃ তোমার খালি এই মধুর মিথ্যে বুলি। এর বুঝি আর স্টক ফুরোয়

না তোমার ? আমি সব সময় তাই ভাবি উদ্দালক, যাঁর দায়িত্ব, তিনি তো কাজের নেশায় পাগল, অথচ তুমি— ! তুমি কী না করলে ? আর এই অকর্মণ্য হার্ট নিয়ে বেঁচেও তো রইলাম এতকাল ! আশ্চর্য ! এখনো তোমার বয়েস ছিল, জীবনকে নতুন করে গড়বার সময় ছিল. শুধু—মৃত্যুটা যদি আমার কাছে আর একটু দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসত !"

উদ্দালক বইয়ের কোণটা বাড়িয়ে মিসেস দত্তর হাতের ওপর একটু মৃদু আঘাত করে বলে, "এই বিশ্রী কথাগুলো বলতে তোমার খুব ভাল লাগে, কেমন ? দিনের দিন তুমি যেন বেশী দুষ্টু হয়ে যাচ্ছ আর—আর বেশী মিষ্টিও !"

শেষের কথাটা উচ্চারণের সময় গলাটা নামল একটু খাদে, ঠোঁটের ওপর ভেসে উঠল একটু দুষ্টু হাসি।

আমি সূক্ষ্মদেহী, আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমি দেখতে পেলাম, আরতি দত্তর সরু সুর্মাটানা চোখ দুটো যেন বিদ্যুৎ-চমকের মতো কেমন একটা লোভে চকচক করে উঠল, কিন্তু সে একটুখানির জন্যেই। সে-দৃষ্টি উদ্দালক দেখতে পেল না। এমন কত দৃষ্টি প্রতি মুহূর্তেই এড়িয়ে যায় উদ্দালকের চোখ থেকে, না গেলে কী যে হতে পারত কে জানে।

এড়িয়ে যায়, হয়তো উদ্দালক অনবরত মধুর প্রলেপ দিয়ে দিয়ে নিজের দুটো খোলা চোখের পাতা আটকে বন্ধ করে ফেলেছে বলেই ! দুজনে মিলে কবিত্বের জাল বুনে বুনে বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে, সে জাল ছেঁড়বার সাহস দুজনের একজনেরও নেই।

তাই হাতের যেখানটায় বইয়ের কোণটা একটু ছুঁইয়েছিল উদ্দালক, সেইখানটায় হাত বুলোতে বুলোতে মিসেস দত্ত বলেন,—"উঃ ! দিলে তো লাগিয়ে ! দুষ্টু বিশেষণটি কার হওয়া উচিত মশাই ?"

"লেগে গেল ?" ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল উদ্দালক, আরতির আঘাত পাওয়া (?) হাতটা ধরে বললে,—"ইস, সত্যি লেগে গেল ? ছি ছি, আমি একটা জানোয়ার।"

কে জানে অসতর্কে আরতি দত্তর একটা নিশ্বাস পড়ল কি না ; কে জানে মনে মনে একবার বলে উঠলেন কি না—'তা যদি হতে পারতে !' (হয়তো ওটা আমার কল্পনা মাত্র) মুখে তো আরতি দত্ত সেই চিহ্নিত জায়গাটায় উদ্দালকের অলক্ষ্যে একটু বেশীমাত্রায় আঙুলের ঘষা দিয়ে বললেন,—"অতোটা তা বলে নয়, অতো কিছু লাগেনি ! শুধু—আরে ইস্ লাল হয়ে গেল যে ! কী ননীর শরীরই হয়েছে বাবা !"

উদ্দালক সেই 'লাল হয়ে যাওয়া' জায়গাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আর টিপে দেখে দেখে, আরো লাল করে তুলে বললে, "সত্যিই ননীর !"

মিসেস দত্ত জানেন, এইটুকুই, এর বেশী আর কিছু নয়। এ সীমানা ছাড়িয়ে বেড়ার ওদিকে পদার্পণ করবে, এমন ছেলে উদ্দালক নয়। তাই হাতটা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন না, ঠিক জানা আছে এক সময় নিজেই নামিয়ে

রাখবে ও।

সত্যিই তাই! অস্বস্তিতে আর আশঙ্কায় বুক কাঁপছিল আমার, কিন্তু উদ্দালক ঠিক এক সময় হাতটা নামিয়ে রাখল। তারপর বলল, "তোমাকে দেখলে মনে হয় যেন এক বোঝা ফুল। ঠিক সদ্যতোলা সকালের ফুল নয়; একটু রোদলাগা, একটু আমলে যাওয়া—"

"থাক থাক. হয়েছে। আমার ডেসক্রুপশান থামাও দিকি, এতোও জানো! ফুলই যদি হই, তাহলে বোধ হয় ঘেঁটু ফুল।"

"আমি তো তোমাকে ভাবতে গেলেই রজনীগন্ধা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনে আরতি?"

"এই হলো আবার মিথ্যাভাষণ শুরু। আচ্ছা উদ্দালক, তুমি তো আগে আমাকে 'দিদি' বলতে? দিদি ডাকটা ছাড়লে কেন?"

উদ্দালকের দৃষ্টিতেও চকিতের জন্য একবার সেই আলো ঝলসে উঠল নাকি? কে জানে! আমি যা-ই দেখি না কেন, আরতি দত্ত দেখলে, দুই চোখে কাব্যময় ছায়া ঘনিয়ে উদ্দালক কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, "দিদি? তোমায় যে কোনদিন 'দিদি' বলেছি, এ আর এখন বিশ্বাসই হয় না আরতি, ভাবতে গেলে ভাবা যায় না, ভাবতে লজ্জা করে।"

"বেশ!" কৌতুকের হালকা হাসি হেসে উঠলেন মিসেস দত্ত; বললেন, "বেশ, তাই ভালো, বয়সে তিন বছরের বড়ো ভদ্রমহিলাটিকে নাম ধরে ধরেই ডাকো। কিন্তু তোমাদের দত্ত সাহেবের আজ এখনো দেখা নেই যে!"

"দত্তদা? মৃদু হাসি হাসল উদ্দালক, "তাঁর বোধ হয় আজকে নতুন কোন এরিয়ার কাজ শুরু হয়েছে! দেখতে হচ্ছে—চুন-সুরকি-সিমেণ্ট কংক্রীট! ফুলের চাইতে যা অনেক মূল্যবান, অনেক স্থায়ী।"

কিন্তু আমি জানি এ সমালোচনায় সায় দেবেন না আরতি দত্ত। এ ব্যঙ্গকে ডাউন করে দিয়ে—পতিপ্রাণা নারীর উৎকণ্ঠা চোখে ফুটিয়ে তুলে বললেন, "তুমি ঠাট্টা করো উদ্দালক, কিন্তু সত্যি ওর কি কষ্ট বলো তো? কী অসম্ভব পরিশ্রমই না করতে হয় ওকে! আহা বেচারা! কিন্তু বাইরে গাড়ির শব্দ হলো মনে হলো না?"

"কই, না তো?"

"একবারটি উঠে দেখো না উদ্দালক, লক্ষ্মীটি! আমার মনে হলো এসেছে ও। দেখবে না?"

অনুরোধ নয়, আকুল মিনতি।

অগত্যাই উঠতে হয় উদ্দালককে। না উঠবে কোন্ যুক্তিতে? একটা শিশুর মতো দুর্বল অসহায় প্রাণীকে শুধু সাহচর্য দেবার জন্যেই যে লোক নিজের জীবনটাকে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে, এটুকু অকারণ ফরমাস তো খাটতেই হবে তাকে।

এঘর থেকে গেট দেখা যায় না, দালানে বেরিয়ে ছোট্ট গোল বারান্দায় ঝুঁকে দেখতে হয়। পাহাড়ের গায়ে প্যালেসের মতো বাড়ি, দত্ত সাহেবের

পদমর্যাদার অনুরূপ।

উদ্দালক চলে যেতেই বালিশের তলা থেকে ছোট্ট একটা আর্শি বার করলে
মিসেস দত্ত। তার সঙ্গে কোথা থেকে যেন বেরিয়ে পড়ল ছোট্ট কৌটো।

প্রসাধনের বহুবিধ মালমশলার একটি।

লিপস্টিক নয়, সুর্মা নয়, গালের রুজ নয়, খানিকটা হাল্কা সীসে রঙে
ভুষো অভ্যস্ত ক্ষিপ্র হাতে আঙুলের আগায় একটু তুলে নিলেন। ঠোঁটের ওপ
বুলিয়ে নিলেন একটা আঙুল, আর একটা আঙুলের মৃদু ঘর্ষণে মুহূর্তে
চোখের কোলে কালি পড়ে গেল। ঠোঁটের হাসিটা দেখাল পাণ্ডুর।

ক্লান্তভাবে বালিশে মাথাটা ফেললেন মিসেস দত্ত।

উদ্দালক ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "কি হলো? আবা
বেশী শরীর খারাপ লাগছে?"

পাণ্ডুর ঠোঁটে হাসলেন আরতি দত্ত, "না, বেশী কিছু নয়।"

"তবে? জল খাবে? খাবে না? ওষুধটা? তাও না? আঙুর মুখে দেবে
একটা? কি চকোলেট একটা?"

"একটু পরে।"

ভারী ক্ষীণ শোনাল কণ্ঠস্বরটা।

"এই তো এতক্ষণ তবু একটু ভালোভাবে কথাটথা কইছিলে? হঠাৎ কি
হলো বলো তো?"

"নতুন কিছু না, যা হয়। আশ্চর্য উদ্দালক, এতো সময় মনে হয় এইরকম
করেই বুঝি হার্টফেল করে লোকে, কিন্তু ফেল তো করি না কই? শুধু যখন
যন্ত্রণাটা বেশী হয়—!"

চোখটা বুজলেন আরতি দত্ত। বালিশের দুপাশে পুষ্ট দুটি বেণী ছড়িয়ে
পড়ল শিথিল হয়ে। বেণীর আগায় জরির ফুল।

খাটের ধারে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে চুলে হাত বুলোতে লাগল উদ্দালক
যন্ত্রণাটা যেখানে বেশী, সেখানে হাত বুলিয়ে দেবে, এমন অসংযম প্রকাশ করে
বসবার ছেলে উদ্দালক নয়। আর, আর আরতি দত্ত? উদ্দালকের হাতটা টেনে
নিয়ে যন্ত্রণার ওপরটায় চেপে ধরবেন, এমন খেলোমি করা তাঁর পক্ষেই কি
সম্ভব?

তিনি যে একটি মহিলা, মার্জিতরুচি শিক্ষিত সভ্য মহিলা, একথা প্রতি
মুহূর্তে যে স্মরণ রাখতে হয় তাঁকে। 'যম-যন্ত্রণা' সহ্য করতে হলেও ভোলবার
উপায় নেই।

তাই যন্ত্রণার জায়গাটা দ্রুত নিশ্বাসে ঘন ঘন ফুলে উঠতে থাকে, সিল্কের
শাড়িটা কাঁপতে থাকে তার তালে তালে, চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে একটা দুরন্ত
ঝড়ের অপেক্ষায় নিমেষ গুনতে থাকেন মিসেস আরতি দত্ত।

কিন্তু না, ঝড় ওঠে না। আজ উঠল না, কোনদিনই ওঠেনি।

উদ্দালকও ভদ্র, সভ্য, কাব্যিক!

কম্পিত আঙুলের ডগায় প্রবহমান তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহকে প্রাণপণে সংহত

করে, চুলেই হাত বুলিয়ে চলে সে।

এক সময় মৃদু বিরক্তির একটা তীব্র প্রতিবাদ ওঠে, "আঃ উদ্দালক, আর ভালো লাগছে না।—জল দাও একটু।"

নদীর কিনার ঘেঁষে বাসা বেঁধেছে দুজনে, তাই প্রাণপণে বালির বাঁধ দিয়ে দিয়ে ভাঙনটাকে আটকে রাখে। ভাঙনে ধ্বসে পড়লে কি হতে পারে, এ ভাববার সাহসটুকুও নেই।

তার চাইতে এই ভালো!

এই স্বপ্নপুরীর মতো নীল আলো জ্বালা ঘর, এই সাটিনের কুশনে মাথা ডুবিয়ে পড়ে থাকা…এই দরকারী অদরকারী হরেক জিনিসে বোঝাই টেবিল, এই মাথার কাছে থরে থরে সাজানো আঙুর আপেল বেদানা কমলা, এই খাটের কাছ ঘেঁষে পাতা ঈজিচেয়ার!……

এছাড়া আর কিছু ভাববারও শক্তি নেই আরতি দত্তর।

দত্ত সাহেব ঘরে ঢুকলেন স্নানের শেষে, বাড়ির ঢিলেঢালা পোশাক পরে। কর্মক্লান্ত শরীব নিয়ে বাইরের ধুলো মাখা পোশাকে স্ত্রী সম্ভাষণে আসবেন দত্তসাহেব এমন গাঁইয়া নয়।

ঈজিচেয়াবটাতেই এসে বসলেন, কারণ আপাতত উদ্দালক ওদিকের সেটিটায় আসীন। ছেলেমানুষের মতো পা দোলাচ্ছে। দত্তসাহেবের সামনে ভারী নাবালক দেখায় ওকে।

ভারী শরীরটাকে চেয়ারের মধ্যে খাপ খাইয়ে বসিয়ে দত্তসাহেব প্রসন্ন সুরে বললেন, "তা'পর, খবর কি? উদ্দালক, সারাদিনের রিপোর্ট কি তোমার?"

উদ্দালক দ্রুত ভঙ্গীতে বলল, "সারাদিন তো ছিল একরকম, সন্ধ্যের দিকে একটু বেড়েছিল।"

"তাই নাকি? বেশী বাড়েনি তো? ওষুধটা দিয়েছিলে?"

"ওষুধটা—আর দিলাম না, মানে—ও আপত্তি করল। একটু পরেই সামলে নিয়েছে।"

আরতিকে দিদি বলা যখন ছেড়েছে উদ্দালক, দত্তসাহেবের সামনেই ছেড়েছে। বলেছে, "এই আবদেরে খুকিটিকে 'দিদি' বলার কোনো মানে হয় দত্তদা? আমি আর দিদি বলছিনে!……স্রেফ্ আরতি!"

সামনে একরকম আর আড়ালে এক রকম সম্বোধন বজায় রাখবে এমন খেলোমি করা চলে না। নিজের কাছে তো বটেই, আরতির কাছেও যে প্রকাশ হয়ে পড়তে হবে তাতে।

দত্তসাহেব স্ত্রীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে উদ্দালককেই বলেন, "তোমার চেহারাটাও তো কেমন ভালো দেখাচ্ছে না……উদ্দালক? আজকাল একটু রোগাও হয়ে গেছ তুমি।"

"আমি? কই?"

উদ্দালক একটা বাহুর মাসলের ওপর আর একটা হাত থাবড়ে মৃদু হাসল।

"আরতি, তুমি নিশ্চয়ই উদ্দালকের খাওয়া টাওয়া একটু দেখছ না?"

আরতি দত্ত চোখের কোলে কালিমাড়া ক্লান্ত দৃষ্টি তুলে ক্ষোভের হাসি হেসে বলেন, "আমি তো তোমাদের সংসারের সবই দেখি!"

"আহা আমার কিছু দেখবার আছেই বা কি? লোহার শরীর। কিন্তু ও হলো কবি মানুষ, কোনদিন বা খেতেই ভুলে গেল। ওকে একটু দেখা দরকার।"

"এ কথাটা বলা মানেই আমাকে কষ্ট দেওয়া। অক্ষমের মানসিক অবস্থা বোঝবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকত!"

"এই দেখো মুস্কিল, একটু ঠাট্টা করবারও উপায় নেই। দেখো উদ্দালক দেখো। তোমাদের কবিদের কাণ্ডই আলাদা।"

দুজনের একজনও কখনো এক লাইন কবিতা লেখেনি, তবু দত্তসাহেব দুজনকেই 'কবি' আখ্যা দিয়ে রেখেছেন।

ওরা দুজনেই প্রায় এক বয়সী, ওরা নেহাত নাবালক। দত্তসাহেব ওদের দিকে বাৎসল্য-রসে ভেজা কৌতুক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন। নাকি তার নীচে রয়েছে এক ছিটে করুণা?

উনি বিশ্বাস করেন উদ্দালককে, বিশ্বাস রাখেন স্ত্রীর শালীনতা-জ্ঞানের ওপর।

এ সময়টায় শুধু রেফ্রিজারেটারে ঠাণ্ডা-করা এক গ্লাস জল ছাড়া আর কিছু খান না দত্তসাহেব।

চাকর জলটা নিয়ে এল। সুদৃশ্য ট্রের ওপর বসানো দামী দামী তিনটি কাঁচের গ্লাসে। শুধু জল! দত্তসাহেবের এক গ্লাস। আর দুজনের যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে তো তারাও খাক।

"জল খাবে উদ্দালক?"

"নাঃ।"

"খেলে পারতে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডাজল খাওয়া ভালো।···আরতি, তোমায় দিক?"

"আমাকে? আচ্ছা রাখো একঠো!"

এরপর গল্প চলল ঘণ্টাখানেক। প্রধানত দত্ত সাহেব আর উদ্দালকের মধ্যে।

আস্তে আস্তে মুখ খুলে যাচ্ছে উদ্দালকের, খুব গল্প শুরু করে দিয়েছে! হয়তো ওর ছাত্র-জীবনের কোনো কৌতুককর কাহিনী, হয়তো নিজের কোনো বীরত্বকাহিনী, হয়তো বা কোনো শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের চরিত্র-মাহাত্ম্য।

ওর স্বপ্নাচ্ছন্ন আর অপ্রতিভ-অপ্রতিভ ভাবটা কেটে যায়, ছেলেমানুষের মতো উজ্জ্বল দেখায়। দত্ত সাহেবের প্রতি এমন একটা সশ্রদ্ধ প্রীতির ভাব দেখা যায়, মনে হয় ছোট ভাই বুঝি।

ঘরে হাসির আওয়াজ ওঠে! দত্ত সাহেবের ভারী গলার প্রাণখোলা হাসিটাই বেশি। অথচ মিসেস দত্ত দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকেন কেমন একটা ঈর্ষার দৃষ্টিতে।

বাইরে চাকর-বাকরগুলো স্তম্ভিত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকে। মনিবকে বত্য' ভেবে ভক্তি করবে, না ক্লীব ভেবে ঘৃণা করবে, বুঝে উঠতে পারে না।

এরপর খাবার ঘণ্টা!

দত্ত সাহেব স্ত্রীর বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে সস্নেহ মমতায় প্রশ্ন করলেন, "কি র রাত্রে?"

"জানি না, খাবার কথা আর শুনতে চাই না।"

"আচ্ছা শুনতে হবে না, দেখবে চলো।"

"যাব আর কোথায়, এইখানেই এক কাপ দুধ দিয়ে যাক শুধু।"

এ বাসনা প্রায় রোজই ব্যক্ত করে মিসেস দত্ত। আর রোজই দত্ত সাহেব নুরোধ করেন—'সামান্য কিছু খাবে না?'

"একেবারে উঠতে পারবে না?" মমতায় আরো স্নিগ্ধ হয়ে আসে দত্ত হেবের কণ্ঠ। স্ত্রীর কোমল পেলব হাতখানির ওপর মৃদুভাবে একটু হাত লিযে বলেন—"টেবিলে একটু বসলে বোধহয় ভালো লাগত। কি কি করেছে জকে?"

'আমায় জিজ্ঞেস করছ?"

ক্ষোভের হাসি হাসলেন আরতি দত্ত।

দত্ত সাহেবও হাসলেন, অপ্রতিভ হাসি। বললেন, "মানে এমনি বলছি! না—দেখা যাক টেবিল আজকে আমাদের কি কি আশ্চর্য জিনিস উপহার তে পারবে। হয়তো—চোখে দেখলে কিছু রুচি আসবে!"

"আচ্ছা চলো!

দত্ত সাহেব ঈষৎ ফিরে দেখলেন, উদ্দালক ঘরে নেই। বললেন, "ধরব?"

ধরলেন না, জিজ্ঞেস করলেন।

"নাঃ ধরতে আর হবে না, উঠছি আস্তে আস্তে।"

"দেখো সাবধান! খাটের বাজুটা ধরো, চোখ বুজে খাট থেকে নামো, থাটা ঘুরে না যায়।"

"সাবধানেই নামছি। তুমি একটু বাইরে—"

অসমাপ্ত কথায় ড্যাস টেনে একটু মৃদু হাসলেন আরতি দত্ত।

অর্থাৎ... ...শাড়ি টাড়ি একটু ঠিকঠাক করে নামবেন, হয়তো বা ব্লাউসটা বদলাবেন। সভ্য ভব্য ভদ্রমহিলা, এ সময় স্বামীর উপস্থিতিও তাঁদের কাছে বিনিয়ম।

মেম সাহেবের ডিশে পরিবেশকের বিশেষ কিছু দেওয়া বারণ।

উনি প্রায় খাসি পাত্রের সামনেই এসে বসেন, ইচ্ছে বুঝে শরীর বুঝে বাঁ হাতে তুলে তুলে নেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য খুব যে কম নেন তাও নয়।

দত্ত সাহেবের আর উদ্দালকের দুজনের অনুরোধের চাপে পড়ে হয়তো ওদের

চাইতে বেশীই নেওয়া হয়ে যায়। ও'রা কেবলই বলেন, "তোমাকে তো বলতে সাহস হয় না, কিন্তু এটা যদি খেয়ে দেখতে। রেঁধেছে বেশ।'

এইভাবে নেহাৎ অনুরোধে পড়ে যা হয় কিছু খেয়ে উঠে পড়েন মিসেস দত্ত। উঠে বলতে থাকেন, "খাওয়াটা বেশী হয়ে গেল! না জানি রাত্রে কি অবস্থা হয়!"

ডাক্তারের নির্দেশে খানিকক্ষণ বাইরের খোলা হাওয়ায় বসতে হয়। তিন জনেই বসেন বারান্দায় পাতা চেয়ারে।

রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে, দেহ মন্থর। এ সময় আর হাসি গল্প চলে না, দত্ত সাহেব বলেন, "কই হে উদ্দালক, তোমার বাঁশিটা বার করোনা?"

"এখন আর—আচ্ছা আনছি!"

বাঁশি নিয়ে আসে উদ্দালক। ভালোই বাজায়। এ-সুর বেশী রাত্রিতে কেমন যেন একটা মাদকতা বহন করে আনে। নেশাচ্ছন্নের মতো চোখ বুজে পড়ে থাকেন দত্ত সাহেব, উদ্দালকও বোধহয় চোখ বুজেই বাজায়।

কখন যে এক সময় মিসেস দত্ত উঠে যান, কারোই চোখে পড়ে না। বলতে গেলে কোনোদিনই চোখে পড়ে না।

এ সময় চোখে পড়াবার চেষ্টাও বৃথা।

চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে 'ফেন্ট' হয়ে পড়ে থেকেও দেখেছেন মিসেস দত্ত দু'জনের একজনও তাকায় না। এক সময় ঘাড়ের ব্যথায় চেতনা ফিরিয়ে আনতে হয়।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে দু'জনেরই মুখে। যুগের-কাছের-চুলে-পাক-ধর' দত্ত সাহেবের ভারী ভারী মুখ আর কালো সাটিনের মতো চকচকে চুলে ঘের উদ্দালকের পাতলা সুগৌর মুখ, তবু যেন প্রায় একরকম।

যেন ওরা সমগোত্র, ওরা সুদূরের।

ও'দের একজনেরও নাগাল পাওয়া যায় না—ওরাই যেন পরস্পরের আশ্রয়!

কী সুন্দর, কী পবিত্র মুখ উদ্দালকের।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি—ও কী করল! ও কেন ওর দেশ ঘর আত্মীয়স্বজন সব ত্যাগ করে এখানে পড়ে আছে? ও তো এদের কেউ নয়?

ও ছাত্র-জীবনে কলেজের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিল, ওর কতো ভবিষ্যৎ, কতো সম্ভাবনা। বিলেত যাওয়ার পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরি ছিল ওর, কিন্তু কী হল?

কে ওর জীবনের শনি?

আরতি?

দত্ত সাহেব?

না ওর ভাগ্যের অধিপতি গ্রহই স্বয়ং শনি?

বিলেতে যাবার আগে কি যেন একটু দরকারে পড়ে দাদার বন্ধু এই দত্ত সাহেবের কাছে এসেছিল উদ্দালক, দরকারটা এখন আর ভেবেও মনে করা যায় না।

শুধু মনে পড়ে, দুতিন দিনের মধ্যে এ শহরের সমস্ত "দ্রষ্টব্য"গুলি দেখতে গিয়ে 'লু' লেগে সৃষ্টিছাড়া রকমের একটা জ্বরে পড়ে গিয়েছিল।

সেই রোগশয্যায় 'মিসেস দত্ত' রূপান্তরিত হলেন 'আরতিদি'তে।

তার পর বম্বে গিয়ে ঠিক যেদিন জাহাজ ছাড়বে, তার আগের দিন খবর পেল, মা মারা গেছেন। বাপ ছিলেন না, মা গেলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। পরবর্তী জাহাজখানাতেও যাওয়া হয়ে উঠল না, তার পরেরটাতেও না।

তারপর থেকে আজ অবধি কতো জাহাজ এল গেল, উদ্দালকের জীবনের জাহাজ আর সমুদ্রে ভাসল না। আটকে রইল বালির চড়ায়।

জগতের অনেক যুক্তিহীন ঘটনার মধ্যে এটা আর একটা।

প্রথম প্রথম ফেরার কথা উঠত। কিন্তু দানা বাঁধতে পেত না। কথা উঠলেই মিসেস দত্ত রুক্ষ রুক্ষ চুলে ঘেরা সুন্দর মুখখানি ঈষৎ ফিরিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলতেন, আর কটা দিন কষ্ট করো উদ্দালক, আর গোটা কতক দিন সবুর করো। বুকের ভেতর মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, বেশী দিন আর আটকে রেখে তোমার ক্ষতি করব না! দেখছ তো তোমাদের দত্ত সাহেবকে? দিন রাতের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা ওঁর কাজ! হয়তো কোন দিন বেচারী আমাকে নিঃসঙ্গ ঘরে নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করতে হবে, কেউ জানতেও পারবে না। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে নিজের ওপরই আমার করুণা হয় উদ্দালক।

দত্ত সাহেব তখনো 'দত্ত দা' হয় নি, তখনো রগের চুলে পাক ধরেনি। তিনি ওর যাওয়ার প্রস্তাব শুনলেই তাঁর দৃঢ় বলিষ্ঠ মুখে হতাশার ছবি ফুটিয়ে আবেগগম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, তুমি চলে গেলে তোমার আরতিদিকে আর বাঁচানো যাবে না ভাই! আমার এই স্বার্থপর অনুরোধ, তোমার অনেক ক্ষতি করছে জানি,—কিন্তু 'ও মরে যাবে' এ কথা যে ভাবা যায় না! তুমি জানো না, —ও মরতে চায় না, বাঁচবার কী দুরন্ত ইচ্ছা ওর! তুমি চলে গেলে ও মরে যাবে! দেখছ তো আমাকে?

এর পরেও নিজের ভবিষ্যৎ-চিন্তা? মানুষ তো পশু নয়?

ধীরে ধীরে এ পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে উদ্দালক!

যাবার কথা উঠতে পারে একথা আর কেউ স্বপ্নেও ভাবে না।

তা' বেঁচে আছেন আরতি দত্ত আরো অনেক বছর, 'নন্দলালের' মতো এক অদ্ভুত বাঁচা!

বিছানাই তাঁর বাঁচার আশ্রয়!

বিছানা ছেড়ে উঠলেই স্বপ্ন ভেঙে যাবে, ফুরিয়ে যাবে জানেন জীবনের সমস্ত সমারোহ, থেমে যাবে সমস্ত গান!

তাই ডাক্তার যদি বলেন, "এবার উঠে পড়ুন না, দত্ত সাহেবকে একটু দেখুন টেখুন, বয়েস তো ওঁরও হয়েছে, অথচ কী অমানুষিক পরিশ্রমই করে চলেছেন —খাওয়া দাওয়ার যত্ন দরকার!"

শুনে দুর্বল হৃদয় নিয়েও কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়েন আরতি দত্ত। বলেন, খাওয়ার যত্ন করতে গিয়ে—শেষে ভদ্রলোককে বিপত্নীক করে বসব, এই আপনি চান বুঝি ?

বাঁশি থামল, দত্ত সাহেব কোমল স্বরে বললেন, "রাত হয়েছে উদ্দালক !"

"ও তাইতো", অপ্রতিভের হাসি হাসে উদ্দালক, "আপনিও যান ! সেই তো ভোর ছটা থেকে জোয়াল কাঁধে ?"

দত্ত সাহেব উঠে পড়েন, নিজের ঘরে যেতে যেতে স্ত্রীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, "আরতি, কিছু লাগবে ? মনিয়ার মাকে ডেকে দেবো ? লাগবে না কিছু ? আচ্ছা ঘুমোও। শুভ রাত্রি !"

অদ্ভুত একটা দরদভরা দৃষ্টিতে অপসৃয়মান লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে উদ্দালক ! তাকিয়ে থাকে তাঁর ভেজানো কপাটটার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় উঠে পড়ে নিজের ঘরে চলে যায় ! হয়তো—আরতির কথা তখন মনেও পড়ে না তার !

খাটের ধার ঘেঁষে পাতা বিশেষ আরামের ব্যবস্থা-সম্বলিত সেই ঈজি-চেয়ারটায় পড়ে থাকেন মিসেস দত্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ! বিছানায় উঠে শুতে ইচ্ছে হয় না। সারাদিন শুয়ে শুয়ে বিছানার আকর্ষণ লুপ্ত হয়ে গেছে।

হতাশায় আর অভিমানে বুকের মধ্যে কেমন একটা জমাট ব্যথা অনুভব করেন, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন, অসুখটা যদি ছলনা, এটা তবে কি ? এই অব্যক্ত যন্ত্রণাটা ?

সারাদিন ওদের আরতির জন্যে চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু আশ্চর্য, রাত্রে ওরা এতো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয় কি করে ? হার্টের অসুখের রোগী কি কখনো রাত্রে হার্ট ফেল করে না ?

অথচ ওদেরই বা দোষ কি ? ডাক্তারের নিষেধ যে ! নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন ঘুমের দরকার আরতি দত্তর ! কিন্তু কেন তিনি ঘুমোবেন ? ঘুমিয়ে লাভ কি তাঁর ? ঘুম না হলে তবু তো আগামী কাল ডাক্তারের কাছে কমপ্লেন্ করবার জোরালো একটা বিষয় থাকে হাতে। মুখের চেহারায় সত্যিই ক্লান্তির ছাপ পড়ে তাতে। তবু তাতে যদি বিশ্বাস করে ওরা।

হার্টের অসুখের গল্প যে কেউই বিশ্বাস করে না, ডাক্তার নয়, স্বামী নয়, এমনকি উদ্দালকও নয়, এই নিষ্ঠুর সত্য আরতির চাইতে বেশী আর কে জানে ?

একঘেয়ে ভাবতে ভাবতে মাথাকুটে মরতে ইচ্ছে হয় মিসেস দত্তর, হঠাৎ কোনো অলৌকিক উপায়ে একবারের জন্যে হার্টফেল করে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, তোমাদের ধারণা কি নিদারুণ ভুল !

কিন্তু কিছুই পারা যায় না, শুধু বসে বসে ভাবা যায়, দত্তসাহেব

উদ্দালককে সহ্য করেন কেন? স্বাভাবিক সরলতায়, না নিষ্ঠুর অবহেলায়? ভাবা যায়, উদ্দালকই বা এখানে রয়ে গেল কেন? কার ওপর মমতায়?

আরতির?

না দত্তসাহেবের?......সন্দেহের এই তীক্ষ্ণ কাঁটা দুটো কিছুতেই উপড়ে ফেলা যায় না।

এ যন্ত্রণার কোনো দর্শক থাকে না আমি বাদে।

কিন্তু আমি কি করব? আমার উপায় কি? তুমি যদি তোমার জীবনে ঈজিচেয়ারকেই বেছে নাও, আরতি,—তুমি যদি না বোঝো—পুরুষের চোখে ঈজিচেয়ারের মূল্য কি, তাহলে আমার কি করবার আছে?

গল্পলেখকদেরও যে বিধাতাপুরুষের মতোই হাত পা বাঁধা!

স্পেশাল ট্রেন

রবিবারের দুপুর। মুখে একগাল হাসি আর হাতে 'আনন্দবাজার'-এর একখানি পৃষ্ঠা নিয়ে সব-জজ-গিন্নি ডাকলেন, "ওগো শুনছ! আজকের কাগজটা সব পড়েছ?"

সময়টা সংবাদপত্রের নয়, কিন্তু গিন্নী-বান্নি মহিলাদের সংবাদপত্র সেবনের প্রধান সময় তো এই দুপুরটিই। মধ্যাহ্ন-আহারের পরে পানের কৌটোটি পাশে ও কাগজখানি হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ার মধ্যে যে আবেশ আছে, দোক্তার নেশার মতই তা মধুর মনোরম।

কর্তার অন্যদিন বাঙলা কাগজ পড়ার সময় হয় না, তবে রবিবারের কাগজটি তিনি মন দিয়ে পড়েন। যাই হোক, এখন তাঁর সবে একটু তন্দ্রা এসেছিল, তাই এহেন উৎফুল্ল 'ওগো' সম্বোধনেও চোখ খুললেন না। মুদিত নেত্রেই জড়িত কণ্ঠে বললেন, "কেন পড়ব না? পঞ্চশীল বৈঠকে—"

কথা শেষ হতে পায় না, গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন, "ধন্যবাদ! ঘুমিয়েও আড্ডা ভুলতে পারছ না? পঞ্চশীলের বৈঠকখানার স্বপ্ন দেখছ? খোঁয়ারি ভেঙে একবার তাকাও দিকি দয়া করে?"

বলা বাহুল্য, খবরের কাগজের গল্প-সল্প টীকা-টিপ্পনী, আইন-আদালত, সিনেমা-সংবাদ ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দরকারি জিনিসগুলি ছাড়া 'আজেবাজে' কতকগুলো কথা পড়ে সময় নষ্ট করেন না সব-জজ-গিন্নী। কাজেই কর্তার কথায় শীলেদের বৈঠকখানা সম্পর্কে কল্পনা করে রেগে ওঠা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

রেগে উঠেছেন!

অতঃপর চোখ খুলতেই হয় জজমশাইকে। জজের জজ! তাঁর রাগ তো সোজা জিনিষ নয়? উঠে বসে খাপ থেকে চশমাটা বার করতে করতে বলেন, "দয়া! বল কি গো? কে কাকে দয়া করে?"

"হয়েছে, থাক! বকে মরছি, গ্রাহ্য নেই! দেখ না কাগজটা—" শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটি খুলে ধরেন গৃহিণী কর্তার নাকের সামনে।

একবার অবহেলাভরে চোখ বুলিয়ে এবং তৎপরে নিবিষ্টভাবে পড়ে নিয়ে সবজজ মহাশয় গোঁফের ফাঁকে কিঞ্চিৎ হেসে বলেন, "বিজ্ঞাপনে অমন ফলাও করে বলেই থাকে।"

"বলেই থাকে!" ব্যস হয়ে গেল জজের রায় দেওয়া!

"বলি যা যা বলেছে, তা না করলে পার পাবে সে?"

"আহা! বুঝছ না? স্পেশাল ট্রেন মানে হচ্ছে—"

"মানে আর তোমায় বোঝাতে হবে না! বৌমা সমস্ত বুঝিয়ে দিয়েছে আমায়! গাড়িতেই থাকা, গাড়িতেই নাওয়া-খাওয়া। হোটেল খুঁজে ধর্মশালা খুঁজে বেড়াতে হবে না—এমন সুযোগ আর মিলবে না। চল না দুজনে বেরিয়ে পড়ি? বৌমার সঙ্গে সব পরামর্শ হয়ে গেছে—"

"ওঃ ইতিমধ্যেই বৌমার সঙ্গে সব পরামর্শ হয়ে গেছে? তবে ত যাওয়াই হয়ে গেছে।"

"তা তো গেছেই—" গৃহিণী বিজয়গৌরবের হাসি হেসে বলেন, "দ্বারকার দিকে আমাদের যাওয়া হয়নি, এই সুযোগে চলেই চল। গা তুলে ওঠ না একবার। ভাল করে খোঁজ খবর নাও না? এই যে ফোন নম্বরও দিয়েছে—"

সবজজমশাই হতাশ ভাবে বলেন, "একখুনি খোঁজ নিতে হবে?"

"নিলেই বা? ক্ষতি কী? শুভস্য শীঘ্রম্! ওঠ বাবু, আর আলিস্যি কর না।"

জজমহাশয় উঠে বসে হাই তোলেন। জানেন এরপর দিবানিদ্রার বাসনা পাগলামি মাত্র। খাটের নীচে রক্ষিত চটিজোড়ায় পা গলাতে গলাতে বলেন, "বৌমাটি হয়েছেন তেমনি। একেবারে শাশুড়ির পোঁ-ধরা! হুজুগে পড়তে দেখলে কোথায় বাধা দিবি—তা নয় আরো উস্কুনি!"

"বাধা দেবে? কেন গো? বৌমা আমার তেমন নয়।"

"নয় বলেই তো অত পৃষ্ঠাবল! গেল অমন মৌজের ঘুমটাই মাটি হয়ে।"

নীচের তলার ঘরে টেলিফোন। কর্তা শিথিল ভঙ্গীতে নামতে থাকেন।

যৌবনকাল হতে জীবন সমর্পণ করে এসেছেন, বিদ্রোহের কল্পনাও মনে আসে না। গৃহিণী যখন সংকল্প করেছেন, তখন করে ছাড়বেনই, এ-অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

দুটো সিঁড়ি নামতেই কী মনে করে গিন্নি আবার এগিয়ে আসেন। গলার স্বর নামিয়ে বলেন, "ওগো শোন! বৌমা বলে দিয়েছে একটা 'কুপে' পাওয়া যায় কি না জিজ্ঞেস করতে! তাতে অনেক সুবিধে!"

"কুপে!"

সবজজমশাই আর একবার অভ্যস্ত চোরা হাসি হেসে বলেন "কুপে!" বৌমাটিই তোমাকে বখিয়ে ছাড়ল! সাজসজ্জায় তো আজকাল প্রায় তরুণী হয়ে উঠছ, আবার 'কুপে' চাই—"

"আঃ হয়েছে, থামো ! কী করব, বৌমা নিজে পছন্দ করে শাড়ি জামা কিনে ানে, জোর করে পরিয়ে তবে ছাড়ে—"

"হুঁ রীতিমত পলিসি ! মুঠোয় পোরবার কৌশলটি ঠিক বেছে নিয়েছেন !"

"বেশ, যাও ! শোনো, আমি ততক্ষণ একটু গাড়িয়ে নিচ্ছি, বুঝলে ? তুমি ুব বিস্তারিত সব জেনে নাও। আর ওই কথাটাও বোলো ! ভুলে যেও না ! ৗমা বলেছে, আগে থেকে না জানালে—"

"আচ্ছা গো আচ্ছা !"

এটা তো হল একটিমাত্র বাড়ির ঘটনা !

কিন্তু 'আনন্দবাজার' তো একখানি মাত্র ছাপা হয় না ? আবার বিজ্ঞাপন-তারাও যে মাত্র একটি সংবাদপত্রে আত্মঘোষণা করেন এমন নয়। কাজেই এ-বজ্ঞাপনটি অনেক গিন্নীরই চোখে পড়ল।

সবজজ-গৃহিণীর মত "নীরত্যাগী ভোজী ক্ষীর পরমহংস" পাঠিকার ংখ্যা তো কম নয়। সর্বভুক পাঠিকাও বিরল নয়। তবে যাঁদের কর্তার পকেটের বস্থা জোরালো নয়, তাঁরা এ-সংবাদের মধ্যে কোনো আলো পেলেন না। াবার পকেটে বলিষ্ঠতার আশ্বাস থাকলেও বাড়ির বাইরে পা বাড়াবার অবস্থা বসময় থাকে না সকলের। কারো সংসারে 'পাঁচজনের কথা'র ভয়, কারো ঘরে থর্ব শ্বশুর শাশুড়ী, কারো বা বৌমার কোলে কচি। এসব প্রতিকূলতা তিক্রম করা বাঙালীর ঘরে সহজ নয়। পয়সা থাকলেও। কাজেই তাঁরাও কবার বিজ্ঞাপনটির দিকে চোখ বুলিয়ে অলক্ষ্যে নিশ্বাস ফেলে সিনেমার ৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যেটা সম্ভব, যেটা করায়ত্ত !

শুধু যাঁদের এসব প্রতিবন্ধকের কিচ্ছুটি নেই, তাঁরাই সহর্ষে 'ওগো'র াছে ছুটে গিয়ে জানালেন, "এমন সুযোগটি আর হবে না।"

তাই বলে সবাই কিছু আর সবজজমশাইয়ের মত প্রত্যক্ষে আত্মসমর্পিত ন। গৃহিণীর আবেদনে এক কথায় সাড়া দিতে, বা অপ্রতিবাদে তা মেনে নতে অনেকেরই পৌরুষে ঘা পড়ে। অতএব প্রতিবাদের প্রহসন চলে।

কোনো সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন অফিসার সদ্যোবিধবার সর্বহারা সুরে লেন, "আর এখন ওসব কেন ? এযাবৎ যা হয়ে গেছে, গেছে ! এখন সব দিকে াত গুটোতে হবে।"

কোনো 'আসন্ন-অবসর' সাহেব আশ্বাসের সুরে বলেন, "এখন কেন ? আর ুটো বছর সবুর কর না। দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে—"

কেউ ঝকঝকে বাঁধানো দাঁতে অবহেলার হাসি হেসে বলেন, "পাগল হয়েছ ? পরের এক্তারে যেতে আছে ? ইচ্ছে করলেই তো নিজেরা—"

কেউ টাকে হাত বুলিয়ে বলেন, "হট্ হট্ করে চৌদ্দটা জায়গায় ঘোরার াইতে একটা হেল্দি জায়গায় বাড়িভাড়া করে মাসখানেক থাকলে হজম-টজমের বিষয়ে উপকার হয়। তোমারও হার্টের ট্রাব্লটা—"

বলা বাহুল্য, এসব দুর্বল প্রতিবাদ খণ্ডন করবার উপযুক্ত যুক্তির অভাব ও-পক্ষে নেই ! অপরপক্ষে ওদিকের যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ অকাট্য ! হাইকোর্টের

দুঁদে উকিলও হার মানেন। সব বলতে পুঁথি বাড়ে। মোট কথা, ফলাফল সহজবোধ্য।

বহির্জগতে যাঁরা যত বেশী 'পদস্থ', অন্তঃপুরে যে তাঁরাই তত বেশ অসহায় অ-পদস্থ, একথা তো শিশুতেও জানে। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না রৌদ্রের চাইতে রৌদ্রতপ্ত বালুকার উত্তাপ বেশী, একথা শাস্ত্রে আছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিনয়টা একটু ঘোরালো করতে কর্তা গৃহিণী কথায় কর্ণপাত না করে হয়তো অফিসে চলে গেলেন এবং সন্ধ্যায় ফিরে শু করলেন, "ওগো শুনছ, অফিসের অমুক বাবুও বলছিল বটে—"

বৈচিত্র্যও কি নেই? যেমন শ্রীমতী চৌধুরী নিজে না-রাম না-গঙ্গা থাকে তাঁর ছোটবোন এসে জামাইবাবুকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। "সত্যি, এত টা রোজগার করেন চৌধুরী সাহেব, অথচ কেবলমাত্র হ্যাঙ্গামার ভয়ে স্ত্রীকে তীর্থ ধর্ম করান না, এর চাইতে অমানুষিকতা আর কি আছে?"

চৌধুরী সাহেব বিরক্তভাবে বলেন, 'বলি দোষ তো খুব দিচ্ছ, সাধে বলেছে শালী! তোমার দিদিটির শুচি-বাইয়ের কথা ভুলে যাচ্ছ বুঝি?"

শালী বললে, "সেই রকম সুব্যবস্থা করে নিয়ে যাবেন!"

"আমি কী করব? ট্রেনে থাকা! 'ওই ও ছুঁয়ে দিলে, ওই ও সাঁটে বসে মাংস-ভাত খেল', এ-সবের উপায়?"

"বেশ তো, এইবেলা আগে ভাগে একটা 'কুপে'র জন্যে দরখাস্ত ঝেড়ে দিন না! তা হলেই ওসব সমস্যা মিটে যাবে।"

অতএব চৌধুরী সাহেবের আপত্তির আর মুখ থাকে না।

তিনি দরখাস্ত ভাঁজতে বসেন।

যাক্ এ সব তো হল গৃহিণীতন্ত্র সংসারের কথা। বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিবেন না জেনেও আরো কেউ কেউ কি আর না ভুলল? যেমন তরুণ কবি সুরঞ্জন, তরুণ আর্টিস্ট শংকরদেব। দুই বন্ধুতে হরিহর, একাত্মা! দু'জনেই নতুন বিয়ে করেছে, বড় লোকের ছেলে, পয়সা আছে।

আর্টিস্ট বলল কবিকে, "গেলে কেমন হয়? দেখে তো মনে হচ্ছে মন্দ নয়। ওরাই সব হাঙ্গামা পোহাবে, বার বার বাক্স বিছানা বাঁধার ঝামেলা নেই। তা ছাড়া—অজান্তা ইলোরা—"

কবি বলল, "দেখেছি ওদের প্রোগ্রাম। সমুদ্রটাও পাওয়া যাচ্ছে। চল না বেরিয়েই পড়ি। বাড়িতে তো 'এদের' দেখাই পাওয়া যায় না। বাইরে গেলে তবু—কী বল?"

'এদের' মানে অবশ্য নবীববাহিতাদের।

নবীববাহিতারা এই অভাবিত সৌভাগ্যের আশায় দিশেহারা হয়ে মূর্ছা যায় যায়।

বিজ্ঞাপনদাতার ঘরে লোকের ভিড় জমে। টেলিফোন-রিসিভার ছুটি পায় না। যারা যেতে ইচ্ছুক, তারা তো খবর নিচ্ছেই, যারা কস্মিনকালেও যাবে না তারা বেশী প্রশ্ন করে মারছে। বিজ্ঞাপন পড়ে—ওঃ আসল কথাটাই বুঝি বলা

হয়নি ? বিজ্ঞাপনের বিবরণ !

আচ্ছা যথাযথই পেশ করছি। ভাব-ভাষা-অলংকার সমেত। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনটি ছিল এই—

ভ্রাম্যমান হোটেল বা মাইতি মহাশয়ের তীর্থযাত্রা স্পেশাল।

বিলাস-ভ্রমণ ও তীর্থ ভ্রমণের অভাবনীয় সুযোগ! পঁচিশ দিনব্যাপী ভ্রমণে—বোম্বাই, নাসিক, দ্বারকা, অজন্তা, ইলোরা সহ চৌদ্দটি দেশ পরিদর্শন।···উৎকৃষ্ট আহার···সর্ববিধ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য,···যাহারা অর্থসামর্থ্য সত্ত্বেও ঝঞ্ঝাটের ভয়ে তীর্থ ভ্রমণে বিরত থাকেন, তাঁহাদের সুবর্ণ-সুযোগ।··· অর্থের বিনিময়ে পরমার্থ লাভ করুন।

ভাষাটা বোধ হয় মাইতি মশায়ের নিজের। কিছু অর্থের বিনিময়ে কোনো ভাল সাহিত্যিককে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারতেন, তাতে কাজ বেশী হত ! সে যাক, 'বিনিময় মূল্য' ধরেছেন 'প্রথম শ্রেণী চারশো নিরানব্বই টাকা চার আনা, তৃতীয় শ্রেণী—"

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীরা গোল্লায় যাক, আমার কাহিনী বাছাইকরা প্রথম শ্রেণীদের নিয়ে।

নির্দিষ্ট রজনীতে মাইতি মহাশয়ের মোহরাঙ্কিত বোম্বে মেলের একখানি বগির সামনে ভিড়ে ভিড়াকার। যাঁরা যাবেন, তাঁরা তো আছেনই, তা ছাড়া—তুলে দেবার জন্যে প্রত্যেক বাড়ি থেকে আধ ডজন পৌনে ডজন লোক এসেছে। সৌভাগ্যশালীদের আত্মীয়বন্ধু একটু বেশীই হয়।

ট্রেন ছাড়তে দেরি ছিল না। প্ল্যাটফর্মেই বিদায়-অভিনন্দন-পর্ব সেরে যে যার নির্দিষ্ট আসনে উঠতে গেলেন। গাড়িটা নতুন ধরনের। 'করিডর' দেওয়া। বার্থ খুঁজে নিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়।

কিন্তু ও কী ?

সহসা ও কী হল ? আগুন জ্বলল, কিসে ?

ট্রেনের কামরায় স্টোভ বার্স্ট করেছে। এক আধটি নয়, একসঙ্গে চৌদ্দটি।

চমকে যাচ্ছেন ? তা হলে খুলেই বলি। স্টোভটা রূপক। আসলে বার্স্ট করল চৌদ্দটি আরোহীর মেজাজ।

'চৌদ্দ'র অপর এক অর্থ 'সাত জোড়া', জানেন তো ? এক্ষেত্রে সেই অর্থই প্রযোজ্য ; সাতটি যুগল, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ! অথবা ভারতীয় প্রথায় শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী। ট্রেনে উঠেই নিজ নিজ আসন দেখে ফেটে পড়েছেন এঁরা ! আহ্লাদে নয়, রাগে। আর সেই ক্রোধাগ্নির দাহিকাশক্তি যে কেরোসিনের চাইতে কিছু কম নয়, সেটা টের পাচ্ছেন মাইতি মশাই। কারণ চৌদ্দটি মিহি ও মোটা কণ্ঠতূণ হতে যে বাক্যবাণগুলি বর্ষিত হতে শুরু করেছে তার লক্ষ্যস্থল একা মাইতি মশাই।

মাইতি মশাই সর্তভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। 'কুপে' প্রার্থী সপ্তদম্পতি দেখছেন 'কুপে' কোথা ? 'কুপে' নেই। দুটি চার-ব্যর্থ ও একটি ছয়-বার্থ কামরায় মাইতি মশাই তাঁদের ভাগ করে গুছিয়ে ফেলেছেন।

এতেও যদি মানুষে, মানে মানুষের মত মানুষে, বার্স্ট না করে, করবে কি সন্দেশ খাওয়ালে?

"চালাকি?"

"জোচ্চুরী!"

"ইয়ার্কি পেয়েছ?"

"চিটিংবাজি!"

"পেপারে লিখব!"

"ব্যবসা ঘুচিয়ে দেব।"

"যাব না! নেবে যাব! টাকা ফেরত চাই, টাকা!"

"এমন জানলে কোন্ '—' এ ফাঁদে পা দিত।"

"আগেই ভেবেছিলাম স্রেফ ভাঁওতা।"

বগিটা প্রথম শ্রেণীর! ধরে নিতে হবে, আরোহিবর্গও তাই! কিন্তু রাগের সময় সে-কথা মনে রাখলে চলে না!

মাইতি মশাই অন্যান্য আরোহিদের ভুলে করজোড়ে এবং গলকোঁচায় তিনটি কামরায় অবস্থিত এই সপ্ত দম্পতির কাছে ছুটোছুটি করছেন, এবং কাতর বচনে বার বার যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তার সারার্থ এই—

এ-ব্যবস্থা সাময়িকমাত্র। বহু চেষ্টাতেও হাওড়া থেকে ঠিকমত গাড়ি তিনি জোগাড় করে উঠতে পারেননি, একটা রাত আর একটা বেলা ধৈর্য ধরে থাকুন এঁরা। কাল সন্ধ্যায় অমুক জংশনে নিশ্চয় বগি বদল করে দেবেন। যদি না দেন······ইত্যাদি।

কিন্তু সর্তভঙ্গকারীর কথা কে এখন বিশ্বাস করবে? গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, এখন তো এনারা মাইতির এক্তারে। কাজেই মাইতিমশায়ের কাতরকণ্ঠ কোথায় তলিয়ে যায়, অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে, "রেখে দিন মশাই ও সব কথা! ও রকম চিটিংবাজি ঢের দেখেছি।"

অবশ্যি এঁদেরই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে?

এঁরা তো আর যেমন তেমন করে শুধু তিথি করবেন এ-মনোভাব নিয়ে আসেননি। সে যারা আসে, তারা থার্ডক্লাস ট্রেনে গুড়ের নাগরি ঠাসা হয়ে কি ঝুলতে ঝুলতে যেতে পারে। তাদের কথা বাদ দাও। এঁরা—রথ দেখবেন কলা বেচবেন, উভয় উদ্দেশ্যে খরচ করেছেন মুঠো ভরে। এদের দাবি জোরালো হবে বৈ কি!

তা ছাড়া আগে সর্ত করিয়ে নিয়েছেন।

আরে বাপু এই সব কেষ্ট-বিষ্টু লোককে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই যদি না করে দিতে পারবি, তবে লিখেছিস কেন "সর্ববিধ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য?" এঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের মান জানা আছে তোর?

কতজনের কত খুঁটিনাটি অভ্যাস!

'কুপে' না হলে চলে? অ্যাড্‌ভোকেট-গিন্নীর সায়াটিকা, তাঁর রাত্রে বিছানায় হটওয়াটার-ব্যাগ চাই, জজ-গিন্নীর গাউট্, তাঁকে দৈনিক পারগেটিভ নিতে হয়।

ফেসর-গিন্নীর হাই প্রেশার, রাত্রে ঘরে আলো জ্বললে 'মারা' যান, ডাক্তার-গিন্নীর ভূতের ভয়, আলো নিভোলেই তিনি আঁতকে ওঠেন। লোহার কারবারী বাঁড়ুজ্যে মশায়ের-গিন্নীর দু' ঘণ্টার কমে পুজো হয় না, জমিহারা জমিদার-গিন্নীর চব্বিশ ঘণ্টা পান নইলে চলে না। সর্বোপরি চৌধুরী-গিন্নীর শুচি-বাই! তিনি ছাড়া জগতের সবাই 'মেলেচ্ছ' এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

কর্তারাও কিছু একেবারে নিরপরাধ নন।

কারো হার্ট-ট্রাব্‌ল, কাউকে দিনে রাতে এগারো বার হজমের ওষুধ খেতে হয়, কাউকে প্রত্যহ ইনসুলিন্ নিতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-সব ব্যাপারে নিজস্ব এলাকা না থাকলে চলে? এক-আধদিন নয়, পঁচিশ দিন থাকা।

গাড়ি চলতে থাকে।

করিডরের সুবিধেয় এ-কামরা ও-কামরায় আনাগোনা চলতে থাকে। কাজেই সমালোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। তা ছাড়া সপ্তযুগল একই ব্যথার ব্যথী। অন্য সময়ে কেউ কাউকে ডেকে কথা কইতেন কি না সন্দেহ। কারণ কারো নাকই তো কম উঁচু নয়! কথা কওয়ার ভয়ে সহযাত্রীর মুখ আড়াল করে বসে থাকতেন এক-একখানা বই কাগজ ধরে। কিন্তু চোর-ঠেঙানোর ক্ষেত্রে ও অপরের সমালোচনার ক্ষেত্রে বাঙালী জাতি যে অপূর্ব একাত্মবোধের পরিচয় দিতে পারে, পৃথিবীর যে-কোনো জাতির কাছে তা দুর্লভ।

"আমাদের এতগুলো লোকের গালে চড় বসালে লোকটা।" সনিশ্বাসে বললেন বাঁড়ুজ্যে মশাই।

"বসাক!" অ্যাডভোকেট বলেন, "টের পাবেন বাছাধন। ওর নামে আমি কেস্ করব।"

প্রফেসর বঙ্কিম কটাক্ষে বললেন, "সাধে কি আর বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি! কাগজে একটা হুজুগ দেখলেন তো অমনি ছোটো তার পেছনে।"

ওদিক থেকে সরোষ উত্তর এল, "পুরুষের বুদ্ধিই বা কী জোরালো! ভালো করে খোঁজ করতে বলিনি আমি? বলিনি 'কুপে'র কথাটা লিখিত্-পড়িত্ করে নিও।"

বলেছিলেন তিনি, করেও ছিলেন প্রফেসর, কিন্তু না দিলে?

'কুপে'র অভাবে কার কী অসুবিধে সে-কথা আর ফুরোতে চায় না। কখনো উদারায়, কখনো মুদারায়, কখনো তারায়! শুনলে মনে হতে পারে, 'কুপে' ছাড়া যে রেলে চড়া যায়, এ যেন ওঁরা ভাবতেই পারেন না।

তাই যতক্ষণ না এঁদের ঘুম পায়, প্রৌঢ় মাইতি মশাই সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মত, এই সপ্তদম্পতির বাক্যবাণে ঝাঁজরা হতেই থাকেন। ঝানু ব্যবসাদার, তাই এহেন গঞ্জনাতেও মেজাজ হারান না। বা শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন না রেল-কোম্পানি এনাদের মাতুল কি না, এবং নিজেরা নিজেরা ভ্রমণে বেরোলে এই মামার বাড়ির আবদারটি খাটত কি না।

না, সে প্রশ্ন করেন না ভদ্রলোক! এই করে মাথার চুল পাকালেন, মাথার রক্ত ঠাণ্ডা বরফ। তিনি সামনে—মা 'লক্ষ্মী' ও 'বাবা নারায়ণ'দের আগামী

সন্ধ্যা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে বলেন। অমুক জংশনে গাড়ি মজুত আছে। সাতখানি 'কুপে' সম্বলিত বগি!

দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুশোকও লোকে সময়ে ভোলে।

অনেক রাত্রে ঝড় থামে। বিরক্ত চিত্তে রাত্রের আহার সমাধা করে যে যার আসনে অঙ্গ ঢালেন।

এই সপ্তদম্পতি ছাড়াও অবশ্য অপর খদ্দের আছে মাইতি মশাইয়ের। অপর আরোহী। পাশের একটি ছয়-বার্থ কামরায় আশ্রয় নিয়েছেন সপুত্রকন্যা দত্ত মশাই। 'জনসন' কোম্পানির বড়বাবু।

এ-পাশের চার বার্থে সস্ত্রীক শিল্পী আর কবি। তারও ও-পাশে আড়তদার নিমাই হাজরা রয়েছেন দুই ছেলে ও এক ভাগ্নে নিয়ে। আরো ওধারে মাইতি মশাই নিজে এবং জনতিনেক কর্মকারী।

সে যাক, অপর আরোহীদের এ-গাড়িতে কোনো মর্মব্যথা নেই, তাঁরা এই কৌতুকাভিনয়ের দর্শকমাত্র।

পাশের কামরাগুলি থেকে তারস্বরে উত্থিত 'কুপে কুপে' আর্তনাদ এঁদের কানে গেছে। বড়বাবু-গিন্নীর কাছে দ্রাক্ষা ফল অম্ল। তিনি মেয়ে-ছেলের কান বাঁচিয়ে জনান্তিকে বলেন, "এতই যদি 'ইয়ে', তো বাড়ি ছেড়ে আসা কেন বাপু? বাড়িতে কি নিজের নিজের ঘর ছিল না? ছিঃ!"

কবি আর শিল্পী আপন বুদ্ধিমাহাত্ম্যে উজ্জ্বল মুখে বলে, "ভাগ্যিস আমরা একটা ফোর বার্থের কথা আগেই বলে রেখেছিলাম তা নইলে দিত আর কারো সঙ্গে ঠেলে। তা হলেই হয়েছে আর কি!"

কবির বৌয়ের জন্মকর্ম সবই কলকাতায়। এতাবৎ কালের মধ্যে সে রেলে গিয়েছে এদিকে চন্দননগর, ওদিকে রানাঘাট! মামার বাড়ি আর পিসির বাড়ি। 'কুপে' রহস্য তার অজ্ঞাত। প্রশ্নোত্তরের মারফতে রহস্য বুঝে ফেলে নাক কুঁচকে বলে, "এঃ! সে কী বিশ্রী! আমরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পেতাম না? 'একঘরে' হয়ে বসে থাকতাম? সে কেমন হত ভাই?"

শিল্পীর বৌ সায় দিয়ে বলে, "তা সত্যি! সে কিছু মজার নয়।"

মহোল্লাসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দুই বন্ধু আপার বার্থে ওঠে, দুই বান্ধবী সেই মজার দৃশ্যে খানিকক্ষণ হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে অবশেষে ঘুমোয়।

রাত্রি-প্রভাতে দুঃখার্তদের নতুন করে শোক উথলে ওঠে বাথরুম-প্রসঙ্গে। 'কুপে'র প্রধানতম সুখ যে নিজস্ব বাথরুম! সুখীরা জানলায় উঁকি ঝুঁকি মেরে পাহাড় দেখছে।

পাহাড় দেখবার স্পৃহা প্রতারিতদের নেই।

তবু সকালের চায়ের পর মেজাজের পারা কিছুটা নামে। মাইতি মশাইয়ের মুণ্ডপাত ছাড়াও—'প্রেশার' 'সুগার' 'সায়াটিকা' 'গাউট' ইত্যাদি মূল্যবান বিষয় নিয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলে। আর এই সময় ও-ঘর থেকে মেয়ে দুটো বড় একটা প্লেটে বোঝাই গোলাপী রেউড়ি নিয়ে এ-ঘরে এসে দাঁড়ায় যেন আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে। কোন স্টেশনে যেন কিনেছে।

"খান আপনারা! যত পারেন।"

জজ-গিন্নী বলেন, "ওমা, এত কিনেছ কেন? মোটে তো চারজন লোক তোমরা?"

ওরা হেসে বলে, "বারে, একলা খাব বুঝি? সবাই মিলে খাব। কী মজার গাড়ি বলুন তো? কেমন বারান্দা দেওয়া! বাড়ির মত এ-ঘর ও-ঘর করা যায়। নিন, তুলে নিন।"

চৌধুরী হেসে বলেন, "এ সব খাওয়ার বয়েস কি আছে বাপু আমাদের?"

"কেন নেই? বাঃ! সব্বাইয়েরই তো চমৎকার দাঁত রয়েছে!"

কথাটা শুনে কারো কারো মুখের উপর কি একটা মেঘের ছায়া ভেসে যায়? বোঝা যায় না, তবে রেউড়ি অল্পবিস্তর সবাই তুলে নেন। ভারী হাসিখুশী মেয়ে দুটি, এক কথায় মন কেড়ে নেয়। কারো বা নাতনীর বয়সী, কারো বা মেয়ের। জড়তা আসে না কোনো পক্ষেই। খানিক গল্প করে উঠে যায়। বলে, 'ও ঘরে যাই! যাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দেখলাম।"

"বেশ মেয়ে দুটি।" একবাক্যে সবাই রায় দেন।

অবশেষে দুপুর গড়িয়ে বিকেল।...বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা!

মাইতি মশাইয়ের 'অমুক জংশনে' এসে গাড়ি থামে।

মাইতি মশাই করজোড়ে বলেন, "বগি বদল করতে হবে, অনুগ্রহ করে নামুন সবাই।"

তবু বিশ্বাস হতে চায় না।

মৃদু গুঞ্জন ওঠে, "আচ্ছা দেখা যাক! ফেরত গাড়ি ত পৃথিবী থেকে উঠে যায়নি।"

চৌধুরী-গিন্নী সগর্বে বলেন, "টাকার ধার ধারি না! এক হাজার গেছে, আরো নয় দু হাজার যাবে। তাই বলে পাঁচজনের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে পারব না।"

কিন্তু এত আস্ফালন মুহূর্তে নিস্তেজ।

গাড়ি দেখে আগুনে জল। সাপের মাথায় ধুলোপড়া! সারি সারি সাত-খানি 'কুপে' সম্বলিত বগিখানি অপেক্ষা করছে তাঁদেরই জন্যে। এদিকে ওদিকে চার-বার্থ ছয়-বার্থের কামরাগুলো।

মাইতি মশাই আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলেন, "কেমন, বলিনি ভাল গাড়ি দেব? এমন গাড়ি এ-লাইনে দ্বিতীয় পাবেন না। দেখুন, দুটোই লোয়ার-বার্থ। বেছে বেছে এই আটহাজার চৌদ্দ নম্বরের গাড়িটির জন্যে দরখাস্ত করে রেখেছিলাম! এতগুলো 'কুপে' রেলকোম্পানি কি সহজে দিতে চায় মশাই।"

শ্রোতাদের মুখে কৃতজ্ঞতার 'হেঁ হেঁ' হাসি!

আর বলার কিছু নেই। দুটোই লোয়ার-বার্থ! আহা! এঁদের যে আপার-বার্থ আরোহণ পর্বতারোহণের তুল্য সেকথা কি বুঝেছিলেন মাইতি মশাই!

কেউ কেড়ে নেবে না; তবু ছুটোছুটি করে উঠে পড়েন সবাই—সায়াটিকা আর গাউট, হার্ট-ট্রাবল আর হাই প্রেশার ভুলে। শুধু চৌধুরী মশাই প্লাটফরমে

দাঁড়িয়ে তদারক করতে থাকেন সকলের সব জিনিস ঠিক উঠল কিনা। এ-গাড়িতে করিডর নেই। এদিক ওদিক হয়ে গেলে মুশকিল।

সময় অনেক ছিল। ধীরে-সুস্থে সকলের মালপত্র তোলা হয়। কারিৎ... গিন্নীরা মুহূর্তে সংসার গুছিয়ে ফেলেন। হুকে আংটায় ছাতা-লাঠি, গরম জলের ব্যাগ! শেলফে ওষুধের শিশি, গঙ্গাজলের বোতল, পানের ডিবে, জর্দার কৌটো। দুদিকে দুটি বিছানা ভাল ভাল সুজনি ঢাকা। ঝালর দেওয়া বালিশ!

"উঠে পড়, উঠে পড়, ঘণ্টি দিয়েছে!"

চৌধুরী মশাই তাড়া দেন তরুণতরুণী চারটিকে। যারা প্লাটফর্মে বেড়াচ্ছিল আর বার'বার অন্যমনস্কের মত তাকাচ্ছিল সাজানো কামরাগুলির দিকে।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে চৌধুরীর কেমন অপ্রতিভ লাগে। ছেলে দুটিকে 'আপনি' বলবেন কি 'তুমি' বলবেন বুঝতে না পেরে মেয়ে দুটিকে বলেন, "ইয়ে, তোমরা এরকম গাড়ি নিলে কেন? 'কুপে'র জন্যে বলে রাখলে পারতে।"

মেয়ে দুটে অসহায় চোখে নিজের নিজের স্বামীর মুখের দিকে চায়।

আর গতকাল যারা আপন বুদ্ধিমত্তায় গৌরবান্বিত ছিল, তারা আরো অসহায়ভাবে একটু ফিকে হাসি হেসে কী একটা বলে গাড়িতে ওঠে। বোধহয় বলে, "দুই বন্ধুতে একসঙ্গে থাকব বলেই—"

কবে যেন কোথায় পড়েছিলাম, এ-জগতে সবাই স্বার্থপর, সহানুভূতিহীন কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। সহানুভূতি কার শরীরে নেই!

আমি তো দেখছি সকলের হৃদয় মমতায় ঠাসা।

রাত্রে শোবার আগে দাঁতের পাটিটি টুপ্ করে, কাঁচের গ্লাসের জলে ফেলে চৌধুরী বলেন, "যাই বল, আমার কিন্তু মেয়ে দুটোর মুখ দেখে ভারী মায়া লাগছিল! এমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল আমাদের কামরার দিকে!"

চৌধুরী-গিন্নী বলেন, "সত্যি! বেচারীরা ছেলেমানুষ, সবে বিয়ে হয়েছে, মন খারাপ তো হতেই পারে। আমাদের তো অন্য কিছুই নয়। শুধু এই নিজের বাতিকের জ্বালায়"—

প্রফেসার প্যাণ্ট ছেড়ে লুঙ্গি জড়াতে জড়াতে বলেন, "মাইতি মশাইয়ের এটা কিন্তু খুব অন্যায় হয়েছে। এতগুলো 'কুপে', অথচ ওরা ছেলেমানুষ, একটা পেল না। আমাদের তো অন্য কিছু না, শুধু তোমার শরীরটার জন্যেই ভাবনা"—নইলে······কই কাঁচের গ্লাসটা?"

ডাক্তার-গিন্নী 'রামনাম' লেখা কাগজটুকু বালিশের তলায় গুঁজতে গুঁজতে বলেন, "আচ্ছা ওরা অত বোকা কেন বলতো? আগে থেকে 'কুপে'র কথা বলে রাখলেই পারত!"

"জানে না, ছেলেমানুষ!" ডাক্তারবাবু দয়ার্দ্রকণ্ঠে বলেন, "আমরা এই বুড়োহাবড়ারা যে যার 'কুপে'য় উঠে পড়লাম, আর ওরা ঘুরে বেড়াতে লাগল দেখে লজ্জাই করছিল। মাইতি মশাই একটু বিবেচনা করে ভাগ করতে পারতেন। বাটিটা কোথায় রাখলে?"

বাঁড়ুয্যে-গিন্নী কর্তার কথার উত্তরে বলেন, "আমার তো অন্য কিছু নয়, শুধু ওই পুজোটুকুর জন্যে। তবু তো গুরুদেবের কথামত কিছুই হয়ে ওঠে না আর কেউও তো স্বার্থ ছাড়ল না বাপু! যাদের পুজো পাঠ নেই, তাদের আলাদা ব্যবস্থার দরকারই বা কী, বুঝি না!"

জজ মশাই বলেন, "যাই বল, আমার কিন্তু সত্যিই ভারি ইয়ে হচ্ছিল। বেচারাদের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। দেখলে তো এতক্ষণ কী ফুর্তি? আর এখন যেন মচ্ছিভঙ্গ হয়ে গেছে! নেহাত তুমি রাগ করবে তাই, নইলে আমাদেরটা ছেড়ে দিতাম।"

"একটায় ওদের কী হবে?" নীরস স্বরে বলেন জর্জগিন্নী, "মাইতি বুড়োবই বা কী আক্কেল! যত চুলে-কলপ, টেকো বুড়ো, বাঁধানো-দেঁতোদের জনে জনে 'কুপে' দিলি, আর ছেলেমানুষ কটাকে পুরে দিলি একটা ঘরে? এই বাইশ-চব্বিশ দিন বেচারারা—আমার তো অন্য কিছুর জন্যে নয়, শুধু রোগের জ্বালাতেই—"

অতএব জগতের সবাইকে স্বার্থপর বা সহানুভূতিহীন বললে মানুষের প্রতি অবিচার করা হয়।

যাদের নিয়ে এত দরদ, মানে যাদের বাত, শুচিবাই, গুরুমন্ত্র, সায়াটিকা, হার্টট্রাবল, ইত্যাদি দরকারী জিনিষ কিছু নেই, আছে শুধু 'অন্য কিছু'—তারা চারজনে মুখোমুখি অনেকক্ষণ বসে থাকে চুপচাপ।

গাড়ির শব্দে ওদের নিজেদের কথা যেন হারিয়ে গেছে।

অনেক রাতে দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফিকে মার্কা হাসি হেসে বলে, "তা হলে শুয়ে পড়া যাক?"

"যাক!"

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নয়, ধীরেসুস্থে আপার-বার্থে ওঠে তারা। তরুণীযুগল আজ আর ওদের এই আরোহণে মজা খুঁজে পায় না।

দুজনে আপন আপন সীটে বসে থাকে জানলা খুলে, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

কে জানে কী ভাবে।

হয়তো ভাবে পঁচিশের দুই গেল।

আর কোথাও কোনখানে অনিদ্রার পালা নেই। এ-ঘরে ও-ঘরে। সে-ঘরে সবাই ঘুমে পাথর।

গাড়ি ছুটছে দুরন্ত বেগে, পাল্লা দিয়ে বইছে নাসিকা-ধ্বনি। ঘরে ঘরে দাঁতের পাটিরা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে জলের তলায় পড়ে। কেউ কাঁচের গ্লাসে, কেউ প্লাস্টিকের বাটিতে। সারাদিনে অনেক দেঁতো হাসি হাসি বেচারারা, 'মিষ্টি হাসি' 'স্নিগ্ধ হাসি' 'ব্যঙ্গ হাসি' 'তিক্ত হাসি' 'উদার হাসি' 'অনুকম্পার হাসি।'

এই ঘণ্টা কয়েকের জন্যে শুধু ছুটি মেলে!

সচরাচর

এ গল্প আমার নয়, দ্বিজেশ উকিলের।

দ্বিজেশ উকিল বলেছিল—গল্পের প্লট চাও তো আমাদের কাছে এস। আমাদের নথিপত্রের ভেতরে অনেক রংদার গল্প পাওয়া যায় হে! ও তোমাদের বানানো গল্প তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। এই তো সেদিনকে—একটা বেহারী ছোকরা আর একটা বাঙালী মেয়ে—

সবিনয়ে বলেছিলাম—বেহারী-বাঙালীর গল্প থাক দ্বিজেশ, তুমি বরং শুধু বাঙালীর গল্পই বল।

দ্বিজেশ মুচকে হেসেছিল—ও, তুমি যে আবার ভারি নীতিবাগীশ। মনে ছিল না। তবে থাক, আমার একজন পরিচিত লোকের একটা ব্যাপাব বলছি শোন। তারপর এ-কথা সে-কথার পর বলেছিল গল্পটা। গল্প তো নয় সত্যি ঘটনা। শুধু নাম ধামটাই পাল্টে বলেছে।

মাঝারি গোছের একটা মফস্বল শহরে ছিল ওরা। ধরে নাও—শৈলেন আর সরযূ। নিঃসন্তান দম্পতি। ভালবাসাবাসি করে বিয়ে ওদের নয়, মা বাপে ধরে দেওয়া বিয়েই। কিন্তু কূল উপছে পড়া ভালবাসার সাগরে ভাসত দুজনে।

বিয়ের সাত আট বছর পরেও যে এমন আবেগ-সমৃদ্ধ ভালবাসা বজায় থাকতে পারে, সে কথা ওদের নিজে চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

দ্বিজেশ বলল—হ্যাঁ তখন আমি '———'তেই প্র্যাকটিস করতাম।···

বাড়ির গিন্নী রেগে গেলেই ওদের ভালবাসার নজীর তুলে ধরে খোঁটা দিতেন আমাকে। বোধ হয় পাড়ার সব গিন্নীরাই তাঁদের কর্তাদের দিতেন। কারণ শৈলেনের দিক থেকে যেন আবেগটা ছিল বেশি প্রবল।

আমি স্টাডি করে দেখেছিলাম লোক-দেখানো আদিখ্যেতা সে নয়, সত্যিকার গভীরত্ব ছিল। একবার বুঝি সরযূ ওর বোন না কার অসুখ শুনে কলকাতায় চলে এসেছিল চার-পাঁচ দিনের জন্যে, শৈলেন কাজের খাতিরে আসতে পারে নি। বললে বিশ্বাস করবে না, লোকটা এই চার পাঁচ দিন ভাতই খেল না। রাঁধুনীটাকে ছুটি দিয়ে শুধু চা বিস্কুট খেয়েই কাটিয়ে দিল।

আমাদের কোর্টেই কাজ করত। কার মুখ থেকে কার কানে কথা যায়, সকলে ক্ষেপিয়ে মারতে লাগল—"শৈলেনবাবু বিরহে অন্নজল ত্যাগ করেছেন—" তাতে লজ্জাও নেই সরমও নেই।

কটা দিন পরে বৌ ফিরল, হতভাগা যেন বাঁচল। মনের আনন্দে সেদিন সক্কলের চায়ের দাম মিটিয়ে দিল নিজের পকেট থেকে।

কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের ক্রূরতা মানুষকে কখন একটানা স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। এ হেন একটি সুখী দম্পতির শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনটুকু বোধ করি চক্ষুশূল হল তাদের। তাই তাদেরই চক্রান্তে সেই জীবনের উপর এল এক কুৎসিত বিপর্যয়!···সেই কথাই বলছি।

সময়টা ছিল বোধ হয় শীতকাল, কিন্তু, দু-তিন দিন ধরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থেকে সেদিন সকাল হতে টিপি টিপি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। একেই মফস্বলের শীত, তার উপর আবার বর্ষা। সোনায় সোহাগা।…হাড়ের মধ্যে যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

সকলেই সকাল সকাল ফিরব ঠিক করে বেরোবার আগে চা-টা জুৎ করে খেয়ে নিচ্ছি, হঠাৎ দেখি শৈলেন উঠে দাঁড়িয়ে বলছে—'আমি চললাম'!

—সে কি হে, চা খেয়ে যাবে না?

—নাঃ! আমার মনটা কেমন ভাল লাগছে না। আপনারা খান আমি যাই।

আমরা ঠিক করেছিলাম শেয়ারে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে যে যাব আস্তানায় ফিরব। কারণ হাঁটবার দিন সেটা নয়। কাজেই শৈলেনের একা চলে যাওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করলাম না কেউই।

সবাই বলতে লাগল বাতিকটা একটু কমাও হে শৈলেন, বৌ আর কার নেই? ভালবাসাবাসিও অল্প-বিস্তর সকলেরই আছে হে। তোমার মত এত বৌ-পাগলা তো কেউ নয়। এই রকম বৌ-পাগলাদের বৌ-ই ঘর ভেঙে পালায়।"

সামান্য পরিহাস। কিন্তু শৈলেনের মুখখানা যেন পাঙাশ হয়ে গেল। চুপ করে বসে থাকল একখানা চেয়ারে। কিন্তু মনে হতে লাগল কে যেন ওকে এখানে বেঁধে রেখেছে। মুখে আসছিল বলি—"শৈলেনের দেহটাকে তো আটকে রাখা হয়েছে, কিন্তু বেচারার দেহাতীত আত্মাটি বোধ হয় "আনারবাগের" সেই ছোট্ট হলদে একতলা বাড়ির খানায় পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।

বললাম না। বয়সে বড্ড তফাৎ। তাছাড়া—পদমর্যাদায় তো তফাৎ আছেই বিলক্ষণ।—ও হল কোর্টের কেরাণী।

যাই হোক আমাদের আড্ডা ভাঙল। দুটো গাড়ি নিয়ে পাড়া বুঝে গাড়ি ভর্তি করা হল। শৈলেন আমার পাড়ার, ও আছে আমারই পাশে। আরও কে কে যেন ছিল।

বেলা বোধ করি তখন সাড়ে তিনটে। বৃষ্টিটা ধরেছে, কিন্তু আকাশ থম্‌থমে অন্ধকার। পথে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। গাড়িটাও চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে। ঘোড়াটার উপর মায়া করে কিছু বলছি না।

হঠাৎ যেই মাত্র গাড়ি 'আনারবাগে'র কাছাকাছি এসে মোড় নিয়েছে—দেখি একটা ঝি-গোছের মেয়েলোক শখের যাত্রার তাড়কা রাক্ষুসীর মত দুহাত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে শৈলেনও কি রকম যেন একটা চীৎকার করে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলা বাহুল্য গাড়িও থামল।

—"ব্যাপার কি হে?"

—"আমার বাড়ির ঝি!"

ততক্ষণে ঝিটা কাছে এসেও গেছে।

ঝিটার অসংলগ্ন 'হাউ হাউ' থেকে পাঠোদ্ধার করে যা বুঝলাম তা হচ্ছে এই,

সে যথারীতি কাজ করতে এসে দূরে থেকে দেখছিল দরজা হাট করে খোলা। এঃ
অসাবধানতার জন্যে মনিব-গিন্নীকে বকবে বলে যেই তাড়াতাড়ি ঢুকেছে দেখে
দরজার কাছেই গিন্নী আর অদূরে একটা ডাকাতের মত দেখতে দস্যি জোয়ান
লোক মরে পড়ে আছে। মাথাটা তার একদম চৌচির। রক্তে ভেসে যাচ্ছে উঠোন

ঝিটা বলতে বলতে দু হাতে চোখ ঢেকে বলে—"বাবু গো সে কি দিশ্য।"

আশ্চর্য! এই জন্যেই কি শৈলেন অমন হয়ে উঠেছিল?…তাই কি ওর মন
বলছিল একটা কিছু ঘটেছে!

যাই হোক সে দৃশ্য আমরাও দেখলাম!

ঘটনাটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হল না। শৈলেনের স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে থাকা
সত্ত্বেও অনুমানেই বোঝা গেল।

বদমাইসটাকে চিনতামও আমি—দ্বিজেশ উকিল হাসল—দুনিয়ার যেখানে
যত বদমাইস আছে তাদেরই তো চিনছি জীবন-ভোর! জগতে যে কোথাও
কোন ভাল লোক আছে, এ আর বিশ্বাস হয় না। হুঁ কি বলছিলাম—কি যেন
নাম ছিল লোকটার মনে নেই, বিড়ি পাকানো ছিল পেশা। অবশ্য ওটা বাইরের
ভেতরের পেশার খবর ছিল আমাদের খাতায়। ওর বহু দুষ্কর্মের ইতিহাস
সযত্নে তোলা ছিল সে খাতায়। সে যাক—শাস্তিটাও পেয়েছে তেমনি শোচনীয়

জ্ঞান হতে সরযু বলল—বসে থেকে থেকে শীত ধরে যাচ্ছিল বলে ভেবেছিল
কাঠের উনুন জেবলে একটু চা তৈরি করে খাবে। ঘর থেকে বেরোতেই দেখে
পাঁচিল টপ্‌কে উঠোনে নামছে লোকটা।

দেখেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল তার, আর—ভয়ঙ্কর একটা ভং
কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে, দালানে দাঁড় করিয়ে রাখা বাটনাবাটা শিলের মোটা
নোড়াটাকে দু হাতে ধরে ছুঁড়ে মেরেছিল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে। তারপর
ওর চৈতন্য জগতে আর কিছু ছিল না। শুধু জ্ঞানশূন্যতার একটা ধোঁয়াটে
অন্ধকারের মধ্যে ঝলসে উঠেছিল একটা রক্তের ঢেউ।…

দবজা খুলে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা যদি সে করে থাকে, অজ্ঞানেই
করেছে।

তারপরই বুঝতেই পারছ?…দ্বিজেশ উকিল বলে—দিন দুপুরে খুন! তা
আবার—খুনী একটি ছাব্বিশ বছরের তরুণী। ছোট্ট মহকুমা শহরটা যেন
ভিৎসুদ্ধ দুলতে লাগল!

ভেবেছিলাম এ খুনকে খুন বলে গণ্য করা হবে না। তাছাড়া আমরা আছি।
কিন্তু—কে জানত একটা বদ-স্ত্রীলোক হতভাগাটার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে—
মামলা লড়বে।

আর কিছু নয়, উকিল মুন্সেফের কারসাজি! ওই করতেই তো আছি
আমরা! আগুনকে নিভতে দিই না. ইন্ধন দিয়ে জীইয়ে রাখি! যাই হোক—
সেই শয়তানী যে মুরগীর ডিম বেচত তা জানতাম না। ও এই বলে মামলা

চুকল—ডিমের দর করতে সরযূ না কি ওর সোয়ামীকে ডেকেছিল, দরে বনে নি বলে রাগের বশে হাতের কাছে যা পেয়েছে ছুঁড়ে মেরেছে !

এতক্ষণে আমি একটা কথা বলি। বলি—এমন গল্পও আদালতে ওঠানো যায় ?

—আদালতে ? হেসে ওঠে দ্বিজেশ—আদালতে যে রকম গল্প ওঠানো যায়, সে তোমাদের গল্প-লেখকদের ধারণার বাইরে, কল্পনার সীমা থেকে অনেক অনেক দূরে। তা নইলে আর এদের এই হাস্যকর গল্প হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায় ? উঃ সেই মামলার সময় যদি শৈলেনকে দেখতে। যেন উন্মাদ পাগল ! হাজার রকম কথা কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছে। কেউ বলছে ফাঁসি হবে, কেউ বলছে দ্বীপান্তর হবে, কেউ বা কমিয়ে বলছে—অন্তত পাঁচ সাতটি বছর জেল।

দিশেহারা শৈলেন কেবল আমাদের হাতে পায়ে পড়ছে। যে করে হোক সরযূকে বাঁচাতে হবে। শুধু প্রাণে বাঁচাই নয় মানসম্ভ্রম নিয়ে পাঁচজনে কথা বলছে, সরযূ মরমে মরে আছে, এ আর ও সহ্য করতে পারছে না।

কেবল বলে—আদালতে বলব আমি খুন করেছি। আরও অনেক পাগলামির কথাই বলে। অবিশ্যি মাথার ঠিক থাকাও শক্ত ছিল। সত্যি বলতে—খুনী স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী প্রাণপাত করে লড়ছে, এ কেস হামেশাই আমাদের হাতে আসে। কিন্তু এ রকম উল্টো কেস কোন ভদ্র ঘরে—তাও রাজা জমিদার নয়, সেরেফ মাছিমারা কেরাণীর ঘরে—বড় একটা দেখা যায় না।

যাই হোক শৈলেনের ব্যাপারটায় এমন কিছু বাহাদুরি ছিল না, যে কোন স্বামীই এক্ষেত্রে ভিটে-মাটি বেচে, কাবলীওলার কাছে ধার করে যে প্রকারে হোক মামলা লড়তই। শৈলেনও তাই করেছে। তার বেশি কিছু করে নি।

অধিকন্তুটা হচ্ছে তার মরীয়া অবস্থাটা ! বেশ বোঝা যেত দরকার হলে ও সরযূর জন্যে নরকে যেতে পারে, বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে।

আড়ালে ছেলেছোকরারা ঠাট্টা করে বলত—'মন্দা সাবিত্রী।' কথাটা সত্যি, সাবিত্রীর মতই বোধ করি জীবন পণ করেছিল সে। বিপদের মুখ থেকে, দুঃখের মুখ থেকে, অপমানের মুখ থেকে, স্ত্রীকে রক্ষা করতে সে সব করতে প্রস্তুত।

সরযূকৃত এই খুনটাকে অবশ্য কেউই ঘৃণার চক্ষে দেখে নি ! পাড়া-পড়শী মহিলারা পর্যন্ত না ! ওভাবে বিপদমুক্ত না হলে সরযূর কী সর্বনাশ ঘটতে পারত সেকথা ভেবে শিউরে উঠেছে সবাই ! তাই—তার কাজকে সমর্থন না করে পারে নি কেউ। এ তো আর নরহত্যা নয়, আত্মরক্ষা ! আত্মার সম্ভ্রম রক্ষা।

আমার গিন্নী কথা উঠলেই বলতেন—"ভাগ্যিস হাতের কাছে পাথরটা ছিল !" অর্থাৎ এটা সরযূর পক্ষে ভাগ্যের কৃপাই।

জামিনে খালাস ছিল সরযূ। মামলা হাইকোর্টে উঠতে কলকাতায় আসতে হল। যেদিন আদালতে তার ডাক পড়ত, ও পক্ষের জেরার মুখে পড়তে হত, সেদিন যদি শৈলেনের যন্ত্রণা দেখতে ! খালি ছটফট করত আর বলত—দ্বিজেশদা,

ও মরে যাবে। নিশ্চয় মরে যাবে। এত লাঞ্ছনা সয়ে আর বাঁচবে না ও।

—আর সরযূ? আমি বলি।

—তাঁর আবার উল্টো ব্যথা! সে বলত "ফাঁসিই যাই, আর জেলেই যা
অনুতাপ করব না। মনে জানব ধর্ম রাখতে প্রাণ গেল! ভাবনা শুধু ও
জন্যে! আমার কিছু হলে ও কি আর বাঁচবে?" মেয়েটা বুঝলে, এদিকে বে
শক্ত ছিল। জলজ্যান্ত আস্ত একটা মানুষকে খুন করে ফেলেছে বলে যে বিশে
কোন আত্মগ্লানি অথবা মানসিক কোন অবস্থান্তর—তা দেখতাম না। সে বিষ
বলত একটা কথা—সেই ভয়ঙ্কর সময়টার কথা আমি মোটে ভাবি ন
দ্বিজেশদাদা, চোখ বুজে এড়িয়ে যাই। মনে করি সে সরযূ আর কেউ।

—এ পর্যন্ত বেশ বুঝছি, কিন্তু শেষটা কি হল তাই বল?

—হল আবার কি! হল—বেকসুর—খালাস!

—বেকসুর খালাস?

আবার কি!...হবেই জানতাম। শুধু উকিল ব্যারিস্টারদের কারসাজি
আর সেই হতভাগা মেয়েলোকটার জেদে এতটা ভুগতে হল। শৈলেনের পক্ষে
কৌঁসুলী জজকে প্রশ্ন করল, একটা ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়াতে আসছে দে
তাকে ইঁট ছুঁড়ে মারা যদি দণ্ডনীয় অপরাধ না হয়, এটাই বা হবে কেন?
জজ উত্তর দিতে পারল না। মামলা ফেঁসে গেল! বৌকে নিয়ে মহাসমারো
কালীঘাটে পুজো দিয়ে এল শৈলেন!

দ্বিজেশ নস্যির কৌটো বার করে বাঁ হাতের তেলোয় ঠুকতে লাগল।

আমি বললাম—তারপর?

—তারপর? ধীরে সুস্থে হাতের নস্যি ঝেড়ে কৌটোর মুখ বন্ধ করে পকে
রেখে দ্বিজেশ উকিল বলল—তারপর শৈলেন জেলা-শহরে ফিরে এসে বির
ভোজ দিল।...টাকা ছিল না, ধার করে দিল।...যাকে যাকে চিনত, কাউকে ব
দিল না। অনেকদিন অমন একটা বড় ভোজ হয় নি ওখানে।

আমি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলি—এটা আর এমন কি একটা গল্প হল? যে কো
সাহসী মেয়েই এই রকমই করত, বাহাদুরির কিছু নেই।

—বাহাদুরি, না সরযূর বাহাদুরির কথা তো বলছি না।...বলে দ্বিজে
পানের কৌটো বার করল। হাত বাড়িয়ে বলল—নেবে নাকি একটা?

—দাও একটা।...যাই বল তোমার গল্পে কোন বিশেষত্ব নেই।

—গল্পটা তো এখনও বলি নি—বলে দ্বিজেশ পানের কৌটোটির ঢাকা ব
করে সযত্নে রুমাল দিয়ে মুছে পকেটে রাখল।

—গল্পটা এখনও বল নি?

—না। আর একটু আছে। সেইটুকুই গল্প! তারপর—শৈলেন সরযূ
ত্যাগ করল।

—ত্যাগ করল!

—হ্যাঁ। ত্যাগ করল।

—বল কি? তার মানে? তার কি সন্দেহ হল—

—না না, সে-সন্দেহ হয় নি। বদমাইসটার হাতে সরযূ একবার পড়লে যে এ পরিস্থিতি হতে পারত না, সে তো কাঁচ ছেলেতেও বোঝে—সরযূর মান গেলে যে সে হতভাগার প্রাণটা যেত না,—এবং সরযূ নিজের প্রাণটা রাখত না এ শৈলেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল।

আমি অবাক হয়ে বলি—তবে ?

—'তবে ?' তবে হচ্ছে এই—শৈলেন বলল—খুনী স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে সে পারবে না।

—অ্যাঁ!

—হুঁ! বলল! স্পষ্টই বলল আমার কাছে—যে হাত দিয়ে ও একটা জল-জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলেছে, সে হাত দিয়ে আমার ভাত রাঁধবে, আমায় খেতে দেবে, আমার সেবা করবে এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না দ্বিজেশদা।

বলল—চমৎকার! খাঁটি প্রেমের নমুনা বটে!

দ্বিজেশ উকিল মাথা নেড়ে বলে—উঁহু, সে তুমি বলতে পার না ভায়া। ভালবাসায় ওর ভেজাল ছিল না।

—বটে ? তবে এটা কি ?

—এটা যে কি, সে কথা বোঝা ভারি শক্ত ভাই! বোধ হয় এরই নাম সংস্কার। যা দয়া মায়া স্নেহ প্রেম বিচার বিবেচনা বুদ্ধি যুক্তি—সব কিছুর চাইতে শক্তিশালী।

—তোমার একথা আমি স্বীকার করি না। লোকটা পাষণ্ড! কিন্তু মামলা তো চলছিল অনেকদিন ধরে, এ যাবৎ করছিল কি ? স্ত্রীর মুখ দেখছিল না ?

—আরে তা কেন ? দুবেলাই তো দেখছিল। তবে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে তো পায় নি, আদালতের হুকুমে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকতে হয়েছিল। তাছাড়া হতভাগার কি তখন জ্ঞানগম্যি ছিল ? মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতন, এমনি একটা নেশার ঘোরে কাটাচ্ছিল।...ভেবেছিলাম—সব মিটে গিয়ে বৌ পেয়ে হাতে স্বর্গ পাবে ছোকরা। তা নয়—হরিষে বিষাদ। অথচ সরযূকে ত্যাগ করতে ওর প্রাণ যে ফেটে যাচ্ছিল তাও বুঝতে পারছিলাম।

—হুঁ, স্বীকার করছি একটা গল্প শোনালে বটে! কিন্তু তারপর ?

—তারপর শুনতে চাও ? তারপর—মানে সরযূকে বিদায় দেওয়ার পর কিছুদিন কেঁদে কেঁদেই বেড়াল ছোকরা। তারপর হঠাৎ একদিন কাউকে বলা কওয়া নেই দুম্ করে একটা বিয়ে করে বসল। দেখেছি বৌকে, কেলে কুচ্ছিৎ একটা মেয়ে! সেই অবধি ওখানেই আছে শুনেছি। ঘর-সংসার করছে। আমি-তো তারপর চলে এলাম! অনেক চেষ্টাচরিত্র করে এখানে—

রেগে উঠে বলি—তুমি কি করলে সে কথা জানবার জন্যে কে মরছে ? সরযূ কি করল তাই বল ?

দ্বিজেশ উকিল আর একবার নস্যির কৌটো বার করে হাতের তেলোয় ঠুকতে ঠুকতে বলল—সে আমি কেমন করে বলব ? আমি তো তার গার্জেন নই যে কী করল আমায় বলতে আসবে ? বেঁচে আছে কি মরে গেছে, বেঁচে

থাকলে কোথায় আছে, সে খবর কে রাখতে যাচ্ছে বল ? যাদের যত কেস্ হাতে আসে, তাদের বাকী জীবনের সুখ-দুঃখের ভাবনাও যদি ভাবতে হয় তাহলে তো আর 'করে খেতে' হয় না।…হয়তো মেয়েটা বেঁচেই আছে। ভাই ভাজের সংসারে দাসীবৃত্তি করে খাচ্ছে…হয়তো বা সে আশ্রয়ও জোটে নি, পথেই নামতে হয়েছে।…যদি শুনি পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে খাচ্ছে, আশ্চর্য হব না। যদি শুনি অধঃপাতের তলায় তলিয়ে গেছে তাতেও অবাক হব না।

ওর এই নির্মম উদাসীনতায় সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলাম, সেইটাই ওর পক্ষে উচিত। পৃথিবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে নরকের রাস্তা বেছে নেওয়াই উচিত ছিল ওর।

দ্বিজেশ উকিল মৃদু হেসে বলেছিল—ওহে ভায়া, ওসব বড় বড় কথা হল নাটক নভেলের কথা! বাস্তব জীবনে সে রাস্তা ইচ্ছে করে বেছে নেবে। তেমন উন্মাদিনী আর কজন হয় বল ? ঘটনাচক্রের ধাক্কা খেতে খেতে শেষ অবধি নরকে পৌঁছে যায়—এই পর্যন্ত।…অবিশ্যি দুঃখের পরীক্ষায় জয়ী হয়ে সম্মানের জগতে টিঁকে যাওয়ার উদাহরণই কি আর নেই ? আছে! জগতে সবই আছে ইচ্ছে করলে ভালটাই ভেবে নিতে পার। তবে—সচরাচর যা ঘটে তাই বলছি।

[১৩৬২]

পত্রাবরণ

শনিবারটা উৎসবের দিন। এ দিনে বিকেলবেলায় রান্নাঘরের চালে ধোঁয়া দেখা যায়। গোঁসাইদের পড়োবাড়ির বাগানে খেলতে খেলতে এই ধূম্রকুণ্ডলী চোখে পড়ায় চম্‌কে উঠল পিতু।

আরে, আজ শনিবার ?

সকালে ঠাকুমা বলেছিল বটে! মনেই নেই। হাতের ধুলো ঝেড়ে পিতু বলে 'আর খেলব না ভাই। বাড়ি যাই।'

সঙ্গিনী লাবণ্য মিনতি বচনে ব'লে ওঠে, 'এখ্‌খুনি যাস নে ভাই, নক্‌খিটি আর এক দান খেলে যা।'

পিতু বান্ধবীর মিনতিতে ঈষৎ নরম হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে বিবেচনা করে অনুরোধ রাখা সম্ভব কিনা। নাঃ বেলা প'ড়ে এসেছে, কে জানে আকাশ কখন চারিদিকে সোনা ঢেলে দিয়েছে।

'না রে না, আজ বাবা আসবে। যাই ভাই।'

লাবি ঠোঁট উল্টে বলে, বাবা আসবে ব'লে অমন করিস কেন রে ?' একলা তোরই বাবা আসবে নাকি ? আমারও তো আজ বাবা আসবে। আমি তোর মতন অমন ছুটছি ?' পিতু বোধ করি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিপন্ন ভাবে বলে, 'তোর বাবা যে বুড়ো।'

'এই অসভ্য মেয়ে!' লাবু চোখ পাকিয়ে বলে, 'আমার বাবাকে বুড়ো বললি ? এই বুদ্ধি হচ্ছে ? বাবা না তোর জেঠামশাই হয় ? রোস্, তোর মাকে

'লে দিচ্ছি গিয়ে।'

যদিও লাবু এবং পিতু অভিন্নহৃদয়া, তবু কেউ কারো অপরাধ অগ্রাহ্য করতে রাজী নয়! অবশ্য জেঠামশাই-জাতীয় ব্যক্তিকে বুড়ো বলা অপরাধের মধ্যে গণ্য কি না, এ নিয়ে তর্ক তোলে না পিতু, ম্লান মুখে বলে, 'বলে দিসনি ভাই, তোর দুটি পায়ে পড়ছি। দোষ হয় জানি না, পাকা চুল দেখি, তাই—ব'লে দিবি না তো?'

ক্ষমাময়ী লাবি আশ্বাসের সুরে বলে, 'আচ্ছা বেশ, ব'লে দেব না। তার বদলে আর এক দান খেল্।'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে রে। বাবা আসবার আগে মুখ হাত ধুয়ে ফরসা জামা পরে নিতে হবে তো? লাবি হেসে উঠে বলে, 'বাবাঃ বাবাঃ! বাবা যেন আর কারুর থাকে না। একলা তোরই আছে। বাবা আসবে খেলব না, বাবা আসবে সাজবো, বাবা কি কুটুম?'

পিতু এবং লাবুর মধ্যে বয়সের তারতম্য না থাকলেও বলাই বাহুল্য বুদ্ধির তারতম্য আছে। পিতু বান্ধবীর উপহাসবাক্যে বিব্রত হয়ে গিয়ে ব'লে বসে, 'বাঃ, কুটুম হবে কেন? ছেঁড়া জামা প'রে থাকলে যে বাবা বুঝতে পারবে আমরা গরীব।'

এরপরও লাবুর হাস্যের ফোয়ারা নিষ্ক্রিয় থাকবে, এমন আশা করা চলে না। অদম্য হাসির ফোয়ারায় বান্ধবীকে প্রায় নাকানি চোবানি খাইয়ে লাবি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'উঃ বাবাঃ, কী নেকী রে তুই? তোরা গরীব আর তোর বাবা বুঝি খুব বড়লোক? তোর বাবা গরীব বলেই তো তোরাও গরীব।'

পিতু আরক্ত মুখে বলে, 'ইস্! কক্খনো বাবা গরীব নয়। দেখিস গিয়ে। কী ফরসা জামা! কত জিনিস আনে!'

লাবি মুচকি হেসে সুরে সুর মিলিয়ে বলে, 'তোর মার গায়ে কত গয়না!'

লাবির বয়েস আট, তাতে কিছু এসে যায় না। কথা শিখে অবধি পাকা কথাই কইতে শিখেছে লাবি। মা পিসিমার অসতর্কতায় এমন অনেক মেয়েই শেখে।

গয়নার কথায় পিতুর পরাজয়। ও অভিমানভরে বলে, 'বেশ বেশ আমরা গরীব। হ'ল তো?'

'ও বাবা মেয়ের আবার রাগ হ'ল। আচ্ছা বাবা ঘাট মানছি! কাল খেলতে আসবি তো?'

'এলে যে মা বকে।'

রবিবারে পিতু মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এ পিতুর মা পছন্দ করে না, সে-কথা লাবির জানা, তাই এই প্রশ্ন।

অবশ্য উত্তরটাও জানা ছিল লাবির, তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'ওই তো মুশকিলের গোড়া। রবিবার এলেই যেন হাড় জ্বলে যায় আমার।'

পিতু বিস্ফারিত চক্ষে বলে, 'রবিবার এলে হাড় জ্বলে যায়?···বাবা এলে ভালো লাগে না তোর?'

'নাঃ! মোটেই না। এসে আমায় কী রাজা ক'রে দেয় শুনি? এসে তো খালি মা'র সঙ্গে গপ্পো করে, আর তাসের আড্ডায় ছোটে। আমার সাথে মধ্যে খালি বকুনি। দেখবে কি, বকবে! কলকাতায় থাকে তাই রক্ষে!'

'আমার বাবা বকে না।'

হৃতগৌরব ফিরে পায় পিতু।

লাবি বান্ধবীর পিতৃগর্বে আঘাত হানে না। গম্ভীরভাবে বলে, 'হ্যাঁ পংকজকাকা লোক ভালো। যা বাবা, তুই বাড়ি যা। শেষে আবার মার কাছে মুখনাড়া খাবি।'

আট বছরের লাবি বর্ষীয়সীর ভঙ্গিতে নিজের পথ দেখে।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। 'বালিকা' ব'লে যাদের অগ্রাহ্য করা হয় অনেক সময় তাদের সম্মেলন-সভায় কান পাতলেই এ চৈতন্য সঞ্চার হয়, অগ্রাহ্যের যোগ্য তারা নয়।

পিতুর মতন মেয়েরাই বরং ব্যতিক্রম! চোরের মতো বেড়ার দরজা ঠেলে উঁকি মেরে দেখে পিতু। নাঃ বাবার আবির্ভাবের ঘোষণা কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে না অতএব নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়া যায়। অতঃপর দু'চার খাবলা জল হাতে মুখ রগড়ে জামাটা বদলে চুলে চিরুনির দুটো টানের ওয়াস্তা। আর পিতুকে পায় কে!

বালতি-ঘটির ব্যাপারটা যথাসাধ্য নিঃশব্দ রাখার চেষ্টা ক'রেও কিন্তু ফল হয় না। জলে ঘটি ডোবানোর ছোট্ট শব্দটুকুও রান্নাঘরে অবস্থিত মানুষটির কান এড়ায় না।

'পিতু।'

ভর্ৎসনার সুর বাজে ঘর থেকে।

'খেলা ফুরোচ্ছিল না বুঝি? চট ক'রে মুখ ধুয়ে নাও। চৌকির ওপর জামা আছে!'—যাক্, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে! কৃতজ্ঞ পিতু এক মুহূর্তে করণীয় কর্তব্য সেরে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলে,—'আজ কী রাঁধবে গো ঠাকুমা?'

ঠাকুমা মুখ তুলে সহাস্যে উত্তর দেন, 'তুই-ই বল, তোরই তো বাবা আসছে!'

'ধ্যাৎ!'

ঘরে ঢুকে উবু হয়ে বসে পিতু। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বলে 'কচুরি করছ মা?'—কচুরি করার কারণটা মধুর লজ্জার! মনোরমার মুখে একটু চাপা হাসি খেলে যায়। উত্তর ঠাকুমাই দেন, 'হ্যাঁ রে! তোর বাবা যে কচুরি খেতে বড় ভালোবাসে। অবিশ্যি ওদের মেসে কতো খায়দায়, খাওয়ার অভাব কিছু নেই তবু ঘরের জিনিস ব'লে কথা! রোজের রোজ একটু ক'রে তেল জমিয়ে—'

মনোরমা মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলে, 'থাক্ মা ওসব কথা। ছেলেমানুষ বলেটলে ফেলবে।'

ঠাকুমা অপ্রতিভ অবস্থা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলেন,—'পিতু আমার তেম

মেয়ে নয়, খুব বুঝদার আছে, কী বলিস পিতু ?'

পিতু সলজ্জ হাসি হাসে।

মনোরমা বলে, 'ভাজা তো হচ্ছে, তোর ভাগের দু'খানা খেয়ে নে !'

রসনায় জল সঞ্চার হয়, তবু দুর্দমনীয় বাসনা দমন ক'রে পিতু তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'এখন খিদে পায়নি। বাবার সঙ্গে খাবো ?'

'সঙ্গে তো খাবি, সামনে ব'সে হ্যাঙলার মত হাত চাটবি তো ?' মনোরমা হাসে।

নাঃ, পিতুর সেই একদিনের অসতর্কতার কাহিনী কেউ আর ভুলে যেতে রাজী নয় !

পিতু আরক্ত মুখে বলে, 'ইস্ ! রোজ যেন তাই করি ! সে তো শুধু একদিন।'

মনোরমা হাসির সঙ্গে বলে, 'আর আজ কী করবি ? বলবি, "কচুরি কী জিনিস ঠাকুমা ? ও কী রকম খেতে ঠাকুমা ?" তাই তো ?'

ঠাকুমা বিপন্ন নাতনীকে রক্ষা করেন। কৃত্রিম ভৎর্সনার সুরে বৌকে বলেন, 'তোমার খালি ওকে খ্যাপানোর তাল্। ও আমার তেমনি বোকা নাকি ?—হুঁ ! কী বলবি রে পিতু ?'

পিতু পৃষ্ঠবলের ভরসায় সোৎসাহে বলে, 'কী বলব ? বলব কচুরি তো পেরায়ই খাই, ঠাকুমা নিত্যি করে। কচুরি খেয়ে খেয়ে আমাদের অরুচি ধ'রে গেছে বাবা, তুমি ভালো ক'রে খাও !'

মনোরমা হেসে ফেলে বলে, 'অত কথা বলতে হবে না তোকে রক্ষে কর। সামনে বসে হাত-পাত না চাটলেই হ'ল !'

পিতু লুব্ধদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়, আজকের এই উৎসবের সুবর্ণ সুযোগে অপ্রত্যাশিত কোন ভোজ্যবস্তু চোখে পড়ে যায় কি না। এরকম পড়ে মাঝে মাঝে। যেমন সেদিন পড়ে গিয়েছিল। নারকোলের মালার মধ্যে একটি নারকোল কোরা। পিতু চায়নি, শুধু প্রশ্ন করেছিল, 'ওটা কী ঠাকুমা ?' তাতেই ঠাকুমা একটা তুলে নিয়ে পিতুর হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন।

নাঃ, নারকোল কোরা আজ নেই, একটা বাটিতে গোটা কতক ছোলাভিজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র, যা কাঁচা খাওয়া চলে।

'ছোলাভিজে কী হবে ঠাকুমা ?'

মনোরমা তিরস্কারের সুরে বলে, 'কী আবার হবে, রান্না হবে। খিদে পেয়েছে, যা খাবার কথা, খা না বাপু।'

ঠাকুমা নাতনীকে বোঝেন।

তিনি তিরস্কার করেন বৌকে, 'খিদে পেয়েছে সে কথা তো ও তোমায় বলতে আসেনি বাছা ! সব তাতে তাড়া দাও কেন ? ছোলাভিজে দিয়ে লাউ রাঁধবো রে পিতু। লাবিদের গাছের লাউ আধখানা দিয়ে গেল লাবির পিসি। দিব্যি কচি, তোর বাবা রুটি দিয়ে লাউঘণ্ট ভালোবাসে। নে দুটো চিবো ততক্ষণ।'

ঠাকুমা দু'টি ছোলাভিজে তুলে নিয়ে নাতনীর দিকে এগিয়ে দেন।

কিন্তু পিতু সহজে হাত বাড়াবে না। ওর বুঝি মান নেই? আড়চোখে শুধ মা'র দিকে তাকায়।

'হয়েছে, আর লজ্জায় কাজ নেই'—মনোরমা হেসে ফেলে একটিপ নুন নিয়ে বলে, 'নে নুন দিয়ে ভালো লাগবে।'

'রান্নাঘরে কেন? বাইরে গিয়ে বসগে না।'

এটা একটা সংকেত।

'বোসগে না' মানেই 'দেখগে না'। 'বাবা আসা দেখাও যে মস্ত একট আমোদ।

একবার ঠাকুমা ছিল না, গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল ত্রিবেণীতে, সে-বার পিতু আ মা দু'জনে দেখেছিল বেড়ার দরজার কাছে একঘণ্টা আগে থেকে দাঁড়িয়ে।

'বাবা! বাবা! বাবা এসেছে, বাবা!'

রান্নাঘরের মধ্যে মনোরমার বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে। এগারো বারো বছ বিয়ে হয়ে গেছে, তবু ওঠে।

পঙ্কজ হাসতে হাসতে আর মেয়ের কথার নকল করতে করতে ঢোকে, 'বাবা বাবা! বাবা!···দেখো বাবু ম্যাজিক দেখো, পিতুরানীর বাবা দেখো।···চা চার পয়সা টিকিট বাবু, চার চার পয়সা টিকিট!' এই রকম স্ফূর্তিবাজ লো পঙ্কজ। সব কথাতেই ওর হাসি।

এরপরও বাবার পিঠ ধরে ঝুলে পড়বে না, এত ধৈর্য পিতুর নেই।

'এই হ'ল আদিখ্যেতা শুরু।' মনোরমা বেরিয়ে এসে চাপা ধমক দেয় 'মানুষটা তেতে পুড়ে এল, ওকে একটু স্থির হতে দে?'

পিতু কিন্তু আর এখন মাকে ভয় করে না।

করে না দু'কারণে। প্রথম তো বিরাট সহায়—বাবা কাছে। দ্বিতীয়ত মায়ে মুখে চোখে যে চাপা হাসির বিদ্যুৎ-ব্যঞ্জনা, সেটুকু পিতুর চোখ এড়ায়নি।

এ মাকে ভয় না করলেও চলে।

মহামায়ার শুদ্ধাচার পাড়াবিখ্যাত। রেলের কাপড়চোপড়ে জলের পাত্র স্পশ করা চলে না। মনোরমা কুয়োর পাড়ে গিয়ে পঙ্কজকে হাত মুখ ধোবার জ ঢেলে দেয়।

পঙ্কজ মুচকে হেসে খাটো গলায় বলে, 'তৃষ্ণার জলকে আটকে রেখে প ধোবার জল দিয়ে পুণ্য নেই।'

মনোরমা তেমনি ভঙ্গিতে বলে, 'হয়েছে খুব হয়েছে। এবার মেয়ে বড় হচ্ছে কথাবার্তা সামলাতে শেখো।'

'মেয়ে?—ঢের দেরী আছে বড় হ'তে।' বলে অদূরবর্তিনী কন্যার দিবে সস্নেহে তাকায় পঙ্কজ।

'সেই তো আরো জ্বালা! এখ্খুনি হয়তো মাকে জিজ্ঞেস করতে ছুটবে 'ঠাকুমা, তেষ্টার জল মানে কী?'

হেসে ওঠে দু'জনেই।

মুখ ধুতে এত দেরী···পিতু ভাবে। মনোরমা বলে, আবার সেই রাশ ক'রে জিনিস এনেছো ? তোমার যেন বাজে খরচ করা এক বাতিক। এইটুকু তো সংসার, এত কে খায় বলো তো ? গেল বারের আনা পাঁপর তো সবই রয়েছে, আবার পাঁপর এনেছো !'

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলে, 'তা তোমরা যদি না খাও আর আনবো না !'

'এই দেখ মুশকিল ! কত খাব ! তরি-তরকারির জ্বালায় এটা ওটা খাবার জো আছে ?'

'এত দিচ্ছে কে ? আর কারো সঙ্গে বন্দোবস্ত করোনি তো ?' হাসতে থাকে পঙ্কজ !

'এইবার তাই করবো ভাবছি। যা অসভ্য হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। ঘর করার অযোগ্য !'

মহামায়া হাঁক পাড়েন, 'অ পঙ্কজ, মুখ ধোওয়া হ'ল ? কচুরি ক'খানা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ! জলটল খেয়ে গপ্‌পো করিস না বাছা।'

'হ'ল তো ?' বলে স্বামীর দিকে একটা সরোষ কটাক্ষ হেনে দ্রুতপদে সরে গেল মনোরমা।

পঙ্কজ দাওয়ায় উঠে চা জলখাবার খেতে বসল।

খেতে দেওয়ার ভার মহামায়ার নিজের হাতে। বৌ দিলেও তাঁর তৃপ্তি হয় না ! ওদের ধরন-ধারণ জানতে তো আর বাকি নেই মহামায়ার ! হয়তো খাওয়ার সময়ই এমন হাসাহাসি জুড়ে দেবে যে, যে খাবে সে টের পাবে না কী খেলাম, যে দেবে সে জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাবে 'কেমন খেলে' ?

বহু যত্নে বহু চেষ্টায় 'প্রাণ কুটে' তৈরী জিনিসের এমন অপব্যয় সহ্য হয় না মহামায়ার। তিনি কাছে বসে খাওয়াবেন, কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করবেন, আর একটু নেবার জন্য সাধ্যসাধনা করবেন, তবে তো তৃপ্তি !

মাছটা মহামায়া ছোঁন না, রবিবার দিন মাছ আছে, মনোরমাই রাঁধে। মহামায়া দাঁড়িয়ে পরিবেশন করান। একদিন খলশে মাছের টক দিতে ভুলে গিয়েছিল মনোরমা, সেই অপরাধে তাকে ন ভুতো না ভবিষ্যতি করেছিলেন মহামায়া। এমনিতে তিনি বৌয়ের প্রতি স্নেহশীলাই, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে নয়।

পঙ্কজ জুত ক'রে বসে বলে, 'কচুরি আর আলু-মরিচ ? দি গ্রাণ্ড ! আজকের জলযোগটি যে রীতিমত রাজসই !'

মহামায়া বিগলিত স্নেহে বলেন, 'কচুরি তো নামেই ! কপালগুণে আজকেই ঘিটা গেছে ফুরিয়ে, তেলেই ভাজলাম। বলি গরম গরম খাবে, মন্দ লাগবে না।'

'মন্দ ?' পঙ্কজ এক কামড় খেয়ে চরম পরিতৃপ্তির স্বরে বলে, 'হুঃ ! তেলে ভাজারই তো তার বেশি গো মা ! এই তো আমাদের মেসে কড়া কড়া ঘি উড়িয়ে রাঁধছে, পারুক দিকিনি একদিন এমন একখানা দি গ্র্যাণ্ড কচুরি ভাজতে ? সত্যি বলতে মা, ক'দিন থেকেই তেলেভাজা ছোলার ডালের কচুরি খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।'

মহামায়ার চোখের জল অসংবরণীয় হয়ে ওঠে। কণ্ঠে বলেন, 'ওরে, সা[illegible]
কি আব শাস্ত্রে বলেছে—মায়ের প্রাণ! কথায় আছে—"ছেলে হাঁকে এপারে, ম
কাঁদে ওপারে।" নদীর ওপার থেকে মায়ের প্রাণ কাঁদে!'

অতঃপর কাঁসিতে অবস্থিত বাকী কচুরিগুলি ছেলের পাতে পড়তে বিলম্ব
হয় না।

এবার পঙ্কজের রাগের পালা।

'ব্যস ব্যস! সবগুলো ঢেলে দিলে? নাঃ তোমাদের কাছে ভালো বলবা[illegible]
জো নেই! এই আট ন'খানা আমি এখন খাবো?'

'কেন খাবি না? রাতের রুটি কম করছি!'

'আর তোমরা খাবে না? দু'খানাও তো রাখতে হয়?'

'বৌমার ভাগ ঘরে আছে, পিতুকে দিয়ে দিয়েছি, আবার কার জন্যে
রাখবো? আমি কি রাতে ডালের জিনিস খাই?'

পঙ্কজ ক্ষুব্ধভাবে বলে, 'ছি ছি! তা'হলে আজ করলে কেন? কাল সকালে
করলেই হ'ত।'

মহামায়া সস্নেহ হাস্যে বলেন, 'শোন কথা! ভারি তো পদাথ জিনিস,
দুখানা তেলেভাজা কচুরি! তার আবার না খেলো না, হ্যানো হ'ল না—আমি
কি খাচ্ছি না? বৌমা আমার যখন তখনই ত' খাবার করছে। এই আজই
বলছিল, "মা, দশমীর দিন আপনাকে পেটভরে ডালপুরী খাওয়াবো।" খাবার
করা বৌমার এক বাতিক।'

'হ্যাঁ! তোমার বৌ নইলে আর এত গুণের কে হবে! হ্যাঁরে পিতু, রোজ
খাস কচুরি ডালপুরী?'

'রোজ।'

পিতু যেন একটা মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে তাকায়। কোথায়
সেই দুর্লভ বস্তু?···দৈনন্দিন ভাত আর রুটিকে কেন্দ্র ক'রে যে দু-একটি
বাহুল্য বস্তুর দর্শন মেলে, সে হচ্ছে কচুর শাক, ওলের ডাঁটা, অথবা পাড়ার
লোকের প্রীতি উপহার লাউটা কুমড়োটা। বাবা আলু আনে, সে-আলুর প্রায়
সব ক'টিইতো তোলা থাকে পরবর্তী শনি-রবিবারের জন্যে। তাতে অবশ্য পিতু
দুঃখিত নয়। শনি-রবিবার উৎসবের দিন, পিতুও জানে।

কিন্তু এতকথা ভাবতে এক সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে না, পিতু ঢোক
গিলে বলে,···'রোজ নয়, পেরায় পেরায় খাই।'

অবোধ পিতু মিথ্যা বলবে না, এটা নিশ্চিত। পঙ্কজ পুলকিত বিস্ময়ে
বলে, 'আশ্চর্য! তোমরা এত কম খরচে কেমন চমৎকার ক'রে সংসার চালাও,
আর আমাদের মেসে! হুঁঃ!'

মহামায়া সন্দিগ্ধভাবে বলেন, 'তবে যে বলিস, তোদের খাওয়া দাওয়া খুব
ভালো।'

'আহা, তেমনি পয়সাটাও তো ভালো গো, তোমাদের তিনজনের যা খরচ
না হয় আমার একার তাই খরচ।'

'ষাট্ ষাট্, তা হোক। পুরুষ বেটাছেলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়। তার একটু দরকার বৈকি!'

পিতু মহোৎসাহে বলে, 'এখানে যে সব জিনিস সস্তা বাবা। তোমাদের কলকেতার মত তো না! আমরা কত খাই! ঠাকুমা তো নিত্যি পায়েস রাঁধে, তোমার জন্য আমার মন কেমন করে। কাল আবার রাঁধবে ঠাকুমা?'

মহামায়া ভাঁড়ারের চিনির কথা স্মরণ ক'রে ইতস্তত ক'রে বলেন, 'দেখি, গয়লা মুখপোড়া যদি ভালো দুধ দেয় তবেই। জলঢালা দুধ হ'লে করছি না।'

পঙ্কজ গেলাসের জলটা সব শেষ ক'রে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে বলে, 'খুব জল ঢালে বুঝি?'

নিছক গোয়ালার নিন্দে করতে মহামায়ার বোধ করি বিবেকে একটু বাধে। কারণ গোয়ালাটা অবিবেকী নয়। তার কাছে নানা বর্ণের দুধ মেলে।

মহামায়া যদি টাকায় আড়াই সের দুধের খদ্দের হন, দুধের রং নীল না হয়ে উপায় কোথা?

ছেলের কথাকে তাই এড়িয়ে গিয়ে মহামায়া বলেন, বাড়তি নিতে চাইলেই চালবে। সব তো খদ্দের-ঘর বাঁধা। এক ছটাক দুধ পড়তে পায় না। কী দেশের কী অবস্থাই হয়েছে!'

অতঃপর প্রসঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।

দেশের পুরনো দিনের আলোচনা চলে। যে আলোচনায় বর্তমানহীন ভবিষ্যৎহীন হতাশ জীবনের সবচেয়ে আনন্দ।

হৃতসর্বস্ব জাতি অতীত গৌরবের গাথা গায়, অভাবগ্রস্ত মানুষ অতীত সচ্ছলতার গল্পে বিভোর হয়।

'পিতু। পান নিয়ে যা।'

ঘর থেকে মনোরমার ডাক আসে। দু'খিলি পান মেয়ের হাতে দিয়ে মনোরমা চাপা ভর্ৎসনার সুরে বলে—'পায়েস টায়েস অত কথা বানাতে কে বলেছে তোমায়?' পিতু অপরাধীভাবে মাথা হেঁট করে।

মা, ঠাকুমা দু'জনকেই বাবার সামনে শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণ করতে দেখে ও ভাবে, এ বুঝি ভারি এক মজার খেলা।

মনোরমাও অবশ্য মিথ্যাচারের জন্য মেয়েকে বেশী তিরস্কারের জোর পায় না। তাই ক্ষমার সুরে বলে, 'আচ্ছা যাও, পানটা দাও গে। বেশী আজে-বাজে কথা বোল না। পড়া দেখে নাওগে না একটু। লেখাপড়া শিখতে হবে না? আর এই এক মানুষ! মেয়েটাকে পড়ানো যে একটা কর্তব্য, সে জ্ঞান নেই।'

লেখাপড়া না কচুপোড়া!

লেখাপড়া শিখতে দায় পড়েছে পিতুর। বাবার সঙ্গে কত ভালো ভালো গপ্পো হবে এখন, তা নয় লেখাপড়া। ছিঃ।

পঙ্কজের অবশ্য পিতৃকর্তব্য পালনে বিশেষ গা দেখা যায় না। পিতা-পুত্রীতে গল্পই চলে।

তা সে গল্পেও শূন্যে স্বর্গ-রচনা। বলা যেতে পারে গল্পের শিরোনামা

হচ্ছে 'যখন অনেক টাকা হবে।'

লটারিতে টাকা পাওয়াটা নিশ্চিত, তারিখটাই যা এখনো জানা যাচ্ছে না সে যাক, টাকাটা কী ভাবে খরচ করা হবে সেইটাই হচ্ছে আসল কথা। বা মেয়েতে সেই কথাই হয়।

জামা কাপড়, খাওয়া দাওয়া খেলনা পুতুল, ঠাকুরমার ঠাকুরঘরের রুপো সিংহাসন, সোনার 'ঝারা', মনোরমার গাদা গাদা গয়না, পঙ্কজের হাতঘা আর চশমা, এ সমস্ত ব্যাপারেই পিতা কন্যার একমত। মতের বৈষম্য একা ব্যাপারে।

পঙ্কজের ইচ্ছে—সকলে মিলে কলকাতায় চলে যাওয়া, পিতুর তাতে দারু অনিচ্ছে। এই বাড়ি, এই গ্রাম, লাবি আর অন্যান্য সঙ্গী-সাথীরা, গোসাঁইদের পোড়োবাড়ির ইঁটের স্তূপ সরিয়ে অতি কষ্টে তৈরী খেলাঘর, উঠোনের আমড়াগাছের ডালে বাঁধা দোলনা—এই সমস্ত ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না পিতু।

পঙ্কজ অফিসের কথা তুলে কলকাতার স্বপক্ষে যুক্তি দেখায়; পিতু ভট্‌চাজ্‌ জ্যাঠার ছেলের উদাহরণ দেয়। যে ছেলেটি ডাক্তার হয়ে নিত্য দু'বেলা কলকাতায় যাবার জন্য মোটর কিনেছে। যখন অনেক টাকা হবে, তখন গাড়ি কিনতেই বা বাধা কী!

কথার মাঝখানে পিতু ব'লে বসে—'বাবা, তুমি গরীব লোক?'

পঙ্কজ মুহূর্তের জন্য থতমত খায়······পরক্ষণেই হা হা ক'রে হেসে উঠে বলে, 'কে বলেছে এ কথা?'

বাবার হাসিতে পিতু বুকে বল পায়! তাই অগ্রাহ্যের সুরে বলে, 'আবার কে? ওই লাবি?'

'লাবি না হাবি!' পঙ্কজ লাবি সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি ক'রে নিজের বুকের উপর একটা থাবড়া মেরে বলে, 'আমার মতন বড়লোক এ-গাঁয়ে কেউ নেই বুঝলি? কেউ না।'

এ হেন ঘোষণায় পিতু বেশ একটু অবাক হয়ে বাপের দিকে তাকায়। কথাটায় সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া শক্ত, অথচ বাবার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ঘোষণার সপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে। আবার হাসিটাও কেমন যেন রহস্য রহস্য!

সন্দেহমোচনার্থে পিতু বলে,—'তা'হলে তোমার জুতো ছেঁড়া কেন?'

'জুতো!'

জুতোর ছেঁড়াটুকু চোখে পড়ে গেছে মেয়েটার! জামা কাপড়ের মত জুতোকে অল্পে ভদ্র চেহারা দেওয়া যায় না।

তবু তো আঁধার ঘেঁষে রোয়াকের নীচে রেখে দিয়েছে জুতোটাকে।

কিন্তু মেয়ের কাছে তো কথায় হারবে না পঙ্কজ, তাই অম্লানবদনে বলে,— 'জুতো ছেঁড়া কেন তাই জিজ্ঞেস করছিস? নতুন জুতো কিনব কখন? দোকানে যাবার সময় আছে! এই তো শনিবার হলেই এখানে? শনি-রবি দুটো দিন গেল। অন্য দিন আপিস। কখন কিনব? টাকা পকেটে নিয়ে তো ঘুরে

বেড়াচ্ছি।'

শুনে পিতু অবাক।

সময় নেই!

পৃথিবীতে কত সময়! অগাধ অফুরন্ত! দিনের উন্মোচন আর রাত্রির অবতরণে আবর্তিত হ'তে হ'তে চলেছে বিরতিহীন একটানা এক সময়ের স্রোত। অনন্তকালব্যাপী সেই তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে দিন আর রাত্রিগুলো। ভট্চাজ্ জ্যাঠা উদয়াস্ত তামাক খাচ্ছেন আর হুঁকো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চৌধুরী-দাদু চব্বিশ ঘণ্টা চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে আছেন। লাবুর পিসি একফালি লাউ কুমড়ো নিয়ে উপহারের ছুতোয় পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও কোন ছুটোছুটি নেই। সব স্তিমিত। সব নিস্তরঙ্গ।

অথচ বেচারী বাবা!

সময়ের অভাবে টাকা পকেটে নিয়ে ছেঁড়া জুতো প'রে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাকে।

এরা যেন অভিনব এক শব্দগঠনের খেলা শিখেছে! সে খেলায় সবাই মশগুল। প্রথমে কে এই খেলা আবিষ্কার করেছিল সে এখন বলা শক্ত। পঙ্কজ? মহামায়া, মনোরমা? নাঃ, সে কারো মনে নেই! তবু কেউ ভেঙ্গে দেবে খেলা। খেলা ভেঙ্গে দিলেই হঠাৎ একেবারে গরীব হয়ে যাবে ওরা। সে দারিদ্র্যের উপর তখন আর কোন আব্রু থাকবে না।

তা হ'লে মহামায়ার ভাঁড়ারের হঠাৎ ঘি ফুরিয়ে যাওয়ার রহস্য যাবে ভেঙ্গে। পঙ্কজের 'সময় অভাবের' গল্প ফুরিয়ে যাবে।

তার চেয়ে এই ভালো!···এই মধুর মিথ্যার জাল!

কাজেই পঙ্কজ অনায়াসেই সহোৎসাহে শুরু করে, 'শুধু জুতো? সময়ের অভাবে কত জিনিস হয়ে উঠছে না জানিস? টাক পড়ে যাচ্ছে, একটা ভালো তেল কেনা হচ্ছে না! তোর মা এত সোয়েটার বুনতে জানে, তবু পশম কেনা হচ্ছে না। আর তোর তো কত জিনিসেরই দরকার তার ঠিকই নেই। সে সব কিছু হচ্ছে না···শুধু সময়ের অভাবে।'

শিশুর কাছে মিথ্যাভাষণে পঙ্কজের বিবেক আহত হয় না! 'সময়ের অভাব' এ কথা কি মিথ্যা? সময়ের অভাবেই তো কিছু হচ্ছে না।

তবু 'সময়' একদিন আসবেই, এ পঙ্কজের স্থির বিশ্বাস।

'অসাচ্ছল্য', 'অনটন' এ যেন নেহাতই সাময়িক একটা অবস্থা মাত্র! ও ঠিক হয়ে যাবে। যখন সময় আসবে তখন শুরু হবে সত্যকার জীবন। যে জীবনের প্রতিটি ছবি পঙ্কজের মুখস্থ।

টাকা পকেটে ক'রে বেড়ানো?

সেও মিথ্যা নয়। পকেটটা জামায় নেই, আছে মনে। এই যা।

বাবার কথায় হৃষ্ট পিতু হঠাৎ আপনমনে ভেঙচানির সুরে বলে ওঠে, 'লাবি না হাবি।'

হো হো ক'রে হেসে ওঠে পঙ্কজ। হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মনোরমা এসে

দাঁড়ায়।

রান্না সাঙ্গ হয়েছে, মহামায়া এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সন্ধ্যাহ্নিকে বসলেন। এবার মনোরমাও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে স্বামীর কাছে বসতে পারে।

'এত হাসি কিসের শুনি?'

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলে, 'যারা বসে না আমরা তাদের কিছু বলি না। এই পিতু খবরদার! বলবি না কেন হাসছিস।'

'এই বসলাম। হ'ল তো?'

পঙ্কজ আরো গম্ভীর মুখে বলে, 'তার আগে বলতে হবে তুমি কেন হাসছ। কেউ তো তোমাকে কোন রহস্য-কাহিনী বলেনি। এসে বসলে. আর হাসতে লাগলে। এর মানে?'

'কোথায় আবার হাসছি? হ্যাঁরে পিতু, হাসছি আমি?' মনোরমা রীতিমত গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করে। পিতু মায়ের মুখের দিকে তাকায়। উজ্জ্বল শিখা হ্যারিকেন লণ্ঠনটার ঠিক সামনা সামনিই বসেছে মনোরমা, তার ঈষৎ আনতমুখের রেখায় রেখায় আলোর আভা।

কিন্তু এ-আভা কি শুধুই হ্যারিকেনের আলোর? হ্যারিকেনের আলো-লাগা মা'র মুখ তো আরও অনেক সময় দেখেছে পিতু। বাবা যেদিন আসে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বই পড়ার সময়, কিংবা পিতুকে পড়ানোর সময়! সে শুধুই বাইরে থেকে গিয়ে-পড়া আলো, ভিতর থেকে ঠিকরে উঠছে এমন আলো তো নয়! এ যেন অজানিত, এ যেন অলৌকিক।

পঙ্কজ মেয়ের অবাক-হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলে, 'শোন, পিতুর হাবি বন্ধু লাবি বলেছে, পিতুর বাবা গরীব! কথাটা হাসির যোগ্য কিনা?'

'তা আবার নয়।' আলোয় ঝলসে ওঠে মনোরমা 'গরীব কি বল? সম্রাট্।'

'এই শুনলি তো পিতু? বলিনি আমি? বলিনি আমার চেয়ে বড়লোক এ-গাঁয়ে আর নেই?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে পিতু। আশ্চর্য! অবাক কথা। বাবার মুখেও সেই একই আলোর উদ্ভাসন!

পিতুর মনে হয়, এদের এই সাধারণ কথাগুলো যেন সাধারণ নয়। হাসিটা তো নয়ই। এই কৌতুকভরা মুখের রেখায় রেখায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আরো অন্য কিছু—যা পিতুর বুদ্ধির বাইরে।

তবু কী অপূর্ব। কী সুন্দর!……আনন্দে হঠাৎ চোখে জল এসে যায় পিতুর।

এখন যদি লাবিকে ডেকে এনে দেখাতে পারত! এখন দেখলে পিতুর মা'র গায়ে গয়না নেই ব'লে ঠাট্টা করবার সাধ্য হ'ত লাবির? গয়না আছে কি না, মনে প'ড়ত?

[১৩৬২]

শেষ অবধি অভিভাবকদের হাতে আত্মসমর্পণ করতেই হল। বিপত্নীক ছেলেকে কেউ বিধবা মেয়ের মত শুধু সজল সহানুভূতি দেখিয়ে ছেড়ে দেয় না! তাকে আবার নতুন জালে জড়িয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত ওপরওলাদের বিবেক বাগ মানে না।

অবিশ্যি বিশেষ করে সুকোমলদের মত কমবয়সীদের কথা বলছি। যারা সত্যিই সহানুভূতির পাত্র। যারা দু'দিনও সংসার করতে পারে নি। যার তরুণী বধূ এতটুকু একটু চিহ্নও রেখে যায় নি।

দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তাবে যথারীতি প্রথমদিকে খুবই আপত্তি করেছিল সুকোমল, কিন্তু শেষ অবধি সে আপত্তি টিঁকল না। টিঁকল না—হয় তো নিজের মধ্যেই ক্রমশ ভাঙা-খুঁটি আঁকড়ে বসে থাকবার জোর সে খুঁজে পাচ্ছিল না বলে।

এবারে বিয়ের প্রধান ঘটকিনী বড় মাসী!

বোধ করি মেয়েটি তাঁর শ্বশুর-বাড়ির তরফের। তা বড় মাসী বুদ্ধিমতী। ঠিক করে একবার সম্মতি আদায় করে নিয়েই তিনি যবনিকার অন্তরালে চলে গেছেন, এবং সেখানে বসে নিঃশব্দে ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! মা পিসীমাও নীরব। কারণ আগের বৌয়ের জন্য মন তাঁদের আজও ব্যথাতুর।

নেহাৎই ছেলের মুখ চেয়ে এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া, [illegible] বৌয়ের মুখ ভোলবার নয়। তাঁরা যা করছেন নিঃশব্দেই করছেন।

কিন্তু পিসতুতো বোন সাবিত্রী এসে যেন সুকোমলের নিঃ[illegible] নচ করে দিল। সাবিত্রী এ বাড়িতেই মানুষ হয়েছে, এ বাড়িতে তা'র [illegible] প্রতাপ। আগের বৌকে সে দেখে নি, স্বামীর সঙ্গে বিদেশে ঘুরছিল, এবারে সুবিধে করে এসেছে।

যাকে দেখে নি, তার জন্যে শোক হবার কথা নয়, তাছাড়া—তার মতে দ্বিতীয়াকে যে গ্রহণ করতে চলেছে প্রথমার জন্য শোক প্রকাশ করাটা তার পক্ষে 'ধাষ্টামো'।

আসামাত্রই সুকোমলকে সে প্রথম সম্ভাষণ করল—ও কমলদা বড্ড যে ফাঁকি দিয়েছিলে সেবার? দেখলে তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন না খেয়ে ছাড়লাম না?

সুকোমল গম্ভীরভাবে বললে—কখন এলে?

—ছ-ঘণ্টা! কাল বিয়ে, তুমি আজও আপিস যাচ্ছ তা কি জানি? ভাবলাম দশদিন থেকে ছুটি নিয়ে বসে আছ।

—ভুল ধারণাটা ভেঙেছে তাহলে?

—তা তো ভাঙল!···যাক, কালও যাবে না তো? বলে হি হি করে হেসে উঠল সাবিত্রী।

পিসীমা আড়ালে মেয়েকে তিরস্কার করলেন—ওর সামনে বিয়ে নিয়ে অ:
হাসি-ঠাট্টা করছিস কেন বাপু ? ওর মন-টন ভাল নেই।

সাবিত্রী চরম অবজ্ঞার বহিপ্রকাশ স্বরূপ ঠোঁট উল্টে বলে—হুঁঃ, মন ভাল নেই ? আরও কত শুনব ! আবার যখন টোপর মাথায় দিতে পারছে—

—সে কথা বলে খোঁটা দিতে পারিস না বাছা, এই বয়েস থেকে কি সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে ? তা বলে—

—আমি ওসব 'তা-বলে'র ধার ধারি না। আমি সে বার কমলদার বিয়েতে আমোদ করতে পাই নি, এবারে চুটিয়ে আমোদ করব !

চায়ের পেয়ালাটা ঠক্ করে টেবিলে বসিয়ে দিয়েই সাবিত্রী ভুরু কুঁচকে বলে —এখনও টেবিলে তোমার 'প্রথমা'-কে ফুলের মালা পরিয়ে বসিয়ে রেখেছ ! এটা কিন্তু ঠিক করছ না কমলদা !

ছেলেবেলায় ওর বাচালতার জন্যে ঢের গাঁট্টা মেরেছে সুকোমল, কিন্তু এখন এঁটে উঠতে পারে না।…জীবনের পরিণতির দিক দিয়ে সুকোমলের চাইতে অনেক ওপরে উঠে গেছে সাবিত্রী, অবস্থাতেও উঠে গেছে অনেকটা। অফিসারের স্ত্রী প্রায় সমবয়সী পিসতুতো বোনের বাচালতা সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

কমলকে চুপ করে থাকতে দেখে সাবিত্রী আবার বলে—চুপ করে রইলে যে ! এ ছবি এখানে রাখা চলবে না !

চকিতে একবার ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করে সুকোমল গম্ভীরভাবে বলে—কেন ?

—ওর আবার 'কেন' কি ? পুরনো প্রিয়ার স্মৃতি আঁকড়ে বসে থাক তোমার নবাগতা সহ্য করবে কেন ?

—সহ্য করবে না ? মানুষ তার সমস্ত পুরনো স্মৃতি মুছে ফেলুক, এই তোমরা—মেয়েরা চাও ?

—এক্ষেত্রে অন্ততঃ !…তুমি যে আগের বৌয়ের ছবির গলায় রোজ ফুলের মালা ঝোলাবে, আর সে বেচারা পুটপুট করে তাই দেখবে, তা চলবে না !

—হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাবে ?

—যাবেই তো। একশ'বার। যাবে না—কেন, তাই বল ? তা ছাড়া—এ ছবি রাখবেই বা কেন ? ওর সামনে তুমি নতুন বৌকে—

—তর্কে তোর সঙ্গে কখনও জিতি নি আমি, কারণ যুক্তির বালাই তোর নেই। তর্ক করব না। শুধু জিজ্ঞেস করি—তোদের মেয়েদেরও তো মৃত সন্তানের ছবি সামনে ঝুলিয়ে রেখে পরবর্তী শিশুটিকে আদর করতে কই বাধে না ?

সাবিত্রী নাক সিঁটকে গালে হাত দিয়ে বলে—ও মা কী ঘেন্নার কথা ! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা ! ছি ছি ! নাঃ ! বুদ্ধিসুদ্ধি তোমার লোপ পেয়েছে কমলদা !

—কেন বুদ্ধিহীনতার কি প্রমাণ পেলে ? আমার মতে স্ত্রী গেলে, দ্বিতীয়বার

ত্রী গ্রহণ যত গর্হিত, তা'র চাইতে ঢের বেশি গর্হিত সন্তান গেলে আবার সন্তান আবাহন। সেই মাতৃস্নেহই তো আবার উজাড় করে দেবে নতুনকে ? দুধ খাওয়াবে ঘুম পাড়াবে কোলে করবে। কোথাও বাধবে না! স্ত্রী তো তবু পরের মেয়ে !

সাবিত্রী অভ্যাসে-সাধা ঠোঁটের ভঙ্গী করে বলে—পাগলের পাগলামি শুনে তো সংসার চলবে না। মোট কথা এ ছবি অন্তত এত চোখের সামনে রাখা হবে না। রাখতে হয় তো—এই—এইখানে !

টপ্ করে ছবিটা তুলে নিয়ে দরজার মাথার একটা ব্র্যাকেটে তুলে রেখে সাবিত্রী বলে—দেখ এখন, ছোটগিন্নী এখান থেকেও নির্বাসন দেয় কি না। যাক—তোমার আলমারির চাবিটা একবার দাও তো ?

ড্রয়ার থেকে চাবিটা বার করে দিতে গিয়ে সুকোমল সন্দিগ্ধভাবে বলে—কি হবে ?

—দরকার আছে দাও না !

—শুনিই না দরকারটা ?

—ডাকাতি করব ! শুনলাম না কি অধিবাসের তত্ত্বর দিতে ছ'খানা মোটে শাড়ি এসেছে !

—তা হবে !

—আহা ! কিছু জানেন না, কচি খোকাটি ! বলি তোমারই না হয় সেকেণ্ড এডিশন, তার তো তা নয় ? তা ছাড়া আমি তত্ত্ব সাজাব—

—আরও কিছু কাপড় দেওয়াই যদি বিধি হয়, তো—দাও গে। কি চাই টাকা ? কত চাই ?

সাবিত্রী বলে—কেন, আবার মেলা কতকগুলো টাকা খরচ করে একগাদা শাড়ি কেনার দরকার কি ? শুনলাম—সে বৌয়ের তিনভাগ শাড়ি আনকোরাই আছে, সেগুলো দিতে দোষ কি ?

চায়ের পেয়ালা ধরা হাতটা কি কেঁপে উঠল, বুকের সঙ্গে সঙ্গে ? ··· সাবধানে ওটাকে নামিয়ে রেখে সুকোমল সাবিত্রীর বেপরোয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বলে —দোষ গুণের কথা থাক, বাজারে আর শাড়ি মিলবে না এমন তো নয় ?

—তা ওগুলো নিয়ে তুমি করবে কি ? সে এসে তো পরবেই ! এখন বরং সৌষ্ঠব করে চারটি সাজিয়ে দেওয়া যেত !

—ওগুলো পরতেই হয় এমন কোন আইন আছে ?

—জানি না ! না পরে ছাড়বে ! সাবিত্রী এবার রেগে উঠে দাঁড়ায়। তর্ক সে ভালবাসে, তর্কের গন্ধ পেলে রক্ষে নেই কিন্তু এ রকম ঠাণ্ডা প্রতিবাদে ওর গায়ে জ্বালা ধরে। তাই উঠে যাবার সময় দুই হাত উল্টে বলে যায়—আমার আর কি ! ও রকম দুঃখীর মত তত্ত্ব সাজাতে পারব না—সাজাব না ! চুকে গেল ল্যাঠা !···মামী নিজেই সাজাক !

সাবিত্রী চলে যাবার পর অনেকক্ষণ সেই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে

সুকোমল ! সব মেয়েই কি এই রকম ? এই রকম অসার ফাঁকা ? সাধনাও কি এই মেয়েই ছিল ? শুধু স্বল্প অবসরে টের পাওয়া যায় নি !

তা হতে পারে না !

নিজের মনকে দৃঢ় করে সুকোমল, সে সম্ভব নয় ! সব মেয়েই যদি এমনি অসার হত—পুরুষ জাতি তাকে সহ্য করত কি করে ? সাবিত্রীর স্বামী অতীন্দ্রবাবুর জন্য করুণা হয় সুকোমলের ।

যে চাবি সাবিত্রীর হাতে দিতে গিয়ে দেয় নি, সেই চাবির রিংটা রাত্রে বার করল সুকোমল। অনেক রাত্রে। বাড়ির সবাই যখন আগামীদিনের সমস্ত গোছগাছ করে রেখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে !

এ চাবি সাধনার গায়ের গয়নাগুলির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সাধনার মা ! সব কিছুই দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। একটা নাতি-নাতনী হয় নি, যে তার স্বার্থে কিছু আগলাবেন। সুস্থ মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন আদর করে, সে মেয়েকে আর ফেরৎ দিতে পারেন নি বলে জামাইকে আর সেই অবধি মুখ দেখান নি তিনি।

সাধনার বাবার দেওয়াই আলমারি !

উপরের দু'টো তাক বোঝাই সাধনার জিনিস, নিচের দিকে সুকোমলের। এইভাবেই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল সাধনা ! নিজের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে খুলতে হয়, কিন্তু উপরের তাকে কোনদিন হাত ঠেকায় নি সুকোমল। যেমন আছে থাক। সাধনার গোছানো !

কোন সময়ই খুলবে না ভেবে একবার নিজের জামা-কাপড় বার করে নেবার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু বার করে নিতে কেমন মায়া হল।···মনে হল অলক্ষ্যে বসে সাধনা ম্লান সুরে বলছে—আমি তো বাধ্য হয়ে তোমার সঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি, ও-গুলোকে আর আলাদা করছ কেন ? আমরা যে দুজনে একদিন একত্রিত ছিলাম, সে স্মৃতি ওদের মধ্যে থাক না।

আলাদা করা হয় নি।

আজ ধীরে ধীরে আলমারিটা খুলল সুকোমল, গভীর রাতে ঘরের দরজায় খিল এঁটে ! ··এই আরশি-বসানো চমৎকার আলমারিটা ঘরের জায়গা জুড়ে থাকবে, আর ঘরের ঘরনী সেটা ব্যবহার করতে পাবে না, এ হয় তো হবে না কে জানে···হয় তো এসেই সে সর্বগ্রাসী দখল শুরু করে দেবে ! কে জানে সে সাবিত্রীর মতই মনোবৃত্তিওলা মেয়ে কিনা। সাবিত্রী ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

তার চাইতে সরানো থাক সব। মনের নিভৃত-গোপনের ছবির মতই লুকনো থাক সাধনার অনেক আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি !

কত শাড়ি, কত জামা, কত অসংখ্য টুকিটাকি !

নববিবাহিতার অপর্যাপ্ত সঞ্চয়ের উপরও জমা হয়েছে, পিত্রালয়ের আর শ্বশুরালয়ের দু'টি বছরের আদরের উপহার ! পুজোয় শীতে রথে দোলে নব বর্ষে জন্মদিনে—কারণে অকারণে।

দু-বছরে আর কটিই বা পরে শেষ করেছিল! বাপের বাড়ি যাবার সময় নিয়েও যায় নি কিছু। শুধু পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল।

সাধনার হাতের গোছানো জিনিসগুলি স্থানভ্রষ্ট হল, এতদিন পরে!· সমস্ত জিনিসগুলো বিছানার উপর স্তূপীকৃত করে যেন ক্লান্ত হয়ে একটু বসল সুকোমল!···জামা কাপড়ের অন্তরালে এত ছেলেমানুষী জিনিস ছিল কে জানত! কৌটোই কত! একটি প্লাস্টিকেব কৌটোয় চারটি কাঁচের চুড়ি, একটা কাগজের বাক্সে নানা রঙের পশমের নমুনা। ছোট্ট কৌটোয় সোনালি টিপ্, উপহারে পাওয়া হরেক রকমের সিঁদুর-কৌটো!

একটি কাশ্মীরী-কাজ-কবা কাঠের বাক্সে যত্নে তুলে রাখা আছে সুকোমলের কাছে পাওয়া স্বল্প কয়েকখানি চিঠি!···সাধনার প্রকৃতিটাই কি এমনি গোছানো ছিল?·· না, সে মনে মনে টের পেয়েছিল চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছে?

নাঃ, তা কেন ভাববে?

এতটুকু অসুস্থতার আভাস নিয়েও তো যায় নি। গিয়ে জ্বর হল, আর মারা গেল!

নাঃ! এসব কাউকে দেখতে দেবে না সুকোমল!

লুকিয়ে সরিয়ে রাখবে!···

এই অতৃপ্ত-বাসনার বস্তুগুলির উপর দস্যুতা সহ্য করতে পারবে না সে!

খাটের তলায় একেবারে ভিতরের দিকে ঢোকানো ছিল, একটা মস্ত বড় স্টীল ট্রাঙ্ক! সাধনার বিয়ের! নিচু হয়ে অনেক কষ্টে ট্রাঙ্কটাকে টেনে বার করল সুকোমল আস্তে আস্তে নিঃশব্দে!

এই ট্রাঙ্কটাই শেষবারে বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সাধনা। এর মধ্যে করেই আবার তাঁর ব্যবহৃত সম্পত্তিগুলি ভরে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন সাধনার মা! সেই অবধি এমনিই সরানো আছে চোখের সামনে থেকে। দৈহিক ব্যথার জায়গাটাতেও যেমন হাত দিতে ভয় করে, মানসিক ব্যথার স্থানটি স্পর্শ করতেও তেমনিই ভয় করে বৈ কি!

সাবিত্রীদের হয় তো করে না, তবু অনেকের করে।

এ ট্রাঙ্কের চাবিও রিঙে আছে। আলমারি খুলতে তেমন কুণ্ঠা আসে না, যেমন আসে বাক্স খুলতে! তবু—খুলে ফেলল সুকোমল। ঘুমন্ত ডালাটা যেন মৃদু একটা আর্তনাদ করে দাঁড়িয়ে উঠল!

গয়নার বাক্সটা, আর সামান্য কিছু শাড়ি জামা। যেগুলি কয়েকদিন পরবে বলে নিয়ে গিয়েছিল।·· আধখানা ব্যবহার করা একটা স্নোর শিশি, মলিন হয়ে যাওয়া প্যাড্ সমেত আধকৌটো পাউডার।

সাধনার মাও কি সাবিত্রীর দলের? চোখের সামনে থেকে সমস্ত চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চেয়েছিলেন? না কি অকস্মাৎ আঘাতে দিশেহারা মাতৃহৃদয় ভেবেছিল সুকোমলের কাছে জিম্মা করে দিলেই বুঝি সব ঠিক থাকবে।

ট্রাংকের জিনিসগুলো বার করে ফেলে আবার একটি একটি করে সব গুছিয়ে

তুলল সুকোমল ;…গুছিয়ে তুলল আলমারি থেকে বার করা সেই স্তূপীকৃত ভার। …দরজার মাথায় তুলে রাখা ফটোখানা নামিয়ে নিয়ে তুলে রাখল কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে। মনে মনে যে কথা সহস্রবার বলেছে সেই কথাই চুপি চুপি উচ্চারণ করল…আমায় ক্ষমা কর সাধনা !

ডালা বন্ধ হতে চায় না, আস্তে আস্তে হাতের চাপ দিয়ে বন্ধ করল ডালা। …তারপর চাবিটা কলে ঢুকিয়ে অনড় হয়ে বসে থেকে এক সময় আরও আস্তে ঘুরিয়ে দিল !

যেন শুধু সাধনার জীবনের এই বস্তুর সঞ্চয়গুলিই নয়, আপন হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয়ও নিভৃতে কোথাও লুকিয়ে রেখে চাবি বন্ধ করে ফেলল সুকোমল !

এ সঞ্চয়ের উপর কারো হাত পড়তে দেবে না, এ সঞ্চয় সরিয়ে রাখবে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে !

গুণ্ঠনবতী

পেয়ারার জেলিটা এনামেলের গামলা থেকে কাঠের চামচ দিয়ে তুলে তুলে কাচের জারের মধ্যে ভরবার সময়, নিবেদিতার মুখে যে প্রসন্ন পরিতৃপ্তির আভা ফুটে ওঠে, সেটুকু দেখবার মতো।

অবশ্য এ থেকে একথা মনে করবার হেতু নেই, নিবেদিতা পেয়ারার জেলির ভীষণ ভক্ত! নিবেদিতার দিকে তেমন করে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, থালাভর্তি বড়ি রোদে দেবার সময়, ভাঁড়ারের শিশিবোতলগুলি ঝেড়ে মুছে চকচকে করবার সময়, কি ধবধপে ওয়াড়গুলি বালিশে পরাবার সময়, নিবেদিতার মুখে লেগে থাকে এমনি পরিতৃপ্ত প্রসন্নতা।

আবার সেই মুখই বিরক্তিকুঞ্চিত হয়ে উঠতে মুহূর্ত দেরী লাগে না, যদি চোখে পড়ে যায়, স্বামী অথবা পুত্রের কেউ, জুতো জোড়াটা খুলে যেখানে রাখবার সেখানে না রেখে ইঞ্চি কয়েক তফাতে রেখেছেন, অথবা চাকর ছোঁড়াটা কুটনোর খোসাগুলো বাড়ির বাইরে ফেলে না এসে উঠোনেই ফেলেছে।

পারিপাট্য আর পরিচ্ছন্নতা, নিবেদিতার জীবনের একমাত্র সাধনা।

ছোট্ট সংসার। আর এই সংসারটি গড়ে তোলবার সমস্ত কৃতিত্বই নিবেদিতার।

এর প্রত্যেকটি তুচ্ছতম জিনিসেও নিবেদিতার হাতের স্পর্শ।

বছর পনরো বয়সে নিবেদিতার যখন বিয়ে হয়েছিলো, স্বামী সত্যশরণ তখন নাবালক বললেই চলে। বিধবা মায়ের অঞ্চলনিধি, মামার বাড়িতে মানুষ।

'মায়ের কষ্ট কমাবো' এই সাধু সংকল্পটুকু ছাড়া তখন আর বেশী কিছু বস্তুর সঞ্চার হয়নি তাঁর মনে। কুড়িবছর বয়সে বি-এ পাশ করেই ঢুকে পড়েছিলেন এক সওদাগরী অফিসে এবং সেই সামান্য উপার্জনের ভরসাতেই বিয়ে করতে দ্বিধা করেননি, মায়ের সাধ মেটাতে।

অবিশ্যি নিবেদিতাই বা এমন কি 'অসামান্য' ঘরের মেয়ে ? কেরানী বাপের ঘরে নেহাত হেলাফেলায় জীবন কেটেছে ছেলেবেলায়। বছর আষ্টেক বয়েস থেকে ছোট ছোট দু'তিনটি ভাই বোনের প্রায় সবটুকু দায়িত্বই তার ঘাড়ে চাপানো হয়েছিলো, মায়ের সময় অভাবের অজুহাতে।

'অজুহাত' বলাটা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অন্যায়, কিন্তু মূল-অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণদৃষ্টি অন্য মন্তব্য করবে। যাক সে কথা, সে জীবন নিবেদিতা ভুলে গিয়েছেন।

মামাশ্বশুর বাড়িতে বছর তিনচার ধরে যে পরগাছা জীবন যাপন করতে হয়েছে, সে জীবনও ভুলেছেন। এখন নিবেদিতার নিজের সংসার! নিজের রচনা!

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর থেকে সত্যশরণকে অবিরত একরকম উত্যক্ত করে করেই বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি সেই বহুপরিবারের বেড়াজাল থেকে।

ভীরু সত্যশরণ প্রথমে দিশেহারা হয়েছিলেন, নিবেদিতার এই দুঃসাহসে। নিশ্চিত ভেবে রেখেছিলেন, আবার লজ্জার মাথা খেয়ে ফিরে আসতে হবে মামার বাড়ির জটিল সংসারচক্রের মধ্যে।

কারণ নিজে আলাদা একটা সংসার করা সম্ভব, এ ধারণাই তাঁর ছিলো না। ভেবেছিলেন, "আচ্ছা বেশ ! জব্দ হোক কিছু।"

কিন্তু তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। যেমন তেমন করে শুধু 'সংসারই' করেন নি, সে সংসারকে ছবির মতো করে সাজিয়েছেন। ফিটফাট ছিমছাম পরিপাটি সুন্দর।

অথচ, নিজের জেদে আলাদা হয়ে এসেছেন, এই অপরাধবোধের দায়িত্বে স্বামীকে কখনো এতোটুকু ঝক্কির ভার দেননি। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে সত্যশরণ টেরও পাননি কখনো, খোঁজও নেননি। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন নিবেদিতার হাতে।

অবিশ্যি জীবনকে বেশী জটিল করেও তোলেননি তাঁরা।

ছোট্ট সংসার, চাহিদা পরিমিত।

একটি মেয়ে, তাকে বিয়ে দিয়েছেন বছর চারপাঁচ আগে। কৃতী জামাই, দূরে থাকে, কদাচিৎ আসে। তাতে দুঃখ নেই নিবেদিতার, মেয়ে সুখে আছে এই ভালো।

এই বিয়েটাও তো নিবেদিতারই অশেষ চেষ্টার পুরস্কার।

সত্যশরণের সাধ্য ছিলো এমন একটি জামাই যোগাড় করবার ?

আর একটি সন্তান, ছেলে গৌতম।

তার জন্যে যথাসময়ে যথোপযুক্ত খাওয়া-পরার যোগান দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। নিজের ধারে কেটে যাচ্ছে সে। টকাটক করে এগিয়ে এগিয়ে সাধারণ ছেলেদের চাইতে বেশ কিছু কম বয়সেই এম-এ পড়ছে এখন। তাকে গড়বার জন্যে নিবেদিতাকে আর কিছু করতে হবে না।

এতোদিনে যেন যুদ্ধের প্রয়োজন ফুরিয়েছে নিবেদিতার।

জীবনে এসেছে একটা স্তিমিত শান্তি।

এখন শুধু মসৃণ পথটায় চাকাটাকে গড়িয়ে দেওয়া। অথচ নিবেদিত আজও যেন ফুরিয়ে যাননি। তাই অটুট স্বাস্থ্য আর অক্লান্ত মন নিয়ে তি দৈনন্দিন কাজগুলোই করে তুলছেন অফুরন্ত।

ফর্সা বিছানা আরো ফর্সা করছেন, ঝাড়া ঘর আবার ঝাড়ছেন। স্বামী পুত্র আর ভৃত্য এই তিনটি প্রাণীকে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে অহ টিকটিক করছেন।

বড়ি দিচ্ছেন, আচার করছেন, নতুন নতুন খাবার শিখছেন বই কাগ রেডিও থেকে!

সত্যশরণ যার নাম দিয়েছেন 'বাতিক'।

কি একটা কাজে বাড়ির ভিতরে এসে সত্যশরণ দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেসে বললেন—আবার কি হচ্ছে আজ? নতুন কি বাতিক?

—নতুন নয় পুরনো—নিবেদিতা হাসলেন—কি চমৎকার সোনার মতো রঙটা হয়েছে দেখো?···পেয়ারাগুলো ভালো ছিলো।

বরাবরই এইরকম 'স্বর্ণবর্ণের' জেলি বানিয়ে থাকেন নিবেদিতা, ও প্রত্যেকবারই যেন নিজের কৃতিত্বে মুগ্ধ হন, পুলকিত হন। সর্ববিষয়েই এ রকম। প্রায় প্রত্যেক হপ্তাতেই সত্যশরণকে শুনতে হয়, বিছানাটা কী ফ হয়েছে দেখেছো? তোমার ধোপার চেয়ে ভালো।

সত্যশরণ যদি অজ্ঞতাবশতঃ ছোকরা চাকরটার প্রশংসা করে বসেন এরজন্যে হেসে গড়িয়ে পড়েন নিবেদিতা। বলেন—ওই আনন্দেই থাকো। ফটকে বাবার সাধ্যি আছে, একটাও ওয়াড় এরকম ফর্সা করবার। শ্রীমতী নিবেদি দেবী, বুঝলে?

সত্যশরণ বলেন—বামনী-ধোপানী একটু উঁচু দরের হবে বৈকি।

প্রায় এই এক ধরনেরই কথা। একই ধরনের হাস্য পরিহাস।

আলাপে আলোচনায় বৈচিত্র্যের স্বাদ আনবার যোগ্যতা, সাদাসিধে মানু সত্যশরণের নেই।

নিবেদিতার ছিলো কি না, সে সন্ধান করছে কে? আত্মীয়-স্বজন যা আছে, সবই ওই 'এক গোয়ালের'।

গৌতমের স্কুল-কলেজ নিয়ে একটু কথাবার্তা কইতে ইচ্ছে করে নিবেদিতার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে, সারাদিন সে কি করলো, কার সঙ্গে মিশলো এই সব।

বিচারকের ভঙ্গীতে নয়, সুহৃদের ভঙ্গীতে।

কিন্তু বড়ো গম্ভীর ছেলে গৌতম। ওর সঙ্গে গল্প বেশী এগোয় না।

তাই মনের কাজ যতো ফুরোচ্ছে নিবেদিতার, হাতের কাজ ততো বাড়ছে ···কে জানে, মনটা ফুরিয়ে যায়নি বলেই হয়তো, এই তার প্রকাশ।

সত্যশরণ নিবেদিতার কথায় আর এক দফা হাসলেন। বললেন—নিজে

সোনার বর্ণ কালি করে এতো সোনালি-সোনালি জেলি করে আর কি হবে ? এতো খাবে কে ?

—কি যে বলো ! এটুকু আব ফুরোতে ক'দিন ? বোতলে মনে হয় অনেক বুঝি। গেলোবারে তো আরো বেশী করেছিলাম।

দাম্পত্য আলাপের সীমানা প্রায় এই পর্যন্ত।

হয়তো ঠিক এইভাবেই বাকী জীবনটা কেটে যেতো নিবেদিতার। হয়তো নতুনের মধ্যে, চাল্লিশ পার হতেই গুরুমন্ত্র নিয়ে, কিছু কিছু পুজো-আর্চা করে বয়েসের আর আচরণের সমতা রাখতেন। ভারসাম্য ঠিক রাখতেন ইহকাল আর পরকালের।···

···হয়তো আরো কিছুদিন পরে—ছেলের বিয়ে দিয়ে, বৌকে সুশিক্ষা দেবার মহৎ প্রেরণায় আর একটু খিটখিটে হতেন, আর আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যেতেন, যদি না—

হ্যাঁ, যদি না একেবারে পুজোর সময় পুরী বেড়াতে আসতেন নিবেদিতা।

বেড়াতে আসাটাও অবশ্য নিবেদিতার চেষ্টার ফল।

সত্যশরণ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র অসুবিধের ফিরিস্তি তুলে তুলে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন, হলো না।

নিবেদিতা উত্তর করলেন—আজন্মকাল তো সুবিধে সুব্যবস্থাই করে এলাম, দেখি না অসুবিধে অব্যবস্থার স্বাদটা কি !···একটা প্রধান সুবিধে তো পাচ্ছো, বাড়ির। সব সময় পাবে ?

গৌতম গম্ভীর ছেলে, প্রস্তাবটা যতোক্ষণ না তার কাছ অবধি এলো, কথা কয়নি। এখন বললে—আমার পড়ার ক্ষতি হবে। ভেবে রেখেছি—এই

নিবেদিতা বললেন—ওখানেই বা তোকে পড়তে মানা করছে কে ? বইপত্তর নিয়ে চল ?

—সে কি করে হবে ? আমি, আর—অন্য একটা ছেলে একজন প্রফেসরের বাড়ি গিয়ে তাঁর সাহায্য নেবো ঠিক হয়েছে—

নিবেদিতা ঈষৎ আহত হয়ে বললেন—এতো সব ঠিক করে ফেলেছিস, কই কিছু বলিসনি তো ?

গৌতম অল্প হেসে বললে—এতে আর বলবার কি আছে ? মাইনে তো লাগবে না !

নিবেদিতা স্বামীর কাছে এসে বললেন—তবে ও থাক। পুরুষ মানুষ, ছেলে মানুষ, জীবনে কতো সুযোগ আসবে। আমি যাবোই।

'আমি' অর্থে 'আমরা'।

সত্যশরণ ছেলের আপত্তি শুনে আশা করেছিলেন, যাওয়া স্থগিত হবার এই একটা মোক্ষম কারণ পাওয়া গেছে।

অবাক্ হয়ে গেলেন নিবেদিতার সংকল্পে।

বললেন—ও থাকবে ? খাবে কি ?

—ফট্‌কে থাকবে, যা পারবে করবে, দু'জনে খাবে ! চারজনেই যাওয়া হবে ভেবে রেখেছিলাম, তা যখন হলো না, করা যাবে কি ? ফট্‌কে ছোঁড়ার কপালে নেই।

সত্যশরণ হতাশ হয়ে নিজেকে নিয়তির হাতেই সঁপে দিলেন।

ক'দিন পরে বেশ একটি প্রকাণ্ড লটবহর আর তার সঙ্গে স্বামীটিকে নিয়ে পুরী এলেন নিবেদিতা।

যদিও স্বামীকে আগে ভয় দেখিয়ে রেখেছিলেন, অসুবিধে অব্যবস্থার স্বাদ পরীক্ষা করতেই যাচ্ছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল 'ব্যবস্থা' আর 'সুবিধে'র সামনে 'অ' বসাবার কোনো অবসরই রাখেননি নিবেদিতা। নিজের বাতিকে রাখেন নি।

অনুষ্ঠানে ত্রুটি থাকবে, এ সহ্যশক্তি নিবেদিতার প্রকৃতিতেই নেই। বিশেষ করে সত্যশরণের ব্যাপারে।

তবু এখানে এসে হঠাৎ যেন বদলে গেলেন নিবেদিতা।

যেন বয়সের একটা মোটা অংশ হারিয়ে ফেললেন।

নিবেদিতা সময়ের জ্ঞান ভুলে ঝিনুক সংগ্রহ করবেন, বালির গাদায় পা ডুবিয়ে চলৎশক্তিহীনের ভূমিকায় হেসে কুটি কুটি হবেন, একটু নির্জনতা সুযোগ পেলেই ছুটোছুটি খেলবেন।

সত্যশরণ বলেন—এখানে এসে খুকি হয়ে গেলে যে !

সত্যিই বটে।

শুধু বয়েস বলেই নয়, গম্ভীর স্বভাব ছেলে গৌতম বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে নিবেদিতার নিজের স্বভাবের ওপর যে একটা গাম্ভীর্যের 'কোটিং' পড়ে আসছিলো, সেটা যেন এখানের এই উদ্দাম সাগরে হাওয়ায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে কোথায় উড়ে গেছে।

সত্যশরণ ঠিক যেন নাগাল পান না।

একটু যেন বিপর্যস্ত হন।

'ক্ষেত্তরের' কাঁসা ভালো বলে, বাসন কেনবার জন্যে যে বেশ একটি মোটা অঙ্কের টাকা আলাদা করে এনেছিলেন নিবেদিতা, তার সদ্ব্যবহার করবার 'চাড়' কই ?...দোকান বাজারের দিকেও তো যেতে চান না। বেড়ানো মানে এই সমুদ্রতীর। এই 'বালির বৃন্দাবন' কি এতোও ভালো লাগে নিবেদিতার ?

সন্ধ্যে হয়ে আসছিলো, তবু নিবেদিতা ঝিনুক কুড়োতেই ব্যস্ত।

সত্যশরণের হাতে একটা থলি, আর নিবেদিতা ছোট-বড়ো মাঝারি নানা আকারের ঝিনুক নির্বিচারে সংগ্রহ করছেন আর থলি বোঝাই করছেন।

সত্যশরণ এক সময় একটু অধৈর্য হয়ে বললেন—আচ্ছা, পাগলের মতো কেবল তো কুড়িয়েই যাচ্ছো, এতো ঝিনুক কি হবে ?

—কি হবে ?...হেসে উঠলেন নিবেদিতা, বললেন—হবে আবার কি ? যাবার

দিনে আবার সমুদ্রের জিনিস সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে যাবো।

সত্যশরণ তো দিশেহারা। বললেন—এই এতোদিন ধরে এতো কষ্ট করে কুড়োলে, ফেলে দেবে?

—কুড়োলাম বলে ওই বস্তাভর্তি ঝিনুক বয়ে নিয়ে যাবো নাকি কলকাতায়?

—তাহলে এতো বোঝাই করলে কেন?

—কেন?···নিবেদিতা হাতের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন—কলকাতা ছেড়ে পুরীতেই বা এলাম কেন?

—আর হবে না, অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না! চলো—

হঠাৎ পিছন থেকে একটি গম্ভীর অথচ সকৌতুক কণ্ঠ ব'লে ওঠে—বিনা অনুমতিতে কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না! সমুদ্রতটকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে যাবেন প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন নাকি?

দু'জনেই চমকে তাকান।

সৌম্যকান্তি মাঝারি বয়সের একটি ভদ্রলোক।

মাথায় কিছু পরিমাণ টাক, চোখে কালো সেলের চশমা। গায়ে ঢিলে হাতা সাদা পাতলা পাঞ্জাবি। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে যেন বিশেষ একটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে, সব কিছুর ওপর।

ফিরে দাঁড়িয়ে তিনজনের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হয়। এবং নবাগত ভদ্রলোকই আবার কথা বলেন—দিন চারেক হলো এসেছি, আর দু'বেলাই চোখে পড়ছে আপনার অদম্য অধ্যবসায়। সরকারী দপ্তরে খোঁজ নিয়ে রেখেছেন, ঝিনুকের ওপর ট্যাক্স আছে কি-না?

এবারে সত্যশরণই নিবেদিতার হয়ে উত্তর দেন—তার দরকার নেই। উনি স্থির করে রেখেছেন, যাবার দিনে সমুদ্রের সম্পত্তি সমুদ্রেই ফেরত দিয়ে যাবেন।

শুনে ভদ্রলোক যেন একটু সচকিত হলেন।

কণ্ঠে ফুটলো তার আভাস। বললেন—তাই নাকি? কিন্তু কেন বলুন তো?

এবারে সোজাসুজি নিবেদিতাই উত্তর দিলেন। বললেন—মন্দ কি? খুশিটা রইলো, দায়টা রইলো না।

ভদ্রলোক বললেন—তা বেশ। আপনার পরিকল্পনাটি নতুন, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা চলে।

সত্যশরণ বললেন—বেশ তো, চলুন না আমাদের বাসায়? দু'দণ্ড বসে বসে ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা যা কিছু সব হবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—কোথায় আপনার বাসা?

—এই তো, একটুখানি।

—বালিভাঙা 'একটুখানি'?

সত্যশরণও হাসেন—তা যা বলেছেন! বালির রাস্তা বেজায় জোচ্চোর। আধমাইল দূর থেকে মনে হয়—ওই যে, ওই তো সামনেই।···আপনি কোথায়?

ভদ্রলোক একটা বিখ্যাত হোটেলের নাম উল্লেখ করলেন।

—আরে! ও তো আমাদের বাসার কাছেই! দেখেন নি, 'তীর্থকুটির'?

তবে আর কি, চলুন এগোনো যাক।···গরীবের কুঁড়েয় একবার পায়ের ধুলো দিয়ে তারপর স্বস্থানে যাবেন।···আমরা মশাই কলকাতার লোক, যেখানেই যাই দু'দিনে হাঁপিয়ে উঠি।

—সমুদ্রের ধারে এসে আপনি হাঁপিয়ে উঠছেন? বলেন কি? বিজ্ঞানকে যে উড়িয়ে দিতে চান দেখছি।···

চমৎকার হেসে ওঠেন ভদ্রলোক।

হাসিটি সত্যিই ভারী সুন্দর খোলামেলা।

নির্বেদিতা স্বামীর এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে মনে মনে অস্বস্তিবোধ না করে পারেন না।······রাস্তায় দেখা হয়েছে, বাঙালী বাঙালীর সঙ্গে দুটো কথা কয়েছো, মিটে গেলো ল্যাঠা!······তাকে আবার ডেকেডুকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া কেন?

স্বামীকে উদ্দেশ করে বলতে যান—'তুমি তো বেশ লোক? উনি হয়তো এই মাত্র বেরিয়েছেন, হয়তো বেড়ানো শেষ হয়নি, ধরে নিয়ে যাচ্ছো মানে?' কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন—কি জানি, তাঁর অনিচ্ছে ভাবটা যদি ধরা পড়ে যায়। বরং উল্টো কথাই বলেন! বলেন—ওঁর কথা বাদ দিন। উনি ফী হাত বিজ্ঞানকে অজ্ঞান করে ছাড়েন। কিন্তু হাঁপিয়ে না উঠলেও 'বন্ধুলাভ' যোগটাকে নষ্ট হতে দেবো কেন?

এই কথাটা বলেই বরং সন্তুষ্ট হন নির্বেদিতা। বেশ ঝরঝরে কথাগুলো বলা গেলো।

ভদ্রলোক বলেন—সেটা উভয় পক্ষে।···কিন্তু এটাতো আপনার নীতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।

নির্বেদিতা অবাক্ হন তাঁর আবার কি নীতি।

অন্ধকার হয়ে গেছে মুখের ভাব দেখা যাচ্ছে না আর, তবু ভদ্রলোক বোধকরি ভাবটা অনুমান করে বলেন—খুশির খেসারতের দায় পোহানো তো আপনার নীতি নয়?

—ওঃ তাই। তা দায়টা কিসের? বন্ধুর জন্যে তো ট্যাক্স লাগে না।

—কিন্তু চা লাগে। দেখবেন শেষে খাল কেটে কুমীর আনলেন।

বেশ লাগে সত্যশরণের এই সব সরস কথাবার্তা।

নিজে তিনি মোটেই আলাপপটু নন, কিন্তু হাস্য-পরিহাস আলাপ-সালাপ ভালোবাসেন খুব। আর মুগ্ধ হন নির্বেদিতার অকুণ্ঠ পটুতায়।

এটা আজ বলে নয়, বরাবরের ব্যবস্থা।

বাড়িতে অতিথি-কুটুম্ব, জামাই-বেহাই, মেয়ে-পুরুষ যেই আসুক অভ্যর্থনার দায় নির্বেদিতার। নিজের কাজ কামাই করে তাঁদের মান রক্ষা করতে হবে বসে-বসে নির্বেদিতাকেই।

সত্যশরণ অপটু। গৌতম অনিচ্ছুক।

সত্যি পারেনও নির্বেদিতা, যার সঙ্গে যেমন।

ভদ্রলোক সেদিন এলেন বটে, তবে বসলেন না।

আগামী দিনের জন্যে চায়ের নেমন্তন্ন পাতিয়ে বিদায় নিলেন। বললেন—াড়ি তো চিনে নিলাম, আর ঠেকায় কে!

বিদ্যুতালোকে স্পষ্ট করে আর একবার দেখা গেলো মানুষটাকে। মাঝারি য়েস, হয়তো নিবেদিতার চাইতে দু'এক বছরের বড়ো, হয়তো বা তাও নয়, ান্তিতে সৌম্যভাব আছে, তার জন্যে দেখায় কিছু বেশী।

কিন্তু প্রকৃতি ভারী সরল।

গম্ভীর গলা, কিন্তু ভাষায় সরস কৌতুকের হীরকধার।

পথে আসতে আসতে পরিচয় জানাজানি হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক এক বে-সরকারী কলেজের প্রফেসর, বিয়ে-টিয়ে করেননি, শখের ধ্যে বছরে দুটো বড়ো ছুটিতে কাছে-পিঠে একটু বেড়াতে আসা, নেশার মধ্যে ধ্যয়ন। যে বই ভালো লাগে দশবার পড়েন, যে দেশ ভালো লাগে পাঁচবার ান।

পুরীতেই এসেছেন এই নিয়ে বার চারেক।

শুনে নিবেদিতা চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছেন—কেন বলুন তো? ভারত-র্ষের আর সব দেশরা কি অপরাধ করলো?

প্রফেসর হেসেছিলেন—বছরে দুটো করে দেশ দেখলেই কি ভারতবর্ষের সব দেশ ফুরিয়ে উঠতে পারবো?

—তবু মোটামুটি ভালো ভালো জায়গাগুলো তো দেখা হয়ে যাবে?

—তখন আবার মনে হবে, 'কি আর হলো, পৃথিবীতে কতো কতো ভালো ভালো জায়গা অদেখা রয়ে গেলো!'

সত্যশরণ বোধকরি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবার বাসনায়, প্রফেসরের এ কথার পিঠে বলে উঠেছিলেন—তার চাইতে মশাই ও আশার গোড়ায় ছাই দেওয়াই ভালো কি বলেন?

এঁদের বাসা থেকে নেমে হোটেলের দিকে যাবার পথে আবার কিছুটা এগিয়ে দিতে এলেন এঁরা, পরদিনের জন্যে পুনঃপুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

প্রফেসর বললেন—'আপনারা তো মাত্র দুজনই আছেন দেখছি। আমি আবার 'তৃতীয় ব্যক্তি' হয়ে কারুর অভিশাপ কুড়োবো না তো?

বলে হাসিমুখে তাকালেন নিবেদিতার দিকে।

নিবেদিতা কিছু বলবার আগেই সত্যশরণ বোধ করি 'কর্তার' দায়িত্ববোধে তাড়াতাড়ি বললেন—না না, সে কি? সে আপনি কিছু মনে করবেন না। উনি লোক খুব ভালো।

—তাই নাকি? আপনি তো তাহলে ভাগ্যবান।

প্রফেসরের অবাধ হাস্যে মুখরিত হয়ে উঠলো নির্জন বেলাভূমি।

নিবেদিতা ভাবলেন—রোসো, বাড়ি ফিরে দেখাচ্ছি মজা।

যেখানে সেখানে বোকার মতো এক একটা কথা না বললেই নয়?

'বাসায় ফিরেই' বলবার আর দেরি সইলো না নিবেদিতার, পথেই তর্ক শুরু করলেন—তোমার ও কি একটা কিম্ভূত কথা বলা হলো ?

—কেন ? কেন ? কোন্‌টা গো ?

—'উনি খুব লোক ভালো'—স্বামীর নকল করে বলে ওঠেন নিবেদিতা- কী চমৎকার ! ভদ্রলোক কি রকম হাসলেন ?

সত্যশরণ মাথা চুলকে বললেন—বাঃ ! হাসির কি আছে ? ভালোকে ভা বলবো না ?

—না বলবে না ! কোনো কথার যদি ছিরি-ছাঁদ থাকে তোমার। হুট্ ক ওকে ডেকে আনবারই বা কি দরকার ছিলো ? বেশ আছি দু'জনে। আবার এসে এসে উৎপাত করুক ?

সত্যশরণ অসহায়ভাবে বলেন—আহা বুঝছো না, ভদ্দরলোক নিজে যে আলাপ করলেন,—আমাদের দিক থেকে একটু আগ্রহ দেখানো উচিত নয় কি

—সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার উচিত-বোধের জ্ঞানটা হঠাৎ খুলে গে দেখছি যে ? ওসব বালাই তো ছিলো না কখনো।

—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা—তা তোমাকে তো তখন বিশেষ অসন্তুষ্ট ম হলো না বাবু ? এখন এ তো রেগে যাচ্ছো কেন ?

—সাধে বলি, তোমার বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে। তুমি যা ভদ্রতা করে 'আসুন মশাই' করছো, আমি যদি তাকে একটু খাতির না দেখ ভাববে কি লোকটা ?…ওকি হচ্ছে ?

গা থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে সেটাকে বারান্দায় টাঙানো দড়িতে ছড় দেবার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন সত্যশরণ। পুরীর বিশ্রামহীন ঝো হাওয়ার সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না কিছুতেই। ব্যর্থ হয়ে লণ্ডভণ্ড জাম নিবেদিতার হাতে ফেলে দিয়ে বলেন—অসম্ভব ! হবে না ! পুরীর আর ভালো, এই দিনরাত্তির ঝড়টা অসহ্য বাবা।

নিবেদিতা সেই দড়িতেই সুকৌশলে জামাটা ছড়িয়ে দিয়ে গলার হ আটকানো সেফটিপিনের গোছা থেকে গোটা দুই লাগিয়ে আটকে এসে বলেন- আমার তো এই জন্যেই এত ভালো লাগে। ঝড় ঝড় !…সারাদিন সারারাত ব বইছে, যেমন সমুদ্র তেমনি বাতাস, বিরামহীন বিশ্রামহীন !

—এখানে এসে কবি হয়ে গেলে দেখছি—ব'লে হাত মুখ ধুতে য সত্যশরণ।…সত্যি বলতে, নিবেদিতার এই নতুন রূপ তেমন যেন ভালো লা না সত্যশরণের। একটু যেন অস্বস্তিকর, হয়তো বা একটু ভীতিকরও। ক ভালো লাগে, শুনলেই যেন গা ছমছম করে।…আসল কথা—'জগতে শ *প্রিয়া আর আমি'—এমন নিঃসঙ্গ অবস্থা জন্মে কখনো আসেনি সত্যশরণে ঠিক ম্যানেজ করতে পারছেন না।*

রাগ হয় গৌতমের ওপর।

এলেই পারতো ছেলেটা। ফটিকটাও আসতে পেতো তাহলে। সংসার সংসারের মতো লাগতো !…একেবারে নিছক একলা ! একটি যদি বা সদালা

লোক জুটলো, দুটো কথা কয়ে বাঁচা যাবে, তাও নিবেদিতার পছন্দ নয় আশ্চর্য !

শুধু স্ত্রীর সঙ্গে গল্প !

কতোক্ষণ করা যায় ?

ভদ্রলোকের নাম যতীশ্বর মুখার্জি ।

বাড়িতে মা আছেন, আছেন দুই দাদা বৌদি । নিজে বিয়ে করেননি। হালকা জীবন, আছেন ভালো । বই-টই নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন বটে, তবু মজলিসীও বলা যায়। এককথায়, যে কোনো ধরনের লোকের সঙ্গেই জমিয়ে নিতে পারেন ।

বুদ্ধিমান লোক ।

এঁদের সঙ্গে এই সামান্য আলাপেই অবস্থাটা অনুমান করে নেন। মনে মনে ভাবেন গিন্নিটি তো বেশ চৌকস, আহা বেচারা কতা ! বোকা-সোকা ভালো-মানুষ ! যেতে হবে কাল ।

* * *

ঝড় ঝড় !

না ঠিক ঝড় বলা চলে না, ঝোড়ো হাওয়া ! মুঠো মুঠো বালি উড়ছে··· ভিজে ভিজে নোনা বালি ।···জমা হচ্ছে—চুলে, কাপড়ে, ঘরের কোণে কোণে ।··· দড়িতে ঝোলানো সত্যশরণের জামাটা তোলা হয়নি। ওটা যেন শূন্যে মাথা কুটে কুটে মরছে ।···

বারান্দাটা থেকে সমুদ্র দেখা যায় না, দেখা যায় ছাতে উঠলে। এখান থেকে শুধু গর্জন ! অন্তহীন শ্রান্তিহীন ।

রাতটা বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের, আকাশে শুধু তারা ।

সন্ধ্যে থেকে পড়ে থাকা ইজিচেয়ারটাতে এসে বসলেন নিবেদিতা ।···কে জানে কতো রাত·· দুটো ? আড়াইটে ?

বেশ লাগছে এভাবে চুপচাপ একা পড়ে থাকতে ।

অভ্যস্ত জীবন থেকে আকাশ পাতাল পার্থক্য !

নিজেকে যেন কলকাতার সেই পরিচিত নিবেদিতা বলে মনেই হয় না ।···

বসে থাকতে থাকতে গা শিরশির করছে, শীত ধরে গেলো প্রায়, তবু যেন উঠে যাবার তাড়া নেই। শুধু আঁচলটা একটু ভালো করে টেনে গায়ে ঢাকা দিলেন ।

কে জানে কেন কিছুতেই ঘুম আসছে না ।

নিজেরই আশ্চর্য লাগছে নিবেদিতার ।

কলকাতাব বাড়িতে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতেন মাঝরাত্রে উঠে খোলা আকাশের নিচে জেগে জেগে চুপচাপ বসে আছেন নিবেদিতা ?

ওখানে সমুদ্র নেই, বাতাস তো আছে ?

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কা খেতে খেতে বাতাস ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রহীন নীরবতার দেশে ! এক একটা বৈশাখী সন্ধ্যায়, কি আশ্বিনের রাতে সেই বাতাস

তো সমুদ্রের গর্জনই বয়ে নিয়ে আসে।···সমুদ্রের মতই উন্মাদ বেদনায় মাথা কুটতে থাকে সারারাত সারাদিন। ঝোড়ো হাওয়ার সেই পাগলামি তো বহুবার দেখেছেন নিবেদিতা।

কই নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়নি তো।

এমন করে হারিয়ে ফেলেননি তো নিজেকে।

তেমন-তেমন এলোমেলো দিনে তিনি ছেলেমেয়েকে কাসি হবার ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছেন, হাত-গলা-ঢাকা মোটাসোটা জামা পরতে বাধ্য করিয়েছেন।···

দিনে রাত্রে সাধ্যপক্ষে ঘরের জানালা দরজা খুলে রাখতে দেননি, পাছে ধুলো এসে ঘর নোংরা হয়। ধুলো-ভীতির এই অদ্ভুত বাতিকে কতোদিন ঝগড়াই হয়ে গেছে সত্যশরণের সঙ্গে।

অথচ এখানে সর্বত্র ভিজে ভিজে নোনা বালি।

নিবেদিতার যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিন্তু নিবেদিতা কে ?

বহুদিন আগে যে ছোট একটা ফ্রক-পরা মেয়ে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ভাইবোনের কান্না সামলাতে, মাঝে মাঝে নিজেই কেঁদে ফেলতো, সেই কি ?

নাকি বহু পরিবারের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া অবগুণ্ঠনবতী যে বধূটি অবিরত পরের মন জুগিয়ে দিন কাটাতো আর অহরহ ভবিষ্যতের রঙিন ছবি আঁকতো, তারই নাম নিবেদিতা ?

আর এই যে, আপন পরিমণ্ডলে দীপ্ত উজ্জ্বল, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির সচেতন মহিমময়ী নিবেদিতা ? অনেকের ভয় অনেকের সম্ভ্রম আর অনেকের ঈর্ষার পাত্র হয়ে বিরাজ করছেন !

নিবেদিতা যাকে যথার্থ 'নিবেদিতা' বলে মেনে এসেছেন এতোদিন, তিনি ছাড়াও আর কোথাও আর কেউ আছে নাকি, 'নিবেদিতা' যার নাম ?

সে কি ছিলো ?

সে কি নতুন জন্ম নিলো ?

তার চেহারাটা আবার কি রকম ?

মানুষ নাকি বার বার জন্মায়, বার বার মরে। দেহান্তের নীতি মেনে মেনে তার এই জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল রচিত।

কিন্তু দেহান্ত না হয়েও একই দেহে কি বার বার মৃত্যু ঘটেনা মানুষের ? বার বার নবজন্মলাভ হয় না ?

প্রতি মুহূর্তেই তো মরছে মানুষ, প্রতি মুহূর্তেই ফের জন্মাচ্ছে নতুন মূর্তি নিয়ে। সেই অনেকগুলো জন্মমৃত্যুর সমষ্টিতে গড়া মানুষকে কি করে তবে 'এক' বলা যায় ?···কি করে সবসময় চিনতে পারা যাবে তাকে ?

*　　　*　　　*

—এ কি তুমি কখন উঠে এসে এই ঝোড়ো হাওয়ার মুখে বসে আছো ?

ডেক্‌চেয়ারটার পাশে সত্যশরণ এসে দাঁড়ালেন।

শিথিল ভঙ্গী ত্যাগ করে নিবেদিতা উঠে বসলেন।

বললেন—এই তো একটু আগে। তুমি অমনি এসে হাজির হয়েছো ? কি ভাবলে, তোমাকে ফেলে কোথাও উধাও হয়েছি ?

—হ্যাঁ ভাবলাম তাই! সেই ভয়েই তো ছুটে বেরোলাম খুঁজতে। চলো চলো, খুব হাওয়া খাওয়া হয়েছে—

—যাওনা তুমি, যাচ্ছি। না কি বসবে একটু ?

—রক্ষে করো, ঘরেই যা কাণ্ড হচ্ছে। আলনা থেকে কাপড়গুলো সমস্ত ঘরের মেঝেয় জমা হয়েছে, আর তোমার ওই টেবিল-ঢাকার কোণটা ক্রমাগত একভাবে উড়ে উড়ে পায়ায় ধাক্কা খাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে কে যেন চটি প'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।···অনেকক্ষণ জেগেছি আমি।···তোমারই হাওয়া খেতে খেতে সময়ের জ্ঞান নেই!

নিবেদিতা উঠলেন।

বললেন--শোওগে তুমি, আমি চেয়ারটা আর তোমার জামাটা তুলে রেখে যাচ্ছি।

—আরে, জামাটা এখনো রয়েছে? কি আশ্চর্য! পিনের খোঁচা লেগে ছিঁড়লো না তো?

—ছিঁড়ে থাকে তো আপদ গেছে। ওটা তো তোমার সেই কাঁধবড়ো পাঞ্জাবিটা?

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ফিরে এসেছেন নিবেদিতা। অভ্যস্ত পটুতায় একসেকেণ্ডে চেয়ারটা তুলে, জামাটা খুলে নামিয়ে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

সত্যশরণ বললেন—এখানে এসে তুমি যেন কি রকম বদলে গেছো।

নিবেদিতা হাসলেন—বদলানোই তো উচিত, চেঞ্জ মানে কি তাহলে? এতো টাকা খরচ করে আসার উদ্দেশ্য কি তবে?

সকালবেলা চায়ের সঙ্গে অনুপানের আয়োজনটা একটু বেশী করা হলো, নিমন্ত্রিত অতিথির খাতিরে!

যত্ন করে করে এটা ওটা তৈরী করলেন নিবেদিতা।

একসময় বারান্দায় বেরিয়ে এসে স্বামীকে বললেন—তোমার অতিথি আর এসেছে! কাল ভদ্রতার খাতিরে বললো 'আসবো আসবো'! আমার শুধু শুধু কর্মভোগ!

—বাঃ সে কি, অতো করে বলা হলো! উনি নিজেও তো—এমন কিছু বেলা হয়নি এখনো, আসবেন ঠিক।

—রাত্রে দেখা, বাড়ি বুঝতে পারবেন তো? আমায় তো এখানে রাস্তাটাস্তা কেমন গুলিয়ে যায়।

—তোমার কথা বাদ দাও। শুনলে তো, ভদ্রলোক চারবার এসেছেন।···কি কি করলে?

—হাতী ঘোড়া অনেক কিছু। তোমার যেমন! সমাজ সংসার ছেড়ে দু'দিন গায়ে হাওয়া লাগাতে এলাম, এখানেও যতো সব ঝামেলা জোটাচ্ছো।

সত্যশরণ একটু আহত হন।

নিবেদিতা যে সত্যিই বিরক্ত হবেন এটা তিনি মোটেই আশঙ্কা করেননি। লোককে খাওয়াতে টাওয়াতে তো খুবই ভালবাসেন নিবেদিতা।

একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সহসা দেখলেন একটা অনুপম উজ্জ্বল আভায় যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছে নিবেদিতার বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখ, দুই হাত কপালে তুলে কলকণ্ঠে কাকে সম্বর্ধনা করছেন—এই যে আসুন! এতোক্ষণ ভীষণ নিন্দে করছিলাম আপনার!

নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলেন সত্যশরণ।

ওঃ তাই? এতোক্ষণ ঠাট্টা করছিলেন নিবেদিতা!

সত্যি ভারি সুন্দর লোক যতীশ্বর।

খাওয়া নিয়ে এমন একটা আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করা যায়, এ জানা ছিলো না নিবেদিতার!

জীবনে অনেক রান্না রেঁধেছেন, অনেক শৌখিন খাবার তৈরি করে করে লোক নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন, ভালো রান্নার খ্যাতি যে নিবেদিতার না আছে তা নয়, মামাতো দ্যাওর আর নন্দাইরা তো কতো হৈ-চৈ করে আমোদ করে খেয়ে যায় তাঁর বাড়িতে, কিন্তু কই, এমন মার্জিত সভ্য সরস প্রশংসা কে করে করেছে?

জানে কে?

ওরা সবাই যেন কেমন স্থূল!

যতীশ্বর বলেন—এসেছেন তো চেঞ্জে, এতো সব যোগাড়-যন্তর করলেন কি করে বলুন তো?

নিবেদিতা লজ্জিত মুখে বলেন—কি আবার এতো যোগাড়-যন্তর দেখলেন আপনি?

—'কি' যে, তা কি আমিই জানি ছাই? এসবে অনেক কিছু লাগে তাই জানি। তাহলে একটা 'ঘরের কথা' বলি আপনাকে। আমি বরাবর একা-একা বেরোই, একবার মেজদার শখ হলো, সপরিবারে আমার সঙ্গ নেবেন।···বেশ চলো! বেশী কোথাও নয় হাতের গোড়ায় ঘাটশিলায়। আমার এক ছাত্রের বাড়ি আছে, মালি গোছের লোকও পাওয়া যাবে একটা, খুব আনন্দ!··· গোছগাছের ধুম দেখে কে! এই স্টোভ আসছে, এই ইক্‌মিক্-কুকার আসছে, একগাদা বাসনই কিনে ফেললেন মেজদা, কাচের এ্যালুমিনিয়ামের এনামেলের হরেক রকম শিশি বোতল কৌটো!···শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম—মেজদা করছো কি বল তো? সারা কলকাতাটা তুলে নিয়ে যেতে চাও নাকি?

মেজদা বললেন—তুই বুঝিস না, মেয়েরা মোটে অগোছ-অবিলি দেখতে পারে না। তোর মেজবৌদির ফর্দ! একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। সব সুশৃঙ্খল চাই।

ভাবলাম তা বটে! মেয়েদের ব্যাপার 'বুঝি' এ দাবি করতে পারি না। আর 'একটু এদিক-ওদিক' হলে যে, কী সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে তাও জানি না। যাক খুব সুশৃঙ্খলে কাটানো যাবে এই আনন্দেই আছি।…প্রথম রাত থেকেই শুরু হলো শৃঙ্খলার নমুনা!…

আশ্বিনের শেষ, কলকাতায় গরম, বাইরে ঠাণ্ডা পড়েছে কিছু কিছু, বিশেষ রাত্রে। ছেলে দুটোকে শুইয়ে মেজদা বললেন—এদের গায়ে একটা করে চাদর-টাদর ঢাকা দিয়ে দাও, ঠাণ্ডা আছে।

মেজবৌদি অবাক্ হয়ে বললেন—গায়ে দেবার চাদর? সে কোথায় পাবো? বাড়তি চাদর তো কিছু আনিনি!…মেজদা বললেন—বেশ করেছো! নিজের শাড়ী ডজন তিনেক এনেছো তো?…বলাই বাহুল্য ভদ্রমহিলা ক্ষেপে উঠলেন—

নিবেদিতা বলেন—শাড়ীর খোঁটা দিলে কোন্ ভদ্রমহিলাই বা না ক্ষেপেন?

—হুঁ, তিনি তখন শুরু করলেন—সিমলে পাহাড়ে আসছি না—কি করে জানবো যে লেপকম্বলসুদ্ধ আনা উচিত ছিলো! আমি তো তবু বুদ্ধি করে ওদের ছোট সোয়েটারগুলো এনেছি, ভাবলাম ভোরে বেড়াতে যাবে! এতো ভেবে, এতো গুছিয়ে আনলাম!

আমার সঙ্গে চাদর-টাদর থাকেই দু'একটা বেশী, সে মোহাড়াটা কোনো রকমে মিটলো।…পরদিন ভোরে আবার! কর্তাগিন্নীতে উচ্চ প্রেমালাপ চলেছে দেখে খোঁজ নিলাম, কী ব্যাপার! না, সাবান টুথপেষ্ট আর্সি চিরুনী আর মেজদার শেভিং সেট্‌টা আসেনি!

—যাঃ, এ আপনি বানাচ্ছেন! এসব আবার ভোলে নাকি মানুষ? —নিবেদিতা বলেন।

—কি মুশকিল! বানাবো কেন! মেজবৌদিই কি জানেন না এসব ভুলতে নেই? পাছে কিছু ভুল হয়ে যায় বলে, ছোট যে এ্যাটাচি কেসটায় 'ছিষ্টি' গুছিয়ে নিয়েছিলেন, সেইটাই খালি ভুলে গেছেন।

যাক সে ঝোঁকটাও কাটলো! মেজদা বললেন—এক কাজ করো, দুটো স্টোভই জ্বালা যাক্, আমি চা-টা করে নিচ্ছি, তুমি দু'চারখানা লুচি আলুভাজা করে ফেলো, খেয়ে দেয়ে বেড়াতে বেরোনো হোক।…এসে তখন তাড়াতাড়ি করে সেরে নেওয়া যাবে।…কিচ্ছু না, মাংস আর ভাত, কি বলিস যতী?

বললাম—'এনাফ্'!…পাশের ঘর থেকে স্টোভ জ্বালার শোঁ শোঁ শব্দ পাচ্ছি, দুটো স্টোভ একসঙ্গে, প্রায় এই সমুদ্রগর্জনের কাছাকাছি, হঠাৎ সে গর্জন ছাপিয়ে, সেই—'দাম্পত্য প্রেমালাপ!'…

শুনলাম 'লুচি হবে না? চাকি বেলুন আসেনি?'

খিদে পেলে মেজদার জ্ঞান থাকে না, বিষম চটেছেন তখন, চীৎকার করছেন—দশদিন ধরে কি ঘোড়ার ডিম গোছালে তবে? আমার পকেট তো ফর্সা হয়ে গেলো 'হ্যানো চাই' 'ত্যানো চাই'-এর জ্বালায়। বিদেশে এসে রান্না খাওয়া করতে হ'লে একটা চাকি বেলুন চাই এ জ্ঞান নেই?

মহা মুশকিল! এ জিনিস তো আমার সুটকেস হাতড়ে মিলবে না!· অগত্যা ছেলেদের জন্যে আনা দু'টিন বিস্কুটের একটিন তক্ষুনি সদ্ব্যবহার করা গেলো পাঁচজনে মিলে।···ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে।···নাটক আরো জমে উঠলো দুপুরবেলা! বেড়িয়ে ফিরে ছেলে দুটো হৈ-চৈ লাগিয়েছে খিদে বলে, মেজদার অবস্থাও তদ্রূপ।···ফেরবার সময় আমাদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আলু পেঁয়াজ আর মাংস নিয়ে এসেছেন কোঁচার কাপড়ে করে···কথা হলো আগামী কাল থেকে বাজার করবার জন্যে একটি থলি নিয়ে বেড়াতে বেরোনো হবে।

মেজদা মহোৎসাহে লেগে গেলেন রান্নায়।

···বৌদি দুটো বঁটি এনেছেন দেখে মহা প্রশংসা।

নিবেদিতা হেসে বললেন—আপনি এতো মজা করে বলতে পারেন! বঁটি আবার দুটো কেন? দু'জনে কুটনো কুটবেন?

—আহা তা কেন! একটায় ফল কাটা হবে!···কিছুক্ষণ পরেই 'আবার, আবার সেই কামান গর্জন'! তখন আবার ভরা দুপুর! রাত্রের ঠাণ্ডার লেশও নেই। আর পারলাম না, উঠে গিয়ে বললাম—মেজদা, করছো কি? খিদে বাড়াবার এ এক নতুন পদ্ধতি নাকি? কতো চেচাচ্ছো?

মেজদা বললেন—চেচাবো না? তুই বলিস কি? সমস্ত নিজে ঠিকঠাক করে মাংসটা চাপিয়ে যেই গরম মসলা চেয়েছি, তোর বৌদি যেন আকাশ থেকে পড়লো! বলে কিনা—'গরম মসলা! গরম মসলা আবার কে আনতে গেছে!'···শোন, শোন তুই!···

মেজাজ ঠাণ্ডা করতে হেসে বললাম—গরম মসলা না দিলে মাংস রাঁধ চলবে না, এরকম কোনো আইন আছে? রেঁধেই দেখো না!···

'তেমন রান্না আমি রাঁধি না। ইচ্ছে হয় ও রাঁধুক!' বলে মেজদা গিযে শুয়ে পড়লেন!

—উঃ, সেই রোদ্দুরে গরম মসলার জন্যে যা ছুটোছুটি!

—বলেন কি? আপনি ছুটলেন?

—বাঃ, তাছাড়া উপায়! গাঁইয়া দেশ, পাওয়াই যায় না সহজে। মাঝি ব্যাটা সেই ইস্তক সমানে আমাকে 'গরম মসলা বাবু' বলে ডাকতো!

সত্যশরণ মহানন্দে মিটিমিটি হাসছিলেন এতোক্ষণ, এইবার মহোৎসাহে বলে ওঠেন—আর ইনি? এঁর ব্যবস্থা যদি দেখেন! আপনি মাঝরাত্রে এসে বাঘের দুধ চেয়ে দেখবেন, ঠকাতে পারবেন না।

—থামো তো তুমি—ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন নিবেদিতা—কথায় একটু মাত্রা রেখো!

সত্যশরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হয়েও জোর বজায় রাখতে বলেন—বাঃ মিথ্যে বলেছি কিছু? ট্রেন থেকে নেমে মাথা ধরার সময় কি হলো?···ব্যাপার কি জানেন মশাই, আমার একটা বিশ্রী ধাত, একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি 'আধকপালে' ধরে বসে আছে, সময় অসময় নেই, হলেই হলো। আমার ম

বলতেন রক্ত-চন্দন, বরাবর তাই লাগাই, সেরেও যায়। তাজ্জব বনে গেলাম মশাই, সেদিন দেখি ইনি বাসায় নেমেই রক্তচন্দন ঘষে এনে হাজির।...তখনো ট্রেনের কাপড় বদলানো হয়নি!

...চকচকে দাঁতে আলোর মত হেসে ওঠেন যতীশ্বর! —যতো শুনছি ততোই আপনার সৌভাগ্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হচ্ছি, সত্যশরণবাবু!

—ছেলেটার আক্কেল দেখছো? সেই একখানা চিঠি ঠেকিয়েই বাস্, বাবুর কর্তব্য সারা হয়ে গেছে!

নিবেদিতা হাতের বইখানা মুড়ে চমকে তাকালেন—চিঠি? কই? কে দিলে?

সত্যশরণ হো হো করে হেসে ওঠেন—তুমি যে সেই 'কাদের সাপ'-এর মতো করলে! চিঠি 'দিলে' আবার কে! দিলে না বলেই তো রাগ করছি। বলছি গৌতমবাবুর আক্কেলের কথা!...হয়েছে আর কি, খাওয়া দাওয়ার তো খুব কষ্ট হচ্ছে? তাতেই রাগ অভিমান হয়েছে বাবুর।

নিবেদিতা কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে যান। সত্যশরণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছেলের আক্কেলেব নিন্দে করতেও পারেন না, পারেন না ছেলের পক্ষ অবলম্বন করতে।

স্বামীর মনস্তত্ত্ব তিনি বুঝতে পারছেন, ছেলের জন্যে মন কেমন করছে। কি খাচ্ছে না খাচ্ছে ভেবে তাঁর নিজের যা কষ্ট হচ্ছে, সেইটাই, 'রাগ অভিমানের' নামে ছেলের দিকেই চাপাতে চাইছেন।

আশ্চর্য! এ মন-কেমনটা নিবেদিতার না হয়ে, হলো সত্যশরণের!... কই, নিবেদিতার এই ক'দিন ক'বার তেমন স্পষ্ট করে মনে পড়েছে গৌতমের কথা? ক'বার মনে পড়েছে কলকাতার কথা?...আনাড়ি ফটিক কি রাঁধছে না রাঁধছে, ঘর সংসার কতো অপরিষ্কার করছে, এসব ভেবে তেমন অস্থির হয়েছেন কোনোদিন?

প্রথমটা অবশ্য ছেলের ওপর তাঁর নিজের অভিমানটাই ছিল প্রবল। জন্মে কক্ষনো কোথাও যাওয়া হয় না, এবারে সত্যশরণের এক বন্ধুর দৌলতে এই বাড়িটা পাওয়া গেলো বলেই না অতো সাধ হয়েছিলো নিবেদিতার, স্বামী-পুত্র নিয়ে কাটিয়ে যাবেন কিছুদিন। সেই সাধে বাদ সাধলো ছেলে।

কিন্তু তাই বলে তিনি মা হয়ে সেই অভিমানটাকে বড়ো করে রেখে দেবেন? ছেলেব জন্যে মন কেমন করবে না? তাকে কষ্ট অসুবিধের মধ্যে ফেলে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে থাকবেন?

নিবেদিতার প্রকৃতি তো এরকম হবার কথা নয়।

নিবেদিতাকে মৌন দেখে সত্যশরণ ফের বলেন—ক'দিন হলো এসেছি আমরা?

সে কথা মনে আছে নিবেদিতার।

দেখেছেন সেদিন, কী দ্রুতগতিতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে! যেন কোথা দিয়ে

…কোন স্বপ্নের ঘোরে।

—এসেছি আজ এই তেইশ দিন!

—এতোদিন ফট্‌কের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে পড়ার বাসনা ঘুচে গেছে বাছাধনের, কি বলো?

ছেলের কথাই একটু কইতে চান সত্যশরণ। 'নিন্দাচ্ছলে স্তুতির' মতো।

—তা ভেবো না! সে ছেলে নয় তোমার! ভাঙবে তো মচকাবে না!

অন্য আর একটা জগৎ থেকে এ জগতে নেমে আসেন নিবেদিতা!

সত্যশরণ বললেন—এক কাজ করলে হয় না? ওকে বিশেষ 'ইয়ে' করে একটা চিঠি লিখে দিই, চলে আসুক! ছুটির শেষ ক'টা দিন এখানে কাটিয়ে সকলে মিলে একসঙ্গে—

নিবেদিতা সহসা কঠিন সুরে রায় দিয়ে দেন—না, আমাদেরই ফেরার চেষ্টা হোক। আর থাকবার দরকার কি?

থতমত খেয়ে যান সত্যশরণ, বুঝতে পারেন না এ কাঠিন্য কার ওপর। স্বামীর ওপর? ছেলের ওপর? কিন্তু কেন? ছেলের ওপর যা রাগ অভিমান হয়েছিলো, তার চিহ্ন তো কই এখানে এসে বোঝাই যায়নি। 'দরকার কি', এ কথার অর্থ আছে?

আসবারই বা কি দরকার পড়েছিলো তবে?

চেষ্টাচরিত্র করে পুজোর ছুটির সঙ্গে আরো একমাস ছুটি নেবার দরকার কি ছিলো?

কিন্তু ভয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন না।

আজকাল যেন মাঝে মাঝে নিবেদিতাকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।

কিন্তু নিবেদিতা নিজেই কি বুঝতে পারবেন, এ কাঠিন্য তাঁর, নিজের ওপর। হঠাৎ কোথায় যেন নিজের একটা ত্রুটি ধরা পড়ে গেছে, এ তারই গ্লানি।

এসে পর্যন্ত তিনিই বা কি এমন অস্থির হয়ে চিঠি লিখেছেন গৌতমকে? প্রবাসী কন্যাকে তো দেনইনি একখানাও।

সত্যশরণের সঙ্গে যতীশ্বরের পরিচয় হবার পর থেকে একটা অলিখিত আইন হয়ে গিয়েছিলো, বেড়াতে বেরোবার সময় যতীশ্বর প্রথমে ওঁদের বাড়ি এসে হাজির হবেন, এসে চা খাবেন, অতঃপর তিনজনে একসঙ্গে বেরোনো হবে।

অথচ এটা এমন কিছু ন্যায্য আইন নয়।

যতীশ্বরও যদি সস্ত্রীক হতেন, দৃশ্যটা শোভন হতো। কিন্তু একক দম্পতি-যুগলের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বেখাপ্পা নয় কি? যতীশ্বর দু'একদিনের পরই এ ব্যবস্থাকে এড়াতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, পেরে ওঠেন নি। পারেন নি ওঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে।

এতো আগ্রহ দেখান সত্যশরণ!

কারণটা এই—সংসারী সামাজিক মানুষ সত্যশরণ, পরিচিত পরিবেশ, অফিসের অভ্যস্ত কাজ, সহকর্মীদের সাহচর্য—সবকিছু ছেড়ে এসে, উদয়াস্ত

কেবলমাত্র স্ত্রীর সান্নিধ্যে যেন হাঁফিয়ে উঠছিলেন। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গল্প আলোচনার যা সব পরিচিত বিষয়বস্তু ছিলো, এখানে তার অনেক কিছুই নেই। যাও বা আছে, নিবেদিতার যেন তাতে মনের যোগ নেই।...

এমন ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি আশীর্বাদের মতো।

হ্যাঁ, সত্যশরণ যতীশ্বরকে আশ্রয় ধরেছেন।

তাঁর আকিঞ্চন এড়ানো শক্ত।

আর নির্বেদিতা ?

সেই তো এক অদ্ভুত রহস্য !

নিবেদিতা যেন একটা অভাবিত সংশয়ের রূপ ধরে যতীশ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

যতীশ্বরের সঙ্গলাভেচ্ছায় সত্যশরণ যে আগ্রহ প্রকাশ করেন, নিবেদিতা তো তার শতাংশের একাংশও করেন না। বরং অনেক সময় স্বামীর কথার প্রতিবাদই করেন। যতীশ্বরের সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন তুলে, স্বামীকে নিবৃত্ত করবারই প্রয়াস পান। কিন্তু ? সেইটাই কি সব ?

যতীশ্বরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার চোখে মুখে যে আলো জ্বলে ওঠে, সে কি লক্ষ্যের বাইরে থাকবার মতো ? সত্যশরণের মতো 'উদোমাদা' লোকের চোখে যদিও বা না ঠেকে, যতীশ্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সীমানা থেকে কি করে আত্মগোপন করবে সে জিনিস ?

মুখের প্রতিবাদের সঙ্গে চোখের অনুনয়ের ভাষার যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

যতীশ্বর অবাক্ হন, অবিশ্বাস করেন, নিজের ধারণাকে সম্পূর্ণ 'ভুল' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। যতীশ্বরের প্রতি নিবেদিতার অসতর্ক মুগ্ধ দৃষ্টি সত্যকে ধরা পড়িয়ে দেয়।

অভাবিত সংশয় নিশ্চিত মীমাংসার মূর্তি ধরে বিপন্ন করে তুলতে চায় যতীশ্বরকে।

কিন্তু—একি সম্ভব ?

একি সম্ভব ?

কী অস্বস্তিকর চিন্তা !

ভাবতে ইচ্ছে করে, অথচ ভাবলে লজ্জা করে। নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা করে। মনে হয় বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেলো নাকি, তা নইলে মনে এমন সন্দেহেরও উদয় হয় ? এমন একটা অসম্ভব অবাস্তব সন্দেহ !

বরং ওদের সঙ্গে যখন ঘোরাফেরা করেন, গল্প করেন, তর্ক করেন, তখন চিন্তাটা এমন পেয়ে বসে না। সন্দেহটা হাস্যকর মনে হয়।

কিন্তু ফিরে এলে ?

একা হলে ?

তখন—তখন আর নিবেদিতার বয়সের মর্যাদা ভালো করে মনে পড়ে না। মনে পড়ে না গৃহিণী নিবেদিতাকে।...মনে পড়ে না—এই সেদিন সত্যশরণের

সঙ্গে কথায় কথায় বয়সের হিসেবে প্রমাণ হয়ে গেছে, নিবেদিতার চাইতে যতীশ্বর নাকি মাস কয়েকের ছোট।

মনে হয় নিবেদিতাই যেন একটি ছোট মেয়ে মাত্র!

দীর্ঘ অবিবাহিত জীবনে এমন বিপন্ন অবস্থায় কখনো পড়েননি যতীশ্বর, এমন বিব্রত বোধ করেননি কোনো দিন।

ভাবেন এড়াতে চেষ্টা করবেন, হয় কই?

দু'বেলা কে যেন লক্ষ আকর্ষণে ওই একটি দিকে টানতে থাকে। না গিয়ে উপায় থাকে না! প্রত্যেক দিন মনে করেন 'আচ্ছা আজই শেষ, তারপর কোনো অজুহাত দেখিয়ে'—কিন্তু পরদিনই হয়তো—না গেলেই চলে না! হয়তো—সেদিন নতুন কোনো একটা জায়গায় যাবার হিড়িক ওঠে। সে দায়িত্ব যে যতীশ্বরেরই।

সত্যশরণ তো চির নাবালক। যতীশ্বরের সঙ্গে আলাপ না হলে, নেহাৎ ওই 'জগন্নাথ' ছাড়া 'দ্রষ্টব্য' বলতে আর কিছু দেখা হয়ে উঠতো নাকি ওঁদের? অজানা জায়গায় যাবার কথা উঠলেই যে সত্যশরণের ভাবনার আর শেষ থাকে না।

অথচ ভারি তো জায়গা পুরী!

দ্রষ্টব্য বলতে যা কিছু সবই তো হাতের কাছে ছড়ানো আছে।···দুর্গমও নয়, দুঃসাধ্যও নয়?···

পুরীতে যা সত্যি 'দেখবার জিনিস' সে তো যে কোনো একটা জায়গায় বালির গাদায় বসে পড়লেই দেখা যায়। তার জন্যে ছুটোছুটি করবার নেই, হাঁফাহাঁফি করবার নেই, টিকিট কাটাতে হয় না, প্রণামী দিতে হয় না!···সেই বিরাট মহান দেবতার, সময়ের একটু এদিক ওদিকে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবার ভয় নেই, 'ভোগ' নেই, 'শয়ান' নেই। আছে শুধু, অনন্তকালের নিত্য আরতি!

তবু তাঁকে ফেলে দেখতে যেতে হয়—'সিদ্ধ বকুল', 'গৌরাঙ্গের ছেঁড়া কাঁথা'!

না দেখলে লোকে বলবে কি?

গালে হাত দিয়ে 'হাঁ' হয়ে যাবে যে!

*　　　*　　　*

সে সব 'ছেঁড়া কাঁথা' মঠ মন্দির ইত্যাদির ব্যাপার প্রায় সবই মিটেছে, এখন নিবেদিতার বায়না এতোদূর এসে কোণারক না দেখে গেলে জীবনই মিথ্যে।

শুনে সত্যশরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে!

কোণারকের পথে যে, ঝোপে-ঝাপে বাঘ আর খোপে-খাপে ডাকাত লুকিয়ে থাকে এবং সুবিধে পেলেই 'ঝুপ' করে ঘাড়ে এসে পড়ে, এ খবর রাখেন না নিবেদিতা?

পুরী এসেছো, বেশ করেছো! জগন্নাথ দেখো, সমুদ্রস্নান করো, দু'খানা

ফট্‌কী শাড়ী হলো, দু'পাঁচখানা 'ক্ষেতরকাঁসা'র বাসন কেনো, এখানে ওখানে বেড়াও, আবার কি !

ফিরে ফিরতি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধো, বাস্‌ !

তা নয়, একি দুঃসাহসিক সাধ ?

এসব শুনে নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন—সেকাল থেকে একাল অবধি যতো লোক 'কোণারক' নামক বিজন অরণ্যের পথে যাত্রা করেছে, তাদের সকলেরই যে যাত্রা, বাঘের দাঁতে কিংবা ডাকাতের হাতে 'মহাযাত্রা'য় পরিণত হয়েছে কিনা :

কর্তা-গিন্নীর এই তর্কের মাঝখানে এসে উদয় হলেন যতীশ্বর। হৈ-হৈ করে উঠলেন সত্যশরণ—এই যে ভায়া, এসে গেছো ! বলি, তুমি তো কালকে—পথের মাঝখানে পটকাটি ফেলে দিয়ে দিব্যি কেটে পড়লে ? এদিকে সে পটকা ফেটে আমার যে জীবন সংশয় !

সরস বাক্‌পটু যতীশ্বরের সঙ্গে বেশ একটু রসালো করে কথা কইবার ইচ্ছেয়, চেষ্টাচরিত্র করে এরকম ঠাট্টা-তামাশা করতে শিখেছেন সত্যশরণ আজকাল।

যতীশ্বর সচকিতে একবার দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারেন।—কারণ কোণারকের কথা তিনিই তুলে গেছেন কাল।

যাই হোক সত্যশরণের কথায় তিনি সহাস্যে বলেন—কেন, কি হলো ?

—হলো আর কি, সেই কোণারক ! কাল থেকে মাথায় ঘুরছে ! ঘুম নেই রাত্তিরে ! মাঝরাত্তিরে উঠে দেখি ঠায় জানলায় বসে !

নিবেদিতা অপ্রতিভ বিরক্তিতে বলেন—হ্যাঁ, মাঝরাতে জানলায় বসেছিলাম কোণারকের চিন্তায় ! এমন বাজে বাজে কথা বলো !

—আচ্ছা তবে, খামোকা ঘুম হচ্ছিলো না কেন ?

—হচ্ছিলো না—হচ্ছিলো না ! তোমার মতো কুম্ভকর্ণ তো সকলে নয় যে, বালিশে মাথা ঠেকোবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে।

যতীশ্বর হেসে বলেন,—তা যেতে বাধাটাই বা কি ? ওখানে হোটেলের বহু লোক যাচ্ছে। প্রায় রোজই তো একটা-না-একটা দল তৈরি হচ্ছে !

—যে যায় যাকগে ভায়া, আমার ওসব তেমন সুবিধে মনে হয় না। নাহক্‌ সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা ! আরে বাবা পৃথিবীতে দেখবার জিনিস কতো রয়েছে, ক'টা দেখছি ?

যতীশ্বর মৃদুহাস্যে বলেন—আমারও অবশ্য আপনার সঙ্গে মতের খুব বেশী তফাত নেই, তবে—

তবে ? আমার ঘরে হুজুগটি তুলে দিয়ে মজা দেখবার তালেই মত বদলাচ্ছিলে, কেমন ? নিজের রসিকতায় নিজেই খুব হাসতে থাকেন সত্যশরণ !

নিবেদিতা যতীশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলেন—খুব তো বলছেন এখন ! সেদিন যে বললেন—দু'বার গেছেন কোণারকে ?

—এই, দলে পড়ে আর কি !

—ইস্‌ তবে যে বলছিলেন—অদ্ভুত ভালো লাগে আপনার ?

—বলে ফেলেছিলাম বুঝি? সে এমন কিছু নয়!···আসল কথা কি জানেন—

সত্যশরণ বললেন—ওঃ এবার তোমরা 'আসল কথায়' নামছো? তাহলে তো আগে চায়ের ব্যবস্থাটা করতে হয় গো! গলা ভিজিয়ে নিয়ে আরম্ভ করাই ভালো!···তর্ক শুরু হলে তো ঘণ্টা কেটে যাবে! তোমার তো তর্ক পেলে আর—

নিবেদিতা বললেন—বেশ, আজ আমি চুপ!

যতীশ্বর সহসা একবার নিবেদিতার মুখের দিকে তাকান। তারপর মৃদু হেসে শান্ত গলায় বলেন—সেটা সহ্য হবে না!···সমুদ্র যদি হঠাৎ আশ্বাস দেয় 'আচ্ছা চুপ করছি—' সইবে আপনার?

নিবেদিতার মুখটা এক সেকেণ্ডের জন্যে কেমন বিবর্ণ দেখায়, মনে হয় উত্তর যোগাবে না, পরক্ষণেই কিন্তু হেসে উত্তর দেন—ওঃ তার মানে—ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে, আমার কথা—সমুদ্রগর্জনের সঙ্গে তুলনীয়। কেমন?

—সেটা উনিই ভালো বলবেন—'গর্জনে'র স্বাদটা যিনি বিলক্ষণ পান!··· বলে যতীশ্বর সকৌতুকে সত্যশরণের দিকে তাকান!

সত্যশরণ পিঠের গেঞ্জিটা উল্টে তুলে, পিঠটা দেওয়ালে ঘষে চুলকোতে চুলকোতে বলেন—ওসব কথার উত্তর কি আর আমার কাছে আছে রে ভায়া? তুমি হলে প্রফেসর মানুষ, লেক্চার করা পেশা, আর ইনি তো—স্রেফ নাটক-নভেল পড়া বিদ্যের জোরেই তোমাকেও হার মানান।···আমি বেচারা তোমাদের অর্ধেক কথার মর্মই বুঝতে পারি না। কি যে হেঁয়ালির ভাষা এখনকার!

নিবেদিতা হঠাৎ কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—ওই শুনুন প্রফেসর মশাই, দেখুন! এই এক তিনকেলে বুড়োর হাতে পড়ে জীবনটাই মাটি হলো আমার।

সত্যশরণ প্রীতহাস্যে বলেন—আর নিজে যেন একেবারে একালিনী। কোন কালে জন্মেছ?

—'সেকেলে' 'একেলে' নির্ণয় করতে কি আর শুধু সাল-তারিখ দেখলেই হয়? ওর আলাদা হিসেব আছে বুঝলে?···কি বলেন প্রফেসর মশাই?

সত্যশরণ হতাশ ভঙ্গীতে বলেন—ওই দেখো ভায়া, আবার হেঁয়ালি!··· কিন্তু সত্যি তুমিই বা এতো কথা কবে শিখলে, তাও তো ভেবে পাই নে সমুদ্দুরের খোলা হাওয়ায় মাথাটা যেন আরো বেশী খুলে গেছে তোমার।··· মাঝে মাঝে মনে হয় দশবছর বয়েস কমে গেলো নাকি!

বাইরের লোকের সামনে কোন্ কথা কতটুকু চালানো যায়, আর কোথায় সীমারেখা টানতে হয় সে জ্ঞান বেচারা সত্যশরণের নেহাতই কম।

নিবেদিতা ঈষৎ বিরক্তভাবে বলেন—হয়েছে, থামো! আর কথা খুঁজে পেলে না।···আসল কথায় আসুন দিকি প্রফেসর মশাই।···কোণারকে যাওয়ার কি হবে? এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যেতে রাজী না হন, আমরাই যাই চলুন। বাঘে খায়, আমাদেরই খাবে।···'বাসে'র ব্যবস্থাটা কি? মাথাপিছু কতো করে ভাড়া?

বহু বাক্ বিনিময়ের শেষে যাওয়ার ব্যবস্থাই পাকা হয়।

সত্যশরণও অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাজী হন।

যদিও নিবেদিতা খুব জোর তলবে বলেন—কেন, তোমার যাবার দরকারটা কি? কেউ তো সাধছে না! না যাবে, নিজেই ঠকবে। আর যদি আমরা বাঘের পেটে যাই, তখন প্রমাণ হবে জিতেছো তুমিই।

সত্যশরণ গম্ভীর ভাবে বলেন—অলক্ষণের কথা নিয়ে বারবার ঠাট্টা করতে নেই।...বেশ ভায়া, ও একটা হেস্তনেস্ত করেই ফেলো। আজ পর্যন্ত তো দেখলাম না কখনো, যেটি ধরবেন, সেটি না করে ছাড়বেন।...আচ্ছা, তোমরা কথাটা সম্পূর্ণ পাকা করে ফেলো, আমি একটু ঘুরে আসছি।

নিবেদিতা বলে ওঠেন--কোথায় আবার এখন ঘুরতে যাবে?

—না না, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি না কোথাও। একটু দোকানে যাবো।

দোকানে? যতীশ্বর বল্লেন—বেশ তো রাত হয়ে গেছে এখন আবার—কোন্ দোকানে? চলুন আমিও উঠি।

--আরে না না, কোথায় রাত? বোসো না। আমি এই এলাম বলে। যাবো আর আসবো।

—ব্যাপারটা কি?

—এই এখানে এক ব্যাটা উড়ের পানের দোকান আছে, বেড়ে পান সাজে। গোটাকতক নিয়ে এসে জমিয়ে বসি।

হঠাৎ যতীশ্বর বলেন—বৌদির চাইতে ভালো পান সাজে আপনার উড়ে?

'বৌদি' শব্দটা এই প্রথম ব্যবহার করেন যতীশ্বর! সত্যশরণের কানে শব্দটা নতুন ঠেকে কিনা কে জানে, তিনি আপন তালেই চটিটা পায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে বলেন—বলা উচিত নয়, উনি চটে যাবেন। তবে—এ আর এক ধরনের বেশ মজার স্বাদ! কি যে 'গুণ্ডি মুণ্ডি' দেয় ব্যাটারা!

সত্যশরণ চলে যেতেই নিবেদিতা দ্রুত ভঙ্গীতে বলে ওঠেন—হঠাৎ নতুন সম্বোধন কেন?

—কই? যতীশ্বর যেন অন্যমনস্ক—ওঃ 'বৌদি' বললাম তাই?...ভালোই তো, কথা বলার সুবিধে।

—এতোদিন বুঝি খুব অসুবিধে পোহাচ্ছিলেন?

—আহা, তা কে বলছে—বাক্‌পটু যতীশ্বরকেও একা একা এভাবে—কেমন একটু নার্ভাস দেখায়। সত্যশরণের যদি কোন বিবেচনা থাকে!

নিবেদিতা অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলেন—নিজেকে একটা সম্বন্ধের সূত্রে বেঁধে ফেলতে না পারলে বুঝি নির্ভয় হতে পারছেন না?...শুধু বন্ধুত্ব থাকা একেবারে অসম্ভব?

যতীশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—'অসম্ভব' শব্দটার সত্যিই কোনো অর্থ আছে কিনা কে জানে। হয়তো নেই।...কিন্তু মুশকিল কি জানেন, আপনাদের যে সম্বোধনের ঠিক কিছু সুবিধে নেই। 'মিসেস অমুক' বলতেও খারাপ লাগে।

—নাই-বা কিছু বললেন !

—কেন বিশেষ একটা ডাকে আপত্তি কি আপনার ?

—নাঃ আপত্তি আর কি !

—কথার সুরে তো মনে হচ্ছে যথেষ্ট আপত্তি।…বেশ ওটা বাতিল। বলুন কি বলবো ? 'মিসেস' দিয়ে পরের নামে না চালিয়ে, নিজের নামে 'দেবী' বললেই হয়। কিন্তু আমি তো আপনার নামই জানি না—

—নাম জানেন না ! আশ্চর্য !

'আশ্চর্যটা' অস্ফুট !

কিন্তু কেনই বা এটা এমন আশ্চর্য মনে হলো নিবেদিতার ! জানাটা কি অবশ্যকর্তব্য ছিলো যতীশ্বরের ?

যতীশ্বর বলেন,—নাম জানবার সুবিধে পেলাম কবে ?…উনি তো 'ওগো শুনছো' দিয়েই কাজ সারেন।

—আপনিও তাই 'বৌদি-টৌদি' যা হয় দিয়ে কাজ সারছিলেন, কেমন ? কাজ সারা নিয়ে কথা !

—তা ছাড়া আর বেশী দাবি করবার ভরসা পাচ্ছি কোথায় বলুন ?

কথা বলার জন্যেই কথা বলা।

তলোয়ারের ফলকের মাঝখান থেকে পিছলে পড়ে সে কথা, ধারালো আগার কাছ পর্যন্ত যেতে সাহস করে না।

—নাম জানতে চাওয়াটা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বলে দোষ ধরবেন ?

—জেনে লাভ কি ?

—লাভ লোকসানের হিসেব ছাড়া, আর কোন কিছু থাকতে নেই ?…ভাবি অনেক সময় কি ধরনের নাম হওয়া সম্ভব আপনার।…মানে আর কি, কি মানায় ? সাহস করে জিগ্যেস করতে পারি না।

—এতে আর সাহসের প্রশ্ন কেন ?…আমার নাম নিবেদিতা !

এলোমেলো বাতাসের কামাই নেই একতিল ! উড়ছে কপালের চুল…উড়ছে শাড়ীর কোণ !…সমুদ্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু…কল্লোল !

নিচে রাস্তায় সত্যশরণকে আসতে দেখা গেলো। ঢিলে-চালা চেহারা, গেঞ্জি মাত্র গায়ে।

—কি হে প্রফেসর, কাজের কথার কতোদূর এগোলো ?

প্রফেসর উত্তর দেবার আগেই দেন নিবেদিতা !

বলেন—সে কথা তো পাকা ! আমার ইচ্ছেই শেষ কথা !

—তা আর জানি না ! ধরেছো যখন ! এই ছোকরাই আমার মাথা খেলো ! …আমার ঘরের গিন্নীটিকে, কি বলে যে—তোমাদের ওই 'তরুণী' করে ছাড়লো !

* * *

কোণারকে যাওয়ার জন্যে এতো তর্ক এতো চেষ্টা, সব পড়লো চাপা। বাক্সবিছানা বাঁধা শুরু হয়ে গেলো নিবেদিতাদের।

গৌতমের চিঠি এসেছে, ফটিকের জ্বর, আর স্টোভ জ্বালতে গৌতম নিজে হাত পুড়িয়েছে।…'তোমরা চলে এসো', কি 'আমার কষ্ট হচ্ছে' একথা বলেনি। কলকাতার এটা ওটা খবরের মধ্যে সাধারণ একটা খবর হিসেবেই চালিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তার জন্যে অভিমান মা বাপের সাজে না। 'তোমাদের আমার প্রয়োজন' একথা দূরে থাক, ছেলেরা যদি স্পষ্ট বলে তোমাদের আমার প্রয়োজন নেই তবু অসময়ে স্থির থাকতে পারে মা-বাপ ?

চিঠিখানা উল্টেপাল্টে বার দুই পড়ে নিবেদিতা মুখ তুলে বললেন—তুমি যে বললে 'গৌতম যেতে লিখেছে', কই ?

—ওই হোলো—সত্যশরণ বললেন—ওর নামই ওর বলা ! ছেলেটিকে চেনো তো ? মান খুইয়ে বলবে—'তোমরা এসো' ?

—মান খোয়াবার দায়টা সর্বদা আমাদের দিকেই থাকা উচিত, কেমন ?—কি মুশকিল, তুমি আবার কি 'আলতাবড়ি' বকতে শুরু করলে ? ফট্‌কের জ্বর, ও হাত পুড়িয়ে বসে আছে, শুনে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে পারবে ?

—কই আর পারছি ? যাচ্ছিই তো ?

যতীশ্বর আর একবার জানান দিতে এসেছিলেন 'বাসে'র ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। পরদিন খুব ভোরে ছাড়বে। প্রায় শেষ রাত্রেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

এসে দেখলেন খোলা সুটকেসের সামনে চুপ করে বসে আছেন নিবেদিতা। সত্যশরণ বাড়ি নেই। সদর দরজা, সিঁড়ির দবজা সব খোলা হাঁ হাঁ কবছে।

হাসতে হাসতে বলে উঠলেন—কি ব্যাপার ! চোরেদের প্রতি এতো সহানুভূতিশীল কেন ? মনে হচ্ছে যথাসর্বস্ব তাদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত !

নিবেদিতা সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বললেন—ওঃ আপনি ! উনি এইমাত্র বেরোলেন।

দরজা খুলে রাখার কৈফিয়ত এটুকু, ওইতেই সারেন নিবেদিতা। মনে হচ্ছে নিতান্ত ক্লান্ত, বেশী কথা বলার স্পৃহা নেই।

যতীশ্বর এদিক ওদিক তাকিয়ে অবাক্ হয়ে বলেন—এ কি, এতো সব ছড়িয়েছেন কেন ? বাসা বদলাবেন নাকি ?

—বাসা নয়, দেশটাই ! কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

—ফিরে যাচ্ছেন !··

—হ্যাঁ !

—কবে ?

—আজই রাত্রে !

মিনিটখানেক স্তব্ধতা !

যতীশ্বর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—এতো হঠাৎ ?

—জীবনে সবই তো একদিন হঠাৎ ঘটে যায়, প্রফেসর মশাই। মৃদু

হাসলেন নিবেদিতা !

—কিন্তু কেন ?

বুকটা দুর দুর করে যতীশ্বরের। পুরুষের বুক হলেও করে।·· সুস্পষ্ট কি কিছু সন্দেহ করেছেন ?

নিবেদিতাকে কোণারকে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে যতীশ্বর কি বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন ?···তাই শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কিন্তু কেন ?

—গৌতমের চিঠি এসেছে !···চাকরের অসুখ, নিজে লুচি ভাজতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে নাকি—

—ওঃ এই কথা !

বুকের স্পন্দন কিছুটা স্বাভাবিক হয় যতীশ্বরের। তার জায়গায় আসে হতাশা। বলেন—তা একেবারে আজকেই ! বেশী পুড়িয়েছে নাকি ?

—লেখেনি স্পষ্ট করে ! কিন্তু—আজ আর কাল ! যেতেই যখন হবে, ও নিয়ে আর তর্ক করিনি।

—না, মানে বলছিলাম—কোণারক ঘুরে এসে পরশু রাত্রের গাড়িতে যেতে পারতেন !

—সে হয় না !

হঠাৎ বিশেষ ব্যগ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন যতীশ্বর—কেন হয় না ? একটা দিনে আর এমন কি এসে যাবে ? আপনি যাবেন ভেবে কাল থেকে—

—কি 'কাল থেকে' ?

—না, না, সে কিছু নয়। বলছি—একটা দিনের তফাতে কি এসে যাবে ?

—এসে যাবে না কিছুই হয়তো ! তবুও হয় না।

—একেবারে অসম্ভব ?

—একেবারে অসম্ভব। আপনার ওই আলাভোলা দাদাটির কাছে সব কিছুতে প্রশ্রয় আছে, নেই শুধু মাতৃস্নেহের ত্রুটির !

* * *

—হয়তো জীবনে আর পুরী আসবেন না ?

—আশা করি না।

—পুরীর কথা একেবারেই ভুলে যাবেন হয় তো !

—অসম্ভব কি ? মানুষ কি না পারে ?···বলেই একটু হেসে ওঠেন নিবেদিতা—একটু ভুল বলেছি, বলা উচিত ছিলো—'মেয়েমানুষে কি না পারে ?'···যাক আপনি কবে ফিরছেন তাই বলুন !

—কে বলতে পারে আজই কিনা !

নিবেদিতা শঙ্কিত ভাবে বলেন—সে কি ?

—কেন, গেলে দোষ আছে ?

নিবেদিতা শুষ্ক হাস্যে বলেন—দোষের কথা হচ্ছে না। কিন্তু যাবেন কেন ? আপনার তো কোনো কারণ আসেনি।

যতীশ্বর চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে স্থির স্বরে বলেন—

—যদি বলি 'এসেছে'।

—নাঃ, আপনি যেন ক্রমশঃ রহস্যময় হয়ে উঠছেন—নিবেদিতা চঞ্চলভাবে উঠে দাঁড়ান, দ্রুতভঙ্গীতে বলেন—না না, সে ভারী বিশ্রী দেখতে লাগবে? আজকেই হঠাৎ যাবেন কেন?

—বারণ করছেন?

—কি মুশকিল, আমার অনুমতি নিয়েই আপনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে নাকি? আপনিও হঠাৎ আজকেই গেলে দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগবে মনে হচ্ছে, তাই বলছি।

এই পর্যন্ত বলতেই পিছন থেকে সত্যশরণের দরাজ গলার সম্বোধন শোনা যায়—ভায়া এখানে? আর আমি তোমাকে হোটেলে গিয়ে খুঁজে এলাম।

যতীশ্বর সচকিতে বলেন—খুঁজে এলেন? কেন?

—বাঃ এই নতুন খবরটি দিতে, আবার কি! কাণ্ড শোনো নি?

যতীশ্বর কি উত্তর দিতেন কে জানে, কিন্তু যতীশ্বরকে স্তম্ভিত আর বাকস্ফূর্তি রহিত করে দিয়ে নিবেদিতা স্বচ্ছন্দে বলে ওঠেন—হয়েছে, তোমার নতুন খবরের বড়াই ঘুচে গেছে!···যতীশ্বরবাবুর অসময়ে আবির্ভাবের কাবণ কি শুনবে?···উনি বলতে এসেছেন—কাল আর ওনার কোণারকে যাওয়া হলো না, আজকেই রাত্রের ট্রেনে কলকাতা রওনা দিচ্ছেন।

—সে কি!

—আর 'সে কি!' আমিও শুনে প্রথমে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম! বলি—কি রে বাবা! এ যেন আমরা নজরবন্দী আসামী, আর উনি গোয়েন্দা পুলিশ! আশ্চয্যি যোগাযোগ বটে।

সত্যশরণ গায়ের ঘামে ভেজা জামাটা খুলতে খুলতে বললেন—তা বেশ হলো ভালো! কিন্তু তোমার ব্যাপারটি কি? স্ত্রী পুত্র কিছুই তো কোথাও রেখে আসো নি? কার কি হলো?

যতীশ্বর অনেক কষ্টে বলেন—কলেজ বোর্ডের একটা মিটিং আছে কাল। আজই মোটে খবর পেলাম!

নিবেদিতা ঝপঝপ করে হাতের কাজ সারতে সারতে বলেন—সাধে কি আর বলে 'ভক্তের বোঝা ভগবান ব'ন'! একা এইসব লটবহর সামলে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছবে কি করে, সবকিছু গুছিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠবে কি করে ভেবে আকুল হচ্ছিলে, ভগবান সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন।···আপনি এক কাজ করুন যতীশ্বরবাবু, ওবেলা আপনার যা যৎকিঞ্চিৎ মালপত্র আছে নিয়ে এখানে চলে আসুন, এখান থেকে একসঙ্গেই—

সত্যশরণ সানন্দে সায় দেন—হ্যাঁ হ্যাঁ! ঠিক ঠিক! সেই বেশ হবে।··· গিন্নীটি আমার কি রকম চালাক দেখছো তো ভায়া, নিজের সুবিধেটির বেলায় জ্ঞান টনটনে!

সত্যিই 'ভেবে আকুল' হচ্ছিলেন সত্যশরণ।

সেই আকুলতার দায়েই ছুটে গিয়েছিলেন যতীশ্বরের খোঁজে, স্টেশনে তুলে

দিতে যাবার কথা বলতে ! এ তো আরো ভালো হলো !

গিন্নীটির টনটনে জ্ঞানের পরিচয়ে উৎফুল্ল সত্যশরণ যাত্রাকালে নিজে এক অজ্ঞানের মতো প্রস্তাব করে বসেন।

বললেন—টিকিটের টাকা, মালপত্র আর নিবেদিতাকে নিয়ে যতীশ্বর আগে রওনা হয়ে যান, সত্যশরণ বাড়িতে তালা লাগিয়ে তালার চাবিটা মালিকের কে এক আত্মীয় আছেন 'চটক পাহাড়ে', সেখানে পেঁছে দিয়ে সোজা যাবেন স্টেশনে !

খুবই সোজা হিসেব !

যতীশ্বর অসহায় ভাবে বলেন—সে আত্মীয়ের বাড়ি কোথায় ? বুঝিয়ে দিন না, আমিই নয় চাবিটা দিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণ গাড়িতে—

—আরে না না, সে ঠিক হবে না। আমাদের ব্যবহারের জন্যে ওরা চৌকি শতরঞ্জি বালতি তোলাউনুন অনেক কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিলো, তার জন্যে একটু ধন্যবাদ দিয়ে আসি। এমন আকস্মিক যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিলো না। ভেবেছিলাম—ভদ্রলোককে একদিন ডেকে এনে আপ্যায়িত করা যাবে। সে আর হলো না।...গাড়ির জন্যে ভেবো না। হেঁটে আমি যাচ্ছি না। একখানা সাইকেল রিক্‌শা ধরে নিয়ে—তুমি কিন্তু এগিয়ে পড়ো এইবার।...কই গো, নাও চটপট ! তোমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে তো তালা লাগাবো !

ইশারায় স্বামীকে একটু আড়ালে ডেকে নিবেদিতা বিপন্নভাবে বলেন—আচ্ছা, তোমার সাধারণ বুদ্ধিটা এতো কম কেন বলো তো ? এরকম প্রস্তাব করতে গেলে কেন ?

সত্যশরণ উদ্বিগ্ন ভাবে বলেন—কি রকম প্রস্তাব ?

—এই, যতীশ্বরবাবুর ঘাড়ে 'নির্জীব' 'সজীব' সবকিছু পোঁটলা পুঁটলি চাপিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি ঝাড়া হাত পা হয়ে—

সত্যশরণ একগাল হেসে বলেন—ওঃ এই কথা ! সে তুমি কিছু ভেবো না। প্রফেসর কিছু মনে করবে না। ছেলেটা খুব ভালো !

—'ভালো' হয়ে তো ভদ্রলোকের ভারী সুবিধে হচ্ছে দেখছি ! কিন্তু—'ইয়ে' এটা কি দেখতেই বেশ ভালো হবে ?...একা আমি ওঁর সঙ্গে গটগট করে চলে যাবো—তুমি আলাদা যাবে—বেশ শোভন হবে ?

সত্যশরণ হা হা করে হেসে ওঠেন—হরি বলো ! এই ভাবনায় অস্থির হচ্ছো ? কচি খুকি ! বলুক না কেউ কিছু, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা ?

—বলবার লোক এখানে বসে নেই কেউ।...কিন্তু ..ধরো আমিই যদি ওর সঙ্গে পালাই।

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে থাকে নিবেদিতার। মুখের রঙ অস্বাভাবিক লাল হয়ে ওঠে।

—তা পালিও। তবে, গিয়ে কিন্তু ঠিকানাটা দিও।

কোন দিকে লক্ষ্যহীন সত্যশরণ আর একদফা হাসতে থাকেন।

*　　　*　　　*

নিবেদিতার মুখ কিন্তু বিরক্তি-কুণ্ঠিত হয়েই থাকে।

যেন স্বামীর এই ছেলেমানুষী অবিবেচনায় বিব্রত বোধ করছেন। কিন্তু সেই বিরক্তির ছায়ার তলায় তলায় জ্বলতে থাকে নাকি একটা খুশির আভা!··· যে আভা বিকশিত হয়ে ওঠে কিশোরী মেয়ের মুখে প্রত্যাশিত সম্ভাবনায়?

বাড়ি থেকে স্টেশনে যাবার পথের পরমায়ু কতোটুকুই বা? মোটরে বড় জোর মিনিট আষ্টেক!

কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেই কি সমস্ত পৃথিবীটা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে না?

'ওলট-পালট' কেন, পৃথিবীটা তো নিশ্চিহ্নই হয়ে যেতে পারে, যদি মহাসমুদ্র উন্মাদ আলোড়নে জেগে ওঠে!

আট মিনিট সময় কি কম?

কিংবা হয়তো কমই।

সাহস সঞ্চয় করতেই যে অর্ধেক সময় কেটে যায়।

*　　　*　　　*

চলন্ত গাড়ির উত্তাল হাওয়ার মাঝখানে মৃদু নিঃশ্বাসের মতো ক'টি কথা উচ্চারিত হয়—আমার জীবনে এমন ভয়ঙ্কর মুহূর্ত আর কখনো আসেনি!

ভয়ঙ্কর!

কারপক্ষে ভয়ঙ্কর!

নিবেদিতা যেন সচেতন হয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখেন। গাড়িবোঝাই হয়ে আছে গৃহস্থালীর নানা সরঞ্জামে! ওই ঘটি বাটি বাক্স বিছানাগুলোর মধ্যে থেকেই কি শক্তি সংগ্রহ করতে চাইছেন নিবেদিতা?

কে জানে কি!

হাসতেই তো দেখা যাচ্ছে তাঁকে।

—'ভয়ঙ্কর' না বলে শোচনীয় বলুন? কর্তাগিন্নী দু'জনে মিলে কেমন জব্দটি করা গেলো!···উঃ, তখন কিন্তু ভারী মজা লাগছিলো। আপনি বোধ হয় আমার চালাকী দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন? একেবারে আপনার যাওয়া পাকা করে নিয়ে তবে আর কাজ? বলছি আর ভাবছি—এই বুঝি ফাঁস করে দেন, এই বুঝি বলে বসেন—'কই আজই কলকাতায় ফিরছি একথা তো বলতে আসিনি আমি।' খুব বাঁচিয়েছেন!

যতীশ্বর রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—তখন বলিনি, তখন বাঁচিয়েছি। এখন আর বাঁচাবো না, এখন বলছি—কেন আমাকে দিয়ে বলালেন ওকথা? বলুন কেন যাবো আমি? নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের স্বাধীনতা হারিয়ে কেন আমার এই অসহায় আত্মসমর্পণ? আমাকে এমন করে টেনে নিয়ে গিয়ে কি লাভ আপনার?

নিবেদিতা জানলার বাইরে তাকিয়ে মুখ না ফিরিয়েই শুকনো গলায় বলেন—বাঃ, লাভ নেই? এইতো দেখছেন কতো সুবিধে হলো! ভাবলাম—যেতেনই

তো দু'চার দিন পরে, না হয় একসঙ্গেই যাওয়া হোক। বলেছিলেনও তো একবার যেন—

সহসা স্থির শান্ত ভদ্র অধ্যাপক একটা বেখাপ্পা কাজ করে বসেন।

জানলার দিকে ফেরানো নিবেদিতার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে বসেন—কেন বলেছিলাম ও কথা, কেন যে, তোমার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে টেঁকা অসম্ভব হবে মনে হয়েছিলো, এ বোঝবার ক্ষমতা কি তোমার নেই, নিবেদিতা?

কাজটা কি বড়ো বেশী দুঃসাহসিক হলো?

কিন্তু দুঃসাহসিক কিসে?

'তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে,
পলকে দেখেছি কতোবার।'

আপন হৃদয় আলোকে নিবেদিতার হৃদয় কি ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পাননি যতীশ্বর? যে আলো নিবেদিতাই নিজের হাতে জ্বালিয়েছেন

কেন দুঃসাহসিক?

যতীশ্বরের নিস্তরঙ্গ কৌমার জীবনে যে জাগিয়েছে এই অজানা অনুভূতির আবেগ, কেন তাকেই সইতে হবে না সেই আবেগের ধাক্কা?

কিন্তু ও-কি, সে আবেগের ধাক্কায় কেঁপে উঠলেন কই নিবেদিতা? হেসে উঠলেন যে! আহত অপদস্থ যতীশ্বরকে হাসির ছুরিতে টুকরো টুকরো করে কাটতে কাটতে বলেছেন—এ আবার কি ছেলেমানুষী রোগে ধরলো আপনাকে? মাটি করেছে!

—নিবেদিতা, দোহাই তোমার! হেসো না এমন করে—

—আরে, আরে, কী কাণ্ড! না হাসিয়ে ছাড়লেন কই আপনি?

আস্তে আস্তে যতীশ্বরের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেন নিবেদিতা।

* * *

ছাড়িয়ে নেওয়া ভিন্ন উপায় কি?

না ছাড়ালে যে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়।

অসতর্ক হয়ে গৃহিণী নিবেদিতার অন্তরালবর্তিনী সত্যিকার নিবেদিতাকে প্রকাশ করে ফেললে তাঁর নিজেরই যে সব মাটি!

গৌরব সম্ভ্রম পদমর্যাদা বিশ্বস্ততা!

কিন্তু সত্যিকার সেই নিবেদিতা কি আর কোথাও কোনোখানে বেঁচে থাকবে এরপর? বরাবর যে, চেতনার আড়াল থেকে সংসারী নিবেদিতাকে দিয়ে এসেছে অফুরন্ত শক্তির যোগান!

* * *

হয়তো এর পরে নিবেদিতার রান্নাঘরে আশ্রয় নেবে ঝুলকালি তেল, হয়তো ভাঁড়ারের শিশি বোতলে পড়বে ধুলোর আস্তরণ। হয়তো নিবেদিতার বালিশের ওয়াড়ে তেলের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে উদাস অবসাদের অবসরে।

যে কর্মভার এতোদিন নুড়িপাথরের মতো অনায়াসে ঠেলে এসেছেন নিবেদিতা, হয়তো সেই ভার 'পাহাড়ের ভার' হয়ে উঠবে তাঁর কাছে।

সহসা ফুরিয়ে যাবে নিবেদিতা।

তবু কিছুই প্রকাশ করা চলবে না। অবগুণ্ঠনখানা সামলাতে হবে প্রাণপণে।

জীবনের যতো কিছু চাকচিক্য সবই তো ওই অবগুণ্ঠনের ওপরে জলের রঙ দিয়ে আঁকা।

[১৩৬২]

পাতাল প্রবেশ

মেজ জ্যেঠির পিছনদিকে দালানের দরজায় দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে মেঘলা দিনেও ঘামতে থাকে আরতি, 'মেজ-জ্যেঠি' শব্দটাকে কিছুতেই উচ্চারণ করে উঠতে পারে না।

অথচ মেজগিন্নী যেভাবে নিবিষ্টচিত্তে হেঁটমুণ্ডে শাকের কাঁড়ি নিয়ে বাছতে বসেছেন, সহসা যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনপানে তাকাবেন এ ভরসাও কম।

কী বিরক্তিকর কাজেই মা পাঠান আরতিকে।

কিছুতে নিজে আসবেন না! 'যা শত্রু পরে পরে'।

আরতির যে এই একই কারণে বারবার এখানে এসে দাঁড়াতে, 'মেজজ্যেঠি' বলে ডাকতে, মাথাটা কাটা যায় সে খেয়াল নেই।

ভারী নিষ্ঠুর মা আরতির।

মায়ের নিষ্ঠুরতায় ক্ষুব্ধ আরতির রাগটা আরো বেড়ে গিয়ে পড়ে বাপের ওপর। কী দরকার তাঁর মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে উদয় হবার? বারোমাস যেখানে থাকেন, জন্মের শোধ থাকুনগে না সেখানে। না এলে সাত জন্মেও বাপের জন্য মন-কেমন করবে না আরতির। বাপ তো না, খাবার কুটুম্ব!

আরতিদের যে কী ভাবে দিন চলে কোনোকালেও তার খোঁজ নেবেন না, থেকে থেকে আসবেন খালি রাজভোগ খেতে। আর মাও তেমনি, জ্ঞাতিগুষ্ঠি পাড়াপড়শীর কাছে ভিক্ষে করে জোগাবেন সেই ভোগটি।

আরতির হাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকলে দেখা যেতো—বিনা নোটিশে যখন তখন 'দুম' করে নিরভিভাবক দুটো স্ত্রীলোকের সংসারে এসে পড়ে রাত্রে 'গরম লুচি' আর ভাতের পাতে 'সরের ঘি' খাবার বায়না করার ফলটা কি! কিন্তু তাতো হবে না। আরতির মা যে আদর্শ হিন্দু ললনা, পতিব্রতা সতী।

মায়ের ওপর, বাপের ওপর, মেজজ্যেঠির ওপর, বোধ করি সমস্ত জগৎ সংসারের ওপরেই তিক্ত বিরক্তি ধরে যায়—ষোলটি বসন্তে গড়া এই নবযৌবনা মেয়েটির।

কিন্তু তাইবা বলি কি করে? 'বসন্ত' আবার কোথায়? বসন্ত অতো সস্তা নয়।

যে মেয়ের সকাল থেকে দুপুর বেলায় ভাত খাওয়ার আগে পর্যন্ত শুধু 'খাবার জল' ছাড়া আর কোনো 'জলখাবার' জোটে না, ভাতের উপকরণ বলতে পড়শীর বাগানের কচু কুমড়োই যার একমাত্র ভরসা, আবার পরম পদার্থের মতো সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা সেই কুমড়ো কচুর একাংশ দিয়েই যাকে রাত্রের আহার সমাধা করতে হয় দু'খানা আটার রুটির সাহায্যে, তার কাছে আবার 'বসন্ত' উঁকি দেবে কোন লজ্জায় ?

দুটোমাত্র শাড়ী-জামা দু'বেলা ব্যবহার করেও দু'বছর চালিয়ে দেবার রহস্যময় কৌশল যাকে আয়ত্ত করতে হয়, তার বয়েসটা কি ষোলোর মাধুর্য নিয়ে দেখা দিতে পায় কোনদিন ? ছে'চল্লিশ বছর বয়েসটা কেন জীবনের সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে জেঁকে এসে বসে ষোলোর ঘাড়ের ওপর। ঠোঁটের কোণায়, চোখের তারায় থাকে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য।

ষোলো বছর বয়েস যদি সত্যিই এসে থাকে আরতির, সেটা তা'র মায়ের ভাবনা বাড়াতে নয়, বিরক্তি বাড়াতে। 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে' এমন অসম্ভব কথা মনের কোণেও ঠাঁই পায় না আরতির মার। তিনি শুধু এই ভেবে বিরক্ত হন যে, যে-মেয়ে কিছুদিন আগে অপ্রতিবাদে মায়ের হুকুম তামিল কবেছে, সে যদি এখন আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, 'পারবো না' বলে চুপ করে বসে থাকে, তা'হলে ভবিষ্যতে কি হবে তাঁর ?

এই আজই তো পড়শীর বাড়ি ধার চাইতে যেতে নিতান্ত অনিচ্ছুক মেয়েকে হুকুমের বদলে মিনতিই করতে হলো। অবিশ্যি তাতেই জিত হয়ে গেছে তাঁর। আদেশের চাইতে মিনতি বড়ো। সে অলঙ্ঘ্য।

তাই না আরতি পূর্বেকার অপমান ভুলে আবার এসে দাঁড়িয়েছে জ্ঞাতি জ্যেঠির কাছে ধার চাইতে—যে-ধার কোনদিনই শোধ করতে পারব না নিশ্চিত জানা। বহুবারই যে-রকম ধার 'অশোধ্য' হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ ঘেমে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে আরতি একবার নকল কাশি কেশে জ্যেঠির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, ফল হয় না।

কে জানে মেজগিন্নীর এই অন্যমনস্কতাটা 'ভান' নাকি ! বিরক্তির একটা বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছে দেখেও দেখতে না-পাওয়া। নইলে রাঙা নটেশাকের মধ্যে এমনকি দ্রষ্টব্য থাকতে পারে যে দৃষ্টিটা আর তার থেকে নড়তে চায় না মেজগিন্নীর ?

—মেজ জ্যেঠিমা !

অস্ফুট এই উচ্চারণটুকুর কার্যকারিতাও বোঝা যায় না। কে জানে হতাশ হয়ে ফিরে যেতো কিনা আরতি, হঠাৎ একটা আকস্মিক ঘটনায় বাধ্য হয়ে মুখ ফেরাতে হলো মেজগিন্নীকে। আর দরজায় জায়গা দিতে দালানের মধ্যে ঢুকে পড়তে হলো আরতিকে।

দরজা খালি পেয়ে হুড়মুড় করে যে ব্যক্তিটি দালানে ঢুকে পড়লো তার এক

হাতে একটা মাছধরা ছিপ, আর অপর হাতে সেই ছিপে ধরা দুটো মুগেল মাছ। সের তিনেক করে হবে।

—পিসিমা, দেখো সক্কাল বেলাই কি রকম শিকার! সাতদিনে তোমার পুকুরের সব মাছ শেষ করে দিয়ে যাবো। 'পিসিমা' একবার আড়চক্ষে নিজের দেবর-কন্যাকে দেখে নিয়ে ভাইপোকে উদ্দেশ করে বলেন—তোর পিসেমশাইয়ের কি একটা মোটে পুকুর নাকিরে রণু? দুটো চারামাছ তুলে তো ভারী বাহাদুরি দেখাচ্ছিস!

—'চারা' থেকেই মহীরুহ।...কি আরতি যে? কি খবর? ভালো আছো তো? খুব যে বড়ো হয়ে গেছো! বলাবাহুল্য আরতি একটু জড়সড় হয় মাত্র, উত্তর দেয় না। মেজগিন্নী বিরক্তভাবে বলেন—তুই এখন বাড়ি যা আরতি, আমি ব্যস্ত আছি। রণু এসেছে—

আরতি কিছু বলবার আগেই রণু হৈ হৈ করে ওঠে—আরে কি মুশকিল! আমার নামে বদনাম কেন বাপু! আমি আবার তোমাকে কি ব্যস্ত করছি? না না, আরতি তুমিই বরং যতো ইচ্ছে ব্যস্ত করো তোমার জ্যেঠিমাকে, তোমাব হলো গিয়ে পাকা চাকরি। তারপর তোমার মা ভালো আছেন তো?

আরতি মনে মনে জ্যেঠির অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি অনুমান করে কোনোমতে একবার ঘাড় নাড়ে। রণু অথবা রণজিত হাতের মাছটাকে দোলাতে দোলাতে বলে—এদের কোথায় রাখবে পিসিমা?

—ছোট বৌ আছে রান্নাঘরে, দিগে যা তা'র কাছে। যাচ্ছি আমি।

রণু চলে যেতেই মেজগিন্নী চোখের অগ্নিজ্বালা কণ্ঠে আমদানী করে আরতিকে প্রায় মরমে মেরে বলেন— কী! তোর বাপ এসেছে বুঝি?

আরতি অবশ্য নীরব।

—টাকা হবে না! বল গে যা তোর মাকে।

তথাপি স্থাণুর মতোই দাঁড়িয়ে থাকে আরতি। মা বলে দিয়েছে টাকা যদি না দেয়, একটু সরের ঘি আর গোটাকতক নৈনিতাল আলু চেয়ে আনবি। ওতো আর কিনতে হয় না মেজদির'।

বদ্যিবাটিতে মেজগিন্নীর বাপের বাড়ি, বাপ আলুর ব্যবসাদার, প্রায়ই মেয়েকে পাঠান বস্তাবন্দী আলু। কিন্তু সে আলু যে মেজগিন্নীর অখদ্যে অবধ্যে জ্ঞাতি দ্যাওরের ভোগে লাগবে, এমন কথা তো ছিলো না। 'সরের ঘি'টা অবশ্য মেজগিন্নীর নিজের কৃতিত্ব।

—ফের দাঁড়িয়ে রইলি যে? বললাম না, টাকা হবে না?

আরতি প্রায় মরীয়া হ'য়ে বলে ওঠে—টাকা নয়, মা বললে—একটু সরের ঘি আর আলু—

'দূত—অবধ্য' এ নীতি গ্রাহ্য করেন না মেজগিন্নী।

রূঢ় দৃষ্টিতে একবার মেয়েটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কটুকণ্ঠে বলেন—তোর মাকে পতিভক্তিটা একটু কমাতে বলগে যা আরতি। পরের ঘাড় দিয়ে বারোমাস চলে না। আমার ঘরে সবাইয়ের পাতে সরের ঘি কুলোতে পারিনে,

নিত্যি যাবো দাতব্য করতে। বল গে যা 'নেই। ভাত খেতে ভাত জোটে না—ঘি খাবার বায়না।'

আরতি যে চলে যাবে সে অবস্থাও যেন থাকে না তার, লজ্জায় ঘৃণায় চোখ-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে, চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসে। কী অপমান! কী অপমান! যতোদিন বয়েস কম ছিলো, লজ্জা হতো, দুঃখে চোখে জল আসতো, এমন দাহ হতো না। সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে উঠতো না একটা দুঃসহ জ্বালায়।

আর ঠিক এই সময় চটিজুতোর শব্দ করতে করতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন মেজকর্তা।

—কী? হচ্ছে কি এখানে? ওদিকে মাছফাচগুলো কোটা হয়ে যাচ্ছে। আমি চারটি টাটকা মৌরলা আনলাম, শশী তো সকালেই এনে ফেলেছে সেরটাক 'পোনা', আবার রণু—

কর্তার কথায় বাধা দিয়ে গিন্নী বলেন—তা যাক না আমার সংসার ভেসে, তোমার জ্ঞাতিগুষ্টির মন রাখাটাই হচ্ছে প্রধান কথা।

—হলো কি?

—নাঃ হয়নি কিছু। ছোটকর্তা অনুগ্রহ করে বাড়ি এসেছেন, কাজেই ছোট গিন্নীর অর্ডার এসেছে আলু আর গব্য ঘৃতের। দুটো টাকা হ'লে কোননা আরো ভালো।

—টাকা হবে না! টাকা কোথায়! আলুফালু থাকে তো—দিয়ে দাওগে গোটাকতক। ভায়ার আমার রোজগারের মুরোদ নেই, কিন্তু মুখটি আছে নবাবী। বারোমাস ছোঁড়া থাকে যে কোথায়—

শেষ কথাটা চটিজুতোর শব্দে বিলীন হয়ে যায়।

মেজগিন্নী বিরক্তচিত্তে ভাঁড়ারের দিকে অগ্রসর হ'ন। বোধকরি ভাবতে ভাবতে যান, ছোট পাথরবাটিগুলো তেমন তেমন ছোট আর কই! চামচে দুই ঘি দেওয়া যায় এমন বাটি থাকলে ভালো হতো। বড়ো বাটিতে যৎকিঞ্চিৎ জিনিস বড্ডো যেন বিশ্রী দেখতে লাগে। প্রার্থীর চাইতে দাদার নির্লজ্জতাটাই প্রকট হয়ে ওঠে তাতে।

অন্যদিন হলে হয়তো আরতি দাঁড়িয়েই থাকতো, চলে যাবার সাহস হতো না। কারণ জানে মেজজ্যেঠি দেবেনই। না নিয়ে যাওয়ার দুঃসহ স্পর্ধা তাঁকে যা অপদস্থ করবে তার কাছে আরতির অপমান? কিছুই না। আরতি কে? আরতি আবার একটা মানুষ নাকি?

আজ কিন্তু হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায় সে। 'গোটাকতক' আলুর আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না কিছুতেই। কে জানে, হয়তো রণুর উপস্থিতিটা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।

এর আগে যখন এসেছিলো রণু, তখন আরতি বছর বারোর। নিতান্ত ছেলেমানুষ-বোধে প্রায় ত্রিশোত্তীর্ণ রণজিৎ তাকে পিঠ চাপড়েছে, মাছ ধরার খিদমদগারী করিয়েছে, প্রশংসা করেছে! মাত্র এই।

তবু সেই স্মৃতিটুকুই আরতির কাছে মূল্যবান।

ডেকে কথাই বা কে কয় তাকে ?

হয়তো লোকে ভাবে কথা কইলেই পাছে কিছু চেয়ে বসে।

আরতির মা সকলের কাছে সব কিছু চেয়ে চেয়ে নিজেদের মানমর্যাদা বলে তো রাখেনি কিছু।

বাড়ী ঢুকেই ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ে আরতি, ছেঁড়া শতরঞ্জিপাতা চৌকিটার ওপর।

এ দৃশ্য মায়ের চোখে পড়তে দেরী হয় না, কাবণ মেয়ের প্রত্যাশায় 'হাঁ' করে ছিলেন তিনি। এসে বলেন—কি হলো ? দিলেন না বুঝি ?

আরতি উঠে বসে।

পাশের ঘরে বাপের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে—না না ! রোজ রোজ কেন দেবে লোকে তোমাদের ? লজ্জা করে না তোমাদের বারোমাস ভিক্ষে করতে ? রোজগার করবার যার ক্ষমতা নেই, তার আবার ঘি আলু ভাতে খাবার শখ কিসেব ? বলে দাওগে বাবাকে যখন তখন এসে আর আমাদের মাথা কিনতে হবে না তাঁকে—

—ওরে সর্বনাশী, চুপ কর—ব্যাকুল হয়ে ওঠেন মা,—শুনতে পাবেন যে !

—পান না, ভালোই তো। অতো 'চুপ চুপ' কিসের ? কি এমন ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করছেন আমাদের ? মামাব দেওয়া ওই ক'টা টাকার ভরসায় ফেলে রেখেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কোনদিন আমরা কি খাই পরি ? কুটুমের মতন এসেই বাড়া ভাতটি পাবেন এতো আশা কেন ? অমন লোকের গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত।

থর থর করে কেঁপে আবার শুয়ে পড়ে আরতি।

কাঁপেন আরতির মাও।

রুদ্ধস্বরে বলেন—কী বললি লক্ষ্মীছাড়ি ? মেয়ে হয়ে তুই বাপের মরণবাক্যি মুখে আনিস ? পয়সা আনতে পারে না বলে সে বাপ বাপই নয় কেমন ? সময় অসময়ে আপনার লোকের কাছে হাত কে না পাতে ? তাতেই তোমার মাথা কাটা যায় ?

—হ্যাঁ যায় !...আরতি ক্ষণপূর্বের অসতর্ক উক্তির লজ্জা ভুলে আবাব চেঁচিয়ে ওঠে—আমি আর ওঁর জন্যে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে যেতে পারবো না, পারবো না। হলো ? তোমাকেও ধন্যবাদ মা, এখনো তুমি বাবার মুখ দেখো।

আরতির মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে মিনিট খানেক নীরব হয়ে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—বেশ ! ভাতের হাঁড়িটা নামিয়েছি, সেই ক'টা সামনে ঢেলে দিয়ে বলিগে, এই পিণ্ডি গেলো, গিলে নিয়ে দড়ি একগাছাও যদি না জোটে কোঁচার খুঁট গলায় জড়িয়ে আড়ায় বেঁধে ঝোলো গে ! তোমার মেয়ের নিচু মাথাটা উঁচু হোক।...কতো দুঃখেই যে বাড়ীতে মুখ দেখায় না মানুষটা, সে আর কে বুঝবে ! বেশ মরুক, মরুক। মরাই ভালো ওঁর।

কিন্তু কই, এহেন বাক্যবাণেও আজ আর আরতিকে অপ্রতিভ করা যায়

কই ? মায়ের গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকে সে। নাঃ, কারুর ওপর কোনো মমতাই আর নেই তার! সব স্বার্থপর। মা তার কেউ নয়—

এর পরই পাশের ঘরে মায়ের গলা শুনতে পায়। তর্জন-গর্জন, খেদ, ধিক্কার, নানা সুরের খেলা। বোঝা যায় না উপলক্ষটা কে! মেয়ে, না তার বাপ!

এর পরই একটা ক্রুদ্ধ অথচ ব্যাকুল আবেদনের বাণী—'যেওনা বলছি—মুখের ভাত ফেলে! মাথা খাও আমার। তবু যাচ্ছে ? বেশ যাও। একটা মানুষ ডোববার মতো জল এখনো দীঘিতে আছে। মুবের ভাত ফেলে চলে গেলে কি করি দেখো।'

—'মরবে এই তো ?' আরতির বাপের গলা ক্ষুব্ধরুষ্ট, শ্লেষাত্মক—'মরেই তো আছো। যার স্বামী এমন হাবাতে হতচ্ছাড়া, মেয়ে অতোবড়ো বিদুষী, তার আবার মরতে বাকী কি ? আমার এই শেষ। আর আসবো না! মনে কোরো তুমি বিধবা হয়েছো। কে ওখানে ?'

'আজ্ঞে আমি, ছোঠকাকাবাবু!'···মাথায় আধঘোমটা টেনে এগিয়ে আসে মেজগিন্নীর ঝি শশী। একটা চুপড়িতে গোটাকতক বড়ো বড়ো আলু, ছোট্ট একটা পাথরবাটিতে একটু ঘি, আর পাতায় মোড়া খানচারেক কোটা মাছের টুকরো দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে মধুবর্ষী কণ্ঠে বলে –'মা পাঠিয়ে দিলেন। দিদিমণি তখন গেছলেন—মায়ের হাতজোড়া ছিলো, একটুক্ষণ দেরী হয়ে ছেলো, তা দিদিমণির তো দেরী সইলনি। চলে এলেন 'ঠর ঠর' করে! মা বলে দিলেন যদি সময় হয় দিদিমণিকে একবার একটা বাটি হাতে করে যেতে, মাছের তেলকাঁটা দিয়ে ছ্যাঁচড়া রান্না হচ্ছে দেবেন। রাঁধা জিনিস তো আমাকে দিয়ে পাঠানো চলবেনি ?'

ছোটকর্তার বোধকরি নিজের কলকাতার বস্তিজীবন স্মরণে আসে।

কার হাতে যে খেতে হয়! সে তুলনায় শশী তো ভাটপাড়ার ভট্‌চায।

উদ্‌গতহাস্য গোপন করে বলেন—আচ্ছা আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি না হয়। মেয়েটার আবার রোদ থেকে এসে মাথা ঘুরছে নাকি, শুয়ে পড়েছে।···

ইয়ে—কইগো—একটা বাটি দাও না।

'মাছের তেলকাঁটা চচ্চড়ির' অপ্রত্যাশিত আনন্দে পূর্ব অঙ্কের শেষ দৃশ্যের কথা বোধকরি আর মনেও থাকে না তাঁর। কাজেই তার সঙ্গে বর্তমান দৃশ্যের সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

ছোটগিন্নীও ততক্ষণে মেজদির যদান্যতার পরিচয়ে দ্রবীভূত। বোঝেন তাঁর নিজেরই যাওয়ার দরকার। কিছুটা তোয়াজ করে আসা প্রয়োজন। বোঝাই যাচ্ছে একটু এদিক ওদিক কথায় মেয়ে তেজ দেখিয়ে চলে এসেছেন। আরে বাপু, ওদের কাছে আমাদের তেজ করলে চলে ? তা ছাড়া মেজদি মানুষটিতো মন্দ নয়, কথাগুলোই যা একটু চড়া। তা' ভগবান যাদের মেরেছেন তাদের

নরম হতে হবে বৈকি !

মেজদির বদলে তাঁর ঝিয়ের কাছেই মাখনের মতো নরম হয়ে পড়েন ছোটগিন্নী। তুমি যাও শশী, আমি যাচ্ছি বাটি নিয়ে।

শশী মুচকে হেসে চলে যায়।

জানে তো এদের ধাত। 'মেখো ভাত খাবি' ? 'না, আঁচাবো কোথা' ?

কর্তাগিন্নী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলেন।

এক পক্ষের ভাব···কই, যাও এবার জন্মের মতো ?

অপর পক্ষের ভাব···যাওয়া আর হলো কই ?

উভয়েরই মুখের প্রসন্নতায় যেন নৈনিতাল আলুর নিটোল মসৃণতা, মাছের 'তেল চচ্চড়ি'র স্নেহস্নিগ্ধতা। আলো ফুটে ওঠাটুকু বোধহয় মেজগিন্নীর করুণার জ্যোতির প্রকাশ।

ওদিকে অপর তৃতীয় পক্ষটি ঘৃণায়, লজ্জায় ধরণীকে দ্বিধা হ'তে বলার বদলে নিজের কপালটাই চৌকির গায়ে ঠুকে ঠুকে দ্বিধা করে ফেলতে চায়!

কী কুৎসিত লোলুপতা!

লোভের কী নির্লজ্জ প্রকাশ! ঘৃণায় 'রি রি' করতে থাকে সমস্ত শরীর।

এই আরতির মা বাপ! এতো নির্লজ্জতা বোধহয় এর আগে কোনদিন ধরা পড়েনি।···কি করবে আরতি ? নিজেকে কি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে ?··· নাঃ, গলায় দড়ি যদি দিতে হয় সে আরতিরই দেওয়া উচিত।···হাঁ মরবে, সেই মরবে।

ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াক ওরা লোকের কৃপাকণায় তুষ্ট হয়ে তাদের পদলেহন করুক। বাপের চাইতে মায়ের ওপরই ঘৃণা বেশী আসে। আজকে যেন সত্যই আশা করছিলো আরতি, একটা কিছু হেস্তনেস্ত হবে। জন্মের শোধ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটবেই একটা।

এই তার পরিণাম!

ভাবতে ভাবতে, কাঁদতে কাঁদতে, ঘৃণা করতে করতে, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো আরতি। ঘুম ভেঙে দেখলে রোদে ছেয়ে গেছে উঠোন, বাড়িটা কেমন যেন থমথমে।

প্রথমটা কিছু মনে পড়ছিলো না, তারপর পড়লো।

জেগেই মনে হলো স্নানের দরকার! বাড়িতে তোলা জলে নয়, দীঘিতে। ঝাঁ ঝাঁ করছে শরীর।

কিন্তু এরা কোথায় গেলো ?

মা আর বাবা ?

* * *

ছেঁড়া গামছাখানা হাতে নিয়ে উঠোনে নামতেই সন্ধান পাওয়া গেলো এদের। রান্নাঘরে। বেড়ার দেওয়ালের ভাঙা ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দু'জনকে।

বাবা খেতে বসেছেন, সামনে মা।

দাঁড়িয়ে প'ড়ে দাঁড়িয়েই থাকে আরতি।

হঠাৎ যেন চমকে গিয়েছে।

*　　　*　　　*

এতো রোগা ওর বাবা ?

ময়লা একটা ফতুয়া পরে বেড়ান বটে সারাদিন, কিন্তু খালি গা কি আরতি আর দেখেনি কোনো সময় ? প্রত্যেকটি পাঁজরের হাড় যেন চামড়ার আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাঁধের হাড়খানা পর্যন্ত খোঁচা হয়ে উঠেছে। আর শীর্ণমুখে কী ক্ষুধার্ত লোলুপতা! নিজের পাতের চাইতে স্ত্রীর হাতের কাঁসিখানার ওপরেই সব দৃষ্টিটুকু আটকে আছে যেন। যদিও তা'তে সামান্যমাত্র তরকারিই পড়ে আছে। মনে হচ্ছে নেহাত চক্ষুলজ্জায় চাইতে পারছে না, অথচ সমস্ত ইচ্ছেটা উগ্র হয়ে আছে ওই অবশিষ্টাংশটুকুর ওপর।

আর মা!

মায়ের মুখে···হ্যাঁ সেই শীর্ণ শ্রীহীন মুখে এ কি অপরিসীম তৃপ্তির ছবি আঁকা। এ ছবি আরতির কতো অপরিচিত!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা সহানুভূতিতে আরতির মুখের কঠিন পেশীগুলো কেমন যেন শিথিল হয়ে আসে। কেন যে আরতির মা লজ্জা ঘেন্না সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষুক-বৃত্তিকেও স্বীকার করে নিয়েছেন, সে প্রশ্নের উত্তর যেন লেখা রয়েছে তাঁর মুখের ওই পরিতৃপ্তির ছবিতে।

মায়ের ঠোঁটের কোণে এখনো এমন হাসি ফুটে উঠতে জানে ? কৌতুক আর প্রশ্রয়ের ? স্নেহ আর দরদের ? হাসিজড়ানো সুরে বলেন—

—অতো আর চক্ষুলজ্জার দরকার কি বাবু, নাও এটুকু। দেমাকী মেয়েতো তোমার খাবেনা এসব।

হাতের কাঁসির সবটুকু দিয়ে দেন স্বামীর পাতে।

—আর তুমি ?

লোভে চকচকে দুইচোখ তুলে প্রশ্ন করেন ছোটকর্তা।

—আমি ?···আমার খাওয়া হয়ে গেছে!

—সে কি, কখন ?

মুখটিপে হাসেন ছোটগিন্নী—এই এখন! তোমার সঙ্গে সঙ্গে। তুমি খেলেই আমার খাওয়া—

—ও হো হো। তাই বলো! কিন্তু না না, অতোটা চচ্চড়ি ফার্ষ্টক্লাশ হয়েছিলো—তোমাদের একটু—

—আহা আমরাতো বারোমাস ঘরের রান্না খাচ্ছি, তোমারই অখাদ্য হোটেলের রান্না খেয়ে প্রাণ যায়।

*　　　*　　　*

নিশ্চিন্ত প্রেমালাপ।

কেউ সাক্ষী রয়েছে—এই ধারণা নেই।

হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে যায় আরতির।

বাড়ির রান্না!

সত্যি কী ভালো ভালো রান্নাই খায় তারা।

*　　　*　　　*

আলু আর রইলো নাকি? মাছ?

আকণ্ঠ খেয়েও আশা মেটেনি। রাত্রের ব্যবস্থার সন্ধান নেওয়া চলছে।

—আলু আছে দুটো বড়ো বড়ো। মাছ আর কই? ভাজা হলো দু'খানা, আর এই দু'খানা ঝাল। চারের তিন যে ভোজনকারীর উদরেই স্থান পেয়েছে, সেটা সহজেই বোঝা যায়!

—বেশ আলুগুলো। ওই সঙ্গে খানকতক রুইয়ের দাগা পড়তো, আর তোমার হাতের রান্না! আহা হা! কতোকাল যে কালিয়া খাইনি। মাছের যোগাড় হয় না দ'খানা?

—কোথায়? সবাই কিপটে হয়ে গেছে আজকাল।

উত্তরটা ম্লান।

—যা বলেছো। একটা নেমন্তন্নও হয় না। সেবারে সেই মেজগিন্নীর নাতির ভাতে যা ভালো নেমন্তন্ন খাওয়া হলো! সেই শেষ না গো? ক'বছর হলো?

—বছর কয়েক।

—সেই শেষ খেয়েছিলাম ভালো কালিয়া। রান্নাটাও হয়েছিলো তেমনি! আহা! আর সেই ইলিশের টকটা? হ্যাঁগো মনে আছে?

গলার স্বরে মনে হয় ঘটনাটা বুঝি গতরাত্রের, এখনো আস্বাদ লেগে রয়েছে জিভে।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে আরতি! এদের ওপর রাগ করবে? হায় ভগবান!

তা'হলে 'করুণা' বস্তুটাকে রাখবে কোথায়?

পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ছোটকর্তা।

ঝট করে ঘরে গিয়ে হনহন করে দীঘির দিকে এগিয়ে চলে আরতি। বেলা দেড়টা দুটোর কম নয়, পথে লোকের চিহ্ন নেই।

কী আশ্চর্য! এই রোদে রণজিৎ একা বসে আছে ছিপ নিয়ে একাগ্র সাধনায়!

—আপনি আবার এখন শিকারে বসেছেন?

চমকে ওঠে রণজিৎ?

—তুমি এ সময়? স্নানে নাকি?

—হ্যাঁ। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—ঘুমিয়ে? চমৎকার!

—চমৎকারই তো। অসময়ে চমৎকার একটি ঘুম দিতে যা মজা—

ছেচল্লিশের খোলস ফেলে ষোলো বছর বয়েসটা আত্মপ্রকাশ করে বসলো নাকি?

—থাক, ও মজা মেয়েদেরই মানায়।

—আর আপনাদের মানায় শুধু আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শিকারের সাধনা, কেমন ?

নির্জন দীঘির পাড়, মধ্যাহ্নের বিশ্রামে বাতাস পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে আছে যেন। এই পরিবেশে নিতান্ত বালিকা বলে আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না আরতিকে।

রণজিৎ তবু গম্ভীরভাবে বলে—তেমন শিকার আর জুটছে কই ? সেবারে এসে তবু পাড়ার একটি মেয়ের একটু সাহায্য-টাহায্য পাওয়া গিয়েছিলো—

—পাড়ার মেয়ের দায়। চটুলহাসি খেলে যায় একটি অস্নাত অভুক্ত শ্রীহীন মুখে। হ্যাঁ বুঝতাম গরম মাছভাজা খাবার আশা আছে—

—খেলেই পাওয়া যায়, ওইতো এক ব্যাটাকে ধরে বেঁধে জলে চুবিয়ে রেখেছি। খাওগে ভেজে।

—দাঁড়ান স্নানটা সেরে নিই। কিন্তু বিনা পরিশ্রমেই পারিশ্রমিক ?

আরতির দৃষ্টিও কি লোভে চকচকে হয়ে উঠেছে তার বাপের মতো ?

কিসের লোভে ?

রণজিৎ বুঝতে পেরেছে সে লোভের সঙ্গে ষোলো বছর বয়সের কোনো সংস্পর্শ নেই, ওটুকু ভানমাত্র ! তাই অবহেলাভরে ধরে রাখা মাছের বাঁধনটা খুলে আরতির পায়ের কাছে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে বলে—পারিশ্রমিক কিসের ? দাতব্য ? নিয়ে যাও খাওগে।

ওর কণ্ঠস্বরে যেন আশাভঙ্গের তিক্ততা।

কিন্তু আরতি কি কুড়িয়ে নেবে হেঁট হয়ে ?

তেজী মেয়ে আরতি !

না কি চলে যাবে গট গট করে ? বলবে 'দাতব্যে'র জিনিসে দরকার নেই তার ?

কি করে যাবে ?

ছ্যাঁচা বেড়ার ফোকর থেকে যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ·পাতলা চামড়ায় ঢাকা একখানি একখানি পাঁজর· ক্ষুধার্ত লোলুপ দুটি চোখ···দেখা যাচ্ছে···অসীম পরিতৃপ্তির ছাপ আঁকা একখানি শীর্ণ মুখ।

হেঁট না হয়ে উপায় কোথায় ?

হয়তো—

হয়তো আরো হেঁট হতেও পিছপা হতো না ! রণজিৎ রক্ষা করেছে।

[১৩৬২]

আর এক দিন

ওদের ভালোবাসাটা তা'বলে এমন কিছু নভেল ভালোবাসা ছিল না।

উভয় পরিবারের বন্ধুত্ব বন্ধনের সূত্রে, প্রায় পারিবারিক প্রথার মতোই—দু'বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকে যে সহজ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, সেইটুকুই।

তার বেশী নয়।

এদের ছেলেরা ওদের ছাতে ঘুড়ি ওড়াতে গেলে, অথবা ওদের ছেলেরা এদের উঠানে মার্বেল খেলতে এলে, কেউই যেমন দোষের বলে গণ্য করতো না, তেমনি গণ্য করতো না এ বাড়ির অলকা ও বাড়ির অশোককে দুখানা রুমাল সেলাই করে দিলে, অথবা ওবাড়ির অশোক এ বাড়ির অলকাকে একখানা বই 'প্রেজেন্ট' করলে!

শুধু এই। এইটুকু সুযোগের অবসরে যতোটুকু, আর যেমন ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

উপহারের বইতে ক্ষিধের চাহিদা মেটে না।

অশোকের ডিউটি ছিলো 'যেন তেন প্রকারেণ' অলকাকে বই জোগান্ দেওয়া। কিন্তু বইয়ের পোকাকে বই জুগিয়ে কুলিয়ে উঠতে কে পারবে?

অশোক বলে—'তোর জন্যে দেখছি আরো দু'চারটে লাইব্রেরীর মেম্বার হতে হবে! মাত্র দুটো লাইব্রেরীর বইতে কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা মেটা শক্ত।

অলকা রেগে বলতো—'কুম্ভকর্ণ' টর্ণ' যা খুসি বলবে না বলছি অশোকদা! তা'হলে আর তোমাদের বাড়ি জন্মে আসবো না।

অশোক হেসে বলতো—না এসে পারবি?

—কেন পারবোনা? বাড়িতে কালীসিংহীর মহাভারত আছে, তাই পড়বো বসে বসে।

—ভালো ভালো! অশোক কৌতুকহাস্যে মন্তব্য করতো—খুব ভালো! ঈশ্বর তোকে সুমতি দিয়েছেন দেখে বড়ো আনন্দ হচ্ছে! সত্যিই তো, কেন মিথ্যে কতকগুলো নভেল নাটক পড়ে উচ্ছন্ন যাবি। 'পরিণীতা' 'পরিণীতা' করে হত্যে হযে যাচ্ছিলি, এনেছিলাম! যাক গে—ফেরৎ দিযে দেবো।

ব্যস আর রক্ষে থাকতো না। হৈ হৈ করে উঠতো অলকা।

—ও মা গো! কী সাংঘাতিক ছেলে তুমি অশোকদা! এনে লুকিয়ে রেখেছো—বলে বাড়াবাড়ি রকমের কাড়াকাড়ি শুরু করে দিতো একেবারে। সম্ভব অসম্ভব এমন সব জায়গা তচ্‌নচ্ করে খুঁজতো যে, গুছিয়ে দিতে তাকেই আবার একঘণ্টা খাটতে হতো।

এসব ঘটনা যে অভিভাবকদের অসাক্ষাতেই ঘটতো এমনও নয়। কারণ তাঁরা এতে কৌতুক উপভোগ করা ছাড়া সন্দেহের কিছু দেখতেন না।

অবিশ্যি অসাক্ষাতেও যে একেবারে কিছুই ঘটানো হ'তো না তা নয়।

ধরো—সেই একটি দিনের কথা!

বোধ হয় সে একটা প্রথম বৈশাখের এলোমেলো বিকেল।

অশোক তদব্যস্ত হয়ে এসে অলকার মাকে প্রশ্ন করে—অলকা কোথায় গেলো মাসীমা? আহা কালকে বেচারা অনেক খেটেখুটে একগাদা বইয়ের এক লিস্ট করে দিয়ে এলো আমায়, আর আমি সেটি—বুঝলেন মাসীমা—সোজা পকেট সুদ্ধু ধোপার বাড়ি! উঃ শুনলে যা হাত পা আছড়াবে!…গেলো

কোথায় ?

অলকার মা আক্ষেপের স্বরে উত্তর দেন—আর কোথায় ! বিকেল হ'লে কি আর মেয়ের টিকি দেখবার জো থাকে ? সেই ছাতে উঠে বসে আছে !

অশোক বললে—'মাট্‌টি' করেছে ! ছাতে এখন কে যাবে বাবা ! থাক, ওর বই আর আসছে না ! রেগে মরবে আর কি !···অলকা ! এই অলকা !

বলা বাহুল্য অলকার কান অবধি পেঁছায় না সে ডাক।

অশোক বলে—তা এ সময় ছাতে উঠে বসে থাকবার ওর দরকারটাই বা কি ? এই রান্নাটান্না, তরকারি কোটা, সব আপনাকে একা করতে হয় তো ? কাজটাজ কিছু শেখান মেয়েকে ?

—কাজ করবে অলকা ? তা'হলেই হয়েছে !

সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মেয়েকে ডাকাডাকি করেন অলকার মা।

—অ মুখপোড়া মেয়ে, নাব্‌না ছাত থেকে ! এই অশোক এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কি লিস্টি ফিস্টি দিয়ে যাবি যা না ?···অলকা ! কালা হয়ে বসে আছিস না কি ?

অশোক বলে—আহা, ওরও দোষ নেই মাসীমা ! ঠেলে খানতিরিশ চল্লিশ বইয়ের নাম লিখে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি আছে, মনে জানে, আসতে যা দেরী। দিনে দু'খানা করে বই গেলে যে কি করে !

অলকার মা বলেন—জোগান পেলে আর গিলবে না কেন ? তোকেও যেমন ভূতে পেয়েছে বাবা ! বলি—অ অলকা ! রোস তোর ছাতের টঙে উঠে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকা বার করছি আমি।

অশোক বলে—আপনার ও ক্ষীণকণ্ঠ তিনতলা অবধি পেঁছুবে না মাসীমা ! বৃথা চেষ্টা ! বিনুনি ধরে হিড়হিড় করে টেনে না আনলে আর নামানো যাবে না।

বিনুনি ধরে টানবার জন্যেই অগত্যা উঠতে হয় ওকে ছাতে।

অলকা অপ্রত্যাশিত খুসিতে চমকে গিয়ে বলে—ওমা ! একি ! তুমি হঠাৎ ছাতে যে ?

—কি করবো—অশোক গম্ভীরভাবে বলে—আমাকে যে 'ভূতে পেয়েছে'।

—ও আবার কি কথা ! অলকা বলে—যা তা বলছো কেন ?

—মাসীমা তো তাই বললেন। ঠিকই বলেছেন। বুদ্ধি আছে, দৃষ্টি আছে, তাই বলেছেন। তবে হিসেবে "একটু" ভুল করে ফেলেছেন, 'ভূত' নয় পেত্নী।

—যাঃ !—বলে চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায় অলকা। এই নিতান্ত সহজ সামান্য পরিহাসেও কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর। অশোকের মুখের কথার সঙ্গে চোখও যে কথা কইতে চাইছে !

চোখের ভাষাকে বড়ো ভয় ! ও 'সামান্য'কে একদণ্ডে অসামান্য করে তুলতে পারে। তাই না, চোখকে এড়াতে অকারণ এতো মুখের কথার সৃষ্টি করা। কথাই হচ্ছে আশ্রয়।

তা' ভয় অশোকেরও ছিলো বৈকি। তা' নইলে অমন 'বলি বলি' চোখ কিছু না বলেই থেমে থাকে?

ছাতে মাদুর পেতে বসে—আর কিছু নয়, বইই পড়ছিলো অলকা। হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই কোল থেকে পড়ে গেলো বইটা। রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা।

—কি, পড়া হচ্ছিল কি? ইস্ কাব্যি!

কুড়িয়ে নিয়ে মাঝখান থেকে একটা কবিতা খুলে ধরে অবজ্ঞার সুরে বলে —পড়লেই হয় না শুধু বোকার মতো! মানে বুঝতে পারিস কিছু?

—কেন পারবো না? খুব পারি। ভগবান একা তোমাকেই সব বুদ্ধিগুলো দিয়ে দিয়েছেন না কি?

—আমার তো তাই ধারণা। পারিস যদি তো—পড় এটা! পড়ে মানে বল। দেখি কেমন বোধশক্তি।

খোলা পাতাটার দিকে চেয়ে অলকার মুখটা লাল হয়ে ওঠে, কথা বলার শক্তি বড়ো বিশেষ থাকে না।

—কই কি হলো? পড়তে পারলি না? সত্যি কি পণ্ডিত! পড়তেই পারে না আবার মানে বোঝার গুমোর। দিনে দু'খানা বই শেষ করার রহস্য এবার বুঝেছি। শুধু চোখ বোলাস্, এই তো? শুনবি তবে? শোন্—মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি—! কবি বলেছেন—

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে—"

শেষ পর্যন্ত মানে বোঝবার জন্য দাঁড়িয়ে শোনার সাহস অলকার অন্ততঃ ছিলো না। বেচারা চোদ্দ বছরের অলকা! ছুটে পালিয়ে গেলো নীচে!

না, চোদ্দ বছরের নায়িকা শুনে হাসবার কিছু নেই।

ঘটনাটা এ যুগের নয়, সে যুগের। তখনো তেরো বছরের 'ললিতা' সগৌরবে আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে পাঠকের চিত্ত জয় করে বেড়াচ্ছে!

অবিশ্যি এমন সুযোগ সুবিধে বড় বেশী পাওয়া যেতো না।

"এ জীবনে দু'জনের মিলন না হ'লে জীবন মিথ্যে হয়ে যাবে"—এমন আজগুবি কথা দু'জনের একজনও ভাবেনি কোন দিন।…দু'জনে দু'জনের বিরহে সারা জীবন ব্যর্থ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে, এমন ডাহা মিছে কথা গল্প লেখকেরও লিখতে বাধবে।

আসল ঘটনা এই—তারপর থেকে ওদের আর দেখাই হয়নি।

সংসারের জটিল ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া—একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে, আর একটি আঠারো বছরের ছেলে, নিজেদের চেষ্টায় আর কখনো মুখোমুখি হ'তে পারেনি।

দু'টো বাড়ির একই বাড়িওলা, বাড়ি দু'খানাকে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কবলে

ফেলে দিয়েছিলো মোটা টাকা মূল্য ধরে নিয়ে। দুই ভাড়াটে ছিটকে চলে গিয়েছিলো—সহরের সম্পূর্ণ দুই প্রান্তে।

অশোকের খবর আর রাখি না!

অলকাকে জানি। ওর বাবা উঠে এসেছিলেন খিদিরপুরের ডকের কাছাকাছি একটা ছোট্ট বাড়িতে। সেখানে এসে কপাল খুলে গেলো ভদ্রলোকের। জলের দরে নাকি কিনে ফেললেন এক জলে-ডোবা জাহাজ। শেষ পর্যন্ত জলেই জল বাধলো!

বাড়ি করলেন, গাড়ি করলেন, মেয়ের ঘটা করে বিয়ে দিলেন।

বিয়ের রাত্রে 'ওরা' এলো দমদম থেকে নেমন্তন্ন খেতে। শুধু অশোকের আসা হলো না! তার তখন নাকি সামনে বি. এ. একজামিন। 'নেমন্তন্ন খাওয়ার' মতো বাজে কাজে সময় নষ্ট করবার সময় কোথায়? চব্বিশ ঘণ্টাই তো পড়ছে—ঘরে খিল দিয়ে।

'বিয়ের দিন নিশ্চয়ই অশোকদার সঙ্গে দেখা হবে—' এমনি একটা সহজ আশার আলোয় মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ছিলো অলকার—বিয়ের দিন পর্যন্ত।

"অশোকদার সঙ্গে দেখা হ'লো না"— এই নৈরাশ্যের মেঘ নিয়ে দাম্পত্য জীবনের শুরু।

সুন্দর স্বভাব স্বামী।

স্নেহে প্রেমে ক্ষমায় মহান, হাসি-খুসি চঞ্চল। সদ্যোন্মেষিত কিশোরীহৃদয় দ্বিধাগ্রস্ত হবার অবকাশই পেলো না। সুখে সৌভাগ্যে আলোকিত হয়ে উঠলো সে জীবন।···শুধু নীল আকাশের কোণে একখণ্ড হালকা মেঘের মতো লেগে রইলো ওই নৈরাশ্যের মেঘটুকু।

বছরের পর বছর কাটে।···

কৈশোর ভরে ওঠে যৌবনের উজ্জ্বলতায়, যৌবন শান্ত হয়ে আসে অনিবার্য পরিণতির গাম্ভীর্যে।···আজকের চল্লিশ বছরের বিজ্ঞ অলকার মধ্যে চোদ্দ-বছরের সেই বুদ্ধিহীন মেয়েটাকে আবিষ্কার করতে যাওয়া পাগলামী। ওর নামটা যে 'অলকা' এ কথাও আর সহজে মনে পড়ে না। ওর নিজেরও নয়। নামের দরকারই বা কবে পড়েছে?

তবু রয়ে গেছে একটা হাস্যকর পাগলামী। দীর্ঘকালের অর্থহীন অভ্যাস। সময়ে অসময়ে অকারণে একবার মনে করা—"আর কখনো দেখা হ'লো না।"

কিন্তু এও এক অদ্ভুত!

ভাবলে কি যে আশ্চর্য লাগে অলকার! এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দৈবাৎ কখনো কোনোদিনও কি দেখা হয়ে যেতে নেই? ভাষাজগতে তা'হলে 'অপ্রত্যাশিত' 'আকস্মিক' 'সহসা' এসব শব্দগুলো আছে কেন? 'সহসা দেখা

হয়েও কি যায় না কারুর সঙ্গে ?

বহুদিনের অদেখা, পরিচিত, স্বল্প পরিচিত, বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কতো লোকের সঙ্গেই তো দেখা হয়ে যায় যখন তখন—পথে ঘাটে ট্রামে বাসে, সিনেমায় বারোয়ারীতলায়, দোকানে স্টেশনে, দেশে বিদেশে।

শুধু সেই লোকটাই এতো দুর্লভ ? কোথাও তার ছায়ামাত্র চোখে পড়লো না এই ছাব্বিশটি বছরের মধ্যে ? আর সব থেকে আরো অদ্ভুত যে, একই সহরে বাস করে আসছে দু'জনে। হয়তো ঠিকানা জোগাড় করাও খুব শক্ত নয়। ঠিকানা জোগাড় করে যে কোনোদিন আচম্‌কা গিয়ে পড়া যায় অশোকের বাড়ি। বলা যায় — কি গো অশোকদা, একেবারে যে ভুলেই গেলে ?'

ক্ষতি কি ?

"সত্যিই তো ক্ষতি কি ? গেলেই হয় ; অশোকের বৌ তোমাকে ধরে মারবে না নিশ্চয় ?"

এ অভিমতটা অলকার স্বামী দেবেশের। অলকার 'অশোকঘটিত' হৃদয় দৌর্বল্যের খবর তার অজানা নয়। কম বয়সে একদা অতিবিশ্বস্ততার ছেলেমানুষী মোহে, স্বামীর কাছে গল্প করেছিলো অলকা 'প্রথম প্রেমের' রঙিন কাহিনী।...আক্ষেপ করেছিলো 'আশ্চর্য্যি, আর কক্‌খনো দেখা হ'লো না'! এখনো মাঝে মাঝে কথা উঠলেই বলে—'যাই বলো বাবু, আর একবার দেখা হওয়ার ইচ্ছে আমার এখনো খুব আছে।'

তা কথাটা ওঠেই যখন তখন।

কৌতুকপ্রিয় দেবেশ ইচ্ছে করে ওঠায়, অলকাকে রাগাতে। 'অশোকদা' নামটা দেবেশের কাছে যেন প্রচলিত প্রবাদ। বরাবর চলে আসছে। কখনো জানলায় কি বারান্দায় একটু বেশীক্ষণ যদি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো অলকাকে, অমনি বলবে—'কি গো, রাস্তায় অশোকদা না কি ? 'বাতায়ন পানে দু'আঁখি তুলিয়া' ?

অলকা রাগ দেখিয়ে উত্তর দেয়—হ্যাঁ তাই তো! রোজ এই সময় সে এসে ঠায় রুদ্দুরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকে যে! তাই বিগলিত করুণায় একবার করে দর্শন দিই।

পথে-ঘাটে বাসে-ট্রামে যেখানে সেখানে অলকাকে ক্ষ্যাপানো এক মজা দেবেশের। কথায় অবিশ্যি এঁটে উঠতে পারে না অলকাকে, তবু বলতে ছাড়ে না। ওদের এই স্বচ্ছন্দ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে অশোকেরও একটা স্থান আছে। বিশিষ্টও নয়, অপরিহার্যও নয়, তবু আছে—ভাতের সঙ্গে থালার আগায় নুনের মতো, পানের সঙ্গে ডিবের কানায় চুণের মতো। আছে শুধু আলাপ আলোচনার স্বাদে আর একটু আস্বাদ দিতে। যতোটুকু প্রয়োজন তা'র বেশী খানিকটা ব্যবহার করে ফেলবার মতো স্পষ্টভাবে নেই।

হয়তো ট্রামে চেপে যাচ্ছে অলকা আলিপুরে ননদের বাড়ি বেড়াতে। হয়তো ওদিকে গাড়ির ভীড় একটু পাতলা হয়ে গেছে, দেবেশ হঠাৎ নিম্নস্বরে বলে বসে—দেখো দেখো, ও পাশের ওই ভদ্রলোকটি তোমার 'অশোকদা' নয় তো ?

সেই থেকে দেখছি 'হাঁ' করে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে।

অলকা চমকে তাকায়। বুকের মধ্যে ছলাৎ করে ওঠে একটা আশার ঢেউ।··· তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে—কথাবার্তায় একটু সভ্য হতে শেখ দিকি।

—বেশ! মজা মন্দ নয়। আমি হলাম অ-সভ্য। আর ওই ব্যক্তিটি যে সেই ইস্তক তোমার মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পাচ্ছে না, তার কি? আমি ভাবলাম—হয়তো বা তোমার "সে"! তা' নইলে কেন এমন করে চেয়ে থাকবে?

অলকা হাসিচাপা মুখ গম্ভীর করে বলে—আমি পথে বেরোলে 'হাঁ' করে চেয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না যে লোকের! সভ্যতা বজায় রাখে কি করে? তা' বলে আমার 'সে' অমন নয়।

—এতোদিনে যে 'সে' কি হয়ে উঠেছে জানো তুমি?

—থামো তুমি, মেলা বক্‌বক্‌ কোরো না। লোকটা তাকাচ্ছে।

বারোয়ারীতলায় কি কোনো কিছুর মেলায়, হয়তো ভীড়ের ঠ্যালায় একটু চোখছাড়া হয়ে গেছে অলকা। দেবেশ এগিয়ে গেছে সামনে, নয়তো পড়ে আছে পিছনে, দু'জনেই খুঁজছে দু'জনকে। দেখা হতেই দেবেশ স্বচ্ছন্দে বলে বসলো—উঃ! রক্ষে পাই! ভাবলাম হয়তো বা মেলার ভীড়ে হঠাৎ "হারানো প্রথম প্রেম"কে খুঁজে পেয়ে আমাকে ভুলে সট্‌কালে তার সঙ্গে।

অলকা উত্তর দেয়—চমৎকার! কল্পনাশক্তি কী প্রখর! আমার প্রথম প্রেমকে আমি যদি বা ভুলে নিশ্চিন্দি থাকি, তুমি আর ভুলতে পারলে না দেখছি।

—কি করে পারবো!···দেবেশ কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে—মনের মধ্যে যে, কাঁটা বিঁধেই আছে।

বিঁধে নেই বলেই হয়তো বলতে পারে। থাকলে পারতো কি?

নিজের থেকে বছর আষ্টেকের ছোটো, চিরদিন অনুপস্থিত একটা ছেলেকে, নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে এমন পাগল দেবেশ নয়। পাগল অলকাও নয়। তবু, সত্যিই কি অলকা মেলার ভীড়ের হাজারখানা মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখে না?···পথ চলতে—থমকে দাঁড়ায় না? সিনেমায় থিয়েটারে গিয়ে ফেরার সময়—"রোসো বাবু, ভীড় কমুক" বলে দাঁড়িয়ে থাকে না সিঁড়ির একধারে, শেষ দর্শকটি চলে যাওয়া পর্যন্ত?···

দেবেশ অনুযোগ করলে বলে—'হোক্‌গে, দু'চার মিনিটে কী রাজ্য বয়ে যাবে! ঠেলাঠেলি দেখতে পারিনে!'

এ একটা নেশা!

বোধকরি অভ্যাসের নেশা! তা' ছাড়া আর কি? ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মতো!

হয়তো সংসারের সহস্র বন্ধনের পাকে পড়ে গেলে এ নেশা কবে ছুটে যেতো, কিন্তু সে অবসর হ'লো কই? নিঃসন্তান জীবন! জীবনের চেহারা আর বদলাতে পেলো না, বরাবর একই রকম থেকে গেলো।

নিঃসন্তান দম্পতি, সর্বত্রই প্রায় এক সঙ্গে ঘোরা ফেরা! দেবেশের মামাতো

বোনের বিয়ে উপলক্ষে সকালের গাড়িতে চলেছে দুজনে চন্দননগর। সেকেণ্ড ক্লাশ একখানি কামরায় উঠে গুছিয়ে বসে দেবেশ প্রথম কথা কয়—হ্যাঁ গো, ওদের বিয়েতে দেবার শাড়ীখানা ভুলে ফেলে আসোনি তো?

—এসেছি।

—কী সর্বনাশ! তা' হলে উপায়?

—উপায়ের অভাব কি? চন্দননগর তাঁতের শাড়ির জন্যে বিখ্যাত।

—তার মানে, গিয়ে আবার একটা কিনতে হবে?

—ভুলে ফেলে এলে অবিশ্যি হতো!…কিন্তু থামো তো তুমি।…খবরের কাগজখানা সঙ্গে নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিলে? তা' নাওনি! জানতাম আগেই। যতো ভুল সব আমিই করি যে।

নবদম্পতি নয় যে কেউ ওদের কথোপকথনে কর্ণপাত করবে, সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই যে কেউ কৌতূহল দৃষ্টি ফেলবে। তাকিয়ে দেখেও না কেউ।

শুধু বোধ করি 'খবরের কাগজ' কথাটা উচ্চারিত হ'তেই একেবারে কোণের দিকে যে ভদ্রলোক একখানা খোলা খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে বসেছিলেন, তিনি কাগজখানা আর একটু বাগিয়ে ধরে নড়েচড়ে কিছু গুছিয়ে বসেন।

বোধ হয় মনে মনে আশঙ্কিত হন, 'এইরে বাবা, চাইবে না তো!' মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তাই মুখের ভাব বোঝা যায় না। কাগজের ওপর জেগে আছে শুধু ভুরুর ওপর থেকে তেল চকচকে টাকওলা মাথাটি।

কর্তা গিন্নীতে নীচুগলায় সাবধানে কথা চলে।

—লোকটাকে যেন কোথায় 'দেখেছি দেখেছি'!

—'লোকটার' আর কতোটুকু দেখতে পাচ্ছো? মুখচন্দ্র তো কাগজের আড়ালে।

—তা'হলেও, হাত পা কপাল ভুরু সবটা মিলিয়ে কেমন যেন 'চেনা চেনা' লাগছে!

—দেখো, আবার তোমার অশোকদা কি না!

চিরাচরিত ধরণে মিটিমিটি হাসে দেবেশ।

অলকাও নীচুগলায় হেসে ওঠে—সত্যি, যা বলেছো! ওই টেকো বুড়োটা নইলে আর অশোকদা কে হবে! দেখাতে তো আর পারলাম না কখনো, কপাল আমার! কী ফাইন্ চুল তা'র জানো? রেশম হার মানে। প্রেমে পড়েছিলাম কি আর অমনি?

—আহা সেই কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম এখনো টিঁকে থাকবে তা'র মানে কি?

—নাঃ একেবারে গড়ের মাঠ হয়ে যাবে! তুমি হিংসের জ্বালায় তাই চাও আর কি!

একটু চুপচাপ।

ছটফটে দেবেশ আবার কথা কয়ে ওঠে—আচ্ছা, কাগজখানা চেয়ে দেখবো একবার?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আচমকা এ কথায় চমকে ওঠে অলকা। কে জানে এতোটাই বা চমকায় কেন ? প্রায় বিরক্তভাবে বলে—কেন, কি এতো রাজকার্য পড়েছে কাগজে ?

—আহা বুঝছো না, কাগজ সরালে মুখটা পরিষ্কার দেখা যেতো !

আসল কথা চুপ করে থাকতে একদণ্ডও পারে না দেবেশ। অলকার নিস্তব্ধতাও ওর অসহনীয়। গল্প কববার মতো কিছু যখন মিলছে না হাতের কাছে, পুরনো ঠাট্টাই চলুক।

অলকা রেগে বলে—যাবে তার কি ? কি চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে তোমার ওর মুখ দেখে ?

দেবেশ কৃত্রিম করুণ মুখে বলে—আমার আর কি ! তোমারই যদি কিছু লাভ হয়। বলছিলে কিনা—ওকে 'চিনি চিনি করি চিনিতে না পারি'—ভাবলাম—

—খবরদাব বলছি, ওই বিদঘুটে কথাগুলো বলবে না আর। যখন তখন যেখানে সেখানে বললেই হ'লো ওই আজেবাজে কথা ! এতো হাড় জ্বালাতেও পারো !

অবশ্য সব কথাই অপরের কান বাঁচিয়ে।

সংবাদপত্র-পাঠক ভদ্রলোক তখন কাগজখানা উল্টে ছোটকরে ভাঁজ করে নিয়ে পড়তে শুরু করছেন। অবনত মুখের সবটাই প্রায় দেখা যাচ্ছে।

অলকা একনজর দেখে নিয়ে মুখটা অন্য দিকে ফেরায়। একখুনি দেবেশ হাসাহাসি সুরু করবে। সত্যিই যে একটু ভালো করে দেখে নিয়ে মনে পড়াবে কোথায় দেখেছে লোকটাকে, সে আর দেবেশের জ্বালায় হবার জো নেই। অথচ দেখেছে যে কোথাও তাতে সন্দেহ নেই !

কিন্তু কবে ? কখন ? কোথায় ?

কোথায় দেখেছে, এরকম গোলগাল নেওয়া-পাতি নেওয়া-পাতি গড়ন, এমন চুকচুকে টাক ?…কই ? অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারে না।

তবু মনে খটকা থেকে যায়। ভুরুর ওপর দিকে, ফর্সা ফর্সা কপালে কালো কুচকুচে ওই তিলটা ? কেমন যেন পরিচিত নয় ? ওরকম আর কার দেখেছে কবে ?

দেবেশের আবার উস্‌খুস শুরু হয়।

—পানের কৌটোটা এসেছে তো ?

—নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখো।

—জর্দাটা ?

—জানি না। নিজের জিনিস নিজে ঠিক করে আনতে পারো না ?

—উঃ একেবারে যে মিলিটারী ! হ'লো কি ?…দেখো—তুমি আমার কথা শুনলে না, ওই ভদ্রলোকের সুটকেসে কিন্তু লেখা রয়েছে—'এ মুখার্জি'।'

মুখার্জি !

অলকা একবার সামান্যতম চমকায়।…তারপর গম্ভীরভাবে আউড়ে যায়—অজিত, অমল, অবনী, অসিত, অপূর্ব, অনিমেষ, 'অখদ্যে', 'অগা' !

অর্থাৎ কি না এতোগুলো নামের মধ্যে যে কোনো একটা নামের অধিকারী যে কোনো মুখুয্যে পরিবারে জন্মালেই সুটকেসে 'এ, মুখার্জী' লিখে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে পারে।

গাড়ি শ্রীরামপুরের কাছ বরাবর আসতেই বহু-আলোচিত ভদ্রলোকটি কাগজখানি পাট করে নিয়ে উঠে দাঁড়ান। সুটকেসটি বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডানহাতে পাটকরা কাগজখানা দেবেশের দিকে বাড়িয়ে ধরে সম্পূর্ণ দেবেশের দিকে তাকিয়েই স্মিতহাস্যে আবেদন করেন--পড়বেন?

ভদ্রতার বদলে ভদ্রতা। দেবেশও স্মিতহাস্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে—দরকার হবে না, এই তো নেবে যাবো এখুনি!

চওড়া ডাঁটিওলা কালো সেলের চশমা পরা ভারী-সারি পুরন্তমুখে অমায়িক হাসিটি বেশ মানানসই। দেখলে আবার যেন দেখতে ইচ্ছে করে।

অমায়িক হাসি আবার প্রশ্ন করেন, যাচ্ছেন কোথায়?

—চন্দননগরে। মামার বাড়ি।

—মামার বাড়ি! ভালো জায়গায় যাচ্ছেন তা'হলে?

সহসা অন্ধকার যবনিকার গায়ে আছড়ে এসে পড়লো হঠাৎ জান্‌লা খুলে দেওয়া আলোর ঝলক!···বিস্মৃতির পর্দায় স্মৃতির বিদ্যুৎ রেখা!

না, সন্দেহের অবকাশ নেই।

অশোকই!

ডান ভুরুর ওপর কালো কুচকুচে তিলটি এখনো তেমনি নির্ভুল! স্পষ্ট!

একটি তিল কি তুচ্ছ? পুরনো মুখকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? ওই তিলটাকে অনবরত দেখতে পাচ্ছিলো, তবু অশোককে চিনতে পারেনি অলকা।···এতোক্ষণ সামনাসামনি বসে থেকে পারেনি, পারেনি পরিষ্কার মুখোমুখি তাকিয়ে।

অশোক পেরেছে।

কিন্তু জগতে কার কি ক্ষতি হ'তো যদি অশোক অলকাকে চিনতে না পারতো! অলকার সঙ্গে নিতান্ত স্থূল এই রসিকতাটুকু না করলেই বা তার ভাগ্যবিধাতার কি এমন এসে যেতো?···অশোককে দিয়ে এই কথাটুকু না বলালে কি চলছিলো না তাঁর—

—কে, অলকা না কি?

—'অশোকদা'! মৃদু অস্ফুট উত্তর।

রেলগাড়ির অসুবিধা সত্ত্বেও নীচু হয়ে নমস্কার করে অলকা।

'অশোকদা'!

দেবেশ চোখ বড়ো করে বলে—অ্যাঁ! সত্যিই তা'হলে আপনি সেই বিখ্যাত অশোকদা?

—বিখ্যাত না কি? কি ব্যাপার!

—বিলক্ষণ! আপনাকে নিয়ে তো আমাদের—ছি ছি অলকা, শেষ পর্যন্ত

তুমিই হেরে গেলে !···বুঝলেন মশাই, আপনার বাল্যবান্ধবী এতোক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন 'অশোকদার কক্‌খনো অতো টাক হতে পারে না', আমার কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো—

—তাই নাকি ?···হা হা করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক—আপনি তো আমাকে দেখেনইনি ?

দেবেশ অভ্যস্ত রসিকতার ভঙ্গিতে বলতে যাচ্ছিলো—'দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি,' কিন্তু বলা হ'লো না, গাড়ির বাঁশী বেজে উঠলো।

ট্রেন শ্রীরামপুর স্টেশনে 'ইন্' করেছে।

মাত্র এক মিনিটের স্টপেজ। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক নড়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি দুই হাত জোড় করে বলেন—নমস্কার ! এসে গেলো আমার গন্তব্য-স্থল।···আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুসি হলাম···অলকা, চললাম তা'হলে ? অনেক দিন পরে দেখা হ'লো, কি বলো ?···

নেমে গেলেন ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি করে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করলো।···আর সেই চলার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলো একটি মধুর বেদনাময় সঙ্গীত। থেমে গেলো একটি সুর।

অভিনয়ের পিছনে আবহসঙ্গীতের মতো, অলকার জীবনের নেপথ্যে ঝঙ্কৃত যে অনাহত মৃদু সুরটি তা'র সমগ্র জীবনকে গেঁথে রেখেছিলো একটি সুষমার ছন্দে, চিরদিনের মতো থেমে গেলো সে সুর, ভেঙে গেলো সে ছন্দ।

না, সে সুর আর বাজবে না, সে ছন্দ আর ফিরে আসবেনা।···"আর একবার দেখা হ'লো না" বলে নিঃশ্বাস ফেলবার মধুর সুখটুকু গেলো ফুরিয়ে—"হয়তো আর একদিন দেখা হবে" এই আবেশময় আশাটুকুর হ'লো সমাধি !

হায় ! কী প্রয়োজন ছিলো আর একবার দেখা হ'বার ! কী ক্ষতি ছিলো আর একদিন দেখা না হ'লে ?

তবু—মনের ভিতরটা কেউ কারুর দেখতে পায় না এই রক্ষা ! বিধাতা পুরুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সমস্ত অসৌজন্য ক্ষমা করে আসছে মানুষ বোধ করি শুধু এই এক অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়। মনের ভিতরের খবরটা মানুষের নিজের হাতের মুঠোয়।

তাই হাত বাড়িয়ে দেবেশের ওপাশ থেকে পানের কৌটোটা তুলে নিয়ে একটা পান বার করতে করতে অলকা বলে—ওই ভুঁড়ি আর ওই টাক ! ছি ছি ! চিনতে পারিনি বলে খুব তো লজ্জা দিলে, চেনবার কোনো উপায় রেখেছে ?

—তা কি জানি—দেবেশ হাসে—আমি তো আর আগে দেখিনি।···ও কি পানটা ছিঁড়ছো যে ছেলেমানুষের মতো ? খাবে না ?

—নাঃ ! শুকিয়ে গেছে।

তা' গেছে বৈকি নেহাৎই শুকিয়ে গেছে। নইলে তুচ্ছ একটু কাজের ক্ষতি

করে কিছুক্ষণের জন্যও কি সহযাত্রী হওয়া যেতো না? যাওয়া যেতো না অলকার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত?

জরুরী কাজ?

কাজ কতো জরুরী হওয়া সম্ভব?

[১৩৬২]

যা নয় তাই

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে' দেখলে গায়ত্রী, সামনে থেকে—পাশ থেকে। কী আছে তার চেহারায়? এমন কি বিশেষত্ব, যার জন্যে বিশ্ব-সংসারের সমস্ত পুরুষ জাতি শুধু তার দিকেই লুব্ধ দৃষ্টি হানছে—এমনি একটা উৎকট ধারণা শ্রীপতির?

এ ধারণাটা কি কিছুতেই ঘোচানো যায় না, যে ধারণার জ্বালায় শ্রীপতির স্বস্তির লেশ নেই, গায়ত্রীর অশান্তির শেষ নেই?

অবশ্য, নিজেকে পুরুষ জাতির চক্ষে সত্যিকার লোভনীয় মনে করতে পারলে রীতিমত একটা সুখাবেশ আসে বৈ কি, সেটা স্বীকার করাটা নিন্দনীয় হলেও অস্বীকার করাটা মিথ্যাচার। কিন্তু সে দাবী করবার মতো সুন্দরী যে গায়ত্রী নয়, এ জ্ঞান তার যথেষ্ট আছে।

শ্রীপতিরই কি নেই? অন্ধ তো নয়?

তবে কেন শ্রীপতির অহরহ এই যম-যন্ত্রণা?

সত্যিকার সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে যারা ঘর করে, তাদের হৃদয়-অরণ্যে কী দাবানল জ্বলতে থাকে তা হলে?

রাগ হয়, অপমান বোধ হয়, দুঃখও হয় গায়ত্রীর।

অকারণ কী আগুনের দাহে খাক্ হয় শ্রীপতি! বাড়িতে পুরুষ-আত্মীয় কেউ বেড়াতে এলেই কাজকর্ম শিকেয় উঠলো তার! তা সে যতো দরকারী কাজই হোক।

আগন্তুক ব্যক্তির বয়স সম্বন্ধে বিচার-বোধের বালাই থাকে না, এমনই বাতিক।

এইতো সেদিন চোখ দেখাতে ডাক্তারবাড়ি যাচ্ছে, বেরোবার মুখে মামাতো ভগিনীপতি রাজেন এলো মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। দাঁড়িয়ে পড়লো শ্রীপতি।

বাক্যবাগীশ লোকটা। পাত্রের বাজার আর বাজার-দর নিয়ে বক্-বক্ করেই চলে, ওঠে না। শ্রীপতিও নড়ে না! অথচ ডাক্তারের সঙ্গে টাইম ঠিক করা আছে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে শ্রীপতির যাওয়াই হলো না।

চোখ চুলোয় যাক, চোখের তারাকে চোখ-ছাড়া করে রেখে চলে যাওয়ার উপায় কোথা তার—যেখানে নির্লজ্জ লোলুপ একজোড়া চোখ হাঁ করে গিলতে

চাইছে তাকে ?

গায়ত্রীর বাপের বাড়ির দিকের নেহাত বাপ ভাই ছাড়া প্রায় সকলেরই এ-বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। লিখিত অনুশাসনে না হলেও অলিখিত শাসনে। বিয়ের পর নূতন নূতন অনেকেই আসতো, এখন কেউ বড়ো আসে না। আসা ছেড়েছে—শ্রীপতির মুখের চেহারায় গলাধাক্কার নীরব নোটিশ পেয়ে।

যাক, এ সবই তো সয়ে এসেছিলো গায়ত্রী।

যে যা বুঝতো, মনে মনেই বুঝতো। শ্রীপতির ভেতরকার এই গলদ এমন করে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েনি কোনো দিন, যেমন কাল হয়ে গেলো।

অথচ আবারও আজ সেই নাটকের পুনরভিনয় হতে চলেছে।

ব্যাপারটা এই: স্কুলজীবনে নৃত্যগীতপটীয়সী বলে রীতিমত একটা খ্যাতি ছিলো গায়ত্রীর। আইবুড়োবেলায় অনেক নেচেছে, অনেক গেয়েছে। সে গায়ত্রী চাপা পড়ে গিয়েছিলো কবরের মাটিতে। এই আট বছর পরে একদল অবুঝ বাহিনী পণ করেছে কবর খুঁড়ে আবিষ্কার করবে তাকে।

কাল কতকটা কাজ এগিয়ে গেছে, আবার আজ আসবে বলে শাসিয়ে রেখে গেছে। গায়ত্রীর বাপের বাড়ির পাড়ার ছেলেরা।

গায়ত্রীর যখন বিয়ে হয়েছে, ওরা তখন হাফ প্যাণ্ট পরে মারবেল খেলতো এখন মস্ত লায়েক হয়ে উঠে এক সমিতি গড়েছে—'দুর্গত-কল্যাণকামী সঙ্ঘ' না কি ঐ রকম একটা গালভরা নাম দিয়ে। সেই সঙ্ঘের উদ্যোগে 'ভুখা মানবের ভুখ' মেটাবার সাধু সংকল্প নিয়ে 'বিচিত্রানুষ্ঠান' না কি ছাই-পাঁশ হবে বুঝি টিকিটের ব্যবস্থায়। টিকিট-বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাবে দান-পুণ্যে!

এই পর্যন্ত বেশ। মোটা টাকার একটা টিকিট যদি ওরা গছিয়ে যেতো গায়ত্রীকে, তাহলেও এসে যেতো না কিছু। শ্রীপতি গরীবও নয়, কৃপণও নয়।

কিন্তু তা তো নয়,—ওদের চাহিদা আরো জোরালো।

ওরা চায় গায়ত্রীকে!

বলে: গায়ত্রীর কণ্ঠস্বরটাই নাকি মোটা চাঁদার চেযেও অনেক বেশী দামী।

ব্যবস্থাপনার গিন্নী রেখাদিকে নিয়ে সদলবলে এসে হানা দিয়েছিলো কাল।

প্রস্তাব শুনে প্রথমটা তো গায়ত্রী হেসেই খুন! বলে: গান গাইবো কি রে? তবু ভালো যে, নাচতে বলিসনি! সে প্রোগ্রামও তো আছে তোদের অনুষ্ঠানে? গান-টান সব ভুলে মেরে দিয়েছি।

—ইস্ তাই বৈ কি! শেখা জিনিস আবার ভুলে যায় মানুষ?

—তা যায় না? বুড়ো হলে যায়।

ছেলের দল হেসে ওঠে: বুড়ো! আপনি বুড়ো? রেখাদি তাহালে কি? স্থবির?

রেখাদি?—রেখার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে গায়ত্রী উত্তর দেয়: রেখাদির কথা বাদ দে, রেখাদি চির-তরুণী।

প্রায় চৌকো গড়নের দেহখানিকে কোনো রকমে একখানা চেয়ারে ঠেসে

ভরিয়ে রেখাদি এতোক্ষণ হাঁপাচ্ছিলেন, এইবার নিজমূর্তি ধরেন : তা থাকবো কেন, তোর মতন অকালপক্ক হবো ! ছিঃ ছিঃ, কী গোল্লায় গেছিস, অ্যাঁ !… বাবাঃ ! বিয়ে আবার কার না হয় ? তোর মতন এমন ডুবে যায় না কেউ ! বিশ্বসংসার ভুলে কেবল 'আমি আর তুমি' !

—আঃ রেখাদি, চিরকাল একরকম থাকবে তুমি ?

—নিশ্চয় ! একশোবার। তোর মতন বদলে যাবো নাকি ? যাক্ গে বাজে কথা, এখন চল দিকিন।

গায়ত্রীর আবার হাসির পালা।

—যাবো কি বলো ! আর এখুনি হঠাৎ কোথায় বা যাবো ?

—কোথায় যাবি ? যমের বাড়ি ! কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। ছেলেগুলো বলেছিলো ঠিক—'আমরা বললে কি আসতে চাইবেন ?' আমি মরতে মরতে এলাম সেই জন্যে। একেবারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছি—চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে হয়, তাও রাজী।

যাওয়ার কথা গায়ত্রী কল্পনাও করে না।

শ্রীপতির অনুপস্থিতিতে একপাল ছেলের সঙ্গে কোথায় না কোথায় তাদের সঙ্ঘের অফিসে যাওয়া ? তা হলে আর ফিরে এসে বাড়ি ঢুকতে হবে না। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সত্যি কথাটা তো আর লোকের কাছে তোলা যায় না, তাই ঠাট্টার ছলে বলে : বাড়ির কর্তা উকিল, সেটি মনে রেখো।…অনধিকার প্রবেশ, 'বলপ্রয়োগ', 'লুঠপাট'—এতোগুলো চার্জশীট তৈরী হয়ে যাবে তোমার নামে।

—রেখে দে তোর উকিল ! বলে—'হাতি ঘোড়া গেলো তল, ব্যাঙ বলে কত জল !' রেখা ভটচায্যি হাইকোর্টের জজকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে !…বিজয়, গাড়িতে স্টার্ট দিতে বল।… গায়ত্রী, জল্দি।…এক মিনিট মাত্র সময় দিতে পারি তোমাকে,—বেশভূষা-সংস্কার করতে।

গায়ত্রী খুঁজে খুঁজে যতো যুক্তি দেখায়, রেখাদির বাক্যের তোড়ে ভেসে যায়। ঘণ্টা দু'তিনের জন্যে একবার বাড়ির বাইরে যেতে যে এতো রকম অসুবিধে হতে পারে, একথা সে গ্রাহ্যই করে না।

—একের নম্বরের কুনো হয়ে গেছিস তুই, সেই জন্যই আরো বেরোনোর দরকার।…ভারী তো সংসার—কর্তা আর গিন্নী, তার আবার এতো বড়াই ! তোর তো চব্বিশ ঘণ্টা ধিঙ্গি-নাচ নেচে বেড়াবার কথা।…চার-চারটে বঘু ডাকাতের পকেট সংস্করণ নিয়ে ঘর করি আমি, তাও তোর চেয়ে আমি অনেক মুক্ত জীব।

গায়ত্রী আর কতো যুঝবে ?

তবু শেষ চেষ্টা করেছিলো, বলেছিলো : শুধু কর্তা-গিন্নী বলেই তো এতো ভাবনা ! কর্তা এসে যখন দেখবেন পাখী উড়ে গেছে, তখন মূর্ছা যাবেন।

—আহা যেতে দে—যেতে দে ! এসে আঁচল দিয়ে বাতাস করে পতিসেবার পুণ্য অর্জন করতে পারবি। সাধে বলছি—বিয়ে করে একেবারে গোল্লায় গেছিস ! বর তো কারুর হয় না, বৌকে ভালোও কেউ বাসে না ? হুঁ !… কোথায় গেলো তোর ওই ঝিটা ? এতোক্ষণ তো ঘুর-ঘুর করছিল !…ওগো

বাছা, কই তুমি ?…এই শোনো, তোমার 'মা' না 'বৌদিদি'—কি বলো, একে নিয়ে চললাম আমি।…বাবু এলে বোলো—একদল ডাকাত আর তাদের সর্দারণী এসে ওনাকে ধরে নিয়ে গেছে !…

—নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না ! বেশ তো কালকেই যাবো না হয় বাপু, আজ কিছু ঠিক করা নেই…

—আরে মোলো তোর ঠিকের নিকুচি করেছে ! কাল থেকে তো রিহার্সাল দেওয়াতে হবে ছুঁড়িগুলোকে। আজ সেই ঠিক করি গে চল্—কিভাবে সাজাতে হবে জিনিসটা।…এ ছোঁড়ারা তো 'রেখাদি সব ভার তোমার'—বলে নিশ্চিন্দি হয়ে হবু গোঁফে তা দিচ্ছে ! রেখাদির যেন শাশুড়ী-মরা দায় ! এদিকে হাতে মাত্র চারটে দিন !

এরপর আর কি করবে গায়ত্রী ?

তবু এই সর্তে গাড়িতে উঠেছে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই নিশ্চয়ই ফেরত দিয়ে যেতে হবে তাকে।…

—হবে বাবা, হবে ! উঃ কী পায়া ভারী ! নাড়ানো যায় না একেবারে ! সাতজন্মেও যেন উকিল-গিন্নী না হই। এতো অহঙ্কার !

ঝিকে অনেকভাবে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে প্রায় নিরুপায় হয়েই বেরিয়ে পড়েছিলো গায়ত্রী।

—আপনাকে টেনে নিয়ে যেতে যে পরিশ্রমটা হলো গায়ত্রীদি, গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা ছিলো এর চেয়ে !

সাফল্যের আনন্দে একগাল হেসে একটা ছেলে এই সস্তা রসিকতাটুকু করে।

গায়ত্রী ফিকে হাসি হেসে বলে ঃ বীর হনুমানদের ক্যাপাসিটিটারও প্রমাণ হয়ে গেলো তো ?

বুকের ভেতর তার তখন হাতুড়ির ঘা পড়ছে !

একমাত্র ভরসা শ্রীপতি ফেরার আগে এসে পড়া।

কিন্তু সে ভরসা কোথায় ভেসে গেলো !

আসলে যা হয় ! 'দুর্গত'দের দুঃখে বিগলিত মহামানবরা যেভাবে আড্ডা জমালেন, তাতে আড়াল থেকে মনে করা বিচিত্র নয় যে, বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রীই বা এসেছে সব। প্রথমে নতুন নতুন পরিকল্পনার রঙিন ফানুসে প্রোগ্রামের সংখ্যা যে কোথায় গিয়ে ঠেকলো—তার ঠিক নেই, তারপরে চললো ছাঁটাই। শেষ পর্যন্ত যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটালো, তখন খেয়াল হলো পাঁচটা বেজে গেছে—পঁচানব্বুই মিনিট আগে।

কাতর গায়ত্রী একেবারে উঠে দাঁড়ালো।

তবু দাঁড়াবার পরেও আরো কতো দেরি !

আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে তাকে ছাড়লো তারা।

—পৌঁছতে যাচ্ছে কে ?

রেখাদির প্রশ্নে একটা ছেলে জানালো ঃ ওই যে শিবাজীদা গাড়ি নিয়ে

রেডি হয়েছেন।

শিবাজীদা! সে আবার কে! এ নাম তো গায়ত্রীর জানা নাম নয়!

'দা' শব্দটা যে রামদা'য়ের কোপ!

ওই একাক্ষর শব্দটিতেই মালুম হচ্ছে, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি এদের বয়সের গণ্ডী পার হয়েছে। কে জানে, কতো দিন আগে পার হয়েছে! মনে করেই হৃৎকম্প হলো গায়ত্রীর। গোঁফ গজিয়েছে—কি গজায়নি, মাথায় খানিক বেড়েছে মাত্র, এই ছেলেগুলোকেই শ্রীপতি বরদাস্ত করতে পারতো কিনা সন্দেহ, দেখেনি তাই রক্ষে!

এর ওপর আবার 'দাদা!'

চাঁদের ওপর চুড়ো!

ব্যগ্র হয়ে বলেঃ কেন তোরা কেউ পারবি না? আবার কেন সে ভদ্দরলোকের ঘাড়ে ভার চাপানো?

—হায় অদৃষ্ট!—গায়ত্রীর কথারই উত্তর দিতে দিতে বাইরে থেকে একটি ছেলে এসে দাঁড়ালোঃ এই বেচারা ভদ্দরলোকের স্কন্ধকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতোদিন না এঁদের কার্য-সমাধা হয়, ততদিন দৈনিক দু'বার করে এ ভার বহন করতে হবে!…অতএব—চলে আসুন নিঃসঙ্কোচে।

সে তো নিঃসঙ্কোচেই অনুরোধ করলো গায়ত্রীকে নিঃসঙ্কোচে চলে আসতে, কিন্তু গায়ত্রীর সঙ্কোচ কি শুধু ভদ্রতার? অপরকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে যে-ভদ্রতাব সঙ্কোচ আসে?

কী স্বচ্ছন্দ জীবন রেখাদির! দেখলে হিংসে হয়।

কি করে ওর সামনে নিজের জীবনের অপমানকর গলদের কথা প্রকাশ করবে গায়ত্রী! কি করে বলবে, একা শিবাজীর সঙ্গে এক গাড়িতে যাবার প্রস্তাব শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে তার!

তা' বলা যায় না।

কাজেই ভেঙে পড়তে উদ্যত আকাশের ভয় অগ্রাহ্য করে বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠতে হয় গিয়ে।

—আসছিস তো কাল?

রেখাদির প্রশ্নে গায়ত্রী যেন এড়াবার একটা উপায় পায়। মিথ্যে রাগের ভান দেখিয়ে বলেঃ এসে কি হবে শুনি? কাজ তো হবে কচু, খালি আড্ডা! কাল আসছি-টাসছি না।

—না এলে এরা ছাড়বে? শিবাজী সহাস্যে বলেঃ 'কল্যাণকামী'দের ঠেকানো অতো সোজা নয়!

ভালোমতো একটা উত্তরের অভাবে গায়ত্রী শুধু হেসে চুপ করে থাকে। গুছিয়ে কথা বলবার মতো মানসিক অবস্থা এখন নয় তার।

কে জানে, কপালে কি আছে তার আজকে!

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই একেবারে শ্রীপতির সামনে।

'রেখাদি পৌঁছে দিয়ে গেলেন'—এই গোছের কিছু একটা মিথ্যে কথা বলেই যে এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা করবে, তারও আর উপায় রইল না!

অথচ সত্যিই কিছু আর শিবাজী ভয়ঙ্কর একটা দৈত্যদানব নয়, নিতান্তই 'ছেলে' মাত্র! গায়ত্রীর চেয়ে দু'মাসের ছোটই হবে হয়তো।

শ্রীপতি রাস্তায় পায়চারি করছিলো।

এসেই ঝিয়ের মুখে গায়ত্রীর 'উধাও' হওয়ার কাহিনী শুনেছে, তার পর থেকে এই ঘণ্টা দুই ধরে চলেছে পিঞ্জরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো পদচারণা।

জল খায়নি, হাত-মুখ ধোয়নি পর্যন্ত।

—ইয়ার ছোকরাটি কে? একটি লক্কা-পায়রা একেবারে!···

গায়ত্রী একটু জোর সঞ্চয় করছিলো মনে মনে। বিরক্ত হয়ে বলে: কি যে অভব্যের মতো কথাবার্তা তোমার! একটা ছেলেমানুষ···

—হ্যাঁ দুগ্ধপোষ্য শিশু বলেই মনে হলো! তা যাওয়া হয়েছিলো কোথায়?

গায়ত্রীর ইচ্ছে হলো, বলে 'যমের বাড়ি', কিন্তু না, শ্রীপতির মেজাজটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, কে জানে!

তাই মনের রাগ চেপে সহজ গলায় বলে: আর বলো কেন! দুপুরবেলা হঠাৎ কি বিপদ! বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ রেখাদি এসে একেবারে জোর-জবরদস্তি শুরু করলেন। কিছুতেই এড়ানো গেলো না!···

—এড়াবার ইচ্ছে থাকলে এড়ানো যায় না, একথা আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। মতলবটা কি, শুনতে পাই? হঠাৎ রেখাদির এমন প্রেম উথলে ওঠবার মানে?

—মানে একটা কিছু আছেই।

গায়ত্রীও একটু বিরক্তি দেখায়।

—বলি, কার হুকুমে একপাল ছোঁড়ার সঙ্গে হৈ হৈ করে বেরিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

বিশ্বের তিক্ততা শ্রীপতির কণ্ঠে।

খোলাখুলি এরকম রূঢ় কথা বড়ো একটা বলে না শ্রীপতি। কিন্তু এর আগে বলবার সুযোগই বা কবে দিয়েছে গায়ত্রী? বাপের বাড়ি পর্যন্ত সাধ্য-পক্ষে যায় না। রাস্তা থেকে একটা ফেরিওয়ালাকে পর্যন্ত ডাকে না।

—আমি যে একটা কৃতদাসী মাত্র, সেটা অতো বুঝিনি।—বলে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় গায়ত্রী—মাথায় একটু খোলা হাওয়া লাগাতে।

—আর কি! লম্বা লম্বা কথা আছে খালি। জানো তো আমি এসব পছন্দ করি না। যাক্, রেখাদির হঠাৎ তোমাকে কি দরকার পড়লো শুনি?

মরীয়া হয়ে গায়ত্রী এক নিশ্বাসে বলে যায়: রেখাদির নয়, আমাদের ওপাড়ার ছেলেরা একটা চ্যারিটি শো করবে আমাকে গান গাইতে হবে।

—বটে! শুধু গাইতে?—বিদ্রূপের কালো হাসি হেসে শ্রীপতি বলে: নাচতে নয়?···দেশে আর গায়িকা পেলো না, কেমন?

—আমার মতো ভালো গায়িকা পায়নি নিশ্চয় বলে একটু বিজয়িনীর হাসি

হাসে গায়ত্রী।

কিন্তু হাসিতে ভোলবার মতো অবস্থা এখন শ্রীপতির নয়, কুৎসিত একটা মুখভঙ্গী করে বলে: রূপ দেখিয়ে, গান শুনিয়ে পয়সা রোজগার করা ভদ্রঘরের মেয়ের উপযুক্ত কাজই বটে!

—বিশ্রী বিশ্রী কথা বলো না,—গায়ত্রী বলে: ঝি-টা ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুনছে!…আচ্ছা তুমি যে বলছো,·· আজকালকার দিনে কে না করছে ও-সব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই করছে। দু'চারটে ফ্যাশনেবল বাড়ির মেয়েদের বেহায়া-পনা দেখে দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে তোমাদের! মোট কথা, বাছাধনদের ভালো করে বুঝিয়ে দিও, এখানে ওসব আবদার চলবে না। ইয়ারকির আর জায়গা পায়নি!

গায়ত্রী স্থিরভাবে বলে: এখন আর কিছু বলা চলবে না, আমি কথা দিয়েছি।

—কথা দিয়েছো? ওঃ তাহলে তো মাথাটা বিকিয়ে গেছে একেবারে! কাল এলে এক কথায় জবাব দিয়ে দেবে। বলবে—আমার স্বামী এসব পছন্দ করেন না।

—তাই কখনো বলা যায়?

এবারে শ্রীপতির আশ্চর্যের পালা!

—স্বামী পছন্দ করেন না—একথা বলা যায় না!…ঘরের বৌ গিয়ে পাঁচশো লোকের সামনে স্টেজে দাঁড়িয়ে নাচনা-গাওনা করবে, সবাই পছন্দ করে এসব?

—খারাপ করে বললেই খারাপ শোনায়। আমি তো দোষের কিছু দেখছি না।

প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করছে গায়ত্রী।

—তুমি দেখছো না, আমি দেখছি, ব্যস! এর ওপর আর কথা নেই।

কিন্তু কথা নেই বললেই কি কথা থামে?

তাসের পিঠে তাসের মতো কথার পিঠে কথা পড়ে!

স্ত্রী সুন্দরী না হলেও অহরহ যে দাবাগ্নি জ্বলছে শ্রীপতির হৃদয়-অরণ্যে, তারই হলকা ছড়িয়ে পড়ে তার কথায়। বলে: বেছে বেছে ভদ্রলোকের বাড়ি আসবার জন্যে সময় বার করেছেন বটে! দুপুরবেলা! দুগ্ধপোষ্য শিশু কিনা, …জ্ঞান হয়নি। পড়তো আমার সামনে, ঠাণ্ডা করে দিতাম একেবারে!

গায়ত্রী বলে: কিভাবে ঠাণ্ডা করতে? গলা-ধাক্কা দিয়ে বোধ হয়?

—দরকার হলে দিতাম বৈকি!…গলাধাক্কা তো ছোটো কথা, ওসব ডেঁপো ছেলেদের চাবুকই হচ্ছে উপযুক্ত ওষুধ!

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনি অনেক কথাই বলে। বলতে বলতে মাত্রা রাখতে পারে না এবং 'শেষ কথাটা' যা বলে সেটা মারাত্মক।

'স্বামী পছন্দ করেন না'—এই কথাটা উচ্চারণ করতে যাদের মাথা কাটা যায়, সেরকম মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র কতো ভালো হয় তা জানা আছে শ্রীপতির।

তাদের সায়েস্তা করবার অস্ত্র হচ্ছে জুতো! এই শ্রীপতির শেষ কথা!

এহেন শেষ কথার পর আর কথা কইবার অবস্থা ছিল না গায়ত্রীর। শুধু অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে হিসেব করেছে—আধ বোতল স্পিরিটে পরনের শাড়ীখানা ভালো করে ভেজে কিনা?···মজবুত একগাছা দড়ি যোগাড় করা কি খুব অসম্ভব?···দোতলার ছাতের আলসে থেকে ফুটপাথের দূরত্বটা কি যথেষ্ট নয়?···দুপুর রাতে হঠাৎ যদি কারুর মৃত্যু-পিপাসা জেগে ওঠে, কি খায় সে? —আইডিন?

এসব অবশ্য গতকালকার চিন্তা! ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত যতোক্ষণ না মাথার রক্তটা ঠাণ্ডা হয়েছিলো, ততোক্ষণের।

সকালে ঘুম থেকে উঠে নিত্যকর্মের ত্রুটি হয়নি। কাজ তো ঢের আছে। বামুন নেই, চাকর নেই—শ্রীপতির অর্থ-নৈতিক অসুবিধায় নয়, অনর্থ-নৈতিক অসুবিধায়।

কাজগুলো করে যাচ্ছে আষাঢ়ের আকাশের থম্‌থমে ভাব নিয়ে।···মনকে ঠিক করে নিয়েছে সে। দূর ছাই, তার আবার জীবন! সে জীবনের আবার ভদ্রতা-অভদ্রতার প্রশ্ন! বলেই দেবে যাওয়া সম্ভব হবে না তার।

বাড়ির ঝি, তারও এতো সাহস হল যে, সকালে বললো: দাদাবাবু কাল কি অনর্থ কাণ্ডই করলো! করবে না? ও বাতিক যে বড়ো সব্বনেশে বাতিক বৌদি! জানি কিনা, নিজের ঘরেই ছিলো—একটা কিছু 'সন্দ' হলো তো মেরে হাড়গতর চূর্ণ করে দিতো!···আপনাদের ভদ্দরের ঘরে তো তবু পরিবারের গায়ে হাত তোলে না।

এ অপমান সয়েও চুপ করে থাকতে হয়েছে।

কী করবে? প্রতিবাদ করা—বকাবকি করা?—সে তো আরো অপমান।···

সকাল থেকে শ্রীপতিও কথা কয়নি। ঠিক রাগে নয়, বরং বলা যায় সাহসের অভাবে। গায়ত্রীর মুখভাব লক্ষ্য করেছে তো।···কালকের কথাগুলো একটু বেশী রূঢ়ই হয়ে গিয়েছিলো সত্যিই!

মনটা খারাপ লাগছে বৈ কি!

প্রেমটা তো মিথ্যে নয়, রাহুর প্রেম—এই যা!

কোর্টে বেরোবার সময় ধাঁ করে সাহস সংগ্রহ করে বলে ফেলে: ছোঁড়াগুলো আবার আজ জ্বালাতে আসবে বোধ হয়? বলে দিও: 'শরীর খারাপ।' ব্যস! ···ঝি দোরটা দাও।

শ্রীপতি চলে যেতেই ঝিকে ভাত খেতে বলে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলো গায়ত্রী। অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলো ঝিয়ের ডাকে: বৌদি ভাত খাবে না?

—না! বলেছি তো? তুই খেয়ে নিগে।

বলে উঠে পড়লো গায়ত্রী, আব চোখ পড়ে গেলো বড়ো আরশিটায়।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো নিজেকে! সামনে থেকে···পাশ

থেকে !

কী আছে তার চেহারায় ? এমন কি বিশেষত্ব—যার জন্যে—আতঙ্কে আতঙ্কে খেয়ে শুয়ে স্বস্তি নেই শ্রীপতির ?

এর চেয়ে যদি একেবারে হাড়-কুৎসিত হতো গায়ত্রী, অনেক ভালো হতো। পৃথিবীসুদ্ধ মানুষজাতি তাকে হাঁ করে দেখছে, এ দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতো শ্রীপতি। গায়ত্রীও বাঁচতো !

আচ্ছা ধরো—যদি সে বসন্ত হয়ে হাড়-কুৎসিত হয়ে যায় ? একেবারে খুব সাংঘাতিক বসন্ত হয়ে ?

কড় কড়—কড়াৎ !

গায়ত্রীর নিভৃত চিন্তার ওপর যেন বজ্রপাত হলো ; আর কিছু নয়, দরজার কড়া নড়েছে।

কিন্তু কে ?

নিশ্চয় শিবাজী !

আর কে এমন সময় ? ··

বসন্ত হয়ে হাড়-কুৎসিত হয়ে যাবার ইচ্ছেটা স্থগিত রেখে তাড়াতাড়ি চুলে একটু চিরুনী বুলিয়ে, পরনের শাড়ীখানা ছেড়ে, আলনা থেকে একটা ফরসা ডুরে শাড়ী টেনে নিয়ে প্রায় পরতে পরতে নীচে নেমে যায়।

ঝি দরজা খুলে দিয়েছে।

একা শিবাজী নয়। রেখাদিও।

এদের সামনে বলতে হবে—'আমার যাওয়া সম্ভব নয় ?' কারণ, আমার স্বামী পছন্দ করেন না ?

গায়ত্রীর গলাটা কেটে ফেললেও কি গলা দিয়ে বেরোবে একথা ?

ওকে দেখেই রেখাদির কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো ঃ ঘুম ভাঙলো মহারানীর ! বাব্বাঃ ! কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে ব্যথা হয়ে গেলো একেবারে ! তা'পর শ্রীমতী এখন যাবেন তো ?

ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে অপরূপ ভঙ্গীতে হেসে ওঠে গায়ত্রী ঃ না গেলে তোমরা ছাড়বে তো ! দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে বাঁচতাম তা' ঘুচে গেলো। কোথা থেকে যে এই বর্গীর হাঙ্গামা এলো কালকে !·· বাড়ি ফিরে দেখি—গিন্নীর অদর্শনে কর্তার কী রাগ ! 'চা খাবো না', 'খাবার খাবো না', 'চাই না—দরকার নেই'···এই সব দস্যিপনা ! আজ বোধ হয় আমার অদৃষ্টে মার খাওয়া আছে ! নিদেন পক্ষে—নাকের ওপর দরজা বন্ধ !···হেসে কুটি কুটি হয় গায়ত্রী—চলো বাবা' যা' আছে কপালে।···ঝি দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কিন্তু বন্ধ দরজা খুলিয়ে আবার তো ঢুকতে হবে ? না কি বন্ধ হয়ে গেলো জন্মের শোধ ? সত্যি সত্যি কি করবে শ্রীপতি, বাড়ি ঢুকতে দেবে না ? না কি ধরে মারবে ? কোনোটাই কি অসম্ভব ?···'ভদ্দর লোকের ঘরে যে পরিবারের গায়ে হাত তোলার রেওয়াজ নেই'—ঝিয়ের এ ধারণাটা নিতান্তই কাঁচা।

একদিন নয়, দৈবাৎ নয়, রোজ রোজ ভর দুপুরে বেরিয়ে যাবে গায়ত্রী—

গানের তালিম দিতে! শেষ পর্যন্ত স্টেজে উঠে গাইবে! সে গান শুনতে আসবে দুশো পাঁচশো পুরুষ!

এতেও যদি শ্রীপতির মাথার রক্তে আগুন ধরে না যায়, তো কিসে আর যাওয়া সম্ভব?

অথচ গায়ত্রী বা এ ছাড়া আর কি করতে পারতো?

সকাল থেকে তো বহুবার প্রতিজ্ঞা করেছে—ফিরিয়ে দেবে ওদের। বলবেঃ 'আমি নিরুপায়, আমি পরাধীন, আমার স্বামী পছন্দ করেন না।'

কই, বলতে পারলো কই?

পরের কাছে এতোখানি মাথা হেঁট করা যায়?

বরং মার খেতে পারবে শ্রীপতির কাছে, তবু লোকের কাছে খাটো হতে পারবে না।···

হয়তো জীবন-ভোর এই-ই করতে হবে, গায়ত্রীকে!·· লাঞ্ছনা সইবে, গঞ্জনা পাবে, হয়তো বা সত্যিই জুতো খাবে, তবু সেই কুৎসিত বিবর্ণ দাম্পত্য-জীবনের ছবিখানা লোকচক্ষে তুলে ধরতে পারবে না।···পাঁচজনের সামনে তুলে ধরবার সময় প্রাণপণে লাগাবে চড়া রঙের পোঁচ্—চট করে যা'তে চোখ ধাঁধিয়ে যায় লোকের।

এ ছাড়া আর কি করতে পারবে? আর কি উপায় আছে তার হাতে?

বিদ্রোহ করা উচিত?

পাগল! গায়ত্রী তো নির্বোধ নয়। বিদ্রোহ করে লোক হাসিয়ে শ্রীপতিকে লোকের কাছে খেলো করে ফেললে গায়ত্রী লোক-সমাজের চুড়োয় উঠবে কোন্ খুঁটির জোরে?

নিজের স্বামীকে যে মেয়ে আঁচলে বাঁধতে পারে নি, পাঁচ জনে তা'কে করুণা করতে পারে, সমীহ করে না।

তবে শূন্য আঁচলের গিঁঠটা বড়ো করে বেঁধে লোক-সমাজে দেখিয়ে বেড়ানো ছাড়া উপায়?

[১৩৬২]

ভদ্রলোক

মোড় ঘুরে আগের রাস্তাটা ছেড়ে নিজের বাড়ির রাস্তায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পা থেকে মাথা অবধি প্রচণ্ড রাগের একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল সুরঞ্জনের।

উঃ, কী নির্লজ্জ! এখনও—এত রাত্রেও! আজও বাদ যায় নি!

আজও ঠিক সেই একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে, বাড়ির সামনের সেই বিশেষ একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, পরিচিত ভঙ্গীতে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে অতিপরিচিত সুদৃশ্য চকোলেট-কলার গাড়িখানা। যে গাড়িখানা দেখতে চায় না বলেই আজ অনেক—অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছে সুরঞ্জন।

মসৃণ পালিশ করা গাঢ় চকোলেট রংটাও যে কারও কারও কাছে কত কুৎসিত

মনে হতে পারে, কত চোখজ্বলা হতে পারে, সেটা বোঝা যেত, যদি—কেউ ঠিক এই মুহূর্তে সুরঞ্জন মল্লিকের চোখের দিকে তাকাত।

নিজের গাড়ির স্টীয়ারিংয়ে রাখা হাতখানা এক সেকেণ্ডের জন্য একবার অনড় হয়ে গেল সুরঞ্জনের। কোন কিছু করবার না থাকলেই যেমন অনড় হয়ে যায় মানুষ।

পরক্ষণেই কী একটা কঠোর প্রতিজ্ঞায় কঠিন মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত গাড়িখানাকে উন্মত্তবেগে ছুটিয়ে সজোরে আছড়ে পড়া যায় না ওই-অলস-বিশ্রামে-এলায়িত অতিথি-গাড়িখানার ওপর। একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ বিধ্বস্ত করে জন্মের শোধ ওর গাড়িজন্ম ঘুচিয়ে দেওয়া যায় না?

নিজের অজ্ঞাতসারে হাতখানা নিশপিশ করতে থাকে, মন হিংস্র দুর্দান্ত হয়ে ওঠে, তবু অভ্যস্ত নিয়মে গাড়ির গতি শিথিল করে আনে সুরঞ্জন।… মন্থরগতিতে এসে থামে ঠিক চকোলেট রঙের পিছনে।

গাড়ি থামার শব্দেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে পুরনো চাকর বিশ্বরূপ। এসেই উঁকি দিয়ে দেখে পেছনের সীটটা।

হ্যাঁ, কিছু আছে।

প্রায়ই থাকে কিছু-না-কিছু।

আজকের জিনিসটা একটু বিশিষ্ট বটে। দুটো ফুলের তোড়া আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভারী ভারী একজোড়া মোটা গোড়ে মালা।

জিনিসগুলো নামিয়ে নিয়ে বাবুর পিছনে পিছনে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসে বিশ্বরূপ। মুখের ভাবটা করুণ আর অপ্রতিভ অপ্রতিভ। যেন বাড়ির-দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা অবাঞ্ছিত গাড়িখানার জন্য সে বেচারীও কতকাংশে দায়ী।

ফুলকপির জোড়া কি ল্যাংড়া আমের টুকরি হলে বিশ্বরূপ সানন্দে বহন করে নিয়ে যেত, কিন্তু আজকের জিনিসগুলো ওর কাছে কি অস্বস্তিকর!

বিশ্বরূপ ইতস্তত করে প্রশ্ন করে—এগুলো কোথায় রাখব বাবু?

সুরঞ্জন অবলীলায় উত্তর দেয়, রাখ্‌গে কোথাও! ফেলেও দিতে পারিস।

নির্দেশটা সুবিধের নয়। বিশ্বরূপ বোঝে, বাবুর মেজাজ খারাপ।

মনে ভাবে—হবে না? তবু নাকি এঁরা বাবু ভদ্রলোক, তাই শুধু মেজাজ খারাপের ওপর দিয়েই ফাঁড়া কাটে। তাদের ঘরে হলে?

মুখে কিছু বলে না। বাবুর পিছন পিছন উপরে উঠে সামনের দালানেই রেখে দেয়।

সভ্যভব্য সাজানো-গোছানো বাড়ি। ঘরের দরজায় দরজায় ভারী পর্দা ফেলা। ভিতরকার তীব্র বিদ্যুতালোকের জের চৌকো খানিকটা আলোর কার্পেটের মত দরজার বাইরে এসে স্থির হয়ে আছে।

সুরঞ্জন সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই একটা ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসে লতিকা, সুরঞ্জনের স্ত্রী।

বোঝা যাচ্ছে, সুরঞ্জনের আসার বারতা তার অজ্ঞাত নেই।

গাড়ির শব্দ…জুতোর শব্দ…ছোট্ট একটু কাশির শব্দ…এইটুকুই যথেষ্ট।

উৎকর্ণ কর্ণের পক্ষে এইটুকুই ঢের।···এর বেশি সাড়াশব্দ সুরঞ্জনের দিক থেকে পাবার আশাও নেই।

চাকর বাকরকে কখনও একটু চড়াগলায় ডাকাডাকি করে না সুরঞ্জন।

তবু নতুন করে যেন আশ্চর্য হয়েছে লতিকা।

দীর্ঘক্ষণ বিরহ-অন্তে পতিসন্দর্শনে উৎফুল্লমুখী লতিকা, সাগ্রহ আনন্দে বলে—এসেছ তুমি ?···মোটেই কিন্তু টের পাইনি। এমন চুপচাপ ভাল ছেলেটির মত আস। নিজের বাড়িতে—বাড়ির কর্তা একটু দাপট দেখাতে জান না। ওই জন্যেই ত—চাকর-বাকরগুলো পর্যন্ত মানে না।···কই, হাত মুখ ধোবে না ?

এতখানি উৎফুল্ল হাসি একফুঁয়ে নিভিয়ে দেওয়া যায় ? দেওয়া সম্ভব ? মানে—দেওয়া মনুষ্যজনোচিত ?

সুরঞ্জন মৃদু হেসে বলে—এত তাড়া কি ?

—বাঃ! তাড়া কি ? বলতে মুখে বাধল না ? কত রাত্তির করে এলে বলে তো ? আর আমি সেই বিকেল থেকে প্রহর গুণছি।

সুরঞ্জন আর একটু হাসে।

হাসিটা কি বেশ মিষ্টি ? কি জানি। মনে হল যেন তিক্ত কটু কষায়ের একটা অপূর্ব সংমিশ্রণ।

হেসে বলে—যাক তবু মন্দের ভাল। প্রহর গুণছ! কড়ি-বরগা গুণতে হয় নি।

—কড়ি-বরগা !

ভারি যেন একটা নতুন কৌতুক কথা। রহস্য হাসির একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায় লতিকার মুখে-চোখে।

—কড়ি-বরগা গোণবার অবকাশ পেলেও তো বেঁচে যেতাম।···গলা নিখাদে নামিয়ে বলে—সন্ধ্যাবেলা একটু একা থাকব—সে জো আছে ? ওই দেখোগে না তোমার বন্ধুরত্নটি ঠিক এসে বসে আছেন! যত ভাবছি এইবারে উঠে গেলে বাঁচি বাবা, ততই গল্প জমাচ্ছেন ভদ্রলোক। যত রাজ্যের—ওঁর সেই ছেলেবেলাকার কাহিনী কার যে শুনতে ভাল লাগছে! তা খেয়াল নেই। যাই বল, তোমার বন্ধুটি বাপু বড় ডালল্।···উঃ, আজ এত বিশ্রী লাগছিল বসে থাকতে—হাই তুলে মরছি, তাও বুঝতে পারে না।

যেন এটা নেহাৎই দৈবাতের ঘটনা। যেন প্রত্যহ এই আদুরে আদুরে গা-জ্বালা-কথা একঘেয়ে কথাগুলো শুনতে হয় না সুরঞ্জনকে।

এত কথার পর একটাও কথা না কওয়া অভদ্রতা নয় কি ? অগত্যাই কথা খুঁজে বার করতে হয় সুরঞ্জনকে—কতক্ষণ এসেছে সিতাংশু ?

—কতক্ষণ ?—লতিকা মাথা দুলিয়ে বলে—তা—অনেক-ক ক্ষণ! সেই ত—সন্ধের খানিকটা পরেই। তোমার সঙ্গে দেখা না করে আর তোমার বন্ধু নড়ছেন না।

—তাই দেখছি—বলে ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সুরঞ্জন।

লতিকা যেন উদ্বেগে ভেসে পড়ে—ঢুকে পড়বে একখুনি ? তাহলেই হয়েছে।

দুই বন্ধু বসলে এখন অর্ধেক রাত কেটে যাবে। একেবারে পোশাক-টোশাক ছেড়ে এলে হত না ?

—নাঃ এখন আর বেশিক্ষণ থাকবে না—বলে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে সুরঞ্জন।

—এই যে—কতক্ষণ ?

একটু সম্ভাষণ করতেই হয় গৃহকর্তাকে, নিজের বাড়িতে অতিথি বন্ধুর অভ্যর্থনা করতে। না বললে ভাল দেখায় না। আবার এর চাইতে বেশিই বা কি বলা যায় ?…"কি, খবর ভাল তো ?"—এ কুশল প্রশ্নটাও দৈহিক বরাদ্দের অতিথির সম্বন্ধে বাহুল্য, হাস্যকর।

সিতাংশু কিন্তু হৈ হৈ করে ওঠে যেন কতকাল দেখে নি সুরঞ্জনকে।

—যাক আসা হল বাবুর ! আমি তো ভাবছিলাম—আজ আর দেখাই হল না। এতক্ষণে বন্ধুর অদর্শনে ম্রিয়মান এবং সম্প্রতি বন্ধুর দর্শনে উৎফুল্ল সিতাংশু উচ্ছ্বসিত হয়ে বাক্যবিন্যাসে।—তুমি তো রাত দশটা অবধি আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফের, এদিকে ঘরের গৃহিণী তো পলকে পলকে ঘড়ি দেখছেন ! উঃ সে যন্ত্রণা যদি দেখতে !—বলে লতিকার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

লতিকা কি বলতে যাচ্ছিল, সুরঞ্জন থামিয়ে দেয় যেন। ও বলে ওঠে—সে যন্ত্রণা না-দেখেও বুঝতে পারছি।

লতিকা ঈষৎ শুকনো মুখে বলে—যন্ত্রণা না হাতি, এত বানাতে পারেন সিতাংশুবাবু।

সুরঞ্জন অদ্ভুত একটু হেসে ওঠে—কেন, বানানো কেন ? ঠিকই তো, যন্ত্রণা তো বটেই, দারুণ যন্ত্রণা। আচ্ছা যাক, ডাক্তার চ্যাটার্জি এসেছিলেন ?

লতিকা ঘাড় কাৎ করে।

সিতাংশু যেন এ খবর নতুন শুনল ! যেন আচমকা ডাক্তারের নামে উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ছে। সকাতরে বলে—ডাক্তার কার জন্যে ? অ্যাঁ ? কই ল—ইয়ে—মিসেস মল্লিক এতক্ষণ তো কিছু বললেন না আমায় ?

লতিকা স্বামীর প্রতি একটি সপ্রেম কটাক্ষ নিক্ষেপ করে স্বামীর বন্ধুকে বলে—বলবার মত হলে তো বলব ? কালকে রাত্রে সামান্য একটু সর্দিজ্বর গোছের হয়েছিল, সকালেই ছেড়ে গেছে, তবু তাই নিয়ে তিলকে তাল করছেন আপনার বন্ধু। সকালে বাড়ি থেকে ফোন করে পান নি, অফিসে গিয়েই আবার ফোন করে তাকে ঠেলে পাঠিয়ে তবে শান্তি।

—তা মাঝে মাঝে কোনখান থেকে কিছু শান্তি আহরণের চেষ্টা করতে হবে বৈকি, কি বল সিতাংশু ?

সুরঞ্জনের এই আলগা একটা প্রশ্নে সিতাংশু যে হঠাৎ পাংশু হয়ে যায় কেন কে জানে।…শান্তি শব্দটাকে কেন্দ্র করে বোকার মত এমন কতকগুলো কথা বলে বসে, যার মানে বোধগম্য হয় না। ওর বক্তব্য বিষয়টা আন্দাজ করতে পারলে বলা যেত—ও যেন দার্শনিকের দৃষ্টিতে বলতে চাইছে—শান্তি নামক বস্তুটা কি সত্যিই কোথাও আছে ? সোনার পাথর-বাটির মতই দুর্লভ বস্তু ওটা।

সুরঞ্জন এবারে একেবারে যেন প্রাণ খুলে হেসে ওঠে। একটু বেশিই হাসে বরং। হেসে হেসে বলে—একেবারে যে কারও কাছে ও বস্তুটা নেই, তাই বা বলা যায় কি করে? কি বল লতিকা? ধর—জগতের সবাইকে বোকা আর নিজেকে চালাক ভেবে যারা নিশ্চিন্ত থাকে, জগতের সবাইকে অন্ধ আর নিজেদের চক্ষুষ্মান ভেবে যারা নির্ভাবনায় কাটায়, তাদের কাছে? তাদের কাছে তো অখণ্ড শান্তি!

—তোমার কথাগুলো এক এক সময় যেন হেঁয়ালির মত লাগে—বলে কালিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ায় সিতাংশু।

—চললে?

—হ্যাঁ উঠি—বলে কথার শেষে বিলম্বিত একটা ড্যাস টেনে সিতাংশু দরজার দিকে পা বাড়ায়।

—আসছ তো কাল?

সহজ স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে সুরঞ্জনের দিক থেকে। বন্ধুর কাছে বন্ধুর অনুরোধের সুরেই।

লতিকা এই অবসরে অতিথির সম্মান রক্ষার ভার নেয়। আদরে এলানো সুরে বলে—হ্যাঁ, আসবেন না আরও কিছু! কেন কি দায় পড়েছে ওঁর রোজ তোমাব বাড়িতে আসতে? তুমি তো সাত জন্মেও যাও না। তাই কি বন্ধুর টানে একটু সকাল-সকাল ফিরতেই পারেন? সে তো সেই ক্লাবের আড্ডাটি সেরে তবে। না সিতাংশুবাবু, আপনি আসবেন না তো আর:

সিতাংশু, সুরঞ্জন, কেউ কোন কথা বলে না।

একজন ধীরে ধীরে চলে যায়, আর একজন একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিকে এগিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

আর পরক্ষণেই লতিকা প্রায় আছড়ে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে।

—কি হল তোমার?

যেন সকৌতুক প্রশ্ন করে সুরঞ্জন।

উত্তর পায় না।

মিনিট খানেক ধরে অভিমানিনী প্রিয়ার ক্রন্দনাবেগে উচ্ছ্বসিত মূর্তির পানে চেয়ে থেকে, বিনাবাক্যে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সুরঞ্জন এবং ধীরেসুস্থে স্নান প্রসাধন সব কিছু সেরে যখন ঘরে ফিরে আসে, তখনও তেমনি কাঁদছে লতিকা।

এবারে বিছানায় বসে পড়ে বলে—হল কি?

লতিকা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—কেন তুমি এমন কর! কেন করবে?

—কি মুস্কিল! কেমন আবার করলাম আমি?

—কেন তুমি রোজ রোজ যত ইচ্ছে দেরী করবে? কেন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি আসবে না?

—তাতে আর এমন কি এসে যায় তোমার?

—কি এসে যায়, তা তুমি কি বুঝবে ? নিত্যি তোমার ওই এক নিরেটমগজ বন্ধুটি তোমার খোঁজে এসে জুটবে, যতক্ষণ তুমি না আস নড়তে চাইবে না, আর আমার প্রাণান্ত ! নিজের অবসরটুকু মাটি, রোজ সেই চা দাও, জল-খাবার দাও, বিরক্ত লাগে না ? অথচ—যতই বিরক্তিকর হোক—জলজ্যান্ত একটা ভদ্রলোককে কিছু আর স্পষ্ট করে বলাও যায় না 'তুমি বাপু বিদায় হও—'। যায় ? বল না ? ভদ্রতার দায় বলেও তো একটা কথা আছে ? সত্যি তুমি বলতে পার—'আর জ্বালাতে এস না হে—' এ্যাঁ ?

—পাগল, তাই কখনও পারা যায় ? পারলে তো—কিন্তু সে কথা যাক, হঠাৎ বিদায়ের প্রশ্ন কেন ?

—কেন নয় ? লতিকা ঠিকরে ওঠে। তোমার বন্ধুকে নিয়ে আমি এত জ্বালা ভোগ করতে যাই কেন ? শুধু শুধু বাজে বাজে গল্প করতে বড্ড বুঝি ভাল লাগে আমার ? তোমার ঠাকুর চাকরগুলিও হয়েছেন তেমনি চমৎকার। সংসারের দরকার, রান্নাবান্নার জন্যে কিছু যদি জিজ্ঞেস করতে এল, যেন মিলিটারী মেজাজে। যেন সাধ করে আমি সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। আমার যা জ্বালা, তা যদি বুঝতে—

—বুঝি বইকি লতিকা, সুরঞ্জন হেসে ওঠে—বুঝি না আবার ! অনেক জ্বালা তোমার। কিন্তু জ্বালার কথা আজ থাক, আজ হচ্ছে মালার দিন। ওঠ, উঠে বসো। প্রথাটা সব সময় রক্ষা করাই ভাল। কি বল ?

উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে ফুলের তোড়া দুটো এনে সাজিয়ে দেয় বিছানার দুপাশে। আর দুগাছা মালাই চাপিয়ে দেয় লতিকার গলায়।

ফিক্ করে হেসে ফেলে লতিকা—বাঃ দুটোই আমাকে কেন ? তোমার প্রাপ্যটা তুমি নাও ?

গলা থেকে একগাছা খুলে নিয়ে সযত্নে স্বামীর গলায় পরিয়ে দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে।

আজ ওদের বিবাহ-বার্ষিকী।

—আরে দুর, এ সব আবার আমায় কেন, এ তোমার শ্রীকণ্ঠেই মানায়—বলে নিজের মালাটা খাটের ছত্রিতে ঝুলিয়ে দেয় সুরঞ্জন। ঝুলিয়ে দিয়ে বিছানায় বসে থাকে চুপচাপ।

তা মানুষ কি একেবারে চুপ করে বসে থাকতে পারে ?

অন্তত কিছু ভাবেও। তাই হয়তো সুরঞ্জন ভাবতে থাকে—পুষ্পমাল্যের মাধ্যমে লোহার বাসরেও বিষকীট প্রবেশ করতে পারে, অথচ এত অজস্র পথ খোলা থাকতে ও ফুলগুলো কীটশূন্য থেকে যায় কেমন করে ?

এত বড় দুগাছা মালায় কত ফুল, সবগুলোই অম্লান নির্মল ?

ফুলের আশ্রয় ছেড়ে কীটেরা আজও গভীর আরও গোপন আশ্রয় খুঁজে পেয়ে গেছে বলেই কি ?

[১৩৬২]

নিরাশ্রয়

হাত থেকে জপের মালাটা আছড়ে ফেলে রঙচটা টিনের ট্রাঙ্কটা গোছাতে বসেন অন্নমাসী। নিঃশব্দ তৎপরতায় যে শুধুই হাতের কাজ করে যান তা নয়, রসনাকেও খাটাতে থাকেন সঙ্গে সঙ্গে! পুরো দমে খাটান।

এবাড়িতে যে আর একদণ্ডও থাকবেন না তিনি, এবাড়ির চৌকাঠ পার হবার আগে এক গণ্ডূষ জলও মুখে দেবেন না, সাড়ম্বরে সেই সংকল্প ঘোষণা করতে করতে অন্নমাসী ট্রাঙ্কের গহ্বরে সুখশয্যায় শায়িত নামাবলী আর মটকার চাদর, 'কেটে কাপড়' আর কম্বলে র‍্যাপারকে নির্মমহস্তে হিঁচড়ে বার করে আবার পাট করতে বসেন।

'—ঢের হয়েছে বাবা! আর নয়, বোনপোর বাড়ি এসে খুব সুখ করে গেলাম। চেরকাল মনে থাকবে। মরণদশা না হলে কেউ বৈমাত্র বোনের বেটা-বোয়ের কাছে শরীর সারতে আসে না—মরণদশা ধরেছিল আমার তাই এসে-ছিলাম—তা' খুব শিক্ষে হলো। এখন দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও বাবা, বিদেয় হয়ে বাঁচি।'...এই হচ্ছে নমুনা।

নানা ছন্দে নানা ভঙ্গীমায় এই কথাগুলোই বারবার বলতে থাকেন অন্নমাসী। অভিযোগ শুনে মনে করা স্বাভাবিক—এ বাড়ির বাসিন্দারা নিজেদের স্বার্থের আনুকূল্যে আটকে রেখেছে অন্নমাসীকে, আর যাবার জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন তিনি। আর এও ভাবতে হবে—ঠিক আজই এমন কোনো ভয়ঙ্করী ঘটনা ঘটে গেছে যার পর আর একদণ্ডও তাঁর এ বাড়িতে থাকা চলে না।

তবে, পর পর দু'তিনটে দিনের চেহারা দেখলে অবশ্য সে ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবে।

রঙচটা ঐ টিনের ট্রাঙ্কটাকে গোছাতে বসা অন্নমাসীর দৈনন্দিন কর্মসূচির অপরিহার্য অঙ্গ। তবে নাকি আক্কেলের মাথা একেবারে খেয়ে বসেননি বলেই বোনপোর সংসারের অকল্যাণ করে অদিনে অক্ষণে চলে যেতে পারেন না। অপমানের জ্বালা গায়ে মেখে আবার সেই ভিটেয় জলগ্রহণও করতে হয় তাঁকে, সে দিনটা থেকে যেতেও হয়।

কিন্তু বোনপো-বৌ রমলা সত্যিই কি এমন অভদ্র যে তার দুর্ব্যবহারে তার বাড়িতে টিকতে পারে না মানুষ? না—তা নয়! দুটো পাশ করা সভ্য ভব্য মেয়ে সে, ঝি চাকরকে পর্যন্ত কখনো 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলে না। মাস-শাশুড়ীকে কোন অপমানের কথা কোনদিন বলেছে সে প্রমাণ করুক দিকি কেউ?

বলে না। কিন্তু বলে না—সেইটাই তো অসহ্য। মুখের ওপর স্পষ্ট করে দু'কথা বলা এর থেকে একশো গুণে ভালো। যেটা সহজ, যেটা স্বাভাবিক, যেটা বোধগম্য। তাতে ফিরিয়ে দু'কথা বলবার পথ আছে। আর বলাবলির সেই সহজযুদ্ধে অন্নমাসীরই জিতের আশা ষোলো আনা।

কিন্তু এ কী ?

পরের মুখের ওপর স্পষ্ট শুনিয়ে দেবার বদলে অহরহ রেই অনুচ্চারিত কটূক্তি নিজের মুখের চেহারায় স্পষ্ট করে লিখে রাখবার এ কী নিষ্ঠুর বিলাস রমলার ? ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন বিরক্ত অবজ্ঞায় প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করছে 'তুমি কেন ? তুমি কে ? চিরকাল এ সংসারে থাকবার আশা করছো না কি তুমি' ?

সে ভাষা পড়তে পারেন অন্নমাসী, মুখ্যু হলেও পারেন। কিন্তু এর উত্তরের ভাষা জানা নেই তাঁর। অদৃশ্য এই আক্রমণের কাছে অহরহ তাঁর নিরুপায় পরাজয়।

তাই না এতো দাহ !

তাই না যখন তখন কারণে অকারণে, হয়তো বা ঝি চাকর কি বাড়ির নেহাত অবোধ ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকেও তুচ্ছ ত্রুটি আবিষ্কার করে এই কাণ্ড করতে হয় তাঁকে ! মরচেধরা পুরনো এই অস্ত্রটা ছাড়া আর কিই বা সম্বল আছে অন্নমাসীর ? রণবিজ্ঞানের আধুনিক কৌশল আয়ত্ত করতে যাবেন কি নিয়ে ? তাই আজকে চঞ্চল একটা বাচ্ছা চাকরের পা দৈবাৎ তাঁর গায়ে ঠেকে যাওয়ার দুরন্ত অপমানে ঘণ্টাখানেক ধরে চেঁচাচ্ছেন অন্নমাসী।

'—গলায় দড়ি আমার গলায় দড়ি ! এখানে বসে বসে বোনপোর বাড়ির ক্ষীর সর খাচ্ছি। কিন্তু আর নয় ! ঝি চাকরের লাথি খেয়ে হজম করতে পারবো না। বিভূতি কোথায় গেলে বাবা ? দাও এখুনি আমার কেষ্টকে একটা 'তার' করে দাও—এসে নিয়ে যাক। বয়াটে হোক, লক্ষ্মীছাড়া হোক, পেটের সন্তান তো বটে সে, তার ভাত মানি্যর ভাত। ক্ষীর সরে কাজ নেই বাবা, ছেলের ঘরে খুদ সেদ্ধ করে খাবো, তুমি এখুনি 'তার' করে দাও বিভূতি।

বিভূতি নিঃশব্দে ঘরের ভেতর বসে মক্কেলের ফাইল ওলটাচ্ছিলো, দেখে মনে হয় না এ আবেদন তার কানে যাচ্ছে। কিন্তু রমলার কানতো বিভূতির মতো অমন সীসে দিয়ে ভর্তি নয়, কতো আর সহ্য করতে পারে সে ?

ঘরের ভেতর এসে ফেটে পড়লো সে—'এই রকমই তা'হলে চলতে থাকবে বরাবর ?'

বিভূতি কেমন একটু অসহায় অপ্রতিভ ভাবে বলে—কিবা করা যায় !

কিছু করা যায় না—কেমন ? অম্লান বদনে বসে বসে এই গালমন্দ সহ্য করতে হবে ! চমৎকার !

উত্তরে বিভূতি একটু বোকার মতোই কথা বলে বসে। বলে, তা ওঁর সঙ্গে একটু 'ইয়ে' করে চললেই হয় ? তা'হলে আর—

—'ইয়ে করে' ? ওঃ, তা'হলে—বাদল মিণ্টুদের নিয়ে আমাকেই এ সংসার ছাড়তে হয়। তা ভিন্ন তো আর ওঁর 'ইয়ে' বাঁচানো যাবে না। কিন্তু বলতে পারো কেন ? কিসের জন্য আমি সর্বদা এতো অশান্তি সহ্য করবো ?

বিভূতি বিব্রতস্বরে বলে—একটু আস্তে। আচ্ছা কি করতে পারা যায় বলো ? স্বভাব তো আর বদলানো যায় না কারুর ? মাঝে মাঝে তো বোঝাতেও

চেষ্টা করি।

—বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করো! বেশ তা'হলে—বরাবর এই থিয়েটারই চলুক। উনি যথেচ্ছ গাল মন্দ করুন, যতো খুশি তেজ দেখান, দিনে পাঁচবার তোমার বাড়ি থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাবার ভান করুন, আর তুমি গিয়ে 'বাপু বাছা' করে মান বজায় রেখো।

বিভূতি একটু ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে বলে—কি করবো? সত্যি তো আর 'বেশ চলে যাও' বলতে পারি না?···আমাদের আশ্রয় ছাড়া ওঁর যে এখন আর কোনো জায়গা নেই সে তো তোমার অজানা নয় রমলা।

রমলা বিরক্ত ভাবে বলে—অজানা থাকবে কেন, খুবই জানা আছে। তা নইলে আর এতোদিন নীরবে সয়ে যাচ্ছি। তবে যাঁর নিজের সে জ্ঞান থাকা উচিৎ ছিলো, তাঁকেই সেটা জানতে না দিয়ে, একটা অবাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে কতোদিন চলবে তাই ভাবি। একটা ভুল ধারণাকে চেষ্টা করে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে বুঝি না। প্রত্যেকেরই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে চৈতন্য থাকা সঙ্গত। দ্বিতীয় আশ্রয়ের মিথ্যা কল্পনায় সত্যিকার আশ্রয়কে তাহ'লে এতো অবহেলা করবার সাহস হয় না। যে ছেলে আজ ছ'মাস হলো মরে ভূত হয়ে গেছে —এখনো তার অহঙ্কার—

—আঃ রমলা, আস্তে কথা কইতে কি তুমি পারো না?

—আস্তে কেন, বোবা হয়ে আছি। কিন্তু তোমাদের মতো অমন বাজে সেণ্টিমেণ্ট আমার নেই। শোক-সংবাদ শুনে হার্টফেল করতে তো কখনো দেখিনি কাউকে। কি জানি তোমার মাসী যদি করেন! কিন্তু এও বলে রাখছি —বেশীদিন আর আমি এসব লুকোচুরির মধ্যে থাকবো না।

—বলতে পারবে মুখের ওপর?

রমলা নীরস স্বরে বলে—ওর আর পারাপারি কি? চিরদিন কি না জানিয়ে চলবে?

—যতোদিন চলে। এতে তো আমাদের কোনো লোকসান নেই রমলা?

—লাভ লোকসানের কথা নয়। মিথ্যে—মিথ্যেই। তার স্বপক্ষে কোনো সদযুক্তি নেই। 'দুঃসংবাদ' বলে শব্দটা তা'হলে থাকতো না। দু'দিন চীৎকার করবেন, হাত পা আছড়াবেন, তারপর সবই ঠিক হয়ে যাবে। অন্ততঃ বুঝে যাবেন নিজের অবস্থাটা কি।···তোমার এই বাজে সেণ্টিমেণ্টটা একেবারে অর্থহীন।

রমলা রাগ করে চলে গেলো।

আর বিভূতি খোলা দরজাটার দিকে চেয়ে তার কথাই ভাবতে লাগল বসে বসে।

হ্যাঁ, তারই কথা।

বিদুষী রমলা, সভ্য ভব্য মার্জিত ভাষায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাই বলুক, বিভূতির কাছে তার অর্থ সুস্পষ্ট। সাদা বাঙলায়—সে মুখরা মাসশাশুড়ীকে ঢীট্ করে দিতে চায়!···

কেনই বা চাইবে না? আশ্রিতার এতো তেজ দর্প কে কবে সহ্য করতে পারে? আর সে দর্পচূর্ণ করবার অমোঘ ওষুধ যখন হাতের মুঠোয় রয়েছে।

বিভূতির এই এক দুর্বলতা। এক রকম অস্বাভাবিকই বৈকি! ছ'মাস ধরে কেষ্টর মৃত্যু-সংবাদটা পুষে রেখেছে, বলতে পারছে না অন্নমাসীকে। দিনে দশবার কেষ্টকে 'তার' করে দেবার অনুরোধ সত্ত্বেও না।

অবিশ্যি একথা মনে করলে ভুল হবে কেষ্ট নামক সুসন্তানটি একটা বড়ো রকমের ভরসা ছিলো অন্নমাসীর, আর নেহাতই 'শরীর সারবার' স্বল্প মেয়াদে সতাতো বোনের ছেলের বাড়ি এসেছিলেন তিনি।

গুণধর পুত্রের কাছে অন্নের প্রত্যাশা অন্নমাসীর কোনো কালেই ছিলো না। ছেলের মূল আস্তানাটা ছিলো গ্রামের বাইরে একটা নীচ পল্লীতে, অর্থের প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে বাড়ি আসতো এবং মাকে গালমন্দ করে টাকাটা সিকেটা—এমনকি সংসারের ঘটিটা বাটিটা পর্যন্ত সংগ্রহ করে কিছুদিনের মতো উধাও হতো।...ছেলের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েই ভিটেয় চাবি দিয়ে জামাইবাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন অন্নমাসী। মেয়ে জামাইয়ের দেওয়া মাসোহারাতেই যখন চালাতে হবে, তখন তাদের কাছে গিয়ে পড়ে থাকাই ভালো।

সেখানে বছরকয়েক কাটানোর পর অন্নমাসীর বরাতগুণে মেয়েটি গেলো মারা। বলাবাহুল্য অতঃপর সে বাড়িতে টিকে থাকা শক্ত হলো। মুখরা শাশুড়ীকে স্ত্রীর খাতিরে যেটুকু সমীহ করে চলতো জামাই, স্ত্রীর মৃত্যুতে সেটা অনাবশ্যক বিবেচনা করলো। কাজেই একদিন 'জামাই বাড়ির মুখে ঝাড়ু মেরে' রংচটা টিনের ট্রাঙ্কটা নিয়ে অন্নমাসী এসে উঠলেন বোন-পো বিভূতির এখানে। সে প্রায় বছর খানেকের কথা।

সে সময়—রমলার কথা বাদ দাও—বিভূতিও যে এই আবির্ভাবটাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখেছিলো তা' নয়। অস্থায়ী ব্যবস্থা ভেবেই চুপ করে ছিলো মাত্র। কিন্তু অন্নমাসীর আচরণে অস্থায়িত্বের লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। এসেই তিনি এই 'নবাবীকেত্তনের' সংসারের হাল ধরতে চাইলেন। বৌ ছেলে আর একপাল চাকর বাকরে মিলে বেচারা বিভূতিকে যে ডোবাতে বসেছে, এ তথ্যটুকু তাঁর চোখে ধরা পড়তে দু'দিনও লাগলো না। কথায় বলে 'মা মাসীর প্রাণ', সেই প্রাণের তাড়নায় মগ্নোন্মুখ ছেলেটাকে ভাসিয়ে তুলবার চেষ্টা করবেন না অন্নমাসী?

'ওমা এইটুকু সংসারে আবার পঞ্চাশটা ঝি-চাকর কেন, দেখলে গা জ্বালা করে!'...'তিরিশ টাকা মাইনে দিয়ে একটা দস্যি বামুন রাখা কি জন্যে, বৌ কি দুটো ভাত সেদ্ধ করতে পারে না? আকাঁড়া গতর নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা করবে কি?'...'ছেলেপুলের এতো নবাবী খাওয়ার ঘটা কি করতে গা, দুধ সন্দেশ মাখন মিছরি নইলে জলখাবার হয় না! দু'খানা দু'খানা পরোটা ভেজে রাখতে পারো না?' 'বিভূতি যাই মেনিমুখো তাই এই সব সহ্য করছে, অন্য ছেলে হলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতো'—এই সব ছিলো অন্নমাসীর প্রথম যুগের বাক-মাধুর্যের নমুনা। তবে রমলার নিরুত্তর অগ্নিদৃষ্টি, আর নিরুত্তাপ কাঠিন্যের

আঘাতে অবশ্য সে যুগ কাটতে দেরি হয়নি। অতঃপর এলো সূক্ষ্ম অভিমানের যুগ! সে যুগে—সাড়ম্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন অন্নমাসী—তিনি আর এ সংসারের কে, দাসীবাঁদীর সামিল বৈ তো নয়। কি দরকার তাঁর এদের কথায় কথা কওয়া?

রমলার ঔদাসীন্যের তুষারপ্রলেপে সে অভিমানের যুগটাও গেছে। এখন ছেলে-পুলে ঝি-চাকর প্রায় প্রকাশ্যেই অবহেলা করছে, এবং শত চেষ্টাতেও রমলার সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই অপমানাহত অন্নমাসী এখন মুহুর্মুহু কেষ্টকে 'তার' করবার নির্দেশ দিচ্ছেন, আর এরা যে তাঁকে যাবার ব্যবস্থা না করে দিয়ে আটকে রেখেছে, সেই কথাটাই পাড়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে ছাড়ছেন।

মধ্যবর্তী খবর শুধু এই—প্রায় মাস কয়েক আগে অন্নমাসীর দেশ থেকে মুকুন্দ নামক এক ছোকরা বোধ করি—কেষ্টর তাড়ির আড্ডার ইয়ার, এসে বাইরের ঘরে বিভূতির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলো, ঘণ্টা খানেকের বেশী থাকেনি।

কী এক অদ্ভুত করুণার বশে কে জানে বিভূতি সে ছেলেটার আসার খবর অন্নমাসীর কাছে সেই যে গোপন করেছিলো, আজ পর্যন্ত আর পারলো না প্রকাশ করতে। অন্নমাসীর এতো ধৃষ্টতায় নয়, রমলার শত উৎপীড়নে নয়। বিভূতি ভাবে—অন্নমাসীর আস্ফালনের সকরুণ দিকটা রমলার চোখে পড়ে না কেন? দয়া করবার মতো মহত্ত্ব না থাকে, অবহেলা করবার উদারতাটুকুও নেই কেন রমলার? কেষ্টর মৃত্যুসংবাদ না জানালেও, বড়লোক বোনপোর সচ্ছল সংসারের নিশ্চিত অন্নের প্রলোভন জয় করে নিশ্চিত উপবাসের দেশে ফিরে যাওয়া যে অন্নমাসীর পক্ষে নিতান্তই কঠিন এটুকুও কি বুঝতে পারে না রমলা? একান্ত নিরুপায় ব্যক্তিকে কি করে লাঞ্ছনা করতে পারে মেয়েরা? কি করে পারে আশ্রিতজনকে ঈর্ষা করতে?

কিন্তু শুধু রমলাকে দোষ দিলেই বা চলবে কেন! আশ্রিতজনের ব্যবহারেও তো দৈন্যভাব থাকা উচিত? তা নয়, তিনি এসে বিভূতির কাছে কেঁদে পড়বেন—বিভূতি তোমার সংসারে ঝ্যাঁটা লাথি খেয়ে আর কতোদিন থাকবো বাবা? এর একটা বিহিত করো!

অন্নমাসীর আবির্ভাব আর অভিযোগে সচমকে চারিদিকে তাকিয়ে নিলে বিভূতি। কাছেপিঠে রমলা নেইতো? যে রকম মরীয়া হয়ে উঠেছে ও, ভয় করে। অবশ্য অন্নমাসীর পদ্ধতি অনুসারে থাকাই উচিত রমলার। দৃষ্টিগোচরে না হোক শ্রবণগোচরে। নেহাতই যে বিভূতির অনুরোধ উপরোধে এ যাত্রা রয়ে গেলেন অন্নমাসী, সে কথা রমলা না জানলেই বা লাভ কি হলো?

তবু দৃষ্টিগোচরে না থাকার সুবিধায়, বিভূতি আশ্বস্ত হয়ে বলে—আচ্ছা আচ্ছা হবে হবে। অতো ব্যস্ত কেন? কে কি বলেছে বলোতো? ধমকে দিচ্ছি তাকে গিয়ে। ছেলেপুলেগুলোও হয়েছে তেমনি পাজী।

অন্নমাসীর চোখ ছল্ ছলিয়ে আসে এবার—না বাবা কেউ মন্দ নয়, আমিই

কুচক্করে বজ্জাত। তা এ পাপকে আর কতোদিন পুষবে? আপদ বিদায় করবার ব্যবস্থা করো।

—কি মুস্কিল! এখুনি যাবে কি গো! সামনের মাসে বাদলাটার পৈতে দেবো ভাবছি, তুমি না থাকলে চলবে কেন?

"—আমি আবার একটা মানুষ, আমার জন্যে আবার অচল।···কি যে বলিস", বলে, আশ্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন অন্নমাসী, জের টেনে বললেন—অবশ্যি ছেলেটার গলায় সুতোগাছাটা দেবে বলছো তাই। থাকতেই হবে কথায় পড়ে। বৌমা পাশ করা মেয়ে, ওসব 'নিয়মকম্ম নিতরিতের' কি বা জানে? তবে কাজটি মিটে গেলে কিন্তু আর একদিনও নয় বাবা। এই বলে রাখলাম।

কেন কে জানে বিভূতির চোখটা ছলছলিয়ে ওঠে।

আহা! কতো অল্পে সন্তুষ্ট, কতো বেচারা।···সম্মানের এই ভানটুকুই কী মূল্যবান এদের কাছে? আচ্ছা কী লোকসান এই ভানটুকুতে! তুচ্ছ করুণা-টুকুতেও কৃপণতা কেন মানুষের!

সস্নেহ মমতায় বলে—আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। এখনতো নিশ্চিন্ত হলাম বাবা। দণ্ডীঘরে থাকা-টাকা সে কত ঝঞ্ঝাট। তোমরা ওসব যত জানো, তেমন কি আর,—ইয়ে, আজ তোমার নিরিমিষ ঘরে কি রাঁধবে বলতো? বহুকাল পলতার বড়া খাওয়া হয়নি, আর মোচার ঘণ্ট। রাঁধো না।

অন্নমাসী এক গাল হেসে বললেন—শোন পাগল ছেলের কথা! মোচা কি অমনি রাঁধবো বল্লেই রাঁধা হয়? রাতে কুটে ভিজিয়ে রাখতে হয় তবে না? আজতো হবে না, আসছে কাল মঙ্গলবার, মোচা খেতে নেই। সেই তোমার সে পরশু।

বিভূতি হতাশভাবে বলে—হায় কপাল! পরশু অবধি টিকলে হয়।

—ষাট ষাট যষ্ঠির দাস! কি যে ছাই ভস্ম কথা ক'স। বলে আর একবার ষাট বানিয়ে হৃষ্টচিত্তে নিরামিষ ঘরের উনুনে আগুন দিতে যান অন্নমাসী।

পাশের দালানে জ্বলন্ত উনুনের চেয়েও আগুন হয়ে রমলা যেখানে গুম হয়ে বসে আছে, সেদিকে একটা কটাক্ষ করে যেতে ভোলেন না!

ঘটনার চেহারাটা প্রায়ই এই একরকম।

কি করে তবে মাসশাশুড়ীকে সমঝে দেবে রমলা? নিজের স্বামীই যে তার প্রতিবন্ধক। আর মজা এই—স্বামীকে যেন মনে মনে ভয় লাগে তার। মুখে যতই আস্ফালন করুক, ভয়টা ভেতরে থাকেই।

কিন্তু কথায় বলে "চোরের সাতদিন সাধুর একদিন।" রমলার কি একটা দিনও আসবে না? মক্কেলের কাজে দিন তিনেকের জন্যে আসানসোল যেতে হলো বিভূতিকে।

মাসীর কথা ভেবে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন যে না হলো তা নয় কিন্তু সত্যি তো আর বৌকে স্পষ্ট করে বলতে পারে না—আমার অনুপস্থিতিতে আমার মাসীর ওপর দুর্ব্যবহার কোরো না।

আবার চারদিন পরে এসে প্রথমেই কিছু আর মাসীর কুশলবার্তা নেবার ফুরসত হয় না! খেয়াল যখন হলো তখন রহস্য করে বললে—মিণ্টু তোর অন্নঠাকুমার কণ্ঠ নীরব কেন? বাড়িটা আন্‌কো ঠেকেছে যে।

মিণ্টু সভয়ে একবার মার মুখের পানে চেয়ে মুখ নামালো। এগারো বারো বছরের পাকা মেয়ে—জগতের অনেক তথ্যই বোঝে।...মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রমলাও মুখ নামালো।

—কি? মায়ে মেয়েতে এতো মুখ-তাকাতাকি কিসের?

বিরক্ত ভাব গোপন করলো না বিভূতি। এবং বাপের বিরক্তির ভয়ে নয়, বোধকরি পৃষ্ঠবলের ভরসায় মিণ্টু তাড়াতাড়ি বলে ফেললে—কেষ্টাকাকার মরার খবর জেনে পর্যন্ত দু'দিন ধরে একটিও তো কথা বলেন না অন্নঠাকুমা। শুধু ঘরের ভেতর বসে থাকেন চোরের মতন।

মিনিট খানেক স্ত্রীর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বিভূতি একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে উঠলো,—এতো বড়ো সুযোগটা আর অবহেলা করতে পারলে না, কেমন?

তিরস্কারের উত্তর তৈরী রেখেছিল রমলা, বিদ্রূপের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একবার থতমত খেয়েই জ্বলে উঠলো সে। সেও বিদ্রূপতিক্ত স্বরে বলে উঠলো, ভয় পেও না, আকস্মিক আঘাতে উন্মাদ হয়ে যাননি তোমার মাসী। দু'দিন চুপ করে আছেন, বোধকরি নিতান্তই চক্ষুলজ্জার দায়ে। দুঃসংবাদ উনি আজ নতুন শুনলেন না, যথাসময়েই শুনেছিলেন। তবে হ্যাঁ, কোটি কোটি নমস্কার করতে হয় তোমার মাসীপিসীর চরণে। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুসংবাদ একেবারে হজম করে ফেলে ছমাস ধরে সেই ছেলের নাম নিয়ে নিয়ে থিয়েটার করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব, এ তোমাদের বাড়ি এসেই দেখলাম।

আগাগোড়া ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমাল লাগে বিভূতির, অথচ রমলার বিদ্রূপকুঞ্চিত মুখের দিকে চেয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে প্রবৃত্তি হয় না...শুধু সেই মুখের দিকে তাকিয়ে এই কথাটাই হঠাৎ মনে হয়—উনিশ বছর ধরে এই মুখের অধিকারিণীর সঙ্গে ঘর করে এসেছে সে! আশ্চর্য!

কিন্তু ক্ষণপূর্বশ্রুত কাহিনীটাও যে আশ্চর্য!

এর রহস্য ভেদ করবে কে—অন্নমাসী ছাড়া?

ঘরে ঢুকে প্রথমটা নজরেই পড়েনি।...তাকিয়ে দেখা গেল রঙচটা সেই ট্রাঙ্কটার পেছনে নিজেকে যথাসম্ভব গোপন করে সত্যিই যেন ধরা-পড়া চোরের মত বসে আছেন অন্নমাসী। বিভূতিকে দেখে আরো একটু জড়সড় হলেন।

ট্রাঙ্কটার উপরেই বসে পড়লো বিভূতি। বিনা ভূমিকায় বললে—বাড়ি যাবে অন্নমাসী?

বাড়ি?...হঠাৎ যেন অকূলে কূল পান অন্নমাসী, ব্যাকুল অনুনয়ে বলেন—হ্যাঁ বাবা তাই যাবো। দু'দিন ধরে ভেবে আর ঠিক করতে পারছিনে। তাই দে, একটু ব্যবস্থা করে বাড়িই পাঠিয়ে দে আমায় এবার।...সেখানে গিয়ে কেষ্টর নাম করে গলা ছেড়ে খানিক কাঁদি গিয়ে।...মহাপাপিষ্ঠী আমি, পুত্রশোকের

কান্না গিলে ফেলে, আজ ছ'মাস ধরে কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গিলছি—এই তামাসা দেখে কেষ্ট "সেখানে" বসে বসে কত হাসিই না হাসছে। ভাঙা ভিটেয় পড়ে প্রাণভরে চেঁচিয়ে সে পাপের প্রাচিত্তির করিগে।

বিভূতি ইতস্ততঃ করে বলে—কিন্তু তুমি তো জানতে না অন্নমাসী ?

অন্নমাসী কেমন হতাশ অসহায় দৃষ্টি মেলে আস্তে আস্তে বলেন—জানতাম বৈ কি বাবা। এ খবর কি মায়ের প্রাণে অজানা থাকে ? মনই জানিয়ে দেয়। মুকুন্দ এসে যেদিন বাইরে বাইবে শুধু তোর সঙ্গে দেখা করে পালিয়ে গেল সে কি আমি টের পাইনি ? তখনই বুঝেছিলাম কী খবর নিয়ে এসেছে সে। জেনে বুঝে চুপ করে থেকেছি, পষ্ট করে জিগ্যেস করিনি।

বিভূতির মুখ থেকে বোধ করি অজ্ঞাতসারেই অস্ফুট একটা 'কেন' উচ্চারিত হয়।

অন্নমাসী মুখ তুলে বলেন—কেন ? কেন তাই শুধোচ্ছিস ? ভেবেছিলাম মোদো মাতাল যা হোক তবু তো 'ছেলে'। তার আশ্রয় জোরের আশ্রয়। সে নাম মুছে গেলে ত্রিজগতে আর মুখ কোথায় আমার ? নিরাশ্রয় হয়ে পরের ঘরে পড়ে থাকা যে বড়ো ঘেন্না।…রাগ করিসনে বাবা, বৌমা বড়ো নিষ্ঠুর, বড়ো অহঙ্কারী। মানুষকে 'মানুষ' জ্ঞান করে না। বড়ো 'হেয় বোধ' হয়ে থাকতে হয় ওর আশ্রয়ে। সেই ওর কাছেই আমি একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে আছি এ কথা স্বীকার করতে পারছিলাম না। তাই মা হয়ে, আমি আজ ছ'মাস—এই শোক চাপা দিয়ে—

ছ'মাস পরে বোধকরি এই প্রথম ছেলের শোকে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে অন্নমাসীর।

কে জানে হয়তো যথার্থ ছেলের শোকেও নয় !

হয়তো এতোদিনে সত্যকার নিরাশ্রয় হয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক দুঃখেই !…

খড়কুটো সাজিয়ে আশ্রয়ের যে-ছলনাটুকু এতোদিন প্রাণপণে খাড়া রেখে আসছিলেন, রমলার একটি ফুৎকারে যে ধুলো-গুঁড়ো হয়ে গেছে সে আশ্রয়।

কিসের জোরে আর তবে দাঁড়িয়ে থাকবেন অন্নমাসী ?

[১৩৬২]

দুরূহ

বিষের পুরিয়াটা পকেট থেকে বার করলো অতীন। অনেক চেষ্টায় জোগাড় করা। যে দিয়েছে বলেছে এতেই যথেষ্ট।

এতেই শত্রুকে শেষ করে দেওয়া যাবে।

এই পুরিয়াটির মধ্যে রয়েছে সেই অমোঘ শক্তি যে শক্তি অতীনের জ্বালার শেষ করতে পারবে। না না, সুইসাইড করতে বসেনি অতীন, স্রেফ হত্যা।

অতীনের মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠলো। অনেক দিন ধরে সহ্য করা গেছে, আর নয়, নীরজা ক্রমশঃ সেই শয়তানটাকে বিছানায় এনেছে।

অতীন অবশ্য বেশ কিছুদিন থেকেই নীরজার ঘর ত্যাগ করে বাইরের ঘরে শুচ্ছে। তবু নীরজার যে এতটা নীচ প্রবৃত্তি হবে তা ভাবতে পারেনি অতীন। যাক আজ পাওয়া গেছে অমোঘ দাওয়াই যাতে শত্রুর শেষ অনিবার্য।

অতীনের কি পাপ হবে ?

অতীন মনে মনে বললো, স্ত্রীর প্রেমপাত্রকে শেষ করায় পাপ আছে একথা শাস্ত্রেও বলবে না, আইনেও বলবে না। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী চিরদিনই বধ্য।

বিষটাকে নিয়ে এগিয়ে গেল অতীন যেখানে সেই শত্রুর জন্যে অন্ন প্রস্তুত করা রয়েছে। এখুনি আসবে ও, পরম আনন্দে খেতে বসবে।

আর একবার সেই হাসিটা হাসলো অতীন, বাছাধনের এই খাওয়াই শেষ খাওয়া হবে। এদিক ওদিক তাকালো, ভাতে মিশিয়ে দিল জিনিসটা।

বারান্দার ওধারে সরে গেল।

দেখতে পেলো ও আসছে, থালার সামনে বসে পড়বে এখুনি।

অতীনের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগলো।

আহ্লাদে ? না উত্তেজনায় ?

আরো এগিয়ে এলো ও। এখুনি মুখে দেবে সেই বিষাক্ত ভাত। হাতুড়িটা বড় জোরে জোরে পড়ছে। হঠাৎ তীব্র বেগে বেরিয়ে এলো অতীন, মাংসের ঝোলমাখা ভাতের থালাটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়।

ও কেঁউ কেঁউ করে উঠলো।

অতীনের বুকের মধ্যেকার হাতুড়িটা থেমে গেল।

একটা কুকুরকে শেষ করাও যে এত দুরূহ তা কে জানতো ?

রাধি, এই রাধি, বলি আছিস কোন্ চুলোয় ? বেঁচে আছিস--না মরেছিস ?

অনেকগুলো ছাপ-মারা একখানা পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে, বিনয় ভট্চায্ চটি জুতোর শব্দ করতে করতে বাইরে থেকে ভেতর বাড়ির দালানে এসে আদরের ছোট বোনটিকে এই স্নেহসম্বোধনে আপ্যায়িত করেন।

মেটে উঠোনের ওদিকে রান্নাঘর।

স্নেহময় দাদার আহ্বানে পুলকিত রাধারানী বেরিয়ে আসে গরম খুন্তি-খানা হাতে নিয়ে। অবিশ্যি দাদাকে ছ্যাঁকা দিতে নয়, বোধ করি হাতে একটা হাতিয়ার থাকলে জিভটা খোলে ভালো বলেই।

খোলা জিভেই উত্তর দেয় সে—মরবো! তোমার সংসারে মরবারই বড়ো ফুরসত আছে যে! বলি সক্কালবেলাই গাঁজা টেনে এলে নাকি মেজদা ? ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছো কেন ?

—চেঁচাচ্ছি কেন ? বলে কি না চেঁচাচ্ছি কেন! এই দেখ কেন চেঁচাচ্ছি! এ রকম চিঠি পড়লে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ; ত' চেঁচানো!

হাতের পোস্টকার্ডখানা বোনের দিকে ছুঁড়ে দেন বিনয় ভট্চায্!

—কোন্ যমের বাড়ি থেকে আবার 'রাধারানী দেবী'র নামে চিঠি এলো—বলে ঈষৎ কৌতূহলে চিঠিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়েই ফেলে দেয় রাধারানী, মুখটা যতোটা বিশ্রী করা সম্ভব, তা' করে বলে—মরণ আর কি! এ আবার কোন্ মুখপোড়ার চিঠি ?

—তুমিই জানো—বিনয় ভট্চায্ 'পরম পুরুষে'র ভঙ্গীতে দুই হাত উল্টে বলেন—তোমার শ্বশুরকুলের সব্বাইকে তো চিনে রাখিনি আমি!

—আর আমিই একেবারে মশামাছিটিকে পর্যন্ত চিনে রেখেছি যে—রান্নাঘরে ফিরে যেতে যেতে কথাটাকে যেন দাদার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরে যায় রাধারানী—তোমার কথা শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায় মেজদা!

জ্বলে যাবারই কথা!

নিতান্ত কটুভাষী রগচটা লোক হলেও এ বোধশক্তিটুকু আছে বিনয়ের, তাই আর কিছু বলেন না।

বিয়ের অষ্টমঙ্গলার ভেতরই বিয়ের শাঁখা দু'গাছা ভেঙ্গে মা-বাপের কাছে ফিরে এসে কায়েম হয়েছিলো রাধারানী তেরো বছর বয়সে, সে-ও আজ তেরো-চোদ্দ বছরের কথা।

ক্রমশ মা-বাপ মরেছে, বড়ো ভাই বিধবা বোনের দায়িত্ব ত্যাগ করেছে—স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেশত্যাগ করে ; রাধারানী এই মেজদার গলায়। শ্বশুরবাড়ির ছায়াও মাড়ায়নি কখনো। ওপক্ষও অবশ্য এই 'বিষকন্যা'কে এই অবধি সযত্নে পরিহার করে চলেছে।

তা'বলে—'গলায় পড়ে আছে' বলে 'চোর' হয়ে আছে রাধারানী, এমন ভাববার কারণ নেই। এক-গা গহনা, মা-বাপ মায়া করে খুলতে দেয়নি। তারা মরতে, সবগুলো খুলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে রাধারানী দাদার পুরনো নরুণপাড় ধুতি-গুলো প'বে 'দজ্জালি' করে বেড়ায়, আর ছুতো পেলেই ভাই-ভাজের মুখের সামনে মাজা-মাজা লম্বা-লম্বা হাত দু'খানা নেড়ে দু'শো কথা শুনিয়ে দেয়। ভাইপো ভাইঝি দু'টোকে ভালো যদি বাসে তো সে অন্তঃশীলা, ব্যবহারিক দৃশ্যে শুধু পাঁশ পেড়ে কাটতে বাকি রাখে। ভাজের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়।

বলাবাহুল্য ভাজও মাটির মানুষ নয়, পেরে ওঠে না কেবল ক্ষমতার অভাবে। বাক্‌বিন্যাসের ক্ষমতায় তো ননদের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারে না. কার্যক্ষমতাও কম। রাগ হলে ছেলে ঠেঙায়, আর ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা কয়।

রাধারানী বেশী কথা বলে না, কিন্তু যা বলে মোক্ষম!

'চিঠি-পর্বের' সময় বাড়ি ছিল না চারুলতা, ঘাট থেকে ফিরে এসেই 'রাধারানী দেবী'-চিহ্নিত পোস্টকার্ডখানা দাওয়ায় পড়ে থাকতে দেখেই দুই চোখ গোল হয়ে উঠলো তার। এ আবার কি অভূতপূর্ব দৃশ্য! বারো বছর এ সংসারে এসেছে সে, এমন দৃশ্য তো কই দেখেনি!

ভিজে হাতখানা ভিজে শাড়ীতেই মুছে চিঠিটা তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বিলম্বিত ছন্দে বলে—এ যে দেখি 'অস্মরণ রাজার স্মরণ' হয়েছে! এবারে—তা'হলে আমাদের মায়া কাটিয়ে শ্বশুরবাড়ি চললে ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি একনজর মাত্র তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলে—কাতর হয়ো না মেজবৌ, তোমাকে চণ্ডীতলার শ্মশানে তুলে না দিয়ে এ সংসার থেকে নড়বো, এমন বেআক্কেলে আমি নই।

—চণ্ডীতলায় আমার শত্তুর যাক—বলে ঠিকরে চলে যায় চারুলতা! আর কথা বাড়াতে সাহস হয় না।

উঃ কিছুতেই কি তার জিত হতে নেই?

যতো গুছিয়ে, যতো কায়দা করেই ছোট্ট একটু কামড় দিতে যাক বেচারা, কি করে যে সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব বার করে ফেলে রাধারানী, আর সে এমন বিষাক্ত জবাব, যে চারুলতার বুদ্ধির ভাঁড়ারে তার প্রতিষেধক নেই।

অথচ রাধারানী অনায়াসে তার কামড়টা তো ফিরিয়ে দেয়ই, তার সঙ্গে নিজে একটি মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিতে ছাড়ে না।

খেতে বসে বিনয় ভট্‌চায্‌ আবার সেই কথা তোলে—বলি চিঠির একটা উত্তুর দিবি তো রাধি?

—কেন, ভূতে পেয়েছে না কি? বলে পাতের গোড়ায় আমড়ার টকের বাটিটা ঠক্‌ করে বসিয়ে দেয় রাধারানী।

বরকে চারুলতার খুব বিশ্বাস নেই, তবু পৃষ্ঠবল হিসেবে ওর সামনে বলে নেয় এক আধটা কথা। কিছু না পেয়ে বলে—বাটিটা পাথরের ঠাকুরঝি, তোমার মেজাজের ঘা সইতে পারবে কেন?

—না পারলে আর করছি কি মেজবৌ, ঘটিবাটি তো আর 'অমর' বর নিয়ে আসে না সংসারে !

মেজবৌ রাধারানীর অনুকরণে ঠাণ্ডাগলায় বলে—সে তো দিনরাতই দেখছি ঠাকুরঝি, তবে মেজাজটা একটু নরম করলে গেরস্তর লোকসানটা কিছু কম হয়।

রাধারানী পাখাখানা নিয়ে ভাইয়ের সামনে বসে পড়ে মধুঢালা সুরে বলে —গেরস্তকে দরদ করতে গেলে কি সংসার করা যায় বৌ ? এই যে—তোমার, একটা পেট ভরাতে তিনটে মানাসের খোরাক লাগে, সে দরদ কে করতে যাচ্ছে বলো ?

কথাটা নিদারুণ সত্য !

চারুলতার—আহারের পরিমাণটি নামের অনুরূপ নয়। আবার রাধারানী নেহাত অল্পাহারী।

সত্যি হলেও—মেয়েমানুষকে খোরাকের খোঁটা, তা'ও আবার 'দেনেওয়ালা'র সামনাসামনি !

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে নিজস্ব ভোঁতা ভাষাই ব্যবহার করে বসে চারুলতা ঃ বলে—খাই বেশ করি, আমি তো কারুর বাপের খাই না।

রাধারানী অমায়িক হাস্যে বলে—আমার তো সেই ধারণাই ছিলো মেজবৌ। তলে তলে তালুইমশাই যে মেয়ের খোরাকী পাঠান তা তো কই খবর পাইনি।

এরপর আর কি বলবে চারুলতা !

এমন দুর্ভাগ্য যে স্বামী কক্ষনো তার পক্ষে নেবে না। এই তো এখন কি বোনকে দু'কথা বলতে পাবতো না ? তা নয়—আদরে গলে গিয়ে বলা হলো —নাঃ দুটোতে একজায়গায় হয়েছে কি ঠোকাঠুকি ! আপদটাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

যেন ভারি একটা অসম্ভব হাস্যকর কথা ! যেন বিধবা মেয়েমানুষ কেউ কখনো শ্বশুরঘর করে না, চিরকাল ভাই-ভাজের ঘাড় ভাঙে !· ·বোনও আনন্দে গলে বলেন—তাই দাও না, আমারও তো তা'হলে হাড় জুড়োয়।

বিনয় ভট্চায্ পরিতৃপ্ত আহারের পরে প্রসন্ন মুখে বলেন—লিখে দে দু'কলম, বিকেলের ডাকে দিয়ে দিই। "অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না, দুঃখিত" এই আর কি।

আত্মসম্মানবোধহীন চারুলতা আবার ফোড়ন কাটে—কেন ? 'অনুরোধ রাখিতে না পারার'ই বা কি আছে ? গেলেই তা'রা খেয়ে ফেলবে ? বলেছে যদি বা—ঘুরে এলেই হয় কিছুদিন। মেয়েমানুষের এক-দুয়োরি হয়ে থাকাই কি খুব মান্যের ?

রাধারানী উত্তর দেওয়ার আগেই বিনয় ভট্চায্ বকে ওঠেন—বাজে বোকো না মেলা। রাধির আবার শ্বশুরবাড়ি ! তাই আবার ও যাবে। শহরে হলে বাপ মা আবার বিয়ে দিতো ওর।

—তোমরাই বা তাই কেন দিলে না ? বলে মুখ টিপে হাসে চারুলতা।

তার চাইতে ঝাঁঝাঁলো টেপাহাসির সঙ্গে রাধারানী বলে—

—পরামর্শদাতা মন্ত্রীর অভাব ছিলো তখন, তাই হয়ে ওঠেনি বৌ।

আর চারুলতাকে অপদস্থের একশেষ করে বিনয় ভট্‌চায্‌ বলে ওঠেন—যেমন নীচ মন তেমনি ইতর কথা! নিজের শাড়ীচুড়ি আর মাছের ন্যাজা ঘুচলে, তবে —কুকুরের উপযুক্ত মুগুর হয়।

মুগুরটা আগে কার মাথায় পড়লে তবে এমন ঘটনাটা ঘটা সম্ভব সেটা আর ভাবেন না ভদ্রলোক।

—দুর্গা! দুর্গা! বলে রান্নাঘরে ফিরে যায় রাধারানী, আর চারুলতা রাগ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

রাধারানীর শ্বশুরবাড়ির কথাটা আজকের 'নিমিত্ত মাত্র', এরকম ঘটনাটা নিত্য-নৈমিত্তিক। এরপরে অবশ্য রাধিই গিয়ে ডেকে এনে খাওয়াবে। তবে এখুনি নয়, চারুলতাকে চরম অবস্থায় পৌঁছতে দিয়ে।

বাবোটা বেজে গেলে আর না খেয়ে থাকতে পারে না চারুলতা। মাথা ঝিমঝিম করে, হাতে পায়ে খিল ধরে।

এরকম দিনে ততক্ষণ রাধারানী কাজ সারে।

দৈনন্দিন পর্ব মিটলেও উপরিগুলো আছে। সুপুরি কাটা, মুগকড়াই ভাঙা, চালডাল ঝাড়া, নিদেনপক্ষে কাঁথা সেলাই।

আজ কিন্তু ওদিক দিয়ে গেলো না রাধারানী। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে এসে, সেই অবহেলিত পোস্টকার্ডখানা নিয়ে উঠে গেলো ছাতে।

মেঘলা দিন!

পড়শীমহলে ছাতে ওঠার প্রয়োজন আর কারো নেই। বাঁড় আচাব আমসত্ত্ব কাঁথাকানি—এই জন্যেই না ছাতের দরকার?

রাধারানীরই বা কবে কোন্‌কালে মেঘলা দিনে ছাতে ওঠার প্রয়োজন হয়েছিলো?

আজই বা কিসের প্রয়োজন?

কিছুই না। শুধু—ফেলে-দেওয়া জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ছে ত—একটু চক্ষুলজ্জা! অথচ কৌতূহলও হচ্ছে। তখনই যদি পড়তো ভালো করে, বালাই চুকে যেতো।

মুখরা রাধারানীর সঙ্গে চক্ষুলজ্জাটা বেমানান। কৌতূহলটা আরো বেশী। সে বোধটা ওর নিজেরই আছে বলেই বোধ হয় লোকলোচনের অগোচরে পালিয়ে এসেছে। দেখতে এসেছে 'সুকুমার চক্রবর্তী' কে? 'নবকুমার চক্রবর্তী'র সঙ্গে যার নামের সাদৃশ্য ধরা পড়ে!

জ্ঞাতিদের কেউ। তাছাড়া আর কে?

নিজের দ্যাওর ভাসুর নয়। তাদের নামগুলোও মনে আছে ঠিকই—'রাজকুমার' 'দেবকুমার' —'কুমারের' গোষ্ঠী একেবারে!

চিঠিখানা বার দু'তিন পড়ে ফেললো রাধারানী। এমনই! হাতে কাজ না থাকলে এমন করেই থাকে মানুষ।

তিন পুরুষের জ্ঞাতি জ্যেঠ্‌শ্বশুরের ছেলে। বিদ্যে সাধ্যি যে অন্তরম্ভা, চিঠির ভাষাতেই মালুম হচ্ছে। তবে লিখেছে ইনিয়ে বিনিয়ে, রাধারানীকে নিয়ে যেতে চায়।

অবশ্য বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে ডাকেনি, ডেকেছে নিছক স্বার্থের খাতিরে।

"মা মরণাপন্ন, সংসারে নিতান্ত লোকাভাব, অথচ তাঁহার 'নিষ্ঠা কাষ্ঠার' বাতিকের জন্য রাঁধুনী চাকরানী অচল। আজ যদি তাঁহার নিজের পুত্রবধূ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে আর রাধারানীকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু রাধারানীও চক্রবর্তী-কুলের বধূ তো বটে। অতএব যদি রাধারানী —ইত্যাদি ইত্যাদি।"

অবশেষে এটুকুও লিখতে ছাড়েনি—রাধারানীর জীবন তো অসার্থকই গেলো, জ্যেঠ্‌শাশুড়ীর সেবারূপ পুণ্যকার্যেও কিছুটা সার্থক হোক।

—দায় পড়েছে!

আপন মনে এটুকু উচ্চারণ করেই হেসে ওঠে রাধারানী।

'চক্কোত্তি কুলের বৌয়ের' ওপর দরদ উথলে উঠলো এতোদিনে। দায়ে পড়ে 'রায়মশাই'। কই তোর বিয়েতে ডাকতে আসিসনি তো?… বাপের শ্রাদ্ধর ভোজে তো বলিসনি? রাধারানী এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর ভাতজলে ভাগ বসাচ্ছে কি না, জানিস সে খবর? এখন ওনার মা মরছে—লোকাভাব, তাই 'কন্না' করতে ডাকতে মনে পড়েছে!

অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ায় রাধারানী।

মেঘলা দুপুরে—বেলা বোঝা যায় না। চারুলতা যে রাগ করে না খেয়ে শুয়ে আছে তাও মনে পড়ে না! সময়ের এমন অলস অপব্যয় রাধারানীর জীবনে বোধ করি প্রথম। অন্যদিন হলে—কিছু না হোক ভাঁড়ারের হাঁড়িকুড়ি-গুলোও পেড়ে ঝাড়ামোছা করতো।

আজ মনে হচ্ছে কোনোদিন বুঝি ছাতে ওঠেনি।… মেঘলা দুপুরে নির্জন ছাতের কেমন যেন একটা মাদকতা আছে।

অনেকখানি শূন্যতা।

তবু যেন একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগানো শরীরী স্পর্শ!

ষোলো, আঠারো, বাইশ সমস্ত বয়সগুলো পার করে এসে, ছাব্বিশ বছর বয়সে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলো রাধারানী নির্জন ছাতের একটা রহস্যময় আত্মা আছে!…তার স্পর্শ পাওয়া যায়। সে স্পর্শ মনকে অকারণ উচাটন করে তোলে।

জীবনভোরই তো ছাতে আসছে। বড়ি আচার আমসত্ত্বের প্রয়োজন বাদেও, ভিজে চ্যালাকাঠ ছড়িয়ে শুকোতে দিতে, সারাবছরের জন্যে কেনা মুগ কলাইয়ে পোকা লাগলে রোদে দিতে, ভাইপো ভাইঝির অকর্মজনিত ভিজে লেপ তোশক বিছিয়ে দিতে, প্রায়ই তো আসতে হয়।…শুধু আসতে হয়নি—মেঘলা দুপুরে। নাঃ কোনোদিন আসেনি।

তাই এই অদ্ভুত রহস্যটা অনাবিষ্কৃত ছিলো রাধার কাছে।

না কি নিজেরই অনাবিষ্কৃত রহস্যময় আত্মাকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললো রাধারানী ?

—পিসি, তুমি এখানে ?…'রক্ষে' এসে গালে হাত দিয়ে দাঁড়ায় !

সাত বছরের মেয়ে হলে কি হবে, চলনে 'বলনে' সতেরো বছরের ধাক্কা ধরে। রঙটা ময়লা, মাজা-ঘষা করলে হয়তো উজ্জ্বল শ্যামে দাঁড়াতো, তবু পিসি সোজাসুজি 'রক্ষেকালী'ই বলে।…'রক্ষেকালী' একটু দম নিয়ে বলে—আমি তোমাকে সাত রাজ্য খুঁজে বেড়াচ্ছি !

রাধারানীর আবার হৃদয়রহস্য ! রাধারানীর আবার আত্মা !

হাসি রাখবার জায়গা কোথায় !

এলো চুলগুলো আঁট করে জড়াতে জড়াতে কটু কষায় তিক্ত—এই ত্রিরস-জারিত কণ্ঠে ভাইঝির কথার উত্তর দেয় রাধারানী—কেন ? আমাকে তোর কি দরকার পড়েছে ? এখুনি জঠরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলে উঠেছে ? পেট তো নয়, রাবণের 'চিলু' ! জ্বলেই আছে ! হবে না কেন ? যেমন মা তেমনি ছাঁ।

'রক্ষে' পিসির স্টাইলেই হাত মুখ নেড়ে বলে—আমি আবার কখন খেতে চাইলাম ? মার যে খিদেয় হাতে পায়ে খিল ধরছে ! ইস্কুলবাড়িতে দুপুরঘণ্টা বেজে গেল !

ওঃ চারুলতা খায় নি !

মুহূর্তে মনটা 'আহা' করে উঠলেও, হৃদয়ের সে 'আহা' রাধারানীর কথায় ধরা পড়ে না। মুখটা বাঁকিয়ে বলে—শুধু খিল কেন, শেকল ছিট্‌কিনি সব পড়ে যাক না তোর মার হাতে পায়ে জিভে।…ঠ্যাকার করে বিছানায় অঙ্গ ঢেলে পড়ে থাকতে পারেন মহারানী, হাঁড়ি থেকে ভাত ঢেলে নিয়ে গিলতে পারেন না ?

—আমি ওসব জানি না বাবা, মা বললে তাই বলতে এসেছি—বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় রক্ষেকালী।

বাপ বলে—'ছোট রাধি'।

খুব মিথ্যে বলে না।

নিচে নেমে চিঠিখানা নিজের ঘরে উঁচু তাকে ফেলে রেখে ভাত বাড়তে বসে রাধারানী, ভাজের আর নিজের।

ঠিকানার জন্যে চিঠিটা রাখা, নইলে ও চিঠি আগুনে পোড়ালে রাগ মেটে না।

*　　　*　　　*

কিন্তু উত্তর দেবার জন্যে যে ঠিকানার আর দরকার হবে না, পরদিনই যে লেখক নিজেই সশরীরে এসে হাজির হবে—একথা কে ভেবেছিলো।

বিনয় ভট্‌চায্‌ আবার চটি চটপট করতে করতে এসে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে চাপা গর্জনে ফেটে পড়েন—রাধি, এই রাধি, কি আমার 'ছেরাদ্দ'র পিণ্ডি

রাঁধছিস ? আয় ঘর থেকে !

--আবার আজ কি হলো ? চেঁচাচ্ছো যে রাক্ষসের মতন ?

—না চেঁচাবো কেন, আশাবরী সুর ভাঁজবো ! 'পই' 'পই' করে বললাম কাল, দু'কলম লিখে ফেলে দে ডাকে—কানেই নেওয়া হলো না। নাও এখন ঠ্যালা সামলাও !

রাধা অবাক্ হয়ে বলে—কিসের ঠ্যালা ?

—কেন, তোমার সাত কালের দ্যাওর একেবারে এসে হাজির হয়েছেন ! চিঠিটা লিখে দিলে আর এই বিপদটি হয় না—

রাধারানী স্থির আত্মস্থ ভাবে বলে—কাল বিকেলের ডাকে চিঠি দিলে আজ সকালে ওর আসা রদ হতো, একথা গোপ্লাকে বোঝাও গে মেজদা ! আমাকে বোঝাতে এসো না।

কথাটা বিনয় ভট্চাযেরও যে জানা নয় তা নয়, তবু 'বিপদ' 'মুশকিল' 'লোকসান' এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারগুলো ঘটে গেলে একটা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলেই যেন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

—আচ্ছা আচ্ছা জানি—বলে বোনকে এক তাড়া লাগিয়ে ভট্চায্ প্রশ্ন করেন—এখন ও যে বলছে রোগা মাকে একলা রেখে এসেছে—দুটো পঁয়-তাল্লিশের গাড়িতে যাবে।

রাধা অবহেলাভরে বলে—তা' যাক না ! বারোটার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে আমার।

—ধেত্তারি তোর রান্নার নিকুচি করেছে ! রান্নার জন্যে, কি আমার ছেরাদ্দ আটকাচ্ছে শুনি ? কথা হচ্ছে তোর যাবার—

—সে কথাও হচ্ছে নাকি ? বিদ্রূপের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে রাধারানীর চোখে মুখে।

বিনয় ভট্চায্ অবাক্ভাবে বলেন—তবে আর ও এসেছে কি করতে ? তোকে নিয়ে যাবে বলেই তো—

—যাবে বুঝি ? ওঃ ! ভেবেছে বোধ হয় বেওয়ারিশ মাল বৈ তো নয়, রাস্তায় পড়ে আছে, নিলেই হলো।

হঠাৎ যেন সুপ্ত পৌরুষ জেগে ওঠে ভট্চাযের। তেড়ে উঠে বলেন—বোধ হয় তাই ! রোসো আমি গিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি বাছাধনকে—বিনয় ভট্চাযের বোন অতো ফেলনা নয় ! সে কারুর বাড়িতে পা ধুতেও যায় না। নিয়ে যাবে ! আবদার !...নেহাত নাকি কুটুম্বু, তাই এতোক্ষণ কিছু বলিনি, এবারে এমন শুনিয়ে দেবো, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। 'চক্কোত্তি বংশে'র বৌ বলে 'দাওয়া' করতে এসেছিস। ভারি আমার সম্পর্ক রে—মরেছে কি বেঁচেছে খোঁজ নিয়েছিস কখনো ?...এখন 'কারে' পড়ে সম্পর্ক বার করতে এসেছিস ! বার করাচ্ছি—

রাধারানী ভ্রূকুটি করে বলে—অসভ্যের মতন চেঁচাচ্ছো কেন মেজদা ? চাল্লিশ হতেই বাহাত্তুরে ধরতে—এই তোমারই দেখছি ! যা বলবে সামনে গিয়ে বলোনা—

—আচ্ছা তাই যাই।

—হয়েছে! খুব বীরত্ব দেখিয়েছো! সে বলা—দু'দণ্ড পরে বললেও চলবে। এখন কুটুম্বুর ভোগের ব্যবস্থাটি কি হবে বলে যাও দিকিন?

বিনয় ভট্চায্ একটু দরাজ হাতের লোক, অতিথ আত্মীয় এলে গেলে খাওয়ান ভালো। সুকুমার আসার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের ইসারায় আটবছরের ছেলেটাকে ময়রার দোকানে পাঠিয়েছেন! মাছের খোঁজে নিজে যাবেন এটা নিশ্চিত।

মাঝখান থেকে রাধার প্রশ্নে চারুলতা একটা আপসোসের ভঙ্গীতে ফোড়ন কেটে ওঠে—ও মা, সে কি! ক্ষীর দই মাছের মুড়োর বায়না দেওয়া হয়নি এখনো? কতো ভাগ্যে কুটুমের পায়ের ধুলো পড়েছে!

রাধা মুচকে হেসে বলে—হয়নি তাই তো দেখছি। বোধ হয় শ্বশুরবাড়ির ধারা শিখছে মেজদা।

চারুলতা আর সহ্য করতে পারে না। অনেক আশা করেছিলো দু'দশ-দিনের জন্যেও যদি বিদেয় হয় রাধা, হাত পা মেলিয়ে বাঁচবে!

ভাইবোন মিলে তো সে আশায় ছাই দিচ্ছেন।

রেগে লাল হয়ে বলে ওঠে—যখন তখন আমার বাপের বাড়ির খোঁটা তুলো না ঠাকুরঝি, ভালো হবে না। ভাইয়ের ভাতে এতো অহংকার কিসে তাও বুঝি না। এতো মিষ্টি ভাত যে, দু'দিনের জন্যে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। কেন, গেলেই হতো?

বিনয় ভট্চায্ 'হাঁ হাঁ' করে বৌকে থামাতেই যাচ্ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু রাধা দু'জনকেই অবাক্ করে দিয়ে, খুন্তিখানা হাত থেকে নামিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে শান্ত নরম গলায় বলে—আচ্ছা, তুমি তা'হলে রান্নাটা দেখো বৌ! ডালে এখনো নুন পড়েনি, মোচায় মসলা মাখা আছে।...গোপ্লাটা কোথায় কোথায় ঘুরছে, খাবার খায়নি, ডেকে খাইও।...সুকুমারকে বলে দাও মেজদা, তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে ভট্চায্ বলে ওঠেন—পাগলটার কথায় তুইও পাগল হবি রাধি? ওর কথা আবার মানুষে ধরে?

—কথা ধরাধরির কথা নয় মেজদা, ভেবে দেখলাম আমার যাওয়াই উচিত। সত্যিই তো আর সম্পর্ক হাত দিয়ে মুছে ফেলবার নয়। আর চিরকালই কি তোমার গলায় পাথর হয়ে বসে থাকবো? বলছে—ভালোই, সেধে তো যাচ্ছি না?

মেজদা বিমূঢ়ভাবে বলেন—আপনার শ্বশুরবাড়ির লোক বলতো—সে আলাদা, এ একেবারে নিষ্পর বললেই হলো! তোর নিজের দ্যাওর-ভাশুরই বা বলবে কি?

রাধা অল্প হেসে বলে—মুখ থাকলেই লোকে বলে মেজদা? বলবার 'মুখ' না থাকলেও বলে।...আচ্ছা দেখি তোমার দু'খানা ফর্সা থানটান যোগাড় করে বেঁধে নিই। পেড়ে ধুতি দেখলেও আবার লোকে কিছু বলতে পারে!

বিনয় ভট্চায্ বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে থাকেন। চারুলতাকে শাসন করবার

কথাও মনে পড়ে না। রাধারানীর কথার যে আর নড়চড় হবে না এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

ট্রেনে তুলে দিয়ে মেয়েমানুষের মতো কাপড়ে চোখ মুছে বিনয় বোনের মাথায় হাত রেখে ধরা গলায় বলেন—জেদ করে চললি মুখপুড়ী, বেশী দিন থাকিসনি। তুই বিনে বাড়িতে টেকা ভার হবে।

—কি যে বলো মেজদা—মুখে হাসি টেনে আর একবার ভাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে রাধা বলে—রক্ষু রইলো, গোপ্‌লা রইলো—আদরের গিন্নী রইলো তোমার—

আর যে মুহূর্তে ট্রেন চলতে শুরু করে, চির দুর্দান্ত মেজদার অপরাধী-অপরাধী মলিন মুখখানা অদৃশ্য হয়ে যায়, গাড়ির দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে রাধার!···মন-কেমনের জন্যে নয়, নিজের মনের চেহারা দেখে শিউরে উঠে।

এ কী সর্বনাশ সে করে বসলো!

কি দুর্মতি হলো তা'র।

নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেই ক্ষান্ত হয় নি শুধু, সরল স্নেহময় বেচারা মেজদাকে অপদস্থের একশেষ করে এলো মিথ্যে ছলনায়!

ছলনাই তো!

চারুলতার ওপর অপরাধের বোঝা চাপিয়ে অভিমানের ভানে ঘর ছেড়ে এলেও নিজেকে কি এখনও বোঝাবে রাধা, কূল ছেড়ে অকূলে পা দিয়েছে সে তুচ্ছ অভিমানের বশে!

চারুলতার ওপর অভিমানে ঘর ছাড়বে রাধা?

চারুলতা তো তার কাছে তৃণ মাত্র!

চিঠিখানা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মন তার উগ্র আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠেনি কি বেরিয়ে পড়বার জন্যে? উন্মুখ হয়ে ওঠেনি এই চিরপরিচিত আবেষ্টনের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে? সেই থেকেই তো মনের মধ্যে চলছিলো—বিদায়ের প্রস্তুতি!

অথচ ক্রমাগতই ঠকিয়েছে ভাই-ভাজকে।

হয়তো—শুধুই ভাই-ভাজকেও নয়—

রাধা কি অকৃতজ্ঞ? রাধা কি হৃদয়হীন?

একটা অজানা অচেনা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তির মোটাস্বার্থের প্রয়োজনের ডাক, এতো প্রবল হয়ে উঠলো তার কাছে, যে বিনা বিচারে মুহূর্তে ত্যাগ করে বসলো চিরদিনের স্নেহাশ্রয়?

কিন্তু—

প্রয়োজনের তাগিদেই বা কে কবে ডেকেছে রাধাকে? কে কবে ডাকবে? কে

কোন্‌দিন বলেছে—'রাধাকে তার চাই।'

আবেদনের কারণটা যতোই তুচ্ছ হোক, স্থূল হোক, রাধার চিরক্ষুধার্ত চিত্তদুয়ারে যে এই প্রথম ধ্বনিত হলো—পুরুষ-কণ্ঠের আবেদন!

এ বস্তুকে উপেক্ষা করবে—এতো ঐশ্বর্য রাধার ভাঁড়ারে কই?

[১৩৬২]

ক্ষণজাত?

কথাটা শুনেই নতুন কনে চমকে তাকাল। মেয়েটাকে দেখে পর্যন্তই কেন কে জানে তার কেমন গা জ্বলে যাচ্ছিল, কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা জ্বলে উঠল।

অথচ এমন কিছু বিষাক্ত কথা বলে নি অলকা।

কনের ছোট ননদ চামেলীকে উদ্দেশ করে হেসে বলছিল সে—বৌ দেখে বাঁচলাম বাবা চামেলীদি, মণ্টুদার প্রতিজ্ঞাটা রইল তাহলে?

চামেলী সন্দিগ্ধভাবে বলে—কিসের প্রতিজ্ঞা?

—ওই যে গো, বরাবর আমাকে শোনাত—'বৌ যা আনব দেখে তাক লেগে যাবে তোদের, তুই তার পাশে দাঁড়ালে মনে হবে যেন চাঁদের পাশে জোনাকি!'

ভালই কথা, অলকার মন্তব্যে কনেকে বাড়ানোই হয়েছে, তবু কথাটা যেন নতুন কনে সাহানার কানে বিষ-বর্ষণ করল।

আশ্চর্য! তারপর থেকে কি যে হল সাহানার, চোখ কান মন তার একাগ্র হয়ে রইল কালো রোগা নেহাৎ সাধারণ এই মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা যে আত্মীয় বলতে কেউ নয়, এমনি পাড়ার মেয়ে, সে তথ্যও সে সংগ্রহ করে ফেলল কমবয়সী একটা ভাগ্নীর কাছ থেকে।

আশ্চর্য!

সাহানার গাত্রদাহের কারণ হতে পারে এমন কি গুণ আছে অলকার? রূপ গুণ বিদ্যে বুদ্ধি সব দিকেই তো তার নম্বর ত্রিশের নিচে।

আর সাহানা?

বলতে গেলে উপরোক্ত কোন বিষয়েই ষাট-সত্তরের নিচে নম্বর নেই তার। বি. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে বিয়ে হচ্ছে, পড়া আরও অগ্রসর হতে পারবে বরপক্ষের সঙ্গে এই শর্ত করিয়ে নিয়ে তবে বিয়েতে মত দিয়েছে সে।

ওর পাশে রোগা ময়লা লম্বাটে অলকাকে দাঁড় করিয়ে 'চাঁদের পাশে জোনাকি' বললে কম বৈ বেশি বলা হবে না। মর্যাদাপূর্ণ ভারিক্কি সৌন্দর্য সাহানার, বয়সেও সে-ই বরং দু-এক বছরের বড় হবে।

অবিশ্যি অলকাও কচি খুকি নয়। কিন্তু এতখানি বয়স অবধি সে করেছে কি? ক্লাস এইট্‌ পর্যন্ত পড়ে পাঠ্যপুস্তক তুলে ফেলে স্কুলের দরজায় প্রণাম ঠুকে চলে এসেছে মায়ের কচি কাঁচা ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করতে, আর সেই পর্যন্ত গোগ্রাসে গিলে আসছে যত সব 'অপাঠ্য কেতাব'। মাত্র একটা

লাইব্রেরীতে কুলোয় না, দুটো লাইব্রেরীর মেম্বার সে।

সকাল সন্ধ্যে মায়ের রান্নাঘরের 'কন্না' করে, সারা দুপুর গল্পের বই ধ্বংস করে, আর সুযোগ পেলেই দুরন্ত ভাই বোনগুলোর একটাকে ঘাড়ে করে পাড়া বেড়াতে যায়। সেই সুত্রে পাড়া-সুদ্ধ গিন্নি মহিলারা তার 'মাসী' 'পিসী', পাড়া-সুদ্ধ তরুণ-তরুণী তার 'দাদা' 'দিদি'।

নেহাৎ যাকে একটা 'মেয়ে' মাত্র বলা যায়, অলকা হচ্ছে সেই মেয়ে।

আর সাহানা হল রীতিমত একটি ভদ্রমহিলা।

সেই সাহানার গা জ্বলে গেল অলকাকে দেখে! আশ্চর্য নয়?

গত রাত্রে ফুলশয্যা হয়ে গেছে। বলতে গেলে প্রায় শেষ রাত্রে। ভীষণ ভিড় বাড়িতে।

আজ দ্বিতীয় রাত্রে মণ্টু অর্থাৎ শুভেন্দু নতুন কনের সঙ্গে আলাপ জমাবার উপলক্ষ হিসেবে প্রশ্ন করে—আচ্ছা এ দুদিন তো এ বাড়ির সকলকে দেখলে, কাকে কি রকম লাগল বল?

সাহানা ঈষৎ বাঁকা হাস্যে ফিরতি প্রশ্ন করে—শুধু বাড়ির? না পাড়ারও?

হাসির বাণে বিব্রত শুভেন্দু বোকার মত বলে—পাড়ার কেন? পাড়ার লোকদের চিনে বেড়াতে কে বলেছে তোমাকে?

—না চেনাই বাঞ্ছনীয় তাহলে? কি বল? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার দৃষ্টিশক্তিটা এত তীক্ষ্ম—যাকে চেনবার, বড় চট করে চিনে ফেলতে পারি।

শুভেন্দুও দৃষ্টিশক্তিকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ম করে বলে—কার কথা বলছ বল তো?

—বলি নি আমি কারুর কথাই, গায়ে লাগছে কেন তোমার?

বৌ আর একবার মুচকে হাসে।

অতঃপর সে রাত্রে আলাপটা আর বেশি এগোতে পারে না। ঘুরে ফিরে বিশেষ একটা সীমায় এসেই যেন ঠোক্কর খায়। বাধ্য হয়ে শুভেন্দু সাহানার স্কুল-কলেজের কথা তোলে, সহপাঠী সহপাঠিনীদের গল্প শোনবার ইচ্ছে প্রকাশ করে, প্রফেসররা কে কেমন পড়ান তার আলোচনা চলে, নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার কথা হয়।

উত্তর অবশ্য সব কথারই দেয় সাহানা।

ছাত্রীমহলে সে নিজে যে কি রকম একটি উজ্জ্বল তারকা সে বিষয়ে অবহিত করিয়ে দিতে ছাড়ে না শুভেন্দুকে এবং এরই ফাঁকে এক অবসরে হঠাৎ বলে বসে—এত তো তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলে, মারাত্মক কিছু একটা আবিষ্কার করতে পারলে?

—নাঃ, তোমার মনের অবস্থা আজ স্বাভাবিক নেই—বলে ঘুমোবার চেষ্টায় বালিশ উল্টে নিয়ে পাশ ফিরে শুল শুভেন্দু, আর চোখ বুজে খুঁজে বেড়াতে লাগল 'পাড়ার লোক' কথাটার রহস্য।

কী ব্যাপার? লক্ষ্যণীয় লোকটা কে? কে হতে পারে? কী কাণ্ড। তাই নাকি রে বাবা!···আরে ধ্যেৎ, এত পাগল আর এত বোকা কখনও হতে পারে

সাহানা ? বি. এস. সি-পরীক্ষা-দিয়ে আসা ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রী সাহানা রায় ! যে কন্যাকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেছে শুভেন্দু ! যাকে আহরণ করে আনতে পারার গৌরবে বন্ধুমহলে ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে সে।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরোবার আগে বিদায়পর্বের বেলাতেও যেন একটু দূরত্ব বজায় রেখে দেয় সাহানা। অনুযোগ করা চলে না এমন একটু দূরত্ব, ধরা ছোঁওয়া যায় না এমন একটু কাঠিন্য।

খানিক পরে শুভেন্দুকে দেখা যায় অলকাদের রান্নাঘরের দালানে। দ্রুত হস্তচালনায় আলু ছাড়াচ্ছিল অলকা, শুভেন্দুকে দেখে কলরব করে ওঠে—ও মা দেখ নতুন মানুষ এসেছে তোমার বাড়িতে। কী মণ্টুদা, নতুন কনের আওতা ছেড়ে হঠাৎ এদিকে ?

কেন কে জানে, অলকার দুগাছামাত্র চুড়িপরা গৃহকর্মনিরত রোগা রোগা হাত দুখানার সঙ্গে সাহানার কারুকার্যময় উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত নিটোল মোলায়েম সুগৌর হাত-দুখানির তুলনা মনে এসে যায় শুভেন্দুর।

মনের কথা থাক, মুখে সেও মুখর হয়ে ওঠে—এদিক ওদিক না করে উপায় ? কী মারাত্মক কথা বলে এসেছিস আমার বৌকে ?

—ওমা ! মারাত্মক আবার কি বলব গো ! তোমার বৌকে তো একেবারে 'ধন্যি ধন্যি' করে এসেছি ! কেন ব্যাপার কি ?

শুভেন্দু অবশ্য ওপর-চালাকিই করে—ধন্যি ধন্যি করে এসেছিস ? তাহলে আমার বৌ তোর 'ছিছিক্কার' নিন্দে করল কেন ?

অলকা গায়েও মাখে না কথাটা, বরং হেসে বলে—কি যে বল ! আমি তোমার মহীয়সী বিদুষী ভার্যার সমালোচনারই যুগ্যি না কি ? সব তোমার কবি-কল্পনা মণ্টুদা !

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন অলকার মা। বলেন—কি গো বাবা, বিয়েবাড়ি ছেড়ে এবাড়িতে ?

—এই দেখুন না কাকীমা, একটু বেড়াতে এসে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে মারা গেলাম বিয়েবাড়ির ভিড় আর গরমে হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম !

সহজেই কথাটা বিশ্বাস করেন অলকার মা।

যদিও সকালবেলা কাজের সময়, তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সস্নেহ-ভাষণে নতুন শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে দু'চারটি তথ্য জিজ্ঞাসা করেন, কুটুম্বদের আক্কেল-বিবেচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন, বৌয়ের রূপগুণের কথা আবার উল্লেখ করেন।

দুষ্টুহাসি হেসে অলকা বলে—এতক্ষণে বুঝেছি মণ্টুদার হঠাৎ শুভাবির্ভাব কেন ? সকালবেলা একটু 'শ্রীমতী চরিতামৃত' শোনবার আশায় !

—যা যা ফাজিল মেয়ে—বলে মা চলে যান।

মণ্টুর মনে হয় সত্যিই যেন আগের থেকে একটু বেশী ফাজিল লাগছে অলকাকে একটু বেশী বাচাল। জানে না এইটাই স্বাভাবিক। অতি গোঁড়া বাড়িতেও সচরাচর এমন দেখা যায়। নতুন বিবাহিত বরকনেকে উপলক্ষ করে

তরুণী মেয়েরা বাচালতার একটা ছাড়পত্র পেয়ে যায় এবং তার সদ্ব্যবহার করতেও ছাড়ে না তারা।

তেমন ক্ষেত্রে হঠাৎ মেয়েগুলো যেন নতুন করে চোখে পড়ে। মনে হয়—এ আবার এত কথা জানে! এ আবার এ সব কথা শিখল কখন?

আচার অনুষ্ঠানের শেষ নেই।

কনে দুচারটে পাশ করে সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকুক আর যাই হোক, এ বাড়ির নিয়ম কানুনগুলো আপাততঃ সবই মানতে হয়।

'সুবচনী' 'সত্যনারায়ণ' 'কালীঘাট' ইত্যাদি সব কিছুই করেন শুভেন্দুর মা। এই উপলক্ষে নিকটতম প্রতিবেশী অলকার মার ঘন ঘন ডাক পড়ে, অলকাও আসে সঙ্গে সঙ্গে।

আসবে না কেন, পাড়ার সব বাড়িই তো তার নিজের বাড়ি।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সাহানা তিক্তদৃষ্টিতে, কথা কইলে উত্তর দেয় আরও তিক্ত ভঙ্গীতে।

তবে মজা এই—অলকা গায়েও মাখে না। নাকি বুঝতেই পারে না? একেবারে পারে না, তাই বা বলা যায় কই? দিব্যি হেসে হেসে বৌয়ের কর্ণ-গোচরীভূত হতে পারে এমন সুরে বলে—খোঁজ নিও তো চামেলীদি নতুনবৌদি ম্যালেরিয়ায় খুব কষে ভুগে এসেছে কি না। কুইনাইনের গুণটা যেন এখনও রয়ে গেছে ভেতরে।

চামেলী হেসে বলে—ঘুরিয়ে ভিন্ন কথা বলতে জানে না ছুঁড়ি।—বৌ যা এনেছি আমরা, বাজারের সেরা, বুঝলি?

কিন্তু বিপদ ঘটেছে শুভেন্দুর।

ও বেচারা আর কিছুতেই অলকার কাছে আগের মত সহজ হতে পারছে না। সাহানার সামনে তো নয়ই। আবার সেই সহজ হতে না পারার খেসারত দিতে, অভদ্রতাটা মেক্‌আপ্‌ করে নিতে, থেকে থেকে ছুটতে হচ্ছে তাকে অলকাদের বাড়িতে, যা হোক একটা ছুতো নিয়ে।

অলকা হাসে আর বলে, সামনাসামনিই বলে—মণ্টুদার ভাবখানা কি জান মা, লোককে দেখান—'দেখ আমি বড়লোকের জামাই হয়ে কিছু বদলাই নি। বরং আরও সামাজিক আরও সাদাসিধে হয়ে গেছি।'

মেয়েকে তাড়না দেন অলকার মা। আবার মনকে নিশ্চিন্ত রেখে চলেও যান সংসারের কাজে।

পাড়ার বড় বড় ছেলেমেয়েগুলোর বিয়ে হয়ে গেলে অপর বড় বড় ছেলে-মেয়েদের মায়েরা যেন খানিকটা হাঁফ ফেলে বাঁচেন। পাহারা দেওয়ার কাজটা কমে। বিয়েটা হয়ে গেছে, আশঙ্কা-প্রুফ্‌ হয়ে গেছে!

হয়তো অনেকক্ষণ পরে এসে দেখেন, দিব্যি গল্প চালাচ্ছে দুজনে। ভাবেন, নতুন বৌয়ের গল্পগুলো একটা কারুর কাছে উজাড় না করে বাঁচছে না বেচারা! ভাবেন আর হাসেন।

কে জানে অলক্ষে আর কেউ হাসে কিনা !

হাসে না শুধু সাহানা। দেখে শুনে মনে হয় হাসতে বুঝি শেখে নি।

প্রথমটায় বিদুষী বৌ বলে তেমন সমীহ কেউ করতে যায় নি, দু-দশটা পাশ আজকাল আর কে না করছে ? চামেলী শেফালী না করুক, ওদের ভাসুরঝি ভাগ্নীরা তো করছে ! কিন্তু বৌয়ের গাম্ভীর্যের বর্মের ঠেক খেয়ে সকলেই ধীরে ধীরে সমীহ করতে শুরু করে। বর পর্যন্ত।

অথচ এত ভদ্র সভ্য মার্জিতভাব সাহানার, নিন্দে করবারও কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখনকার বড় সড় মেয়ে, অষ্টমঙ্গলায় দুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি ঘুরে এসে আবার ঘর করছিল। মাস-দেড়েক পরে পাকাপাকি ভাবে বাপের বাড়ি ফেরার তোড়জোড় সুরু হল। কলেজের খোঁজ খবর নিতে হবে। ভর্তি হবে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে।

শুভেন্দু মুখ শুকিয়ে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। একসময় বলে—কিছুতেই কেন তোমার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলাম না সাহানা, তাই ভাবছি।

সাহানা সুটকেস গোছাতে গোছাতে মুখ না তুলেই বলে—তার খুব বেশী প্রয়োজনই বা কি ? আচার অনুষ্ঠানের কাছি দিয়ে দুজনকে একসঙ্গে বেঁধে দিলেই যে কাছাকাছি হতে পারা যাবে, এমনই বা আশা করছ কেন ?

শুভেন্দু কিছু আর বিদ্যেয় বৌয়ের চাইতে খাটো নয়, কিন্তু কথায় হেরে যায় সব সময়।

অবিশ্যি মেয়েদের কাছে কথায় জিততে পুরুষজাতি কবে কোথায় পেরেছে ? বড় জোর জিততে পারে ধমকের দাপটে চুপ করিয়ে দিয়ে। সভ্য সমাজে সে পদ্ধতি অচল।

বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দুও পৌঁছে দিতে যাবে, এটা বাড়ির সকলে তো বটেই, বৌ নিজেও আশা করেছিল, কিন্তু সকলের আশায় ছাই দিয়ে শুভেন্দু রয়েই গেলো বাড়িতে।

চামেলীও আগামীকাল শ্বশুর বাড়ি যাবে, মন খারাপ, তবু ফিকে হাসি হেসে বলে—ছোড়দার বুঝি বিরহের জ্বালায় হাত পা উঠলই না ? তা যাও শ্রীমন্দিরে গিয়ে শুয়ে পড় গে ? এখনও শ্রীমতীর সৌরভ ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে !

—উঃ, কী ইয়ারই হয়েছিস তোরা আজকাল !

হাসতে হাসতে বোনের মাথায় একটা টোকা মেরে চলে যায় শুভেন্দু। মিনিট দুই পরে বলে যায়—যাই একটু ঘুরে আসি।

একটু ঘুরতে আর কোথায় বা যাবে—দুখানা বাড়ির পরেই যখন একটা চেনা বাড়ি রয়েছে ?

অলকা বলে—তোমার আজকাল কি হয়েছে গো মণ্টুদা ? খুব যে ঘন ঘন আগমন ?

শুভেন্দু গম্ভীরভাবে বলে—কেন, এলে দোষ হয় ?

—সে কি গো, দোষ কিসের ! হঠাৎ এত দয়া কেন তাই ভাবছি ।

ফস করে বলে বসে শুভেন্দু—ধর তোকে দেখতে আসি । বিশ্বাস হয় না ?

সামান্য থতমত খেয়েই সামলে নেয় অলকা, মৃদু হেসে বলে—খুব হয় । অবিশ্বাসের কি আছে ? পূর্ণিমার মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্যেই তো অমাবস্যার দরকার ।

হঠাৎ ওর একটা হাত ধরে ফেলে শুভেন্দু গম্ভীরভাবে বলে—এত কথা কবে শিখলে ফাজিল মেয়ে ?

হাতটা ধরে মনে হয় রোগা গড়নের হাত বেশ সহজে আয়ত্ত করা যায় । নিটোল ভারী ভারী হাতে হাত ঠেকলে যেন নিজেকে বড় ক্ষুদ্র বলে বোধ হয় ।

অলকা হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, সহজে পারে না । হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে বসে ।

—আঃ, ছেড়ে দাও বলছি, খেলার পুতুল পেয়েছ নাকি—বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে ।

এর পর ঘটনার গতি দ্রুত ।

বাঁধ-ভাঙা নদী উদ্দাম হয়ে ওঠে কূলছাপানো বন্যার বেগে ।

একদিন তুচ্ছ একটা কারণে শুভেন্দুর মা বাড়ি বয়ে এসে অলকার মায়ের সঙ্গে বচসা করে যান, অলকার মাও বেশ দুকথা শুনিয়ে দেন ।

অলকার পথে বেরোন বন্ধ হয়, সাহানাকে আনাবার জন্যে শুভেন্দুর বাপ বেয়াইকে চিঠি লেখেন ।

আরও কদিন পরে অলকাদের উঠে যেতে দেখা যায় এই পাড়া থেকে । আরও গম্ভীর হয়ে বরের ঘর করতে আসে সাহানা । অনেক কিছুই কানে গেছে তার ।

আর এরও কিছুদিন পরে দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমের একটা অখ্যাত শহরের নিতান্ত শ্রীহীন ওয়েটিঙ্-রুমে দুখানা লোহার চেয়ার পেতে বসে প্যাকিং বাক্সের টেবিলে রেখে চা খাচ্ছে দুটি অ-সম প্রাণী ।

ছেলেটি সুন্দর সুকান্তি । বেশভূষায় আভিজাত্যের ছাপ ।

মেয়েটা রোগা কালো, পরণপরিচ্ছদে পারিপাট্যের নিতান্তই অভাব । তবু সব ত্রুটি তার পুষিয়ে গেছে বোধ হয় মুখের ঔজ্জ্বল্যে ।

খালি পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ছেলেটি বলে—আশ্চর্য ! মানুষের কাছে সব থেকে অপরিচিত বোধ হয় নিজের মনটা ! তাই না ?

মেয়েটি বলে—কি জানি, হয়তো অপরিচিত নয় । পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে, চোখ বুজে মনটাকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করে মানুষ ।

ছেলেটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে আত্মগতভাবে বলে—মাঝখানের ব্যাপারটা যদি না ঘটত !

মেয়েটি রুদ্ধশ্বাসবক্ষে মনে মনে ভাবে সে ব্যাপারটা না ঘটলে, হয়তো এ ব্যাপারটাও ঘটত না!

কে জানে ওর ধারণাটাই ঠিক কিনা!

মুখ্যু হোক, অতি সাধারণ হোক, জাতটা যে ভয়ঙ্কর! সহজাত বুদ্ধিতে বুঝে ফেলে অনেক কিছু।

কে জানে—সহজাত নারীপ্রকৃতির বশে ছাই-চাপা আগুনটাকেই আবিষ্কার করে বসেছিল সাহানা, না অবিশ্বাস আর অবহেলার অরণি কাষ্ঠে নিজেই সে আগুনকে সৃষ্টি করল।

নিঃশঙ্ক শিশুকে একবার ভূতের ভয় দেখালেই যে সে অবিরত ভূত দেখতে শুরু করে এ জ্ঞান বোধ হয় ছিল না সাহানার!

[১৩৬২]

ভান

বাসভর্তি লোকের মাঝখানে একটু জায়গা দখল করে বেশ সহজভাবেই বসেছিল লোকটা, কনডাকটার এসে টিকিটের জন্যে হাত পাততেই হঠাৎ বেয়াড়া রকমের একটা হাসি হেসে উঠল।

এ হাসি চিনতে কারো ভুল হয় না।

আশপাশের লোক সভয়ে যতটা সম্ভব সরে বসবার চেষ্টা করল, এবং কনডাকটার ছোকরা মুহূর্তকাল ইতিকর্তব্য চিন্তা না করে লোকটাকে নির্দেশ দিল, 'নেমে যান স্যর।'

বলা বাহুল্য, নেমে যাবার কোন লক্ষণ তার দিক থেকে দেখা গেল না, উত্তরে শুধু দন্ত বিকশিত করে বেশ জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

কনডাকটার আর কিছু বলবার উপক্রম করতেই অন্য আরোহীবর্গ উদার অভিমত প্রকাশ করেন, 'ছেড়ে দাও হে, ছেড়ে দাও। দেখাই যাচ্ছে পাগল! নাড়াচাড়া করে আর বিপদ ডেকে আনা কেন? চুপচাপ বসে আছে থাক।'

ফল হয় উল্টো।

এহেন উদার অভিমতে বোধ করি পাগলের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।… সে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে শুরু করে, 'পাগল বলবেন না স্যর, পাগল বলবেন না। মনে বড়ো দাগা পাব।…চন্দ্র সূয্যি সাক্ষী, আমার সাতপুরুষে কখনো কেউ পাগল ছিল না।…আমাকে আপনারা পাগল বলে ভুল করবেন না, দুঃখের জ্বালায় আজ আমার এই অবস্থা। নইলে আমিও মশাই খানদানী ঘরের ছেলে। আর আমার জীবনের ইতিহাস যদি শোনেন—নাঃ সত্যি কথা বললে তো বিশ্বাস করবেন না!'

একটি কৌতুকপ্রিয় ছোকরা বলে ওঠে, 'বলে যান না স্যর, অবিশ্বাসের কি আছে?'

অপর আরোহীরা একটু 'মজা'র আশায় জুত করে বসে।

বোঝা যাচ্ছে যে, লোকটা মারাত্মক টাইপের পাগল নয়। যাকে বলে ছিটগ্রস্ত। অতএব—খানিকটা সময় কাটবে ভালো।

সুস্থ মানুষের কাছে 'পাগল' যে দস্তুরমতো একটা উপভোগ্য বস্তু, এ আর কে না জানে!···কে জানে, কেন মানুষের 'পাগলামির' প্রতি এমন দুরন্ত আকর্ষণ! পাগলের আবোল-তাবোল কথার মধ্যে কী রস পায় সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ?

হয়তো বা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই গুপ্ত হয়ে আছে পাগলামির বীজ! আবোল-তাবোল ব্যবহার করবার একটা দুরন্ত লোভ দমিত হয়ে আছে অবচেতন চেতনার অন্তরালে, পরের পাগলামিতে তা'র কিছুটা তৃপ্তি সাধন হয়। তাই 'ভাব' লাগিয়ে মূর্ছা যেতে যে নাও পারে, 'ভাব' দেখে চোখ দিয়ে অন্ততঃ আনন্দাশ্রু ঝরে তা'র।

লোকটা একবার সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইশারায় কৌতুকপ্রিয় ছোকরাটিকে কাছে ডাকে।···কাছে আসতেই গলা খাটো করে গোপন তথ্য পরিবেশনের ভঙ্গীতে বলে, 'পেপার পড়েন তো দাদা? নিশ্চয় পড়েন?···জানেন অবিশ্যিই প্রতাপগড়ের মহারাজার জামাই আজ পাঁচটি বছর নিরুদ্দেশ?'

ছোকরা হাসি লুকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'ইস্ তাই নাকি? জানি না তো—'

'বলেন কি? তবে আর কোন খবরটা রাখেন দাদা?···পাঁচ পাঁচটি বছর।···সে জামাই আছে কোথায় জানেন?···জানবেন কোথা থেকে, জানবার কথাও নয়।·· অবিশ্বাস না করেন তো বলি,—' গলার স্বর আরো খাটো করে মুখের চেহারায় একটি রহস্যময় ব্যঞ্জনা এনে লোকটা নিজের বুকে একটা হাত রেখে বলে, 'সে লোক—আপনাদের সামনেই বসে।'

বলা বাহুল্য, একটা হাসির তরঙ্গ খেলে যায় সকলের মধ্যে।

পাগল মাথা তুলে একবার পরিস্থিতিটা দেখে নিয়ে বলে, 'বিশ্বাস করলেন না?···করবেন না তা জানি। চিনি তো সব শালাকেই।'

'এই খবরদার! মুখ সামলে—'

এক ভদ্রলোক তেড়ে ওঠেন।···অপর একজন তাঁর জামার কোণ ধ'রে নিবৃত্ত করেন,···বলেন, 'আপনিও যে ক্ষেপলেন মশাই। পাগলের কথা আবার ধরতে আছে?'

পাগল এবার রীতিমত চটে ওঠে।

আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে চড়া সুরে বলে, 'বার বার 'পাগল' 'পাগল' করবেন না মশাই। বলছি—কস্মিনকালেও আমি পাগল নই।···সত্যি পাগল যদি কেউ থাকে তো সে আপনারাই। নইলে সহজ মানুষকে পাগল বলে হাসেন, আর সত্যিকার পাগলকে 'নেতা' বলে মাথায় করে নাচেন, 'দেবতা' বলে তার পায়ে গড়াগড়ি খান! ছ্যাঃ!'

'ও বাবা এ যে দেখছি দস্তুরমতো জ্ঞানী পাগল।'

একজন অস্ফুট মন্তব্য করেন।

আগের ছোকরাটি বলে ওঠে, 'ওসব কথা থাক স্যর, রাজকন্যার খবর বলুন! রাজার জামাই তো নিরুদ্দেশ, মেয়ে?'

লোকটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, যেন আচম্‌কা একটা শক্‌ পেয়েছে। মাথা হেঁট করে নিজের তালুতে কি যেন নিরীক্ষণ করে, তারপর ফিসফিস করে বলে, 'সেই তো কথা দাদা।...আটকে রেখেছে।...বন্দিনী রাজকন্যা! ও হো হো! ...আমি দাদা কোর্টে নালিশ তুলবো!...জানি, সে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছে!...বুঝতেই পারছেন—লাভ ম্যারেজের ব্যাপার? ...তাই বলছিলাম কি—আপনারা পাঁচজনে যদি ব্যাপারটাকে একটু সিমপ্যাথির চক্ষে দেখেন! কোর্ট খরচাটা তুলতে পারলেই দেখে নিই একবার। দেখুন সামান্য ক'টা টাকার অভাবে দু'টো প্রাণ নষ্ট হ'তে বসেছে।...দু'টি ফুল্ল কুসুম!'

চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। হাসির ঝড় বয়। লোকটা কিন্তু এসব গ্রাহ্য করে না। এই ছোকরাকেই মুরুব্বি ধরে বলে, 'দেখুন না দাদা, বলে কয়ে পাঁচজনকে—'

সে ছোকরা তামাসার সুরে চীৎকার করে বলতে শুরু করে, 'ও মশাইরা শুনছেন? সামান্য কিছু টাকার যোগাড় হলেই একটি বন্দিনী রাজকন্যা উদ্ধার হন।·· দেখুন আপনারা যদি কিছু—'

বলা বাহুল্য, পকেটে হাত কারোই পড়ে না। বরং দু'চারটি বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনা যায়।...'পাকা জোচ্চোর', 'এ আবার এক নতুন ট্রিক্‌স্‌'...'উঃ পথে ঘাটে চলা দায়'—ইত্যাদি।

লোকটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর পকেট থেকে একখানা আধময়লা রুমাল বার করে দু'হাতে বিছিয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেউ নেমে যায়, নতুন কেউ ওঠে, রুমালের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না! পাগলা একটু দেখেই হঠাৎ 'হা হা' শব্দে বিটকেল একটা হাসি হেসে রুমালটা নিজের কপালে কষে বেঁধে নিলে। মনে হলো, একটা কিছু বুঝি করে বসবে।

আরোহীর দল আর একবার সভয়ে সরে বসল।

কিন্তু না, কিছুই করল না। ক্ষতিকর পাগল সে সত্যিই নয়।...পরবর্তী স্টপেজটা আসতেই ধীরে ধীরে উঠে পড়ে।...দার্শনিকের ভঙ্গীতে উদাস সুরে বলে, 'জানতাম একটা ফুটো পয়সাও কেউ খসাবে না। দুনিয়াটাকে তো দেখলাম ঢের।'

দরজার দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ যেন সকলের চোখে পড়ে যায় লোকটার দেহটা কতো শীর্ণ, আর পরন-পরিচ্ছদগুলো কতো জীর্ণ। ফালা ফালা ছেঁড়া শার্টের ফাঁক দিয়ে পিঠের হাড়গুলো নির্লজ্জভাবে উঁকি মারছে।

কেন কে জানে হঠাৎ অনেকেই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পকেটের মধ্যে হাতগুলো নিসপিস করে, কিন্তু এমন পণ্ডাপণ্ডি ধিক্কারের দয়া দেখাতেও চক্ষুলজ্জায় বাধে।

তবু এক বুড়ো ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ডাক দেন, 'এই শোনো—ইয়ে সামান্য

কিছু—'

পাগল লোকটা ফিরে দাঁড়ায়। বলে, 'দেবেন কিছু? দিন!—পাগলের আবার মান অভিমান!'

বুড়ো ভদ্রলোকের ব্যাপারটা যেন হঠাৎ মন্ত্রের মতো কার্যকরী হয়ে ওঠে। ঝড়াজ্‌ঝড় পয়সা পড়ে।—দু' আনা চার আনা আটা আনা দাক্ষিণ্য দেখাবার সুযোগ পেয়ে যেন বর্তে যায় সবাই। বিরুদ্ধ মন্তব্যকারীরাও।

মানুষ কি সত্যিই হৃদয়হীন? তা' নয়! তাদের হৃদয়কে অনবরত দোহন করা হয় ব'লেই এক এক সময় শুকিয়ে ওঠে।···

পরের স্টপেজে নেমে পড়ে উল্টো মুখে হাঁটতে শুরু করে লোকটা দ্রুত-ভঙ্গীতে।

বাসের মধ্যে এক ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'লোকটাকে জানি! আমাদের ওদিকেই থাকতো। শুনবেন ওর কাহিনী? রায়টের সময় বৌটা গেলো হারিয়ে, চোখের সামনে তিন তিনটে ছেলেকে গুণ্ডারা কেটে কুচি কুচি করে পুকুরে ভাসিয়ে দিলে। সেই থেকে লোকটা—' সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোকটি চমৎকার এক গল্প ফাঁদেন।

* * *

পাগল দ্রুতপদে হেঁটে একটা বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়ে। শ্রীহীন অন্ধকার একটা ঘরে নড়বড়ে একটা চৌকির ওপর একটি মেয়ে বা বৌ, যাই বলা হোক, চুপচাপ শুয়েছিল, পাশে একটা জীর্ণশীর্ণ ঘুমন্ত ছেলে।

ঘরে সংসারে কোথাও কোনোখানে ভদ্রগোছের জিনিসপত্র কিছুই নেই, তবু এক নজরে দেখলেও চিনতে ভুল হয় না, এরা চিরদিন বস্তিতে ছিল না। এই ঘর, এই পরিবেশ এদের নয়। নিজের শিকড় থেকে উপড়ে ছিট্‌কে এখানে এসে পড়েছে।

তাই ব'লে 'তিন তিনটি ছেলে'র গল্পও সত্যি নয়। বৌ হারানো তো নয়ই। 'দাঙ্গা' 'দুর্ভিক্ষ' 'মহামারীর' মতো সাময়িক গল্প নয়, 'একটি মেয়ে আর একটি ছেলের' চিরন্তন গল্প!···পালিয়ে এসেছে প্রেমের দায়ে, তারপর হিতৈষী অভিভাবকদের ভয়ে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো তিনতলা দালান কোঠা থেকে পিছলোতে পিছলোতে ঠেক্‌ খেয়েছে এসে এই মাঠকোঠায়।

বৌ বললে বৌ, প্রিয়া বললে প্রিয়া। বিয়েটা আইনসঙ্গত করিয়ে নেবার সুযোগ জোটেনি বলেই চিরাচরিত প্রথায় কবিত্ব করে বলেছে, বিবাহের চেয়ে বড়ো বন্ধনে বন্দী রইলো তারা; তাদের বিবাহের পুরোহিত স্বয়ং ভগবান।

তা সে সব হচ্ছে প্রথম দিকের কথা। অনেকদিন কাটলো তারপর।

এখন আর বিবাহের বৈধতা বা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে দু'জনের একজনও মাথা ঘামায় না, এখন বর্তমান কালটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে অতীতকে, ভবিষ্যৎকে। এখন জগতের সর্বকিছুর চাইতে যা বড়ো সেই ভাতের গ্রাসের চিন্তাটাই গ্রাস করে রেখেছে অন্য সব চিন্তাকে।

হয়তো বুঝেছে যার ভাত নেই, তার সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটাই হাস্যকর।

লোকটার নাম শঙ্কর, মেয়েটার নাম সুধা।

দারিদ্র্যের অগ্নিদাহে বাইরেটা অমন ঝলসে গেছে বলেই মনে হচ্ছে 'লোকটা'। তিনতলার সেই খোলামেলা হাওয়াদার ঘরটায় যদি থাকতো আজও, হয়তো বলা যেতো 'ছেলেটা'।

শঙ্কর ঘরে ঢুকতেই সুধা ধড়মড় করে উঠে বসল। বসে বললে, 'তোমার কাণ্ডটা কি ? কখন বেরিয়েছ তা'র ঠিক আছে ?'

শঙ্কর আচমকা এক অট্টহাসি হেসে বলে উঠল, 'ঠিক মানে ? পাগলের কিছু ঠিক থাকে ?'

'ও আবার কি কথার ছিরি ?'—সুধা বকে ওঠে, কতো দুঃখে ঘুমিয়েছে ছেলেটা, এক্ষুণি আবার ওঠাও ওকে ?···এতোক্ষণ বাইরে থাকলে ভাবনা হয় না ? নাওয়া নেই খাওয়া নেই—'

'খাওয়া ?···হা হা হা, তুমি যে না হাসিয়ে ছাড়ছ না সুধা, খাওয়ার ব্যবস্থা মজুত আছে নাকি তোমার ঘরে ?'

'নেই তো নেই। তাই বলে তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াবে নাকি সারাদিন ? ···তা'তেই ভাতের ব্যবস্থা হবে ?'

'হবে না মানে ?'

পকেট থেকে মুঠো করে খুচরো পয়সার গাদা বার করে চৌকির ওপর ঝন্‌ঝন্ করে ছড়িয়ে দেয় শঙ্কর, 'এই নাও বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধারের কড়ি।'

পয়সার শব্দে পাছে পাশের ঘরের বাসিন্দাদের কৌতূহল উদ্রেক হয়, তাই তাড়াতাড়ি সামলে কুড়িয়ে নিয়ে সুধা চক্ষু বিস্ফারিত করে বলে, 'এসব কি ?'

'চিনতে পাচ্ছো না ? দীর্ঘকালের অদর্শনে একেবারে ভুলে গেছো ?...ওকে বলে 'পয়সা', বুঝলে ?'

'এ তুমি পেলে কোথায় ?'

'পেলাম ? ..পাঁচজন হৃদয়বান ব্যক্তির পকেট থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে।'

পয়সা ভর্তি হাতের মুঠোটা শক্ত হয়ে ওঠে সুধার।...নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'যা বলে গেলে তাই করলে শেষ পর্যন্ত ? ভিক্ষে করলে ? তুমি ?'

'আমি ?' অলৌকিক একটা হাসি ফুটে ওঠে শঙ্করের মুখ। বলে, 'নাঃ আমি আর পারলাম কই ? হাত পাততে গিয়ে ভুলে যাওয়া বংশের রক্ত চিন্ চিন্ করে উঠল। শেষ পর্যন্ত একটা পাগলকে দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে নিলাম।'

সুধা উদ্বিগ্ন মুখে বলে, 'কি সব গোলমেলে কথা বলছ ? কিছু তো বুঝতে পারছি না। পাগল আবার তুমি যোগাড় করলে কোথায় ?'

শঙ্কর গায়ের ছেঁড়া শার্টটা খুলে ফেলে সেইটা ঘুরিয়েই বাতাস খেতে খেতে বলে 'যোগাড় করতে হয় না গো, যোগাড় করতে হয় না।...ও ব্যাটা সকলের ঘরেই মজুত থাকে, দরকার বুঝলেই উঁকি মারে।'

'নাঃ তুমি আজ দেখছি আমাকেই পাগল করে ছাড়বে।...যাক্ আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না, এখন নাইবে টাইবে ?...বিকেলের কলের জলটাও তো

এসে গেছে।'

'হ্যাঁ নাইব! নাওয়াটা দরকার মনে হচ্ছে বটে।...সমস্ত শরীরটা কেমন অশুচি লাগছে সুধা। ওই তো পয়সা পেয়েছ, পাশের ঘরের নিমাইটাকে দিয়ে খোকার জন্যে দুধ আর তোমার জন্যে কিছু খাবার আনিয়ে নিতে পারবে?'

'আর তোমার জন্যে?'

'আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে নয়। আজকের দিনটা থাক।...কিছু মন খারাপ করো না সুধা সত্যিই আজ আর আমার খিদে নেই। স্নান করে এসে একটু শোবো। যা বললাম করো গে—'

সুধা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'আগে ঠিক করে বলো এ পয়সা কোথায় পেলে? ভিক্ষে করলে, না চুরি করলে?'

শঙ্কর ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে গম্ভীরভাবে বলে, 'চুরি করবো বললেই কি চট্ করে চুরি করা যায় সুধা? ওর জন্যে ট্রেনিংয়ের দরকার। ভিক্ষে করাও সহজ নয়, জিভের দরজায় কে যেন চাবি আটকে দেয়।... পাগলের অভিনয় করে দু' পাঁচজনকে একটু তামাসা দেখিয়ে কিছু মজুরি নিয়ে এলাম। ...এখনো তোমার চোখের অবাক্ অবাক্ চাউনি ঘুচলো না? কেন বলো তো সুধা, দিন দিন এতো বোকা হয়ে যাচ্ছ?...ও কি কাঁদছো মানে?... কাঁদবার কি হলো?'

'শেষ পর্যন্ত তুমি পাগল সেজে ভিক্ষে করে আনলে?... একটা কাজকর্ম কিছুতেই জোটাতে পারলে না?'

কান্নায় ভেঙে পড়ে সুধা।

শঙ্কর কিন্তু ওকে থামাবার কোনো চেষ্টা করে না, কিছুক্ষণ কেমন হিংস্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে ওকে একটা নাড়া দিয়ে বলে ওঠে 'কাজকর্ম জোটে কিনা, সে খবর বুঝি এই সাত বছরেও টের পাওনি?... কাঁদতে হবে না শখ করে! ওঠো শিগ্‌গির!...যাও—নিমাইকে দিয়ে ভালো কিছু খাবার আনাও আর চা। দু'জনেই খাবো। কেন খাবো না? স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করলে দোষ হয় না?...তা'ছাড়া—অন্যায় কি করেছি আমি? বেশ করব খাবো! খাবার খাব, চা খাব, সিগারেট খাব।'

আশ্চর্যের কথা, খোকাকে দুধ আর বিস্কুট খাইয়ে পাশের ঘরের নিতাইয়ের কাছে খেলতে দিয়ে, নিজেদের খাদ্যগুলো বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই উদরসাৎ করে এরা।...এবং আরো আশ্চর্যের কথা, খাওয়ার পরে ভাঙা তক্তাপোশে গা এলিয়ে দিব্যি জমিয়ে সুধার কাছে গল্প করে শঙ্কর, তার অভিনয় কৌশলের কথা। ...আর সুধা সেই 'বন্দিনী রাজকন্যা' এবং 'দু'টি ফুল্ল কুসুমের' গল্প শুনে হেসে কুটি কুটি হয়।

'অসাধ্য' বলে কোনো কথা কি সত্যিই আছে সংসারে?

চুরির নেশা আর ভিক্ষের নেশা বোধকরি মদের নেশার চাইতে কিছু কম

জোরালো নয়।

পরদিনই আবার রীতিমত মেক্ আপ্ করে বেরোতে দেখা যায় শঙ্করকে। চুলগুলো ইচ্ছে করে খানিক উস্কো করে, শার্টের পিঠের ছেঁড়াগুলো আঙুল ঢুকিয়ে আরো খানিক লম্বা করে, বেশীর ভাগ গলায় কোঁচানো উড়ুনি ঝোলানোর ভঙ্গীতে খানিকটা আধময়লা ন্যাকড়া পাক দিয়ে, ঝুলিয়ে নেয়।··· সুধাকে ডেকে ডেকে বলে, 'দেখো তো—বেশ 'পাগল পাগল' দেখাচ্ছে কিনা?' তারপর শিয়ালদায় গিয়ে একখানা ট্রেনের থার্ড ক্লাশ কামরায় উঠে পড়ে।

অতঃপর একটি মনের মতো লোক বেছে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে চুপি চুপি বলতে শুরু করে, 'পেপার পড়েন তো দাদা? প্রতাপগড়ের রাজবাড়ির খবর রাখেন—?'

* * *

শেয়ালদায়, হাওড়ায়···বাসে ট্রামে পথে।

* * *

দমদমে, দক্ষিণেশ্বরে, শহরতলীর আশে পাশে।···রোজ নতুন জায়গা খুঁজে বার করতে হয়, খুঁজে বার করতে হয় নতুন নতুন কথার মারপ্যাঁচ্। লোকটা যে শিক্ষিত পাগল সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না কারো। আর লোকের কাছে পথের পাগলের চাইতে যে শিক্ষিত পাগলের আকর্ষণ বেশী সেটা বোধ করি না বললেও চলবে।

লোক বুঝে বুঝে নতুন নতুন কায়দা মাথায় খেলাতে থাকে শঙ্কর! মহিলাদের কাছে একরকম, কমবয়সীদের কাছে আর একরকম। উপার্জন নেহাত মন্দ হয় না।

দুঃখ এই—সারাদিনটাই প্রায় বাইরে বাইরে কাটে।

ভাঙা তক্তাপোশে শুয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবির স্বপ্ন দেখবার সময় পায় না।···রাত্রে যখনই পড়ে, তখুনি মড়ার মতো ঘুমোয়! প্রথম প্রথম লোক-ঠকানোর ভঙ্গিমাটা নকল করে সুধাকে দেখিয়ে মজা করত, ক্রমশ পুরনো হয়ে গেছে সেটা।···বলতেও গা আসে না, সুধাও কান দিয়ে শোনে না।

শুধু বেরোবার সময় সুধার সার্টিফিকেটটি চাই।···ঘুরে ফিরে বলবে, 'আর্শি তো নেই—তুমিই আমার আর্শি'।···দেখো তো—বেশ 'পাগল' 'পাগল' দেখাচ্ছে কিনা?'

এক একদিন সুধা বলে, 'দাড়ি আর কখনো কামাবে না তা বলে? আগে কি বলতে মনে আছে? বলতে না—পয়সা হলেই প্রথমে একটা ভালো শেভিং সেট্ কিনবে আর একটা বড়ো আর্শি? কি বিশ্রী দেখাচ্ছে বলো দিকি?'

শঙ্কর গালে হাত বুলিয়ে বলে, 'খুব খারাপ দেখতে লাগছে, না? আর পছন্দ হয় না কেমন?'

'আহা কি কথার ছিরিই হয়েছে তোমার আজকাল! বলছি কি—ওসব ইল্লুতেবিত্তি ছাড়ো না এবার? দাড়ি কামিয়ে, ফরসা কাপড়চোপড় পরে, চাকরি-বাকরি খোঁজো না আবার।'

শঙ্কর গম্ভীর হয়ে যায় হঠাৎ। বলে, 'ফরসা জামাকাপড়ের ওপর বড্ডো মন

পড়েছে আজকাল, কেমন? হুঁ বুঝেছি। নিজেরও তাই আজকাল সাজগোজের ঘটা দেখছি।···ব্যাপার তো ভালো নয় সুধারানী!'

সুধা বলে, 'সাজগোজ আবার দেখলে কোথায়? ওই পয়সা থেকেই বাঁচিয়ে একখানা শাড়ী কিনেছি, আর তিন আনা দিয়ে একটা মোটা চিরুনি—এতেই সাজ দেখলে?···বেশ, কাল থেকে আবার ছেঁড়া ন্যাকড়া পরেই থাকবো—।'

ভাবলে অভিমান দেখালে বোধ করি অপ্রতিভ হয়ে যাবে শঙ্কর। কিন্তু কই? অপ্রস্তুতির চিহ্নও নেই তার মুখে। কি হয়েছে তার কে জানে। শঙ্কর নিজেও বুঝতে পারে না, তার কি হয়েছে। বুঝতে পারে না—যে-সুধাকে কিছু দিতে পারতো না বলে শুধু মমতা দিয়েই ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছে হতো, সেই সুধাকেই কেবল যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছে হয় কেন?

নিজেই বুঝতে পারল না, কী করে তার কণ্ঠে অমন কর্কশ সুর ফুটলো। কী করে বললো 'থাকবেই তো! আলবাত থাকবে। না তো কি আমি হতভাগা চব্বিশ ঘণ্টা ন্যাকড়া পরে পথে বেড়াবো, আর তুমি রাজকন্যা সেজে ঘরে বসে পাড়ার লোকের সঙ্গে আড্ডা দেবে?'

'পাড়ার লোকের সঙ্গে আড্ডা দিই?'

হতবুদ্ধি সুধার মুখে আর কথা যোগায় না।

'দাওই তো, একশো বার দাও। আচ্ছা আমিও দেখে নিচ্ছি—।' বলে গমগম করে বেরিয়ে যায় শঙ্কর, আর হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুধা।···

প্রায়ই আজকাল এই ধরনের পালা চলে।—

এতোকাল পরে কি সুধাকে সন্দেহ!

এমনি বসে আছে একদিন, হঠাৎ নিতাই এসে বলে, 'সুধা কাকীমা, একজন ভদ্দরলোক আপনাকে খুঁজছেন।'

ধড়াস করে ওঠে বুকটা! কাঁপা গলায় সুধা বলে, 'আমায় খুঁজতে যাবে কেন, যাঃ!'

'হ্যাঁ আপনাকেই তো। বাইরে আসুন একবারটি!'

কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে। বাইরে এসে দাঁড়িয়েই চমকে ওঠে সুধা। ···জামাইবাবু!

'হ্যাঁ সুধা, আমি! অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা যোগাড় করেছি।···উঃ কম ভুগিয়েছ আমাকে।'

সুধা মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলে, 'হঠাৎ মরামানুষের ঠিকানা যোগাড় করবার কষ্ট স্বীকার করতে ইচ্ছে হলো কেন জামাইবাবু?'

'তোমাদের ওসব কাব্যি কথাবার্তা আমি বুঝি না ভাই।···মোটকথা তোমার দিদির প্রেরিত দূত হিসেবে এসেছি, দু'টি সংবাদ দিতে।···কান্নাকাটি কোরো না,—একটি সংবাদ হচ্ছে, তোমার বাবা মারা গেছেন—'

'অ্যাঁ! মারা গেছেন!'

সুধা চালার খুঁটিটা শক্ত করে চেপে ধরে।

'হ্যাঁ মারা গেছেন! খুব একটা অস্বাভাবিক খবর নয়, বয়েস হয়েছিলো, ভুগছিলেন অনেকদিন থেকে…এই কেঁদো না খবরদার—তা'হলে কিন্তু পালাব। …শোনো, দ্বিতীয় খবরটা ভালো।…মারা যাবার আগে বোধহয় কিছু সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল ভদ্রলোকের, তাই—তোমাকে নাকি ক্ষমা করে গেছেন এবং মোটা কিছু টাকাও রেখে গেছেন তোমার নামে।…অবশ্য একটা শর্তে—শঙ্করের সঙ্গেই যদি বিয়ে-টিয়ে করে ভদ্রভাবে ঘর করে থাকো এতোদিন এবং—'

'বিয়ে আমাদের হয়নি—'

যেন প্রেতের কণ্ঠ থেকে কথা বেরোয়।

জামাইবাবু ব্যস্তভাবে বলেন, 'আচ্ছা সে না হয় যা হয় একটা ব্যবস্থা করে নিলেই হবে। আমরা উকিল মানুষ পুকুর চুরি করতে পারি, গোটাকতক বছর চুরি করব—সে এমন কিছু নয়।…কথা হচ্ছে—সে হতভাগা আছে তো টিকে? ফেলেটেলে পালায়নি তো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে সুধা।

'তবে আর কি! সব ঠিকই আছে। মোট কথা তোমার দিদির ইচ্ছে আজই তোমাকে গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে যাই। শুধু তোমার বাবার ভয়েই তো এতোদিন কেউ সাহস করে খোঁজ খবর করতে পারিনি ভাই। যাক সেকথা, তিনিই যখন করে গেছেন, তখন আর ভয় কিসের? তোমার মা তো তোমার আশায় হাঁ করে রয়েছেন।…কবে যাচ্ছ বলো?'

সুধা মাথা নেড়ে বলে, 'আমি যাবো না।'

'যাবে না? তার মানে? আর এখন যেতে বাধা কি?'

'বাধা কি কেবল বাইরেই থাকে জামাইবাবু?'

'এই হ'লো আবার কাব্যি শুরু। আরে বাবা, না হয় ভেতর থেকেই প্রবল বাধা চাড়া দিয়ে উঠছে তোমার, তা সেটাকে মনের জোরে দমন করে ফেলো! …এই নরক থেকে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি গিয়ে তখন মান-অভিমান সব কোরো।'—

'এ মুখ আমি মাকে দিদিকে দেখাতে পারবো না জামাইবাবু!'

'এই দেখো পেটেণ্ট মেয়েলিপনা। এই তো আমাকে মুখ দেখালে, কি হলো? আকাশ থেকে বজ্রপাত হলো?'

'আমার খোকাকে আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন জামাইবাবু?'

জামাইবাবু বোধ করি ঈষৎ থতমত খেয়ে যান। বলেন, 'খোকা? ওঃ। তা বেশ তো! দূর থেকে খোঁজ খবর অবশ্য তোমার কখনো কখনো রেখেছি আমি, তবে—এ খবরটা জানতাম না। বিদেশে থাকি, কতোই আর হয়ে ওঠে! ভেবেছিলাম—বুদ্ধি করে আইনসঙ্গত কিছু একটা করে রেখেছো। যাক গে, আমরা ধরে নিয়েছি বিয়েই হয়েছে তোমাদের।…কাজেই ওর জন্যে আটকাবে না। তোমার বাবা একদিন নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তুমি নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে যাচ্ছো…কি মতি হলো,—সকালবেলাই উঠে বললেন—'উইল' করবো,—আর।…খোঁজো তাকে।—সেই থেকে তোড়জোড় করে খোঁজ চলছে। তবে দুঃখের বিষয় দেখাটা হলো না। বলে গেছেন, তা'কে বলো আশীর্বাদ করে

গেলাম—।'

হঠাৎ দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে সুধা। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

জামাইবাবু অবশ্য এ সবের জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। বলেন, 'আচ্ছা, তুমি একটু সামলাও। আমি আবার আসছি। কখন এলে শঙ্করের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে?'

'তার সঙ্গে আর দেখা করতে হবে না জামাইবাবু, সে আর দেখা করার যোগ্য নেই।'

'কেন? নেশা ভাঙ ধরেছে বুঝি হতভাগা?'

বেশ সহজভাবেই উচ্চারণ করেন ভদ্রলোক। জগতের হাটের হাড়হদ্দ জানতে বাকী নেই এঁদের! কোন্ জীবনের কী পরিণাম, বোঝেন।

সুধা কিন্তু মাথা নাড়ে।

জামাইবাবু আরো স্বচ্ছন্দে বলেন, 'তা'হলে? কারে পড়ে—ফেরিওয়ালা-গিরিটিরি ধরেছে বুঝি? না-কি দাঁতের মাজনের ক্যানভাসিং?'

'সে আমি বলতে পারবো না জামাইবাবু।'

জামাইবাবু সহাস্যে বলেন, 'কি মুশকিল! বলতে না পারবার কি আছে? লোকের পকেট মেরে বেড়াচ্ছে শুনলেও আশ্চয্যি হবো না রে দিদি, যে বিদ্যের যে ফল!...যাই হোক—মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হওয়াটা তো দরকার! আসবো কখন? কখন বাড়ি থাকে সে?'

সুধা মুখ তুলে কি বলতে গিয়েই 'কাঠ' হয়ে যায়।

শঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছে জামাইবাবুর পিছনে।

এসে দাঁড়িয়ে—

আগাছার জঙ্গলের মতো একমুখ দাড়ির মধ্যে থেকে বিটকেল একটা মিটমিটি হাসি হাসছে।

জামাইবাবু বোধকরি সুধার মুখ দেখেই পিছন দিকে তাকান। তাকিয়ে থতমত খেয়ে অস্ফুট স্বরে বলেন, 'এ আবার কে রে বাবা? কি হতচ্ছাড়া জায়গায় থাকিস, ছিঃ ছিঃ!...যাওঃ যাওঃ তুমি কোনদিকে যাবে হে বাপু, চলে যাও।'

কাঠ হয়েই তাকিয়ে থাকে সুধা।

প্রকাশ করতে পারে না শঙ্করের পরিচয়!

জামাইবাবুর কাছে কী অদ্ভুত বীভৎস লাগছে ওকে। ভান করতে করতে চোখের চাউনিটাও শঙ্কর অমন উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল কি করে?...জামাইবাবু যদি চিনতে না পারেন, অবাক্ হবার কিছু নেই।...আর সত্যি কতোই বা দেখেছেন শঙ্করকে?...শ্বশুরবাড়ির পাড়ার ছেলে, এই তো!

ঈশ্বর জানেন কি ভাগ্যে শঙ্করও কিছু বলে ফেলে না। বিড়বিড় করে কি বকতে বকতে উঠোন দিয়ে নেমে চলে যায়।

সুধা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ভাবে আজ যেমন করে হোক ওকে অন্ততঃ দাড়ি কামিয়ে সভ্য হ'তে বলবে। যাতে জামাইবাবু কাল এসে ধরতে না পারেন।

সত্যি কি নীচেই নেমে গেছে তারা!...এতোদিন যেন এ অধঃপতনটা চোখে পড়েনি। উচ্চস্তরের সংস্পর্শে আসতেই সহসা খেয়াল হলো!

জামাইবাবু বলেন, 'দিব্যি জায়গাটিতে এনে তুলেছে বটে! এইসব রাস্কেলদের যে কী শাস্তি হওয়া উচিত! ক্ষমতা নেই এক ছটাক, প্রেম করবার শখ ষোলো আনা।...থাকগে, তোর আবার হয়তো রাগ হবে ভাই।...কিন্তু বলছিলাম কি, এখনই কেন তুই ছেলে নিয়ে চল না আমার সঙ্গে?...দু' লাইন চিঠি লিখে রেখে যাবি?'

'তাই কখনো হয় জামাইবাবু?'

'হয় না, না? তা বটে! ওটা একটু অন্যায় প্রস্তাব হচ্ছে, না? কি জানিস ভাই, এই বিশ্রী অবস্থাটা দেখে মাথার ঠিক রাখতে পারছি না! অবশ্য তোর যা হাল হয়েছে, তা'তে এর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।...এই যে এক্ষুণি গেলো—পাগলের মতো ও লোকটা কে?'

'এই বাড়িরই ভাড়াটে!'

'উঃ! কী সাংঘাতিক! যাক্ রাত্তিরে তো একবার ফিরবেই শঙ্কর? বলে রেখো সব কথা। কাল সক্কালেই আমি আসবো।'

'ও কি রাজী হবে জামাইবাবু?'

'হবে না মানে? কেউ তো তা'কে দয়া করছে না। তোমার বাপের উইলের টাকা তুমি পাবে, জোরের ওপর থাকবে।—মান খাটো হবার কিছু তো নেই? তাছাড়া—আই. এ. পর্যন্ত পড়েও ছিলো তো ছোকরা? দেবো অখন কোথাও ঢুকিয়ে। জানাশোনা ফার্ম আছে দু'একটা। মনে রেখো, কাল এসে আর ফেরা নয়। একেবারে চাটিবাটি তুলে—বুঝলে? সে ছোলরার সঙ্গে দেখা হলো না যে! হলে আজই আমি কাজ সেরে ফেলতাম! আসল কথাটা খুলেই বলি, যার জন্যে আরো এতো তাড়াহুড়ে! এই সামনের বুধবারেই শ্রাদ্ধ, তোমার মার আর দিদির ইচ্ছে এই গোলমালের ছুতোর তোমাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা! আসলে ব্যাপারটা যে দোষের কিছুই নয়, তোমার বাবার জেদের ফলেই যে এতোটা দূর গড়িয়েছে এইটেই প্রতিপন্ন করে ছাড়বেন এই আর কি। অবিশ্যি ব্যাপারটা তো তাই বটেই! বুড়ো ভদ্রলোককে ঢের জপিয়েছি আমরা খোঁজ-তল্লাস করে একটা মিটমাট করে নিতে। ও বাবা, তখন একেবারে মিলিটারী! স্বপ্নটা দেখলেন, দেখলেন একেবারে মরণকালে। যাক, যতোদিন গ্রহদোষ থাকে ভুগতেই হয়। তাহলে চল্লাম? ওই কথা থাকল।'

চলে গেলেন ভদ্রলোক।

বসবার কথা ওঠেই না। এখানে ওঁকে বসতে বলবার কথা কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু উনি যা বলে গেলেন, তাই কি কল্পনার আয়ত্তে নেওয়া যায়? সত্যিই এসেছিলেন উনি, না ও একটা স্বপ্ন? স্বপ্ন কি এতো যথাযথ হয়? স্বপ্নের মানুষ এমন নিখুঁত নিটোল পরিষ্কার কথা কয়? কিন্তু পরিষ্কার আর থাকছে কই? সব যে কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে! সুধা আবার বাড়ি ফিরতে পাবে?

মার সঙ্গে দিদির সঙ্গে দেখা হবে? লোকে সহজভাবে কথা কইবে তার সঙ্গে? কি কথা ওসব? স্বপ্নের মানুষ ছাড়া এমন অদ্ভুত কথা কেউ বলে যায়?

নাকি দীর্ঘ সময় ধরে একটানা একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল সুধা, যাকে সাত সাতটি বছর বলে ভুল করেছে? শেষ হয়ে গেছে রাত, মিলিয়ে যাচ্ছে দুঃস্বপ্ন! ···সকালের আলোয় জেগে উঠবে সত্যিকার সুধা?

কি আশ্চর্য! জামাইবাবুকে তো কোনো প্রশ্নই করল না সুধা?···'মা কেমন আছেন'—এটুকু পর্যন্ত নয়।···বাবা, বাবা, কতো স্নেহ তোমার মনের মধ্যে ছিলো, তাই তুমি শেষ সময় হতভাগী সুধাকেই স্বপ্ন দেখলে? ঠিকই দেখেছো অথই জলে পড়ে ডুবে যাচ্ছে সুধা। উঃ কী খাঁটি স্বপ্ন!

কিন্তু সুধা কি সত্যিই যেতে পারবে? মুখ দেখাতে পারবে সকলের কাছে? ···সেই গেটটার সামনে গাড়ি থেকে নামবে? ঢুকে যাবে বাড়ির মধ্যে গাড়ি-বারান্দার তলা দিয়ে? ঘুরে বেড়াবে সেই ঘরে, সেই দালানে? সেই সিঁড়িটা দিয়ে তরতর করে উঠে যাবে একতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে তেতলায়?

কে জানে শঙ্করের মা এখনো বেঁচে আছেন কি না? ওপাশের সেই বাড়িতেই আছেন নাকি?

চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে সুধা, ক্রমশই নানা কথা মনে এসে যাচ্ছে।··· মনে পড়ছে না কোথায় বসে আছে সে! মনে পড়েছে না—নিতান্ত অসময়ে এসে পড়েছে শঙ্কর। এখুনি কেন ফিরে এলো সেটা খোঁজ নেওয়া দরকার! ও ভাবতে থাকে এতো বড়ো গ্রহবৈগুণ্যও তাহ'লে কাটে?

বর্ষার পরে দেখা দেয় শরৎ? রাত্রির পর সকাল? মৃত্যুর পর জীবন?

'সুধা কাকীমা, শিগ্‌গির দেখো এসে, কী কাণ্ড করছে শঙ্কর কাকা।'

নিতাইয়ের তীব্র চীৎকারে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় সুধা, মনে পড়ে শঙ্কর এসেছিল। কিন্তু কাণ্ড আবার কি করলো সে?

পড়ি তো মরি করে ছুটে যায় ঘরের দিকে।

কাণ্ডই বটে, নিতাই ছেলেটা না দেখলে যে কী হতো শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর জানেন।···এক ঝট্‌কায় শঙ্করের গলায় মোচড় দিয়ে দিয়ে পাকখাওয়ানো উড়ুনীর ন্যাকড়াখানা খুলে নিয়ে সুধা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'কি, হচ্ছে কি?'

হাঁফাচ্ছে শঙ্করও। শীর্ণ বুকটা হাপরের মতো উঠছে নামছে, চোখ দুটো যেন ডেলা পাকিয়ে গেছে।

সুধা প্রায় ওর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, 'হচ্ছিল কি?'

ক্রমশ ধাতস্থ হয়ে উঠছে শঙ্কর, বলে, 'মনের খেদে গলায় দড়ি দিচ্ছিলাম সুধারানী।'

'কেন? কেন এতোদিন পরে আজ তুমি এই সর্বনাশ করতে বসছ?'

'আরো আগেই দেওয়া উচিত ছিল, তাই না? এতোদিন অপেক্ষা করাটা ঠিক হয়নি, কেমন? নতুন ভাবের লোককে আর লুকিয়ে রাখতে পাচ্ছো না, বাড়িতেই ডাকতে শুরু করেছ—'

'কি বলছ পাগলের মতন ? ডাকলাম আবার কা'কে ? কে এসেছিল জানো ?'

'জানি বৈ কি', প্রবল হাসি হেসে ওঠে শঙ্কর, 'এসেছিল তোমার ফরসা ধুতি-পাঞ্জাবি ! যার সঙ্গে পালিয়ে যাবার ঠিকঠাক চলছিল, আমি এসে পড়তেই বেঠিক হয়ে গেল ।'

ক্রুদ্ধ সুধা বলে, 'আমাকে তাই ভাবো বুঝি তুমি ?'

শঙ্কর অম্লান বদনে বলে, 'যা সত্যি তাই ভাবি সুধারানী, খারাপ মেয়েরা ওই রকমই করে থাকে ।—এক জায়গায় বেশী দিন টিকে থাকে না ।'

সমস্ত রক্ত মাথায় চড়তে থাকে সুধার, রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'আমি খারাপ মেয়ে ?'

'আবার কি ? যে মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে না করা বরের সঙ্গে ঘর করতে পারে, তা'কে কি বলবে লোকে ? সীতা ? সাবিত্রী ?···ও আবার কি, মূর্ছা যাচ্ছো নাকি ?···এই সেরেছে ! কি মুশকিল, ঠাট্টা বোঝো না ? একটু কড়ারকমের তামাসা করছিলাম !···এই সুধা, সুধা ! শোন আমি ঠাট্টা করছিলাম !···উঃ ভারি ভীতু তো তুমি ?'

হঠাৎ ভারী শান্ত আর স্তিমিত দেখায় শঙ্করকে ।—

একখানা ভাঙা পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকে সুধাকে ম্লান মুখে বসে বসে ।—

অনেক রাত্রে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে সুধা !

শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ চলে···পরদিন কিভাবে জামাইবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হবে···বেশ আত্মসম্মান বজায় রেখে কথা বলতে হবে, অবশ্য । নেহাত যেন হ্যাংলা না ভাবেন তাদের ।···

সত্যি মান খুইয়ে কোনোদিন তো ওঁদের কাছে সাহায্য চাইতে যায়নি তারা ?···তারপর আরো নানা কথা ! সুধার মন যেন ময়ূরের মতো পেখম মেলে উঠেছে ।

'সক্কাল বেলা উঠেই কিন্তু তুমি প্রথম কি করবে মনে আছে তো ?'

শঙ্কর মৃদু হেসে বলে, 'আছে ।'

'হ্যাঁ নিশ্চয় !···জামাইবাবুর সামনে তখন এমন লজ্জা করল আমার । সক্কাল বেলা উঠে দাড়ি কামাবে, ওরই মধ্যে একটা একটু ফরসা আর কম ছেঁড়া জামা কাপড় রাখলাম দড়িতে, সেইটা পরে নেবে বুঝলে ?···আর খোকনের জন্যে একটা জামা কিনে আনবে । মনে থাকবে ?'

'থাকবে গো থাকবে ?···ফরসা কাপড়টা পরাই চাই কি বলো ? নইলে তোমার মনে ধরবে না কেমন ?'

'হ্যাঁ ! আর দাড়ি কামানো !···আঃ, কবে যে তুমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাবু সেজে আফিস যাবে, আর আমি তোমার ফেরার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব !···ভেবে যেন আর ধৈর্য ধরছে না···কখন যে রাত কাটবে, কখন সকাল হবে হ্যাঁ গো ।'

রাত্রি কাটে ! রাত্রির পরে আসে সকাল ! মৃত্যুর পর জীবন ?

কিন্তু তারও পর ?

বুক ভর্তি আনন্দ নিয়ে ঘুম ভাঙে সুধার।

উঠে দেখলে শঙ্কর কাছে নেই, কখন উঠে গেছে।

ওঃ কথা রাখা হয়েছে তাহলে ? ভোরবেলাই উঠেছেন বাবু ? সত্যি ইদানীং কি রকম যে হয়ে যাচ্ছিল মানুষটা ! যেন সুধার নাগালের বাইরে কোথায় চলে যাচ্ছিল !···অনেক দিন পরে কাল রাত্রে আবার যেন কাছে পাওয়া গেল।···হঠাৎ সুধাকে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ধাতস্থ হয়ে গেল আর কি ! ···তা অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মন্দ হয়নি ! একরকম শাপে বর।

যাক বাবা, আজ আর ওকে সকালবেলাই উঠে পাগলের সাজ সাজতে বসতে হবে না ? আজ সুধা ওর আস্ত মুখটা দেখতে পাবে। দারিদ্র্যের জ্বালায় কী হতচ্ছাড়া ব্যবসাই বেছে নিতে হয়েছিল বেচারাকে। জগতে ভিক্ষে করবার এতো রকম উপায় থাকতে এমন অদ্ভুত উপায়টাই বা মাথায় এল কি করে এই আশ্চয্যি ! মনকে চোখ ঠেরে যতোই চমকপ্রদ নাম আবিষ্কার করুক শঙ্কর, 'ভিক্ষে' ছাড়া আর কি ?

সত্যি করবেই বা কি !

জগতের সমস্ত কাজ-কর্মের দরজা যেন শঙ্করের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুস্থ চেহারা নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ালে, পথে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যেত না ?

যাক, এতদিনে বেচারার সব জ্বালার অবসান হতে চলেছে। জগতের দরজা খুলে গেছে ওর সামনে।

তা' খুব ভুলও ভাবেনি সুধা।

এক হিসেবে সকল জ্বালার অবসান বৈকি !

জেগে উঠে চৌকি থেকে নামতে গিয়েই শিউরে পা তুলে নিতে হলো, সুধাকে।

চৌকির তলা থেকে গুঁড়ি মেরে শঙ্কর আসছে বেরিয়ে।

ভোরবেলা উঠে চৌকির তলায় ওর কি কাজ পড়লো ?

নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে দেখে সুধা আর্তনাদ করে ওঠে না, আছড়ে পড়ে না ! হয়তো সেগুলো করবার মতো ক্ষমতাও খুঁজে পায় না বলেই পারে না। ···চেয়েই থাকে।

আর সুধার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই শঙ্কর ফিক করে হেসে নিয়ে বলে, 'কোন্ কাপড়টা পরি গো ? ফরসা কাপড় খুঁজে পাচ্ছি না যে !···লজ্জায় চৌকির তলায় লুকিয়ে বসে আছি !'

এ হাসি চিনতে ভুল হয় না।

ভান করবার দায় ফুরিয়েছে শঙ্করের···আর এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেছে ওর সামনে ! সেখানে কাজের আকাল হবে না !

[১৩৬২]

"—সচিবঃ"

রাতের অন্ধকারের মেয়াদ সবটা শেষ হয়নি, বাইরের দরজায় সজোরে কড়া নড়ে উঠলো। এতো ভোরে ঝি আসে না, অসময়ে আচমকা কে এ-রকম অভব্যের মতো ?

বিরক্ত চিত্তে ঘুমচোখে এসে দোর খুলে দিয়েই 'থ' হয়ে গেলো বিভূতি। বন্ধুর ভাগ্নে ডাকতে এসেছে, শ্মশানে যেতে হবে। সুখেন্দুর দাদা হঠাৎ হার্টফেল করেছেন রাত্রে।

বিভূতির মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। কাল রাত্তির দশটা পর্যন্ত সুখেন্দুর বাড়ি বসে তাস খেলে এসেছে সে, তখন দেখেছে দাদাকে, পরিপাটি কোঁচানো ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে কোথা থেকে যেন নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরলেন। রাত বারোটায় সে মানুষ ফরসা ?

একমিনিট দাঁড়াতে বলে ছেলেটাকে, চোখে মুখে জল দিয়ে আর চায়ের বদলে ঠাণ্ডা জল এক গ্লাস খেয়ে স্ত্রীকে খবরটা জানিয়ে বেরিয়ে পড়লো বিভূতি। সুখেন্দু ওর প্রাণের বন্ধু।

যেতে যেতে বকবক করছে নিতাই—"নেমন্তন্ন খেয়ে তো আর আজকাল পেট ভরে না মানুষের। বাড়ি এসে বললেন—দু'খানা রুটি দিতে। খেলেনও দিব্য—খান দুত্তিন রুটি—পটল ভাজা—একবাটি দুধ। তখন কিছু না।···শুয়ে পড়ে তারপর বুঝি জল চেয়েছেন বড়োমামীর কাছে, কাচের গেলাসে করে জল দিলেন বড়োমামী। জল খেতে গিয়েই শরীর কেমন করেছে—সকলকে ডাকতে বলেছেন—বাসু আধঘণ্টার মধ্যে সব ফিনিস।"

শুনতে শুনতে মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে বিভূতির। বিশ্রী লাগছে নিতাইয়ের বকবকানি। ঘুমভেঙেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসছে বলে ? না-কি জীবনের নশ্বরতার দিকটা ছোকরা বড়ো বেশী স্পষ্ট ক'রে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বলে ?

বিশ্রী লাগছে—অথচ বারণ করাও যায় না, মুখের বিরাম নেই ছোকরার। আকাট মুখ্যু বলেই বোধ হয়, নইলে এতো কথা কয় ? একটা লোক কাল ছিল—আজ নেই—এইটাই তো যথেষ্ট খবর, একমাত্র খবর ; সে লোকটা 'নেই' হয়ে যাবার আগে পটলভাজা দিয়ে রুটি খেয়েছিল—কি কাচের গেলাসে জল খেয়েছিল—এটাই কি একটা জানবার মতো তথ্য ? কাল রাত্রে বিভূতি নিজেই তো খেয়েছে রুটির সঙ্গে পটলভাজা। এই তো—এইমাত্র কাচের গেলাসে জল খেয়ে এলো ! সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাগুলো এতো ফেনিয়ে বলবার কি দরকার নিতাইয়ের ? মানুষের বুকের ছমছমানি বাড়াবার জন্যে ?

আরো একবার মনে হয় বিভূতির, ছেলেটা একেবারে মুখ্যু গেঁয়ো। নইলে এইভাবে ঘরের কথা বলে ? "—ইদানীং তো ছোটমামাতে বড়োমামাতে মোটে বনাবনি ছিল না ? ইনি যান পুবে, তো—উনি দক্ষিণে। নেহাত নাকি দিদিমা

বুড়ি এখনো বেঁচে, তাই ভেন্নহাঁড়ি হয়নি, নইলে এতোদিনে উঠোনে পাঁচিল পড়তো। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিভূতি মামা, কালকের ওই দুর্ঘটনার পর—ছোটমামা যেন একেবারে পাগল। সামলে রাখা যায় না। যতোই হোক বাবা—সহোদর ভাই, রক্তের টান যাবে কোথায়? সেই যে পড়েছিলাম—'দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ'—সেইটা বোধ হয় মনে পড়েছে ছোটমামার, তাই আপসোসের সীমা নেই।"

আঃ কী বিটকেল ডেঁপো ছেলেটা!

না আজকেই যেন ডেঁপোমিটা বড্ডো বেড়েছে?

কই এতোদিন সুখেন্দুর বাড়ি যায় আসে বিভূতি, এতো কথা কইবার সাহস তো হয় না ওর।

অবশ্য বিচারে একটু ভুল করে বিভূতি, আকস্মিক এই দুর্ঘটনাটা ওকেও তো কম বিচলিত করেনি, এটা তারই প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু বিভূতির মনে হচ্ছে—পথটাই বা ফুরোচ্ছে না কেন? তা'হলেই তো নেতাইয়ের কথা ফুরোয়। প্রায় রোজই তো সুখেন্দুর বাড়ি যায় সে তাস খেলতে—কই কোনো দিন তো মনে হয় না তার বাড়ির দূরত্বটা এত বেশী।

নিতাই ব'লে চলে—"এইতো বাবা, এইতো জীবন! মুনিঋষিরা সাধে বলে গেছে—'পদ্মপত্রে জল'! আমার কি মনে হয় জানেন বিভূতিমামা, ওই যে রবারের বেলুনগুলো—ওগুলো যেন মানুষের জীবনের মতন, এতো রংচং, এতো বাহার,—আকাশে উড়ছে—যতো ইচ্ছে ফুলছে ফাঁপছে—একটি ছিদ্দির হলো—ব্যস!"

আঃ এ হতভাগা ছেলেটা কি রাস্তার মাঝখানে এখন জীবনদর্শন আলোচনা করতে চায়? কি মুশকিলেই পড়া গেছে! বাধ্য হয়েই এবার বলতে হয় বিভূতিকে—"পা চালিয়ে চলো নিতাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

একটু সমঝে চুপ করে যায় ছোকরা।

মৃত্যুকে তো কতোবারই দেখলো বিভূতি, কিন্তু এমনভাবে কবে দেখেছে? কবে এমন গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধে?···কবে এতো স্পষ্ট করে অনুভব করেছে—জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে ব্যবধান মাত্র একটি রুদ্ধদ্বার কপাটের। যে কোনো মুহূর্তে খুলে পড়তে পারে সেই অর্গলহীন কপাটখানা।

কালকের সেই নিমন্ত্রণফেরত আদ্দির পাঞ্জাবিটাই বোধহয় আবার চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শুভেন্দুবাবুর গায়ে, পরিয়ে দেওয়া হয়েছে চুনোটকরা ধুতি, গিলে-কোঁচানো উড়ুনি।···বেজায় নাকি বাবু ছিলেন ভদ্রলোক, তাই শেষসজ্জায় এমন সমারোহ।

সুখেন্দুর মা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছেন—'ও বাবা, তুই কি মালাচন্দন পরে বর সেজে বিয়ে করতে যাচ্ছিস? তোর মুখে যে মরণের কোনো চিহ্ন নেই বাবা, লোকে কেন তবে মিছে করে এমন সব্বনেশে কথা বলছে?···ও বাবা তুই

যে হাসিমুখে ঘুমোচ্ছিস বাবা—"

একটানা সুরে বারে বারে একই কথা বলে যাচ্ছে বুড়ী, গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডের মতো।

বিভূতিও অবাক্ হয়ে দেখে—সত্যিই তো, কে বলবে মৃত্যু হয়েছে শুভেন্দুবাবুর! পরিষ্কার ধপধপে কপাল, টিকলো নাকের নীচে শৌখিন করে ছাঁটা গোঁফ, প্রশান্ত প্রসন্ন মুখ।

এতো ভাল দেখতে ছিলেন ভদ্রলোক? কই কোনোদিন তো খেয়াল করেনি বিভূতি! সুখেন্দুর মুখে ক্রমাগত দাদার বিরুদ্ধে টিটকিরি ও বিষোদ্গার শুনে শুনে বিভূতির মনেও অকারণ কেমন একটা তাচ্ছিল্য ও বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি হয়েছিল ভদ্রলোকের উপর। ভালো করে তাকিয়ে দেখেওনি কোনোদিন!

দেখতে দেখতে হঠাৎ কি যে হয়—সমস্ত শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে বিভূতির···এতো লোকজন···চীৎকার কান্না···সব ঝাপ্সা হয়ে আসে···মনে হয় পায়ের তলায় যেন কোনো কঠিন জিনিস নেই তার।···এ কার মুখ? সুখেন্দুর দাদা শুভেন্দুবাবুর?···না তো! এ মুখ যে বিভূতির দাদার।···আলাভোলা সাজ, মোটা মোটা গোঁফ আর দাড়িবহুল মুখওয়ালা ভূপতিবাবুর সঙ্গে শুভেন্দুর কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাবার কথা নয়, তবু যেন বুদ্ধিবৃত্তি সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যায় বিভূতির।···পা থেকে মাথা অবধি ক্রমাগত বিদ্যুৎ-চমকের মতো চমক লাগে!···অকারণে বারবার সেই কাল্পনিক সাদৃশ্যটাই চোখে পড়তে থাকে। সুখেন্দুর বাড়ির দালানের সঙ্গে নিজের বাড়ির দালানটার পার্থক্য ঘুচে যায়···কেন? বিভূতির দাদার মুখটাও এমনি প্রশান্ত আর প্রসন্ন বলে?

কিন্তু কবে দেখেছে সে? কতোদিন আগে?

দাদার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখছে—এ দৃশ্যটা তো কই কিছুতেই মনে পড়ছে না বিভূতির! বক্রোক্তি আর বঙ্কিম কটাক্ষ···এই দিয়েই তো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে।

ছেলেবেলায় দেখা মুখটাই কি তা'হলে বারবার এসে ছায়া ফেলছে শুভেন্দুবাবুর ফরসা ধপধপে মুখের ওপর?···জোর করে চোখটা সরিয়ে নিলে বিভূতি, অকারণ আতঙ্ককে প্রশ্রয় দেবে না সে, কিছুতেই না। তার চেয়ে সুখেন্দুকে সান্ত্বনা দেওয়া যাক।

সুখেন্দুর চেহারা দেখেও চমকাতে হলো! এক রাত্রের মধ্যে এ কী অদ্ভুত চেহারা হয়েছে সুখেন্দুর! চোখদুটো মাতালের মতো লাল টকটকে ফুলো-ফুলো, কালি-মাড়া মুখ, পাগলের মতো এলোমেলো চুল। কাল রাত্রেও তাসের আড্ডায় কে একজন বলছিল—"তোমার কেন বয়েস বাড়ছে না হে সুখেন্দু? পাকা হর্তুকি-টর্তুকি খেয়েছো—না কি—বলো তো?" আজ বুড়ো দেখাচ্ছে সুখেন্দুকে।

বিভূতি গিয়ে সুখেন্দুর কাছে বসে। ছেঁদো কথা ছাড়া এ ক্ষেত্রে আর

কোনো কথাই জোগায় না মানুষের, বিভূতিও সেই ছেঁদো কথাই বলে—"কি করবে ভাই, মানুষ তো চিরদিনের নয় ? যার যেদিন নিয়তি শেষ হবে"—

সহসা ছেলেমানুষের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সুখেন্দু, বিভূতির হাতটা সজোরে চেপে ধরে বলে—"দাদা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই বিভূতি।" আচ্ছা বিভূতিরই বা কে আছে ? দাদা ভিন্ন ?

তবু তো মা রয়েছেন সুখেন্দুর। কিন্তু শোকের সময় মার কথা ভুলে গিয়ে ওই কথাই বারবার বলতে থাকে সুখেন্দু—"মাথার ওপর থেকে আমার ছাতা গেলো বিভূতি। পর্বতের আড়াল চলে গেলো আমার! ছেলেবেলায় বাবা গেছেন—দাদা নিজে না খেয়ে আমায় খাইয়েছে, দাদা ভিন্ন আমার আর কেউ ছিল না ভাই।"

মেয়েমানুষের মতো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে সুখেন্দু, এখন আর মনে পড়ছে না—এই বিভূতির কাছেই হাজার দিন ও দাদার সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থপরতার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়ে দিয়ে নিন্দে করে এসেছে।

সে কথা বিভূতিরও এখন তেমন স্পষ্ট মনে পড়ছে না, ঘুরে ফিরে কেবলি মনে পড়ছে তারই বা আর কে আছে ? সুখেন্দুর তো তবু মা আছেন।

কিন্তু আর তো বসে বসে বিলাপ করবার সময় নেই, বহিরাগত আত্মীয়-বন্ধুরা তাগাদা দিয়ে ওঠায় সবাইকে, নির্বিকার কঠিন মুখে প্রত্যেকে আপন আপন কর্তব্য করে যায়। মনুষ্যজীবনের সব চেয়ে কঠোর, সব চেয়ে রূঢ় কুৎসিত কর্তব্য! কর্তব্যের অভিশাপ!

বড়ো আকস্মিক মারা গেলো যে শুভেন্দু, ধাতস্থ হতে সময় লাগছে, তা নয় তো হিন্দুশাস্ত্রে শবদেহ বাসী করবার আইন নেই। আর বেশী বেআইনি করা চলে না! শাস্ত্রের আইনে বাঁধা মানুষ। যে যতো সংস্কারমুক্তই হোক—আগুন না ছুঁয়ে আর নিমপাতা দাঁতে না কেটে নিজে নিজে বাড়ি ফিরুক দিকিনি কেউ ?

যথারীতি কর্তব্য সেরে ফিরতে বেলা দুটো-আড়াইটে বাজলো। ভিজে কাপড়ে ফিরতে হয়েছে। আজকের বাজারে শ্মশান-বন্ধুদের জন্যে 'ঘাটে' ধোপদস্ত ধুতির বোঝা পাঠাবার ক্ষমতা কোনো গৃহস্থেরই নেই, সে আশা কেউ করেও না। রিক্‌শা চড়ে বাড়ি ফিরলো বিভূতি। আর হাঁটবার ক্ষমতা হচ্ছিল না বলেও নয়, বর্ষার দিনে ভিজে ধুতিটা যেন কামড় দিয়ে দিয়ে মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল—জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা।

ফিরে দেখলো বাইরের ঘরে বসে দাদার ছেলে নন্তু বন্ধুদের সঙ্গে ক্যারাম খেলছে। কেন ? নন্তু বাড়ি বসে কেন ? কলেজ যায় নি ?—ওঃ আজ রবিবার, না ?

হঠাৎ যেন সুখেন্দুর দাদার একটা অদ্ভুত সদ্বিবেচনার পরিচয় পেয়ে সকাল থেকে খিঁচড়োনো মনটা একটু ভালো হয়ে গেলো বিভূতির। যাক অফিসটা কামাই হয়নি তাহলে!

বাড়ির ভেতরটা চারিদিক নিঃঝুম, আকাশটা মেঘলা, বাতাসটা জোলো—

কিছুক্ষণ আগে বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, উঠোনটা ভিজে ভিজে। —কেমন যেন নিরানন্দ ভাব।

সুখেন্দুর বাড়ির হাওয়া এ বাড়িতে এসে লেগেছে নাকি? না বিভূতির নিজের মানসিক অবস্থারই ছায়া?

একখানা শুকনো কাপড়ের জন্যে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে গিয়ে ভিজে কাপড়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বিভূতি।—এ কি?

নীচের দালানে পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন স্নেহলতা! বিভূতির বৌদি। মুখের ভাবটা কেমন যেন ক্লান্ত করুণ, হস্তচ্যুত হাতপাখাখানা সাক্ষ্য দিচ্ছে—ক্লান্তির, অবসন্নতার।

—বৌদি!

উচ্চারণ করেই নিজের কানে কেমন অদ্ভুত লাগলো বিভূতির। 'বৌদি' বলে কতোকাল ডেকে কথা কয়নি সে! তাই এমন অশ্রুতপূর্ব ঠেকলো! কই? দেওর-ভাজের মধ্যে কেউ কাউকে ডেকে কথা বলা—মনেই পড়ে না তো?

—এখানে ঘুমোচ্ছো যে?

ধড়মড় করে উঠে বসলেন স্নেহলতা। দেখলেন প্রশ্নকর্তা বিভূতি।

স্নেহলতার মুখের দিকে ভালো করে চাইলে ধরা পড়তো সে-মুখ কৃত-কৃতার্থের।

—ঠাকুরপো! এসেছো? সারা হলো সব?

—হলো। কী কাণ্ডই যে হয়ে গেলো! সে দেখলে আর—

বিভূতির কণ্ঠে এমন অন্তরঙ্গতার সুর? এখনো আছে?...কৃতার্থম্মন্যের মতোই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন স্নেহলতা—"সব শুনবো ভাই, কিন্তু তুমি কি গঙ্গা থেকে এতোটা পথ ভিজে কাপড়ে এলে? সর্বনাশ! এই বাদলার দিন!—" তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছ বরাবর উঠে ডাক দেন—"ছোট বৌ, অ ছোট বৌ, শীগ্‌গির একখানা ধুতি নিয়ে নেমে আয়—ঠাকুরপো ফিরেছে—"

অনেকদিন পর ছোট বৌকে 'তুই' বলেন স্নেহলতা।

—থাক থাক, আমিই যাই—

স্নেহলতা থামান,—"না ভাই, ও কাপড়ে ছেলেপুলের ঘরে ঢুকতে নেই।... বাণী, অ বাণী, চট করে তোর কাকার একখানা ধুতি নিয়ে আয় দিকিন?"

ব্যাপারটা বুঝে বাণী তার পক্ষে যতোটা শীগ্‌গির সম্ভব একখানা ধুতি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। উৎকণ্ঠিত স্নেহলতা মাথা ভিজে আছে কি না বিভূতির, বারবার প্রশ্ন করেন। যেমন করতেন অনেকদিন আগে—বিভূতি যখন খেলার মাঠ থেকে ভিজে কাদা মেখে বাড়ি আসতো। যখন—বিভূতি সেই কাদামাখা অবস্থাতেই হামাটানা বাণীটাকে টপ্ করে তুলে নিয়ে বলের মতোই লোফালুফি শুরু করতো!

এতোক্ষণে চোখে পড়ে বিভূতির—দালানের এক পাশে লোহার ঢাকা চাপানো কার যেন ভাত বাড়া রয়েছে।...হ্যাঁ ভাতই হবে, আসন আর জলের গ্লাসটা নিশ্চিত সাক্ষ্য দিচ্ছে কাছের গোড়ায় বসে।

—দাদা এখনো খাননি নাকি ?

বিভূতির আশ্চর্য প্রশ্নে বিগলিত স্নেহলতা তাড়াতাড়ি যে একগাড়ি কথা বলে যান তার তাৎপর্য এই—মেয়ের বিয়ের 'সম্বন্ধ' করতে বেহালা না বালী কোথায় যেন যেতে হয়েছে ভূপতিকে। সেই দশটার সময় বেরিয়েছেন, এখনো ফেরার নাম নেই।...একেই শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না ক'দিন, তার ওপর শুভেন্দুবাবুর খবরটা শুনে মনটা খুব খারাপ ছিল।...কেন যে এতো দেরি হচ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিভূতি অনুযোগ করে—শরীর ভালো ছিল না তো যেতে নিষেধ করেননি কেন স্নেহলতা! স্নেহলতা তৎক্ষণাৎ নিজের দোষ স্বীকার করেন অকপটে, তিনিই একরকম জোর করে পাঠিয়েছেন, রবিবার ছাড়া তো সময় হয় না। মেয়ের বিয়ে যে বড়ো দুর্দান্ত জিনিস!

বিভূতি দাদার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ঘোরতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। অতঃপর বিভূতির খাওয়ার কথা ওঠে। স্নেহলতা বাণীকে পাঠাতে চান খুড়ীর ঘুম ভাঙাতে—কারণ বিভূতির ভাত স্নেহলতার হাঁড়িতে নেই।

মা মারা গেছেন, তাই 'ভেন্নহাঁড়ি' হতে বাধা হয়নি।

বিভূতি কিন্তু অবেলায় ভাত খেতে চায় না, বলে—বরং একটু চা পেলে মন্দ হতো না।

—ওমা, তার আবার 'যদি'র কি আছে?...এই বাণী, শীগ্‌গির স্টোভটা ধরিয়ে জল চড়া দিকিন একটু!

বিভূতি ঈষৎ অস্বস্তি প্রকাশ করে—"থাক থাক, ওকে আর এখন কষ্ট দেওয়া কেন, যাচ্ছি আমি ওপরে—"

স্নেহলতা কান দেন না সে আপত্তিতে।—বুড়োধাড়ী মেয়ের এক পেয়ালা চা করতে আবার কষ্ট কি, শ্বশুরঘরে যেতে হবে না আজ বাদে কাল!

যেন রোজই বিভূতি 'এদিকে' চা খায়।...যেন বড়োমাছটা কিনে খবরের কাগজ জড়িয়ে একেবারে বৌয়ের রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দেয় না বিভূতি, যেন বিভূতির বৌ রান্নাঘরের দোর ভেজিয়ে কোটে না সে মাছ।

চা খেতে খেতে—বৌয়ের সঙ্গে নয়—বৌদির সঙ্গে গল্প করে বিভূতি সুখেন্দুর বাড়ির শোচনীয় অবস্থার কথা, সুখেন্দুর মার বুড়োবয়সে দুর্গতির কথা!

ওদিকে—ঘুম থেকে উঠে ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বেজে গেছে দেখে মাথা ঘুরে যায় ছোট বৌয়ের। অভুক্ত স্বামীর কথা ভেবে ধড়ফড়িয়ে ওঠে মনটা। কি করবে? চাকরটাকে পাঠাবে নাকি সুখেন্দুর বাড়ি?

নিচে নামতে গিয়ে থমকে গেলো, গলা পাওয়া যাচ্ছে না বিভূতির? বাবু এসেছেন তা'হলে? আটঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরে এতো গল্পের ধুম কার সঙ্গে? 'ও বাড়িতে'—বাক্যালাপ বলতে তো বাণী, নেহাত 'কাকা কাকা' করে গায়ে পড়ে আদর কাড়ায় বলেই। কিন্তু এইটাই কি বাণীর সঙ্গে গল্প করবার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়? মাধুরী যখন ছটফট করছে স্বামীর আসার আশায়!

কিন্তু একা বাণী কি? না তো।…এহেন দোদুল্যমান হৃদয়ে উঁকি মেরে না দেখে তো আর থাকা যায় না সত্যি? ওকে কেউ দেখতে পায় না অবিশ্যি, ও-ই দেখে।…স্নেহলতার সামনে বসে চা খাচ্ছে বিভূতি, আর বলছে—"তোমার কিন্তু একদিন সুখেন্দুর মা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত বৌদি, সেবারে অতো আলাপ হলো—"

ওঃ, তাই নাকি? বিভূতির বন্ধুর বাড়ি শোক প্রকাশের কর্তব্যপালন করতে যাওয়া বিভূতির স্ত্রীর উচিত নয়, 'উচিত' বৌদির! হঠাৎ ভালোবাসা উথলে উঠলো যে একেবারে।

নিচে না নেমে ঘরেই ফিরে যায় মাধুরী, আর যথেষ্ট বাদলা হাওয়া সত্ত্বেও পাখার নিয়ামক যন্ত্রটাকে শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়ে দুম্ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে। •

কিন্তু শুয়ে কতোক্ষণ থাকা সম্ভব?

ধৈর্যের একটা মাত্রা আছে তো? যথাসর্বস্ব চুরি যাচ্ছে—দেখে কে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে চোরের ওপর রাগ করে?

ওঃ ভাশুর ঠাকুরও এসে জমিয়ে বসেছেন? ভালো। সিঁড়ির মাঝখানেই তা'হলে স্থিত হতে হয়। যে যাই বলুক মাধুরীকে, ভাশুরের সামনে বেরিয়ে কথা বলেছে সে, বলুক দিকি কেউ?…তবে হাঁ—হাঁড়িই আলাদা, বাড়ি তো আর আলাদা নয়? গলা সামলে কে কতো থাকতে পারে? আগে আগে বড়োগিন্নী যে খুব শাসাতেন ভাশুরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিয়ে, গলাখাটো করবার উপদেশ দিতেন—একদিন এমন একটা বচন ঝেড়েছে মাধুরী, একেবারে ঢীট হয়ে গেছেন।…সত্যিই তো—বাড়িতে যদি দু' ঘর ভাড়াটে থাকতো—তাদের ওপর সমীহ দেখাতে গলাখাটো করে চলতো নাকি স্নেহলতা? …তবে? মাধুরীই বা তা করতে যাবে কেন? হাঁড়ি যখন আলাদা তখন আলাদা দু'ঘর ভাড়াটের সঙ্গে প্রভেদ কি? তবু যে ঘোমটা দেয় মাধুরী, সে মাধুরী বলেই।

ভারী ভারী গম্ভীর গলায় আওয়াজ আসছে—"পাগল হয়েছিস বিভূতি, ওখানেই চেষ্টা দেখবো কি! পাত্রটি যেমন উৎকৃষ্ট, 'খাঁই'টিও তো তেমনি অনাসৃষ্টি? বলে কিনা, তিন হাজার টাকা নগদ! আমায় কাটলে বেরোবে?"

দাদার চাইতে অনেক হাল্কা পাতলা স্বর বিভূতির—"তা' টাকা না খরচ করে আর ভালো বিয়ে কোথায় হচ্ছে? বরং পাত্রটি যদি মোটা কিছু টাকা হাতে পেয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তোমারই লাভ।"

ভারী গলার হাসিটাও ভারী—"লাভ তো বুঝলাম, কিন্তু আসে কোথা থেকে?"

—"সে যা হয় করে হয়ে যাবে অখন"—এমন ব্যস্ত শোনায় বিভূতির গলা, যেন লগ্নভ্রষ্ট হতে বসেছে বাণীর বিয়ের, তাই তাগাদা দিচ্ছে তার কাকা—"বাণী তো তোমার একার নয়! টাকার অভাবে এমন ভালো পাত্রটি হাতছাড়া হয়ে

যাবে—এটা তো সম্ভব নয়! না না, তুমি মোটেই অমন গা ঢিলে দিয়ো না দাদা, আমি বলছি টাকার জন্যে আটকাবে না।”

—“তা তোমারও তো মেয়েটি ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছে”—স্নেহলতার সকৌতুক কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—“এই তো আজ মায়ের হাঁড়িকুড়ি টানাটানি শুরু করে দিয়েছিল—তোমারও তো একটি জামাই খুঁজলে ভালো হয়। ঠাকুরপো? জমানো টাকা খয়রাত করে বসলে মেয়ের উপায়?”

—“তা ওটাকেও না হয় সেদিন পিঁলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে—এক খরচে হয়ে যাবে।”

বিভূতির ধাতেও তা'হলে—পরিহাস রহস্যের স্থান আছে? গোমড়ামুখের চাষ কেবল মাধুরীর কাছে? বটে!

আবার ভারী গলা—“কিন্তু এটাও তো ন্যায্য হয় না বিভু, সকলের সব ঘুচিয়ে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া?”

—“আচ্ছা আচ্ছা, সে আমরা বুঝবো, কি বলো বৌদি? টাকা গেলে আবার হবে—কিন্তু যা তা একটা বিয়ে হয়ে গেলে তো আর ফিরবে না—”

নাঃ, ধৈর্যের ওপর এতো অত্যাচার সহ্য করা যায় না। নিরুপায় হয়েই মাধুরী উঠে ঘরে গিয়ে তিন বছরের ঘুমন্ত মেয়েটাকে এক হ্যাঁচকায় টেনে তুলে মেজেয় বসিয়ে দিয়ে ‘কষকষ’ করে কান দুটো মলে দেয় তার। আকস্মিক এ হেন অত্যাচারে সে যা প্রতিশোধ নেবার নেয়।

ছুটে আসে বিভূতি, আসে বাণী, আসেন স্নেহলতা, শুধু ভূপতিই নিরুপায়—সেইমাত্র আসনে বসে পড়েছেন তিনি।

কিন্তু হঠাৎ মেয়েটার কি হলো? ঘুমোচ্ছিলো না?

ঘুমন্ত পড়ে গেলো খাট থেকে?···অনেকগুলো প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। প্রশ্নের উত্তরে মাধুরী মুখ বাঁকিয়ে নিরীহ ক'টি প্রশ্নই করে—চোখের মাথা কি খেয়ে বসে আছে মাধুরী, যে চোখের সামনে খাট থেকে মেয়ে পড়ে যাবে? কেন, মেয়ে কি কোনো সময়ে কাঁদে না? হঠাৎ এমন কি ভাগ্যি ফিরলো তার যে, তিন বাড়ির লোক ছুটে এসেছে দরদ দেখাতে?

‘তিন বাড়ির লোক, তিন ঠাঁই হয়।’

বাণী চলে যায় নিজের পড়ার ঘরে, স্নেহলতা স্বামীর আহারস্থলে। বিভূতি বসে থাকে—এসেই যেখানে বসে পড়েছিল।···অপরাধ-বোধের ভাবে মুখ দিয়ে আর বাক্যি সরে না তার। এতোক্ষণে খেয়াল হয়—পাগলের মতো কী আবোল-তাবোল বকে এসেছে। কে জানে—ওই নেহাত ‘কথার কথা’ টুকুর সুযোগ নিয়ে না আবার বিভূতিকে ফ্যাসাদে ফেলেন ওঁরা। বলা যায় না—ওঁরা সব পারেন। পাকা ঝানু তো!

অসময়ে ঘুম ভেঙে আর সারাদিন নানা রকম ‘রপটানি’ করে বুদ্ধিটা কেমন ঘোলাই হয়ে গিয়েছিল সত্যি। তা নয় তো ওঁদের সঙ্গে অতো মৌখিক ভদ্রতা করবারই বা দরকার কি ছিল?···

হাতের ঢিল আর মুখের কথা! ছুঁড়লে তো নিরুপায়।

এখন ভরসা মাধুরী।

বুদ্ধি খাটিয়ে বার করুক কি ভাবে গুছিয়ে কথা বলে ওঁদের মন থেকে ওই অসঙ্গত আশাটাকে দূর করা যায়। জমানো টাকাগুলো বাণীর বিয়েতে খরচ করবে? সত্যি তো আর পাগল নয় বিভূতি!

[১৩৬২]

ঊর্ণনাভ

কারণটা তো যৎসামান্য।

ব্যতিকটা অসামান্য বলেই হয়তো ঘটনার চেহারা এমন মোড় নিল। দুর্ভাগ্য-ক্রমে সে ঘটনা ঘটে গেল আমারই সামনে।

অথচ তারকদা এবং তারকবৌদির সুদীর্ঘ দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে এমন কারণ কি সত্যই আর কখনও আসে নি? তাই কি সম্ভব? হয়তো এসেছে।

সমুদ্রের বুকে তরঙ্গের মত এসেছে, গর্জেছে, লয় পেয়েছে। এ হেন ঘূর্ণিঝড় উঠল, বোধ করি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে। আর আগেই বলেছি, সেই হতভাগ্য তৃতীয় ব্যক্তি হলাম স্বয়ং আমি।

ব্যাপারটা এই—কোজাগরী রাত্রে গ্রামের বারোয়ারী তলায় বেশ একটি জমকালো রকমের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়েছিল। আর সেই আয়োজনের মধ্যে আমারও কিছু অংশ ছিল।

গ্রামে অবশ্য বাস করি না। অনেকদিন হল বাস তুলে দিয়েছি, মা বাবা যাওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। পুজোর সময় দেশে আসার আকর্ষণও কখনও অনুভব করি না।

কিন্তু এবারে আসতে হয়েছে।

পুজোর আগে গ্রামের কয়েকটি অতি উৎসাহী ছেলে খুঁজে খুঁজে আমার কলকাতার বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করে মোটা টাকা চাঁদা আদায় করে এনেছিল, এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এসেছিল—'দেশ'কে যেন একেবারে ভুলে না যাই!···আমার মত কৃতী সন্তানরাই যদি দেশকে ত্যাগ করে—ইত্যাদি ইত্যাদি!

গ্রামের বাস তুলে কলকাতায় বাসা করলেই, সে ভাগ্যবানের 'কৃতী'ত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না কারুর। নিশ্চিত স্থির করে রাখে 'লোকটা পয়সা করেছে'।

আবার সূক্ষ্ম কোন সেণ্টিমেণ্টের দায়ে একটা মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে বসলে, তার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের মোটাত্বটা আন্দাজ করতে বসে।

তখন অবশ্য—সেই, বয়সে হাল্কা কিন্তু কথায় ভারী ছেলেগুলোকে দাবড়ানি দিয়ে বলেছিলাম—আমার 'দেশ' ওই ছোট্ট গ্রামটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বাঙলাদেশই আমার দেশ—তবু ওদের অনুরোধ মনকে নাড়া দিয়েছিল।

তাই এবারে এই পুজোর ছুটিতে কলকাতার আমোদ-বৈচিত্র্যের আকর্ষণ ত্যাগ করে দেশের বাড়িতে আসা।

তা এসে দেখলাম—'বিচিত্রানুষ্ঠানের' আয়োজনে এরাও কলকাতার চাইতে

খুব বেশী পিছনে নেই। আকারে কম হলেও প্রকারে কাছাকাছি। দুর্গাপুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত একটানা 'অনুষ্ঠানে'র ত্রুটি নেই।

এলাম তো!

এসে পড়ে এক মুস্কিল।

কি গুণে যে এরা আমাকে একজন বিচক্ষণ মুরুব্বি ঠাউরেছে ভগবান জানেন। কিন্তু দেখছি—ফি-হাত পরামর্শ চাইতে আসছে। তা'হলেই—এতবড় একজন পৃষ্ঠপোষক হয়ে কিছু আর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে থাকা যায় না? 'পোষকতা'র নমুনাস্বরূপ 'কিছু একটা করে দিই' গোছের মনোবৃত্তির বশে এদের একটা আইটেম বাড়িয়ে দিলাম। কিয়ৎ পরিমাণে খ্যাত একটি যাদুকরকে কলকাতা থেকে আনিয়ে তার বিদ্যা প্রদর্শনের আয়োজন করা গেল। যেটা এখানে এখনও নতুন।

বলাবাহুল্য গাঁটের কড়ি খরচা করে করি নি। যাদুকরটি আমার এক বন্ধু। আর বিনিপয়সায় খাটিয়ে নিতে না পারলে বন্ধুত্ব কিসের?

সে যাই হোক, যাদুকর বন্ধু আর তার চেলা-চামুণ্ডার খাওয়াদাওয়ার ভার নিজের বাড়িতে রেখেছিলাম, এবং তারই তদ্বির করতে একবার বাড়ির মধ্যে এসে হঠাৎ কানে এল পিসীমার একটা খেদোক্তি।

…'আমাদের তারকের বৌয়ের কথা বলছি—আহা এত যে কাণ্ডকারখানা হচ্ছে সাত পাড়ার ঝি-বৌ ঝেঁটিয়ে আসছে, অথচ ছুঁড়ির কোনখানে পা বাড়াবার হুকুম নেই!"

শুনে প্রথমটা এত হাসি পেল!

স্নেহ এবং আক্ষেপ বশতঃ পিসীমা তারকদার বৌ সম্বন্ধে যে সভ্য বিশেষণটি প্রয়োগ করলেন, সেটি যে যোগ্য প্রয়োগ হয় নি সে কথা বলা আবশ্যক! প্রায় মধ্যবয়সী একজন মহিলা সম্বন্ধে এহেন উক্তি!

কিন্তু বাক্যার্থ শুনে চমকালাম।

ছেলেবেলায় জানতাম বটে সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত তারকদা বৌকে সহজে কোথাও যেতে টেতে দেন না। এমন কি মনে আছে—আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষান্তে পরমানন্দে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একদিন মা ডেকে নিয়ে চুপি চুপি আদেশ দিলেন—দেখ বাপু, তুই ওই তোর জ্যেঠীমার বাড়ি বেশি যাওয়া আসা করিস নে আর। বড় হয়েছিস—তারক পছন্দ করে না।

'পছন্দ না করার' মত বড় হয়েছিলাম কি না, সেটা না বুঝলেও কথাটার মানে বোঝবার মত বড় হয়েছিলাম। কাজেই—বলা বাহুল্য একটু আহতই হয়েছিলাম।

এমন কি একবার এ সন্দেহও হয়েছিল, তারকদার নামাঙ্কিত পাঞ্জায় মা হয়ত নিজের ইচ্ছাটাই ঘোষণা করছেন।

পরে ভুল ভেঙেছিল।

পাড়ায় কাদের যেন ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে তারকদার বৌয়ের

'মাথাধরা'র জন্য অনুপস্থিতি, জ্ঞাতিদের মেয়ের বিয়েতে 'পেটব্যথা'র জন্য অনুপস্থিতি, ইত্যাদি বেশ একটু আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মহিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে।

তখনই কানে আসত তারকদার 'বাতিক'।

তারপর—কত পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে পরমায়ুকে ছোট ছোট করে আনছি, কত পরিপক্ক হচ্ছি, কত অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাচ্ছি—কত নতুন নতুন অভ্যাসের সৃষ্টি করছি। কে বা কাকে মনে রেখেছে। ম্যাট্রিক-পড়া সেই ছেলেটাকেই মনে করলে চিনতে পারি না আর, মনে হয় আর কেউ।···

এখন—এতকাল পরে—যদি সে যুগের ভাষা কানে আসে, সত্যিই চমকে যেতে হয় না কি?

আমার চাইতেও বয়সে দু-চার বছরের বড় একজন ভদ্রমহিলার প্রতি যে এমন শাস্তি প্রয়োগ করা চলে, এই ভেবেই অবাক হলাম।

ডেকে বললাম—ব্যাপার কি পিসীমা? হঠাৎ কার জন্যে এত আক্ষেপ প্রকাশ?

পিসীমা বললেন—আর কার! আমাদের তারকের বৌয়ের কথা বলছি। তারক হতভাগার বাতিকের জ্বালায় কোন চুলোয় যাবার জো আছে বৌটার?··· সে বার চূড়ামণিযোগে গাঁ সুদ্ধু মেয়ে বাঁশবেড়ে গিয়ে গঙ্গাচ্ছ্যান করে এল—ও যেতে পেল না।···কত দুঃখু করল।

বিরক্ত হয়ে বললাম—দুঃখু করে বসে থাকলে তার দুঃখু ঘোচে না পিসীমা। তারকদার বাতিকটাকে অত সম্মান না দেখালেই হয়। জোর করতে হয়।

পিসীমা বোধ করি আমার এই পরিণত বয়সেও অপরিণত বুদ্ধির পরিচয়ে একটু সস্নেহ করুণার হাসি হেসে বলেন—তা আর নয়! তারক তাহলে রক্ষে রাখবে! ···এই যে—কি তোদের ম্যাজিক হচ্ছে, সকল বৌ-ঝি সংসারের কাজ 'নে থো' করে সেরে কোন কাল থেকে মাঠে গিয়ে বসে আছে, কই তারকের বৌ একটু উঁকি দিক দিকিনি? আস্ত রাখবে না।

বললাম—তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেও না?

—কে ভরসা করে নিয়ে যাবে বাবা!···কই এতদিন যে এত রমক হল, দিয়েছে আসতে? মায়ের চরণে একটু পুষ্পাঞ্জলি দিতে—নিজে সঙ্গে করে আসে, নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

বললাম—তা বেশ তো—এ সব ক্ষেত্রেও তাই করলে পারেন। বুড়ো বয়সে এখনও এমন অদ্ভুত বাতিক!

—বাতিক কি আর বুড়ো যুবো মানে রে?

শুনে আবার হাসি পেল। সত্যি, সব কিছু মেনে নেবার কি অসীম ক্ষমতা এঁদের। এঁদের অভিধানে বোধহয় 'অসহনীয়' বলে কোন শব্দ নেই।

ভাবলাম—রোস, আজ তারকদাকে জব্দ করব। যতই হোক, আমাকে

অবিশ্যই কিছু বলতে পারবেন না। তা ছাড়া যাব নেহাৎ অনভিজ্ঞের ভঙ্গীতে। দেখি কি ভাবে অনুরোধ এড়ান।

গেলামও তাই।

গিয়ে দেখি তারকদা বাড়ি নেই। বিশেষ কোন দরকারে কোথায় গেছেন বুঝি!

আমি ডাকহাঁক করতেই বৌদি বোধ করি নিতান্ত বাধ্য হয়েই বেরিয়ে এলেন। খুব সম্ভব গ্রামের ঠাকুরপোরা আমার মত দুঃসাহস প্রকাশ করে না কখনও, কাজেই এমন বিপদেরও সম্মুখীন হতে হয় না তাঁকে।

আমি দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলি—একি বৌদি, এখনও বাড়ি বসে? মাঠে যান নি?

অনেকদিন পরে আমাকে দেখে, এবং আমি বাড়ি বয়ে এসে তল্লাস করছি দেখে বোধ করি বেশ একটু খুশী হন বৌদি। তাই ফিক্ করে হেসে ফেলেন—বলেন—নাঃ মাঠে চরা অভ্যেস নেই।

—তা মাঠ আজ আর মাঠ নেই, চাঁদের হাট! চলুন চলুন, এর পরে আর জায়গা পাবেন না।

—হুঁ! চললাম! আমি নইলে আর যাবে কে? ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!

খুব অবোধের ভানে বলি—তার মানে? আপনি কি মনে করছেন এ সব ছেলে-ভুলোনো ম্যাজিক? পি. সি. সরকারের চেলা ও। পি. সি, সরকার—জানেন তো? যে সারা পৃথিবী ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছে ওর শিক্ষা। ওর ম্যাজিকও দেখবার মত—

—আরে ভাই, জীবনভোরই তো ম্যাজিক দেখছি।

হেসে ফেলে বলি—বেশ তো, একবার না হয় ম্যাজিক দেখাবারই ভূমিকা নিন না? আপনাদের বিধাতাপ্রদত্ত নামই তো যাদুকরী! তাই না? ম্যাজিসিয়ানরা লোকের পকেট থেকে ঘড়ি ওড়ায়, আঙুল থেকে আঙটি ওড়ায়, আপনি রান্নাঘরের মধ্যে থেকে তারকদার বৌটিকে উড়িয়ে ফেলুন না! তিনি এসে—স্তম্ভিত—বিস্মিত—হতচকিত—

বৌদি হেসে উঠে বলেন—বলে যাও—বলে যাও—'ক্ষিপ্ত' 'উন্মত্ত' 'প্রহারোদ্যত'···

—আর কি! হতভাগা পুরুষজাতিকে যতটা কালো তুলি দিয়ে আঁকতে পারেন! ধরুন, আপনি আমার সঙ্গে গিয়ে নারীসমাজে মিশে বসে পড়লেন, সেখানে গিয়ে তো আর উনি ডাক হাঁক করতে পারবেন না?

—হুঁ, তারপর?

—তারপর ঘরের ভাত বেশী খরচ!

—আহা রে অবোধ বালক! জগতের কিছুই জানলে না!

আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পিছন থেকে কাঁধে তারকদার হাতের

স্পর্শ পেলাম।…হ্যাঁ হ্যাঁ কাঁধেই, ঘাড়ে নয়। সে কথা ভাবলে বড্ড অবিচার করা হবে তারকদার ওপর। ভালবেসেই কাঁধে হাত দিয়েছেন। তবে আশ্চর্য, কি রকম যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসেছেন।

কি ভাগ্যি গিন্নীটিকে আমার সঙ্গে নির্জনালাপে মগ্ন দেখেও খুব বেশী বিচলিত হন নি। বোধ করি পাড়ার ঠাকুরপোদের চাইতে আমার প্রতি একটু উচ্চ ধারণার বশেই এ উদারতা।

বললেন—কতক্ষণ ?

—এই তো—! বৌদিকে ভাড়া দিয়ে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যেতে এসেছি। এখনও বাড়ি বসে! আর দেরি করলে কিন্তু জায়গা পাওয়া দায় হবে।

তারকদা একবার বৌদির দিকে কূটদৃষ্টি হেনে বলেন—যাওয়াটা কোথায় ?

—কি আশ্চর্য! বারোয়ারীতলায়, আবার কোথায়!

তারকদা এক টুকরো উচ্চাঙ্গের হাসিতে আমাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন—দূর দূর, বারোয়ারীতলায় ভদ্রলোকের মেয়েরা যায় ?

—কি সর্বনাশ! বল কি তারকদা ? পাড়ার লোকের কানে উঠলে যে, মানহানির দায়ে পুলিশে দেবে তোমাকে। কোন বিশিষ্ট ভদ্রকন্যাদেরই আর ওখানে আসতে বাকি নেই।…এলে কোন দিক দিয়ে ?

—এলাম তো ওখেন দিয়েই। হাটের হট্টগোল হচ্ছে বটে!…

—একটিও ভদ্রমহিলাকে দেখলে না ?

তারকদা উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ বৌদি হেসে উঠে বলেন—তা হয়তো দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু আমার মত সুন্দরী নিশ্চয়ই একটিও দেখেন নি! কি বল গো, দেখেছ ?

তারকদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—ওই! ওই জন্যেই তো! বিজু শুনলি তো অভাব্যি কথা। সাধে কি আর আমি—বেশ তো যাও না। কে মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছে! যাও।

—পাগল হয়েছ!—বৌদি বেশ লহর তুলে হেসে ওঠেন—হ্যাঁ চললাম! আমার বুঝি আর ক্ষয়ে যাবার ভয় নেই ? আমি গিয়ে দাঁড়ালে, ও তোমাদের ম্যাজিক-ফ্যাজিকের দিকে কি আর দৃষ্টি থাকবে কারুর ? দেশসুদ্ধু বেটাছেলে যে আমার পানেই হাঁ করে চেয়ে থাকবে! তখন ? অতগুলো দৃষ্টিবাণ সহ্য করে কি আর আস্ত দেহটা নিয়ে ফিরে আসতে পারব ? হয়তো—ক্ষইতে ক্ষইতে কপূরের মতো উবেই যাব!

দেখলাম বৌদির কৌতুকপ্রিয়তাটি অক্ষুণ্ণ আছে এখনও।

নাঃ—পিসীমার বাক্যে বাহুল্য-দোষ আছে। যতটা বলেছেন ততটা নয় নিশ্চয়ই।

তারকদা অবশ্য তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তা এত কড়া কৌতুক হজম করা শক্তও। জ্বলে উঠে জ্বলন্ত স্বরেই বললেন—দেখ, তোমার ওই বিচ্ছিরি তামাশাগুলো একটু সামলে কোর। বিজু কলকাতায় বাস করে, সভ্যসমাজে ঘোরে-ফেরে, তোমার ওই সব গেঁয়ো কথাবার্তা শুনলে—

শুনলে কি হবে তারকদা নিজেই হয়তো বুঝে উঠতে পারছিলেন না, বৌদি পাদপূরণ করে দেন—শুনলে মূর্ছা যেতে পারে, কি বল ? তা মন্দই বা কি ? রূপের ছটায় হোক, বাক্যির ছটায় হোক, মূর্ছা যাওয়ানো নিয়ে কথা ! কি বল ঠাকুরপো ?

—উঃ ! কথা, কথা ! ঘরে বসে বসেই এত কথার চাষ ! পথে ঘাটে চরতে দিলে যে কি হত ! বুঝলি বিজু, ওর ওই কথার জ্বালায় হাড়মাস কালি হয়ে গেল আমার ।

প্রায় স্ত্রীলোকের মতই খেদোক্তি করেন তারকদা ।

এতে কি মনে হয় এঁর হুকুমের বিরুদ্ধে এক পা বেরোবার জো নেই বৌদির ? যত সব বাজে কথা ! হয়তো বৌদির কথার ধারটা দাদার বুদ্ধির পক্ষে একটু বেশী ধারালো ।

বললাম—আচ্ছা, আমি তা হলে এগোচ্ছি । বৌদিকে নিয়ে তুমিও বেরিয়ে পড় তারকদা ! এরপর সত্যিই ঢুকতে পারবে না । গাছের ওপর পর্যন্ত লোক উঠেছে ।

তারকদা গম্ভীরভাবে বলেন—আমি যাচ্ছি-টাচ্ছি না ! তোমার বৌদিকে নিয়ে যেতে পার ।

বৌদি 'কৌতুককটাক্ষ' না কি, তাই করে বলেন—রক্ষে কর ! কলকাতাবাসী সভ্য ভাইকে দেখে এখন নয় মস্ত উদারতা করে বসছ, কিন্তু এর পর ? বাড়ি বসে যম-যন্ত্রণা ভোগ করবে তো ? সে অবস্থা স্মরণ করে আমিই কি আর ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারব ?

এতক্ষণে বুঝি বাধাটা কোন্ পক্ষে ।

মুখে বলি—তবে থাক ! কাল যখন সকলে 'ধন্যি ধন্যি' করবে তখন আপসোস করবেন ।···চল্লাম তারকদা, ওদিকে ওরা হয়তো আমার অদর্শনে চোখে সরষের ফুল দেখছে ।

তারকদা হঠাৎ কি ভাবে ভাবিত হয়ে বলে ওঠেন—আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া । তুই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের দিকে ঢুকিয়ে দিবি, বুঝলি ?··· পিসীমা-টিসিমা—ইয়ে—বৌমাটৌমা—সব আছেন তো ?

—হ্যাঁ, তাঁদের জিম্মে করে দেবে, যাতে পালিয়ে যাবার ভয়টা কম থাকে । কিন্তু আমার তো যাওয়া হয় না ঠাকুরপো ! আমার যে রান্না বাকি ।

—ধ্যেৎতারি নিকুচি করেছে রান্নার ! কুঁড়ের সর্দার ! এখনও রান্না হয় নি ? দেখছিস তো বিজু ? আর লোকে বলে আমি নাকি ওর পায়ে ছেকল পরিয়ে রেখে দিয়েছি, তোরাও তাই ভাবিস্ ।

বৌদি গালে হাত দিয়ে বলেন—ও মা সে কি ! 'পায়ে' ছেকল ? ছিঃ ! কে বলেছে একথা ?

—কেন এই তো—রাস্তায় নন্দখুড়ীর সঙ্গে দেখা । তোমার দুঃখে গলে গেলেন একেবারে । "আহা, বৌটা কিছু দেখতে পায় না—ওরও তো মনিষ্যির শরীর—সাধ ইচ্ছে কি হয় না ?"···শোন !···এই আমারও তো মনিষ্যির শরীর,

কই ধেই ধেই করে হুজুগে মেতে বেড়াবার ইচ্ছে তো হয় না।···যাক্‌গে তুই নিয়ে যা বিজু।

প্রমাদ গণি। মনে হয় দরকার নেই বাবা!

—না বাপু, তোমাদের এ সবের মধ্যে আমি নেই। ইচ্ছে হয় তুমি নিজেই নিয়ে যেও। বলতে এসেছিলাম দেরি করে গেলে সুবিধে করতে পারবে না, তাই।···

বলে পালিয়ে আসি।

তারপর বহু ব্যাপারের মধ্যে পড়ে তলিয়ে যাই একেবারে! মনেও থাকে না এসব কথা।

রাত্তির দেড়টা পর্যন্ত এদের অনুষ্ঠান চলল।

ম্যাজিকের পর গান, গানের পর 'হরবোলা' ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাঙতে ভাঙতেই—জলস্রোতের মত জনতার স্রোত!

যখন ভিড় একেবারে পাতলা হয়ে গেছে, উদ্যোক্তারা জাল গোটাবার তালে হান্‌ফান্‌ করে বেড়াচ্ছে, তখন একটি ছেলে এসে বললে—একজন বৌ আপনাকে খুঁজছেন!

বৌ!

শুনে তো অবাক! নিজের বৌকে তো অনেকক্ষণ আগে পার করে রেখে এসেছি। এতক্ষণে বোধ করি এক ঘুম হয়ে গেল তাঁর। আবার কার বৌ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে?

গিয়ে দেখে আরও অবাক! আর কেউ নয়, তারকদার বৌ!

স্টেজের পিছন দিকে একটা বাঁশের খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কি সর্বনাশ! ইনি এখানে এ সময় একা?

বলি—কি ব্যাপার বৌদি?

বৌদি উদ্বিগ্ন মুখে বলেন—তোমার দাদাকে ওর মধ্যে দেখলে?

—কে? তারকদা? কই না তো? এসেছিলেন নাকি?

—এসেছিলেন বৈকি! কি মতি হল, তুমি চলে আসার পর একরকম জোর করেই নিয়ে এলেন আমায়। বললেন—শেষ হয়ে গেলে এই দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে। ঘুরে এসে কাঁটালতলা দিয়ে নিয়ে যাবেন। সেই হিসেবে দাঁড়িয়ে আছি। তা কই? তুমি ভিড় ভাঙার সময় দেখেছ ভাল করে? কোনখানে বসে ঢুলছেন না তো?

—না না। শতরঞ্চি-টঞ্চি তো গুটিয়ে ফেলা হল। ভুলে চলে যান নি তো?

—ভুলে? বৌদি একটু হাসলেন। বললেন—চলেই গেছেন দেখছি। তবে ভুল নয়, বোধ হয় ইচ্ছাকৃত। খুব সম্ভব আমাকে বসিয়ে দিয়েই চলে গেছেন। আর ইচ্ছে করে এতক্ষণ যমযন্ত্রণা ভুগছেন্‌। যাক, তুমি একটু কষ্ট কর ভাই, পৌঁছে দেবে চল।

সত্যি বলতে, এ অনুরোধে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। এত রাত্রে একা

আমার সঙ্গে বৌকে ফিরতে দেখে খুব যে খুশী হয়ে উঠবেন তারকদা, এমন তো মনে হয় না।

বললাম—তার চেয়ে এক কাজ করুন না? পাড়ার কোন গিন্নী-টিন্নীকে এখনও বোধহয় রাস্তায় পাব, তাঁদেরই কাউকে বলে দিই—তাঁর সঙ্গে—

বৌদি দুই হাত জোড় করে বলেন—মাপ কর ভাই, পাড়ার গিন্নীদের সামনে আর অপদস্থ হতে চাই না। তা ছাড়া তাঁরা তো আগুনে কাঠ জোগাবার সুযোগই খুঁজে বেড়ান। তুমিই চল! তোমারই ওপর বরং একটু ছেন্দা আছে 'ওনার' দেখতে পাই!

—তবে চলুন—বলে পা চালাতে শুরু করে কৌতূহলের বশে বলি—আচ্ছা তারকদা এ রকম করলেন কেন?

—কি জানি ভাই! নির্বোধ লোকেরা যে কি ভেবে কী করে।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

সারা পথ আর কোন কথা হল না।

নির্বোধ লোকেরা 'যে কি ভেবে কি করে', জানতে পারলাম তারকদার দরজায় এসে।

কড়া নেড়ে নেড়ে ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে যখন দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা দিতে শুরু করেছি, এবং আশপাশের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা উৎকর্ণ হয়ে উঠেছেন অনুমান করছি, তখন সহসা দোতলার জানলা খুলে গেল এবং কটু তিক্ত কর্কশ প্রশ্ন কানে এল—কে?

—নেমে এস না। দরকার আছে—দোরটা খোল।

ভাবছি দোর খুললেই তাঁর প্রচণ্ড ঘুমের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেব। কি না তখন উত্তর এল—'আমার কোন দরকার নেই। যা দরকার সকালে এসে বোল।'

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল। কড়া কড়া কথা মুখে এল।

তবু রাত-দুপুরে আর দৃশ্যের অবতারণা না করে বললাম—সকালে আমি কলকাতার পথে, দরকার আমার নয়, তোমারই। বৌদিকে ফেলে রেখে চলে এলে—

বোধ করি এই সূত্রটুকুই খুঁজছিলেন। সেই দোতালার জানলা থেকেই চীৎকার শুরু হল—বৌদি? কার বৌদি? কার কথা হচ্ছে? এ বাড়ির বৌরা রাত্তির দুটো পর্যন্ত রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে ইয়ার বন্ধু নিয়ে বাড়ি ঢোকে না। এ বাড়ি থেকে কেউ কোথাও যায় নি।

এ রকম ইতর কথায় রক্তটা যতটা গরম হবার তা হল। তবু মাথা ঠাণ্ডা করে বৌদিকে বললাম—আর লোক হাসাবেন না বৌদি, চলুন আপাতত আমাদের বাড়িতেই গিয়ে শুয়ে পড়বেন চলুন। সকালে যা হয় করবেন।

বৌদি ধীরে ধীরে বলেন—সে হয় না ভাই, তোমার সামনে এ মুখ দেখাচ্ছি। কিন্তু তোমার বৌয়ের সামনে পারব না।

—কিন্তু উনি তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন, দোর খুলবেন না, করবেন কি ?

—খোলাতেই হবে ভাই। আচ্ছা তুমি যাও। এবার যা হবে আমার ভাগ্যে।

—যাব কি বলুন ? আপনাকে এইভাবে রেখে ?

—ভয় নেই ঠাকুরপো, মনের ঘেন্নায় ডুবে মরতে যাব না। কতক্ষণ দাঁড়াবে তুমি ? শুনলাম—পাঁচটার গাড়িতে যেতে হবে তোমাকে।

—তা হয় না। আপনাকে বাড়ি না ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে—আমার যাওয়া অসম্ভব।··· দেখি অধ্যবসায়ের পরীক্ষা।

শুরু হয় পরীক্ষা। তারকদাকে গুলি করে মারবার সাধু ইচ্ছে দমন করে আবার দোর ঠেলি। আবার কড়া নাড়ি, অনুনয়-বিনয় করতে থাকি।

অবশেষে দরজা খোলে।

খোলা দরজার দুই কপাটে হাত রেখে তারকদা বজ্রনিনাদে যে প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করেন, সে কথা উচ্চারণ করা অপর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। মোট কথাটার ভাবার্থ এই—যে স্ত্রী রাত দুটো পর্যন্ত বাইরে ঘুরে বেড়ায়—লজ্জার মাথা খেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ি ফেরবার সাহস করে, সে রকম স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর সঙ্গে তারকদার কোন সম্পর্ক নেই। ইচ্ছে হলে গোয়ালে পড়ে থাকতে পারে, উঠোন ঝাঁট দিয়ে দুটো ভাত পেতে পারে, কিন্তু রান্নাঘরের ছায়া যেন না মাড়ায় সে।···তার হাতে জল খাবার প্রবৃত্তি তারকদার নেই। সে স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন তারকদা। তাকে যদি গ্রহণ করেন তো ··· ভয়ংকর একটা শপথ-বাক্য উচ্চারণ করে হাঁপাতে থাকেন তারকদা।

বৌদি যে তারকদার হাতের তলা দিয়ে সুড়ুৎ করে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ঢুকে পড়লেন বুঝতে পারলাম না, আমি প্রায় টলতে টলতে ফিরে এলাম।

নিজেকেই সমস্ত কারণটার জন্য দায়ী করতে থাকি। এতদিন পরে দেশে এসে যে এমন একটা কুৎসিত নাটকের নায়কের ভূমিকা নিতে হবে, তা কে ভেবেছিল !

আমাকে যতই আশ্বাস দিন, বৌদির শেষ গতি যে দীঘির জল, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র রইল না। অথচ তার কি প্রতিকারই বা আমি করতে পারি ?

একটা দিনও যে দেখে যাব তার জো নেই।—আজই ছুটির শেষ দিন। ভোরের গাড়িতে রওনা হতে হবে। তা ছাড়া যদিই বা থাকতে চাই, স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ কি দেব ?

নাঃ, তার কাছে এ গল্প করা যায় না।

মেয়েদের কাছে মেয়েদের এতখানি পরাজয়ের কাহিনী প্রকাশ করতে পৌরুষে ঘা লাগে।

তারকদার মনস্তত্ত্বও বুঝি। নির্বোধের মনস্তত্ত্ব।

নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার বশেই লোকটা এই কৌশলে লোক-সমাজে প্রচার করতে চেয়েছে—স্ত্রীকে যে শাসন করে থাকে সে, সেটা নিতান্ত অকারণ নয়।

ছাড়া পেলেই মেয়েছেলে যে এমনি বেচাল হয়ে ওঠে এ তথ্য তার জানা বলেই সে দৃষ্টি রাখে, এখন সত্যি মিথ্যে দেখুক লোকে ? কিন্তু নার্ভাস লোকটা শেষ পর্যন্ত নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারল না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার করে বসল।

কেবলমাত্র বৌদির আত্মহত্যার সংবাদটি ছাড়া এ কাহিনীর আর কোন উপসংহার থাকার কথা নয়। কিন্তু বিধাতাপুরুষ নামক ঔপন্যাসিকটি বহু রসের রসিক, তাঁর রচিত কাহিনীর প্লট আমাদের কলমের সঙ্গে মেলে না !

মেলে না—সে প্রমাণ পেলাম আবার মাস আষ্টেক পরে দেশে এসে। দেশে আসার স্পৃহামাত্র ছিল না, আনিয়ে ছাড়লেন পিসীমা বাড়াবাড়ি রোগ করে। আবার চিঠির মারফৎ এমন ইচ্ছেও ব্যক্ত করলেন যে আমার চাঁদমুখখানি একবার না দেখে তাঁর মরেও শান্তি নেই।

অগত্যাই আসতে হল।

কি ভাগ্যি, মরে আর আমার শান্তি ঘোচালেন না, বরং যতটা দোদুল্যমান মনে এসেছিলাম, দেখে তেমন কিছু মনে হল না।···তাঁর মুখেই এ কাহিনীর শেষাংশ শুনলাম।

সেই বিরক্তিকর ঘটনার পর অনেকটা তারকদার ওপর নৃশংস প্রতিশোধের বশেই একান্ত কামনা করেছিলাম আত্মহত্যাটা যেন অবশ্যই ঘটে। এবং সেই অপঘাত মৃত্যুর সংবাদটার প্রতীক্ষা করতে করতে হতাশ হয়ে এক সময় ভুলেই গিয়েছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাকে।

এখানে এসে কথায় কথায় ওঁদের কথা উঠল।

শুনলাম—বৌদি যতই সাবধান হতে চেষ্টা করুন, লোক জানাজানি হতে কিছু বাকি ছিল না সেদিন।

বারোয়ারীতলার কল্যাণে পাড়ার কোন বাড়িতেই কেউ তখন নাকি নিদ্রাভিভূত ছিলেন না। কেউ সবে এসে শুয়েছেন, কেউ হাত পা ধুয়ে শোবার উদ্যোগ করছেন। কাজেই তারকদার উদাত্তকণ্ঠ শোনবার সুযোগ হারান নি কেউ।··· গভীর রাত্রির স্তব্ধতার উপর প্রত্যেকটি শব্দ কেটে কেটে বসেছে, এবং তাঁদের মনের প্রস্তরফলকেও কেটে বসে পড়েছে। হাত দিয়ে মুছে ফেলবার উপায় রাখে নি।

কাজেই পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠারা রায় দিয়েছেন—"তারক যখন 'মা' ডেকে দিব্যি গেলে বৌকে ত্যাগ করেছে, তখন কোন ছলেই আর সে বৌকে গ্রহণ করা চলে না !"

অতএব তদবধি ঘরে আর ওঠেন নি বৌদি। গোয়ালেই অবস্থান করছেন। তারকদার সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। থাকবেই বা কি করে ? সম্বোধন সমস্যাটা যে ঘোচবার নয় !

গোয়ালে উনুন পেতেছেন, রান্নাবান্না সেখানেই চলে। ধর্মের সাক্ষী একটা নাকি বামুনদের ছোঁড়াকে রেখেছেন রাঁধতে, সে শুধু তারকদাকে ঠকানো।

রান্নার 'রা'ও জানে না ছোঁড়া, প্রথম দিন ভাতের ফ্যান গালতে গিয়েই নাকি হাত পুড়িয়েছিল।...তা ছাড়া চিরদিনের 'খাউন্ডুলে' মানুষ তারকদা, তিনি কি আর সে রান্না মুখে তুলতে পারেন? কাজেই বৌদিই পরিপাটি করে রেঁধে দেন, সেই ছোঁড়াকে দিয়ে পরিবেশন করান। ঘরের কাজ-টাজ ছোঁড়াই করে, বাইরের কাজের ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে সে কাজগুলো বৌদি করেন। দু দুটো লোক রাখবার মত অবস্থা তো সত্যিই নেই তারকদার।

ধিক্কারে সমস্ত মন 'ছি ছি' করে উঠল।

সত্যি, মানুষের প্রাণের মমতা কী অসীম! সেই ধিক্কার প্রকাশ না করে পারলাম না। বললাম—তোমাদের দীঘির জল কি একেবারেই শুকিয়ে গেছে পিসীমা?

পিসীমা হাসলেন। বললেন—তোরা বেটাছেলে, বুঝবি না। কিন্তু একটু গলা খাটো কর, ঝাঁপের শব্দ পেলাম, বোধহয় বৌমা এল।

—কে এল?—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠি আমি।

—বৌমা, তারকের বৌ। আমার অসুখ হয়ে পর্যন্ত এই দুপুরবেলাটি রোজ আসে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

আমি টিটকিরি দিয়ে বলি—বৌকে ত্যাগ করে তারকদা তা হলে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছেন বল?

পিসীমা আমাকে চোখের ইশারা করেন। ফিরে দেখি বৌদি! নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে হাসছেন। কে জানে মুখের রেখায় কেমন একটা বার্ধক্যের ছাপ দেখলাম কি না, হাসিটা কিন্তু অম্লান!

অপ্রতিভ পিসীমা আর কিছু না পেয়ে বলে বসলেন—এই তোমার কথাই হচ্ছিল! বিজু তো শুনে রেগে অস্থির!

বৌদি হেসে ওঠেন—শুধু অস্থির? তবু ভাল ঠাকুরপো! আমি ভাবছিলাম আমার জন্যে বিষের অর্ডার দিতেই যাচ্ছিলে বুঝি বা।

কথা যখন একেবারেই এমন ভাবে এসে দাঁড়ায় তখন আর চক্ষুলজ্জা থাকে না, ক্রুদ্ধভাবে বলি—তাই উচিত ছিল! বেঁচে থাকতে আপনার লজ্জা অনুভব করা উচিত।

—কি মুস্কিল! বৌদি দুই হাত উল্টে বলেন—শুনুন পিসীমা, আপনার ভাইপোর কথা। পৃথিবীতে দু চারটে পাগল আছে বলে সুস্থ মানুষদের বেঁচে থাকতে লজ্জা করবে?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, এ শক্তি কি সত্যিই ভিতরের, না চেষ্টাকৃত? যদি সত্যি হয়, কে এই শক্তির যোগানদার?

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলি—অহরহ এই যন্ত্রণা সহে টিকে থাকা বোধ করি আপনাদের পক্ষেই সম্ভব!

বৌদি সহাস্যমুখে বলেন—তুমিও যেমন ঠাকুরপো, যন্ত্রণা মনে করলেই যন্ত্রণা! ও জিনিসটা অনেকটা বেলগাছের বেম্মদত্যির মত! মনে করতে শুরু করলে, পায়ে খড়ম গলায় পৈতের গোছা নিয়ে সশরীরে আছে, না করলে নেই।

তবে হ্যাঁ, মুশকিলের একশেষ ওই রান্নাবান্নার সময়টা ! বামুনদের ছোঁড়াটাকে দোরে পাহারা বসিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে করা তো ? পাছে তোমার দাদা টের পান !

আমি তাচ্ছিল্যভরে বলি—বাঙালকে আর হাইকোর্ট দেখাবেন না বৌদি, রান্না খেয়ে টের পান না ?

বৌদি প্রসন্নহাস্যে বলেন—তা কি জানি ! হয়তো পান, তবু একটা আবডাল তো রইল ? প্রকাশ হয়ে পড়লে যে খাওয়া ঘুচে যাবে, মানো বাধবে বাবুর ।

বিস্ময়ে প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে যায় আমার । বলি—ওঁর সেই মান্য বজায় রাখবার জন্যে আপনাব এই কৃচ্ছ্রসাধন ? অথচ যে আপনার মান-মর্যাদা কিছুই —কিন্তু থাক সে কথা । তবে দিব্যি-টিব্যি সবই যদি এত মানেন, এই লুকো-চুরিতে পাপ হচ্ছে না আপনার ?

বৌদি পিসীমার পাশে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে পড়ে অবলীলাক্রমে উত্তর দেন—পাপ আবার হচ্ছে না ? খুব হচ্ছে । কত জন্মের মহাপাতকের ফলে ওর হাতে পড়েছি, আবার এ জন্মে এই পাপ কুড়োচ্ছি । কিন্তু কি করব বল ? খাওয়ার কষ্ট যে তোমার দাদা মোটে সহ্য করতে পারেন না, রান্না পছন্দ না হলে খাওয়াই হয় না সেদিন । অন্য কারুর হাতে পড়লে কি আর ওঁর শরীর টিকবে ?

[১৩৬২]

ভাড়াটে বাড়ি

অবশেষে বাড়ি মিলেছে !

মনের মতো বাড়ি !

ভাড়াটে বাড়ি যে আজকাল আর পাওয়া যায় না এ কথা কচিছেলেটাও জানে, তবু দীর্ঘকাল ধরে কচিছেলের বাড়া বায়না করে এসেছে রমলা । এ বাড়ি থেকে সে উঠে যাবেই যাবে ।

এই অসাধ্য সাধনের সাধনায় একদিন একতিল স্বস্তি দেয়নি সুরেশকে, উঠতে-বসতে খেতে-শুতে 'বাড়ি বাড়ি' করে পাগল করেছে তাকে ।

এ বাড়িটার—যে কি কি অসুবিধে, এ শুনতে শুনতে মূল তালিকাটা মুখস্থ হয়ে গেছে সুরেশের । তা'ছাড়া ছোটো-খাটো অসুবিধের নতুন নতুন ফিরিস্তি রোজই প্রায় যোগ হচ্ছে ।

বললে কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, গত দু'বছরের মধ্যে সুরেশ একটা ছুটির দিনে একটা বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যায়নি, একদিন মাছ ধরতে ছোটেনি, তাস খেলেনি. দাবা খেলেনি, সিনেমা থিয়েটার দেখেনি, এমন কি দুপুরবেলা বিছানায় একটু গা গড়ায়নি ।

সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, দুপুর নেই, শুধু বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছে ।

অর্থাৎ রমলা বার করে ছেড়েছে !

রমলার কাজ হচ্ছে অবিরত খবরের কাগজের 'বাড়িভাড়ার' বিজ্ঞাপন কেটে

জড়ো করা, আর তার নির্দেশে সুরেশকে ঠেলে ঠেলে পাঠানো।

সুরেশের লাভের মধ্যে এই ছুতোয় বৃহত্তর কলিকাতার প্রায় সমস্ত পথ ঘাট মুখস্থ হয়ে গিয়েছে তার। কারণ বাড়ি সম্বন্ধে রমলার দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। যে কোনো দিকে হোক, বাড়ির 'ভালোত্ব'টাই তার প্রধান লক্ষ্য।

ভালো বাড়ি চাই।

এ বাড়ি ছেড়ে ভালো বাড়ি!

বিয়ে হয়ে পর্যন্ত এই পনেরো বছর ধরে খাঁচার মতো এই বাড়িখানায় বাস করে এলো রমলা। জীবনের সমস্ত ভালো বয়েসগুলো গেলো খসে। এখনো পড়ে থাকবে এই হতচ্ছাড়া খাঁচাখানায়? কক্ষনো না।

অসাধ্য সাধনাই করতে হবে সুরেশকে।

খবরের কাগজের 'কর্মখালি' আর 'বাড়িভাড়া' যে কিছু নয়, ওযে শুধু লোক ধাঁধানো ভাঁওতা, একথা স্ত্রীকে বোঝাতে বোঝাতে কাহিল হয়ে গিয়েছে ভদ্রলোক, বচসা হয়েছে, মনান্তর হয়েছে, দু'চারদিন কথা বন্ধর পালা পর্যন্ত চলে গেছে, তবু হাল ছাড়েনি রমলা।

তাই না এতোদিনে হালে পানি পেয়েছে?

পেয়েছে মনের মতো বাড়ি! ঠিক যেমনটি খুঁজেছিল। ভাড়া অবশ্য এ বাড়ির চারগুণ। কিন্তু কি করা যাবে, ভালো জিনিসের ভালো দাম দিতেই হয়।

দেবে নাই বা কেন? এখন সুরেশের অবস্থা ফিরেছে যখন। আগে তো এতো জোর করেনি রমলা? কারণ আগে সুরেশের আয় ছিলো কম, দায় ছিল বেশী। এখন পালাটা উল্টেছে।

এখন সুরেশের পর পর দুটি আইবুড়ো বোনের বিয়ে দিয়ে ফেলে দায়টা গেছে, কর্মজগতে এক আকস্মিক উন্নতিতে আয়টা বেড়েছে। রমলারই বা তবে দাবী বাড়বে না কেন?

আজই সন্ধ্যাবেলায় যেতে হবে! আজকের দিনটা শুভ। আজ আর একতিল সময় নেই রমলার। কতো গোছ, কতো ব্যবস্থা, কতো আয়োজন। সুরেশের মায়ের আমলের সংসার।

পরে এসেছে রমলার হাতে।

কতোদিনের কতো সঞ্চয় জমা হয়ে আছে এখানে-সেখানে। ভাঁড়ার ঘরে, রান্নাঘরে, শোবার ঘরে, তাকে, কুলঙ্গিতে, ঘুলঘুলির মধ্যে! জিনিসের চাইতে জঞ্জাল বেশী, আবশ্যকের চাইতে আবর্জনা!

এ বাড়িতে যেসব কুলো ডালা ঝুড়ি চুপড়ি, প্যাকিং কাঠের বাক্স, চটের পর্দা বেমালুম খাপ খেয়ে দিব্যি মানানসই হয়ে বাস করেছিল, তারা হঠাৎ বাস্তুহারা হয়ে পড়ছে। ওদের ত্যাগ করো। ওরা বাতিল! ওরা ও-বাড়িতে 'অচল'!

আরো কতকগুলো জিনিস আছে, যেমন রংচটা আসবাব, ধোঁয়াধরা ফটো, ডালাভাঙা ক্যাসবাক্স—এগুলো নিয়ে যে কি করবে সেই সমস্যা।

এ সবই কি চালানো যাবে ও-বাড়িতে ?

সে বাড়িতে মোজাইক্ করা মেঝে, সিনেমা স্টাইলের জানালা, রাস্তার ওপর ঘর পিছু আলাদা আলাদা ঝুল বারান্দা।

এই সবের জন্যেই আরো খাটুনি আর চিন্তার অন্ত নেই।

ভাবী বাড়ির জানালা দরজার জন্যে অনেকদিন থেকে বাহারি বাহারি পর্দা করে রেখেছে রমলা, বাহারি টেবিলঢাকা। কিন্তু আসবাব-পত্র তো সত্যি কিনে রাখতে পারেনি এক সেট ?

যাক্, আস্তে আস্তে সবই কিনবে।

ঘোড়া যখন হয়েছে চাবুকও হবে। এখন শুধু বর্জনের নির্বাচন।

সকালবেলাটা আবার ছোট ননদ এসে খানিকটা সময় খরচ করিয়ে দিয়ে গেল। কাছেই থাকে, পাড়ার মধ্যেই শ্বশুরবাড়ি। ইচ্ছে হলেই বেড়াতে আসে।

এরা দূরে চলে যাচ্ছে বলে ম্রিয়মাণ মুখে দেখা করতে এলো।

ম্রিয়মাণ হবে বৈকি, মস্ত, একটা সুখ চলে গেলো তো ওর। মন কেমন করলেই বাপের বাড়ি বেড়াতে আসতে পাওয়া কি সোজা সুখ ? ওর ধরন-ধারণ দেখে, রমলা মনে একটু রাগ আনতে চেষ্টা করলে, ভাবলে—জগৎটা কি স্বার্থপর ! এই যে আমরা এখানে কতো কষ্ট পোহাচ্ছিলাম,—এখন কতো ভালো বাড়িতে থাকতে যাচ্ছি, তা' একটু আনন্দ নেই। নিজের সুবিধেটুকু চলে যাচ্ছে, সেই দুঃখেই কাতর।···কেন রে বাপু, রমলারা তো আর কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে না ? পায়ে হেঁটে আসতিস, না হয় দু' আনা ট্রামভাড়া খরচা করে যাবি ?

কিন্তু রাগটায় তেমন জোর পেলো না।

সেই যে মেয়েটা খাবার টাবার সব ঠেলে সরিয়ে রেখে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে কেমন যেন শুকনো শুকনো মুখে উঠে গেলো, সে মুখটা যেন কিছুতেই চোখের সামনে থেকে সরতে চাইছে না।

শ্বাশুড়ী মারা যাবার সময় নেহাত ছেলেমানুষ ছিল মেয়েটা, রমলাকে অনেক আবদার পোহাতে হয়েছে ওর। এই তো সবে দুটি বছর বিয়ে হয়েছে।

যাবার সময় এঘর ওঘর ঘুরে গেলো।

ফেলে দেওয়া জঞ্জালের স্তূপ থেকে বেছে বেছে নিজের ছেলেবেলাকার তুচ্ছ কি দু' একটা সঞ্চয় নিলো আঁচলে বেঁধে, আরো কিছু যেন খুঁজে খুঁজে বেড়ালো ! দেখে একটু হাসিই পাচ্ছিলো রমলার।

নে বাপু যা খুশি। রমলার অতো ছোট দিকে নজর নেই।

শেষ পরে—হেঁট হয়ে নমস্কার করলো রমলাকে, আর ফিকে হাসি হেসে বলে গেলো—আমার বিয়ের 'বসুধারা'টা রয়ে গেলো এ বাড়ির দেওয়ালে !

ওকে বিদায় দিয়ে অনেকক্ষণ খোলা দরজাটায় দাঁড়িয়ে থাকলো রমলা পথের দিকে তাকিয়ে।···ছেলেরা স্কুলে গেছে, সুরেশ অফিসে, ছোট ছেলেমেয়ে দুটো কেঁদে কেঁদে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। থাকবার মধ্যে—রমলা তো একাই

রয়েছে শুধু। থাকলোই না হয় দুদণ্ড দাঁড়িয়ে।

একটু পরেই মনে পড়ে গেলো—কাজের পাহাড় আছে পড়ে।

অলসতার সময় নেই। ছেলে মেয়ে উঠে পড়লে রক্ষে নেই।

ও বাড়িতে গিয়েই ছোট ননদটিকে নিয়ে গিয়ে দু'চার দিন রাখবে, এই সাধু সংকল্প করে জোর তলবে কাজে লেগে গেলো রমলা। আচ্ছা ওর তো রূপ ভালোই হলো! পাড়ায় শ্বশুরবাড়ি হয়ে, বাপের বাড়ি এসে থাকার ব্যাপারটা তো মোটেই ছিল না। বেড়িয়ে চলে যেতো।

এ তো তবু দু'পাঁচ দিন থাকা হবে!

না না, এ বেশ ভালই হয়েছে।

'বসুধারা'র কথায় ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে নতুন করে চোখ পড়লো ভুলে যাওয়া দেওয়ালের দিকে! ভুলে যাবারই কথা, ধোঁয়ায় ধুলোয় কুৎসিত বিবর্ণ ওই দেওয়ালগুলোকে দেওয়াল বলে মনেই হয় না।

পথ আর ঘর এই দুটোকে আলাদা করবার একটা আড়াল মাত্র!

বসুধারা একটা কেন গোটা তিন চারই তো রয়েছে।

সদ্য টাটকা ধারাটা এই ছোটো ননদের বিয়ের। তার আগেরটা মেজ ননদের। সব থেকে পুরনো ওই মেটে বিবর্ণ দাগটা তো শুনেছে সুরেশেরই বিয়ের নান্দীমুখের!

আর—কোণের দেওয়ালের ওটা?

ওটা—বিয়ের নয়!

অন্নপ্রাশনের!

বসুধারা! চিহ্নটা রয়েছে! আর কিছু না!

এটা রয়েছে—অথচ কোনোদিন লক্ষ্য পড়েনি রমলার! সারা বেলা ভাঁড়ার ঘরে বসে কাজ করেছে কতোদিন, তবুও না!

কিন্তু দেওয়ালের এই চিহ্নটা ছাড়া আর কোথাও কোনো চিহ্নই তো নেই!

কি করেই বা থাকবে?

বারো তেরো বছর ধরে একটা সাতমাসের ক্ষুদ্র শিশুর কোন্ চিহ্নটুকুই বা জীইয়ে রাখতে পারে মানুষ? তারপরে আরো দু'চারটি সন্তান যার কোলে এসেছে?

মুখে ভাত খাওয়া বাসনগুলো—তাই কবে কখন ভেঙে চুরে ক্ষয়ে হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রয়েছে শুধু মেটে সিঁদুর গোলা এই অনুজ্জ্বল চিহ্নটা!

ছোট্ট টোপর-পরা ছোট্ট মুখটা মনে করতে চেষ্টা করলে রমলা, পারলো না! টোপরটা মনে পড়লো, মুখটা মনে পড়লো না।

রমলার প্রথম সন্তানের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই, রমলার মনেও নয়! আছে শুধু এই ভাড়াটে বাড়ির কোণের একটা দেওয়ালে!

শোবার ঘর থেকে চীৎকার ভেসে এলো—প্রচণ্ড কান্নার!

এই সর্বনাশ! খুকী উঠেছে!

মেয়ের গলা তো নয়—কাঁসর। আর চেঁচাতে যদি শুরু করলো, থামায় কার সাধ্যি !

ভাঁড়ারের দরজাটা টেনে শেকল তুলে দিয়ে ছুটে চলে গেলো রমলা। মরতে আবার চৌকীর ওপর শুইয়ে এসেছে ! পড়লে বাঁচবে না !

স্মৃতির ভাঁড়ারেও তো এমনি করেই দরজা টেনে শেকল তুলে দিতে হয় ! নইলে বর্তমানের চাহিদা মেটানো যাবে কি করে ?

কাজের পরে কাজ !

নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

আর পেরে উঠছে না রমলা ! এতো শেকড় কাটতে হবে তা কি আগে ভেবেছিল ? জোর গলায় সুরেশকে বলেছিলো—"তোমাকে কিছু করতে হবে না, সব আমি করবো। তুমি ও বাড়ি গিয়েই পিঁড়ি পেতে খেতে বসতে পাবে।"

টিফিন ক্যারিয়ারে লুচি তরকারি ভরে নেবার মতলবটা আর ফাঁস করেনি।

সুরেশ বলেছিল—"হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলা গিয়েই আবার তক্ষুণি রাঁধতে বসবে না কি ? পাগল ! কিছু কিনে টিনে খেলেই হবে।" রমলা মিটিমিটি হেসেছিলো।

তাক লাগিয়ে দেবে সে সুরেশকে।

কিন্তু তেমন পারলো না !

'লেপের চালিটা' ছাদের সীলিঙে ঝুলছে, ওটা খুলে নিতে সুরেশের সাহায্য চাই। ওটা নাকি সুরেশের বাবার হাতে টাঙানো। শ্বশুরকে রমলা দেখেনি ! দেখেছে শ্বশুরের হাতের এই কাজটা।

ওটা নামাতে পারেনি, আর খুলতে পারেনি এই ব্র্যাকেট আলনাটা।

দেওয়ালের মায়া বিসর্জন দিয়ে বালি ভেঙে চেনচ করেও পারেনি। মোক্ষম পুঁতে আছে !

আর কিচ্ছু না করে চুপচাপ ওই আলনাটার দিকেই চেয়ে বসে আছে রমলা !

ঠিক ওর কাছেই যেন একটা হাস্যোজ্জ্বল কিশোর মুখ দেখতে পাচ্ছে ! গোল গোল পুরন্ত মুখ, চোখে চশমা ! হাতে হাতুড়ীটা উঁচানো।

আলনাটা পুঁতে ফেলে বাঁহাতে বেশ নেড়ে চেড়ে কাজের স্থায়িত্বটা দেখে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলছে—"এতে কেবল মাত্র আমার জামা কাপড় থাকবে, বুঝলেন বৌদি মহাশয়া ? আপনার শাড়ি ব্লাউস চাপিয়েছেন কি—এ-ই !"

হাতুড়ীটা রমলার মাথায় বসিয়ে দেবার ইঙ্গিত করে 'হো হো' হাসি। —বাড়াবাড়ি রকমের হাসতো ! হাসির জন্যে সময় সময় ধমক খেতো সুরেশের কাছে।

সুরেশের ছোটো ভাই দেবেন।

রমলারই সমবয়সী ছিল।

থার্ড ইয়ারে উঠেই টাইফয়েড হলো !···

অফিস-ফেরতই একেবারে ঠেলাগাড়ি আর মুটের পাল নিয়ে হৈ হৈ করে বাড়ি ঢুকলো সুরেশ। পঞ্জিকায় নাকি শুভক্ষণের আয়ুটা স্বল্প হয়ে আসছে। দেরি করলে চলবে না।

ছেলেমেয়েরা ফরসা জামা পরে তৈরি হয়ে আছে। স্ফূর্তির শেষ নেই তাদের ! শুধু রমলার ভঙ্গীতেই কেমন শিথিলতা।

প্রচণ্ড তাড়া দিয়ে ওঠে সুরেশ—একী ? এখনো তৈরি হওনি যে ? ব্যাপার কি ? আটটা দশ মিনিট পর্যন্ত ভালো সময় আছে বলেছিলে না ? সাতটা তো বেজেই গেছে।

রমলা মুখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে চায় !

ক্লান্তস্বরে বলে—"ভাবছি গিয়ে আর কি হবে ? থেকেই যাই না ?"

[১৩৬২]

নিছক গল্প

কবরেজ দাদু বললেন—দূর দূর একালে আবার গল্প হয় ? জমবে কাকে নিয়ে ? একালের গল্প যেন "সুবচনীর খোঁড়া হাঁস" ! গল্প হলো লাগাম-ছাড়া ঘোড়া, ইচ্ছে মতন দৌড়বে। গল্প হ'তো রাজা মহারাজাদের ! পৃথিবী থেকে রাজা মহারাজা নির্মূল হলো, গল্পও ফুরোলো।

শুনে বললাম—কবরেজ দাদু, নিজের চক্ষে রাজা মহারাজা দেখেছো তুমি ?

দাদু রেগে বললেন—দেখিনি ? বলিস কি ? আজন্মকাল রাজা মহারাজা নিয়েই তো ঘর করে এলাম !···কাঠচণ্ডীপুরের মহারাজা বল'তন—"কবরেজ—"

বললাম—কাঠচণ্ডীপুর ? সে আবার কোথা দাদু ?

কবরেজ দাদু মিনিটখানেক অপলক নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রতিপ্রশ্ন করলেন—তোরা না ভূগোল পড়িস ?

লজ্জায় অধোবদন হলাম।

বলতে পারলাম না ভূগোল আমি পড়ি না, বরাবর পরীক্ষার সময় পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকি !···কবরেজ দাদু বীর বিক্রমে বলে চললেন—মহারাজা বলতেন—"কবরেজ, তোমাকে 'কবিরাজের' পরিবর্তে 'গল্পরাজ' উপাধি দেওয়া উচিত। এতো গল্প তুমি পাও কোথায় ?"

বলতাম—মহারাজ, পাই আপনারই দৌলতে। শুনে ভারি খুসি। গল্প পেলে আর কিছুটি চাইতেন না তিনি, রাজকার্য মাথায় উঠতো। গল্পের গুণে আমার কথায় উঠতেন বসতেন।

আমি বললাম—দাদু, এতোবড়ো সুযোগ হেলায় হারিয়েছো ? সেই সময় 'টু পাইস' করে নিতে হয় ?

দাদু বললেন—দূর দূর, ওসব ছেঁড়া দিকে নজর থাকলে কি আর রাজা রাজড়ার নজরে পড়া যায় ?···হ্যাঁ কি বলছিলাম—সেই রাজার কিনা একদিন

আমার ওপর হলো গোঁসা। তলব পাঠালেন পাইক দিয়ে। আমি তো অবাক, এই সময়টা রাজার আফিঙের ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকবার কথা, এ সময় তলব কেন?...আফিঙের নেশা শুনে চমকালি যে? মহারাজ দিন তিন ভরি আফিঙ খেতেন, এ গল্প করিনি বুঝি কোনোদিন? সেকালের রাজা রাজড়ারা অমন দু'চার ভরি খেয়ে পার করতে পারতেন। মানে আর কি, মন্ত্রীরাই একটু একটু করে ধরিয়ে এতোখানি করে তুলতেন। নইলে ঝিমোবেন কি করে? রাজা রাজড়ার চোখ কান সর্বদা সজাগ থাকলে রক্ষে আছে?

যাই হোক, মহারাজা তলব করে সাদা চোখে তাকিয়ে বললেন—কবরেজ, এবার তো তোমার জরিমানা হয়—!

তটস্থ হয়ে বললাম—সে কি মহারাজ, সে কি? অপরাধ?

—বলি তোমার আফিঙে আর নেশা হচ্ছে না কেন?

বললাম—সর্বনাশ! কে বললে?

—'কে বললে' মানে? নেশা ধরছে না আমার, খবর দিতে যাবে অন্য লোকে?...এই দেখো না, কিছুদিন থেকে আর মৌজ করে ঝিমুনি আসছে না। ...খালি ইচ্ছে হচ্ছে একে শূলে দেই, ওকে শালে চড়াই। তার সাক্ষী দেখো না কেন, তোমাকে দেখেই ইচ্ছা হলো তোমার আধখানা মাটিতে পুঁতে আধখানা বুনো শেয়াল দিয়ে খাওয়াই।

মনে কর শুনে আমি কোথায়?

ধরে নে, আমি আর নেই!

মনে মনে দুর্গানাম জপ করছি, তবু মুখে সাহস দেখিয়ে বললাম—মহা-রাজের এই সামান্য ইচ্ছেটুকু যদি আমার দ্বারা পূরণ হয়, আমার পক্ষে তার চাইতে সৌভাগ্যের আর কি আছে? জন্ম জন্ম আমায় বুনো শেয়ালে খাক!... কিন্তু মহারাজ, একটি দিন সময় দিতে হবে।

মহারাজ দরাজ গলায় বললেন—বে—শ! কিন্তু কেন?

আজ্ঞে নেশা কেন হচ্ছে না তার একটা ফয়সলা করে না গেলে যে বৈকুণ্ঠে গিয়েও স্বস্তি পাবো না।

মহারাজ চোখ পাকিয়ে বললেন—বৈকুণ্ঠে?—তুমি বৈকুণ্ঠে যাবে মানে?

জোড়হাতে বললাম—মহারাজের যদি আপত্তি থাকে তো যাবো না। কিন্তু ফয়সলা আমায় করতেই হবে।...দৈনিক তিনটি ভরি করে আফিঙ আমি রাজ-বাড়িতে পাঠাচ্ছি, সে মাল যাচ্ছে কোথায়?

—যাচ্ছে মানে? নিক্তি ধরে ওজন করে খাচ্ছি—তা' জানো?

—ওজন করছে কে? যে করছে, নিশ্চয় সেই ব্যাটাই—

—খবরদার কবরেজ, মুখ সামলে! ওজন করে হাতে তুলে দেন স্বয়ং মহারাণী।

বললাম—হুজুর বেফাঁস কথার জন্যে গুণে সাতহাত নাকে খত দিচ্ছি। এখন একবার অন্দরে যাবার ছাড়পত্র চাই যে।

মহারাজ বললেন—কবরেজ, বেশী চালাকি কোরো না। তোমার আবার

ছাড়পত্র কি ? সেবারে মহারাণীর অম্লশূল সারিয়েছিলো কে ? আর গেলো বছরে গেঁটে বাত ? মহারাণীর ব্রতের ব্রাহ্মণ হয় কে ?

অতএব মহারাজকে কুর্ণিশ করে ঢুকে গেলাম অন্দরে। সোজা মহারাণী মহলে।···বললাম—রাণীমা, মহারাজের আফিঙ ওজন কে করে ?

মহারাণী বললেন—কবরেজ, আমিই করি। রাণী হই আর যাই হই, হিন্দুর মেয়ে তো বটে, পতিসেবার পুণ্যটুকু ছাড়ি কেন ?

—রাণীমা, ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি ?

—নির্ভয়েই বলো।

—আজ্ঞে ঠিক খাঁটিটুকু দেন তো ?

মহারাণী হেসে বলেন—তা'হলে বলি কবরেজ, সঙ্গদোষে আমারও একটু বদ-অভ্যাস হয়ে গেছে। বেশী নয়—মটর ভোর ! ওজনের কারচুপিতে সেইটুকু সেরে নেই।

—বেশ করেন, আজ্ঞে খুব উত্তম করেন। আফিঙ হচ্ছে শূল বেদনার মহৌষধ। কিন্তু কথা হচ্ছে—আপনার হাতে পৌঁছায় কে ?

—কেন, খাসদাসী দুন্দুভী !

খাসদাসী দুন্দুভীর কাছে গিয়ে বললাম—দুন্দুভী, সত্যি করে বল দিকি, মহারাজের বরাদ্দ আফিঙ থেকে দৈনিক কতোটা করে সরাস ? দুন্দুভী জিভ কেটে বললে—বলেন কি কবরেজমশাই, কতো—টা ? এই বড়োজোর সিকি ভরিটাক। ওইটুকু সরিয়ে ফেলে নিক্তি মেপে সেই ওজনের তামাকগুলি মিশিয়ে রাখি। লজ্জার কথা কি আর বলি, আমার বুড়োর যে আবার মহারাজের দেখাদেখি রাজনেশায় ধরেছে !

—তাতো হতেই পারে বাছা, যতোই হোক রাজবাড়ির ছায়ায় মানুষ ! কিন্তু —বলি তুমি কার হাত থেকে পাও ?

—কেন, রাজ অন্দরের খোদ পাহারাদার হারাণ বিশ্বাসের কাছ থেকে !

পাহারাদার হারাণের কাছে গিয়ে শুধোলাম—বিশ্বাস, এমন অবিশ্বাসের কাজ করছিস কি ব'লে ?

বিশ্বাস দুঃখে মরে গিয়ে বললো—কবরেজ মশাই, এমন কথাটা কেন বললেন ? অবিশ্বাসের কাজ আমার সাত পুরুষে করেনি।

বললাম—তবে আফিঙ যাচ্ছে কোথা ?

হারাণ গম্ভীর ভাবে বললো—ওঃ এই কথা ! তা যাচ্ছে যে, সেটা ধরলো কে ?

—অপর কেউ নয়, স্বয়ং আমি ! এখন ভেতরের কথা খুলে বল্।

—আজ্ঞে কাউকে না বলেন তো বলি—মাত্তর আধভরিটাক সরিয়ে ফেলে সেইটুকুন ওজনে পুরনো তেঁতুল মিশিয়ে দিই। ওটুকুতে আর কি এসে যাচ্ছে ?

—কি এসে যাচ্ছে তা'র তুমি কি বুঝবে ? তোমাকে তো আর মহারাজের মেজাজের ধারে কাছে আসতে হয় না ? কিন্তু তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছায়

কে ? আমার দাওয়াই খানার নরহরি গরাই ?

হারাণ বললো—পাগল হয়েছেন কবরেজ মশাই, নরহরির সাধ্য কি যে দেউড়ী ডিঙিয়ে এতোদূর আসে ? কাছারী বাড়ির কানাই সামন্ত নেই ?

শুনে তো—বুঝলি কিনা চটেমটে চললাম সামন্তর কাছে !

গিয়ে বললাম—সামন্ত, বৃত্তান্ত কি ?

সামন্ত হাই তুলে বললো—কিসের 'বৃত্তান্ত' ?

—বৃত্তান্ত হচ্ছে—আফিঙের ! বলি—মহারাজের ঝিমুনি আসে না কেন ? আফিঙ কোথায় যায় ? সামন্ত উড়িয়ে দিয়ে বললো—যাবে আবার কোথায় ? যেখানের জিনিস সেখানেই থাকে !

বললাম—সামন্ত, মিছে কথা বোলোনা। আজ প্রাতঃকাল থেকে আফিঙের গতিবিধির হিসেব রাখছি আমি। অনেকটা অবহিত হয়ে এসেছি।···যা বলবে সত্যি বলো।

সামন্ত আর একটা হাই তুলে বললো—নেহাৎই তা'হলে শুনবেন কবরেজ মশাই ?

—শুনবো না মানে ? না শুনে ছাড়বো ?

সামন্ত ইতস্ততঃ করে বললো—কথাটা আর কিছুই নয় ! রাজভোগ্য আফিঙের কিছু খদ্দের আছে। ডবল দাম নিয়ে সাধা-সাধি করে। যে জিনিস মহারাজের জন্যে বরাদ্দ, সেই জিনিসই তাদের চাই। তাই—আর কি, একটু এদিক ওদিক হয়ে যায়।

—হুঁ বুঝলাম ! কিন্তু ভেজালটা কি চালাচ্ছো ?

—আজ্ঞে সে কিছু নয়, সে আর নাই শুনলেন !

—উঁহুঁ, শুনতে যে হবেই সামন্ত ! মহারাজের কাছে পেশ করতে হবে।

সামন্ত বললো—আজ্ঞে তা'হলে একটু সবুর করতে হবে। বাড়ি থেকে জেনে এসে বলবো। ওটা ঘরেই এঁরা ব্যবস্থা করে দেন কিনা !

শুনে যেন চমকে গেলাম, বুঝলি ? সত্যি বলতে কি—'ঘরের ওঁদের' কাছে গিয়ে হানা দিতে কার ইচ্ছে হয় বল ? বললাম—এতো দূর ! আচ্ছা ! যাক্ অনেকটা তো ফয়সালা হয়ে এলো। এমনিতেই দিব্যচক্ষু খুলে যাচ্ছে।···এখন বলো তো হে, তোমার কাছারীতে আসে কার হাত দিয়ে ?

—কেন, দেউড়ীর বেতাল পাঠকের ! নিজে হাতে করে দিয়ে যায় !

কাছারী থেকে বেরিয়ে ধরলাম গিয়ে বেতাল পাঠককে। বললাম—বেতাল, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, লোভের বশে একেবারে বেতালা হয়ে যাস ? মাত্রাজ্ঞান থাকে না ! আফিঙের রহস্য কি ?

বেতাল সরল মুখে বোকা বোকা চাউনী হেনে বললো—রহস্যের খবর তো জানি না কবরেজ মশাই। নরহরি এসে আমার হাতে দেয়, আমি কাছারী বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসে খালাস।

—হুঁ, আমার এই আঙটির সোনা ছুঁয়ে বল দিকিন, পৌঁছে দেবার

আগে কিছু করিস কি না ? ভেতরে কিছু কারচুপি আছে কিনা ?

বেতাল মাথা চুলকে বললো—কবরেজ মশাই, ফট্ করে যখন সোনা ছোঁওয়ার কথা বললেন, তখন বলি—যা করবার নরহরিই করে, আমার সঙ্গে দামের বখরা।

বুঝলি কি না, এতোক্ষণে শিরায় শিরায় পূর্বপুরুষের রক্ত চিন চিন করে উঠলো! বললাম—বটে ? আমার পায়ের খড়মের কথা বুঝি ভুলে গেছে সে ব্যাটা!

গেলাম নিজের কোর্টে। খড়ম খুলে বললাম—নরহরি!

নরহরি আমার মেজাজ দেখে থরহরি হয়ে বললো—আ—আজ্ঞে ?

—বল ব্যাটা, মহারাজের বরাদ্দ আফিঙে কি করিস ? কতো ভেজাল মেশাস্ ?

নরহরি গম্ভীর ভাবে বললো—ঠাকুর মশাই, এই আপনার পৈতা ছুঁয়ে দিব্যি গালছি, আফিঙে ভেজাল আমি দিই না।

হাতের মধ্যে খড়ম নিসপিস করছিলো, অনেক করে নিজেকে সংবরণ করে বললাম—চালাকি পেয়েছিস ? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লাভের কারবার চলছে, আর তুই যুধিষ্ঠির সেজে আমার চোখে ধুলো দিবি ?

নরহরি বললো—বিশ্বাস করেন না করেন আপনার ইচ্ছে, তবে আফিঙে ভেজাল আমি দিই না।

আমার তখন—'প্রভুভাব!' চোখ রাঙিয়ে বললাম—বটে! তবে নেশা কেন হয় না ?

নরহরি উদাস ভাবে বললো—আজ্ঞে নেশা হবে কোথা থেকে ? জিনিসটা যে আসলে আফিঙই নয়।

—দেখ্ নরহরি, আবোল তাবোল বক্‌বি না। যা বলবি পষ্ট বল!…ও বললো—আজ্ঞে অভয় যখন দিচ্ছেন, পষ্টই বলি—আফিঙ জিনিষটা দুর্লভ, বাজারে ছাড়লে পড়তে পায় না। …মহারাজা কতো কি ভালোমন্দ খান, ও আপনার আফিঙটুকু খেলেন আর না খেলেন! তবু—আমার দু'পয়সা ঘরে আসে।

রাগ করতেও ভুলে গেলাম। হতাশ হয়ে বললাম—তবে রাজবাড়িতে যাব কি ?

—আজ্ঞে দোষের কিছু নয়! জীওলের আঠা জানেন তো ? সেই জীওলের আঠা, আর 'মাৎগুড়' বেমালুম মিশিয়ে চালান দিয়ে দিই। দেখবেন জিনিসটা ধরে কার সাধ্য!

মাথার চুল ছিঁড়ে বললাম—উঃ কী আর করবো—চল ব্যাটা সব কটাকে ধরে চালান দিইগে। একধার থেকে শূলে চড়াবি চল।…

মহারাণী বাদে, নরহরি থেকে দুন্দুভী পর্যন্ত সবাইকে ধরে নিয়ে মহারাজের সামনে হাজির করলাম। বললাম—এই শুনুন মহারাজ, এই বার্তা!

আফিঙে কেন মৌজ হয় না তার ফয়সালা হয়েছে।

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা শুনে, বুঝলি কিনা—বিশ্বাস করবি কিনা জানিনে, মহারাজ একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠলেন—বটে, আমার রাজ্যের চুনোপুঁটির পর্যন্ত এতো বুদ্ধি? একধার থেকে সকলের বেতন বৃদ্ধি হোক! আর নরহরিকে মানপত্র প্রদান করা হোক।

শুনে আমি তো বুঝতেই পারছিস? একেবারে নেই।

কারের কণ্ঠে শুধোলাম—মহারাজ, এমন দুর্বিপাকের কারণ কি? হতভাগা নরহরি মানপত্র পায় কোন আইনে?

মহারাজ চোখ পাকিয়ে বললেন—আবিষ্কারের পুরস্কার নেই? গুণের কদর নেই?··· আর দেখো কবরেজ, তোমার জন্যে ব্যবস্থা হচ্ছে—ছ' মাসের জন্যে জ্যান্ত গোর! তুমি যখন এই রাজ্যের আবহাওয়ায় বাস করেও এতো বোকা রয়ে গেছো, তখন তোমার জন্যে এই ব্যবস্থারই দরকার।··· নগর কোটাল! এঁকে নিয়ে গিয়ে ছ'মাস মাটির মধ্যে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করোগে। এযাবৎ দেশের জল হাওয়াতে কাজ হয় নি, এবার মাটির গুণ ফলে কিনা দেখি!

ব্যস, ঝপাঝপ্ কোদাল পেড়ে গোর খোঁড়া হয়ে গেলো। মহারাজ বললেন—কবরেজ, মেপে দেখো তুমি ওর মধ্যে ধরবে কিনা!

বললাম—আজ্ঞে অনায়াসে! তবে কিনা দুশ্চিন্তা হচ্ছে, এই ছ'মাস আপনাকে গল্প শোনাবে কে?

মহারাজ চোখ পাকিয়ে বললেন—তাই তো! এতোক্ষণ তো এ খেয়াল করিনি! · কোটাল, খবরদার!

কোটাল ঘাড় চুলকে বললো—আজ্ঞে গোর খোঁড়া হয়ে গেছে যে? আইনের মান থাকে না!

মহারাজ হাস্যবদনে বললেন—রাজ্যে তো লোকের অভাব নেই বাপু, কমবেশী সবাই সাড়ে তিন হাত। চালিয়ে দাও না কাউকে?· চলো কবরেজ গল্প শুনিগে।

তারপর বুঝলি কিনা, একাদিক্রমে তিনদিন তিনরাত গল্প। এক-টা করে শেষ হয়, আর মহারাজ নতুন উৎসাহে বলেন—কবরেজ লাগাও আর একটা।

শুনে হেসে বললাম—কবরেজ দাদু, সন্দেহ হচ্ছে এ গল্পের সবটাই ফাঁকি। যা খুসি বানাচ্ছো তুমি।

কবরেজ দাদু চটেমটে বললেন—'গল্প' শব্দের অর্থ কি হে বাপু? যা খুসি বানাতে না পারলে আবার 'গল্প' কি হলো? সাধে কি আর বলছিলাম—দেশ থেকে রাজরাজড়াও নির্মূল হ'লো, গল্পও ফুরোলো!··· তোমাদের কাছে গল্প বলতে বসলে 'যা খুসি' বলে পার পাওয়া যাবে? 'বাস্তব' আর 'সম্ভব' এই দু'টো শক্ত খোঁটা পুঁতে, তার চৌহদ্দির মধ্যে পাক খেয়ে মরতে হবে!

[১৩৬২]

ভবিষ্যৎ বাণী

আমার জ্যেঠামশাই মেয়েদের বেশী বুদ্ধি থাকাটা মোটেই ভালো চক্ষে দেখতেন না। চালাক-চতুর মেয়ে দেখলে ভারী চটে যেতেন। বলতেন—'মেয়ে জ্যাঠা'।

এতে 'জ্যাঠা' শব্দটির প্রতি অবিচার হচ্ছে কি না সে কথাও তলিয়ে দেখতেন না।

এ হেন মনোভাব নিয়ে, তিনি যে মেয়েদের সাহিত্যচর্চার সখকে সুচক্ষে দেখবেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর মতে মেয়েদের পক্ষে সাহিত্যচর্চার সখ একটা দুঃসাহসিক জ্যাঠামী! তেমন কারো সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হ'লে মেয়ে শব্দটার ওপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলতেন—'মেয়ে' কবি, 'মেয়ে' লেখক।

মেয়েদের পক্ষে সাহিত্যচর্চা যে অনধিকারচর্চা, এর সপক্ষে তাঁর হাতে নজীরও ছিলো। তিনি বলতেন 'শাস্ত্রে যদি মেয়েদের এ সব করতে বলবে, তবে ব্যাকরণশাস্ত্রে 'কবি' 'সাহিত্যিক' 'নাট্যকার' ইত্যাদি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নেই কেন?

এ কথার কি আর উত্তর দেওয়া যেতো না? যেতো। শাস্ত্রে তো কখনো নজীরের অভাব হয় না। পরস্পরবিরোধী অনেক নজীর আছে শাস্ত্রে, কিন্তু উত্তর দেবে কে? আমাদের ছেলেবেলায় একালের মতো জ্যেঠামশাইদের ভুল শুধরে দেবার আইন ছিলো না।

অবিশ্যি শুধু আমার জ্যেঠামশাইকে দোষ দিলেও ঠিক ন্যায্য হয় না। স্পষ্ট ভাষায় এ রকম নজীর না দেখালেও, কি সেকালে কি একালে, পুরুষজাতি যে মনে মনে কখনোই মেয়েদের একটু বেশী বুদ্ধি থাকাকে সমর্থন করেন না, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। মেয়েদের সাহিত্যচর্চাকেও না।

তবে না কি আধুনিক যুগে মানুষ মনের ভাব গোপন করতে পটু হয়েছে, তাই অভব্যতা করে 'মেয়ে লেখক' না বলে ভব্যতা করে লেখিকা বলা হয়। তাই ব'লে কি আর সহজে কেউ পাত্তা দিতে চান? চান না। যাঁরা নিজেরা ওই কাজের কাজী, তাঁরা তো সরস্বতীর কমল বনের দিকে মহিলার আবির্ভাব দেখলেই ভুরু কুঁচকে মাথা নেড়ে বলেন—'ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই ছোট এ তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'

ওই নেহাৎ লেখিকারা গিন্নী-বান্নী হয়ে গেলে, চুলের পাকামীটা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়লে, নিমরাজি হয়ে কিঞ্চিৎ জমি ছেড়ে দেন মাত্র।

সে যাক্—

একালের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে আগের কালের কথা। আমাদের বাড়িতে তেরশো আটাশ সালে বারোশো আটাত্তরের হাওয়া বইতো।

কেন বইতো, কে বহাতো, সে হলো গিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য। তবে মোটের

মাথায় পরিবারের সকলেই সেই হাওয়ার দ্বারা চালিত হতে বাধ্য হ'তো।

বাড়ির ক্ষুদ্রে পুরুষরা পর্যন্ত 'মেয়ে জ্যাঠা' পছন্দ করতো না, এবং নিজেদেরকে মা খুড়িমার অভিভাবক বলে গণ্য করতো।

বারো বছর পার হলেই মেয়েদের হারেমে রাখা হ'তো, এবং কোথাও যাবার দরকার পড়লে ঘোড়ার গাড়ির খড়খড়ি এঁটে, অন্ধকূপ হত্যার কাছাকাছি অবস্থা করে রাজরাস্তা অতিক্রম করানো হ'তো।

এই রকম অজস্র 'হ'তো' আর অসংখ্য 'হ'তো না'র উদাহরণ আছে, সে আর কতো লিখবো! মেয়েদের 'কি' করা উচিত আর 'কি' করতে নেই, তার বহুবিধ ধারা, তার অনুচ্ছেদ উপচ্ছেদ, সব কিছু মুখস্থ রাখতে হ'তো আমাদের।

তবে একটি শক্ত কাজ আমাদের করতে হ'তো না, সে হচ্ছে লেখাপড়া করা। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে ফেললেই যে 'কেসত্তা' পরপুরুষকে প্রেমপত্র লিখতে শুরু করবে, এ সম্বন্ধে অভিভাবকদের মধ্যে মতভেদ ছিলো না।

তবু এতো সতর্কতার মাঝখান থেকেও, সিমেণ্টের দেয়ালের ফাটলে অশ্বত্থ-চারার উঁকি দেওয়ার মতো আমি একটা মারাত্মক কাজ করে বসলাম। বারো বছর বয়সে এক প্রেমের কবিতা লিখে ফেললাম।

লিখলাম, পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেললাম।

সে যাই হোক, ভিতরে ভিতরে যাই করি না করি, লোক জানাজানি হবার কিছু ছিলো না, 'কাল' করলো আমার দিদি। পিঠোপিঠি দিদি, তার সঙ্গে আমার 'পিঠ' সংক্রান্ত ব্যাপারেরই আদান প্রদান ছিলো বেশী। দিদি আমার গোপন ভাণ্ডার থেকে কবিতাটি আবিষ্কার করে ফেলে সমাজে রাষ্ট্র করে দিলো।

আর সেই কবিতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে এক অনর্থপাত হয়ে গেলো। সেই কথাই বলবো।

সেদিন অবশ্য দিদিকে জীবনের পরম শত্রু বলেই মনে হয়েছিলো, দিদিও শত্রুতাসাধনরূপ মহৎ প্রেরণার বশেই কাজটি করেছিলো। কিন্তু এখন বুঝছি, দিদি অজান্তে আমার মস্ত উপকারই করে ফেলেছিলো। জানতে পারলে কি আর করতো?

কে জানে সেদিন সেই অকালপক্কতার পরিচয়টুকু লোক জানাজানি করে না দিলে, এ জীবনে কোনোদিন চক্ষুলজ্জা ঘুচতো কি না। হয়তো ঘুচতো না। গাছের ফুল গাছেই শুকোতো। আর—বাঙলা দেশের পাঠকগোষ্ঠী কী অমূল্য সম্পদ থেকেই না বঞ্চিত হ'তো তা'হলে!

সে যাক্—সেই কবিতার কথা বলি।

খবরটা যেই চাউর হয়ে গেলো, সকলের ভাব দেখে মনে হ'লো, আমার সেই প্রেমের কবিতাটুকু যেন বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চড় হয়ে সারা সংসারের গালে পড়েছে!

প্রথমেই মা দেখলেন। দেখে বললেন—ভেতরে ভেতরে এতো পাকা হয়ে

উঠেছো তুমি? জানতাম না। আচ্ছা, তোমাকে শায়েস্তা করা হচ্ছে! ছি ছি ছি! আমার মুখে চুনকালি দিলে তুমি!

বাবা দেখেই মুখ গম্ভীর করে বললেন—উঠিয়ে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে! ছিঁড়ে কুচি কুচি করে নর্দমায় ফেলে দাওগে ও কাগজ।

দাদাদের মধ্যে একজন বললেন—একদিন না খেতে দিয়ে ঘরে দোর বন্ধ করে রাখলেই কাব্যি বেরিয়ে যাবে!

আর একজন বললেন—আহা, সেই সঙ্গে ওর কবিতার খাতাটা, আর কিছু কবিতার বইপত্তর ঘরে রেখে দিও! বই দেখে টুকে মারতে হবে তো? নিজে লিখেছে! হুঃ!

জ্যেঠামশাই বকলেন না, শুধু দালানে পাইচারি করতে করতে বলতে লাগলেন—প্রতিকার করতে হবে, এর প্রতিকার করতে হবে। এতো স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না এ বাড়িতে। মনে করেছে বুঝি এ সংসারের মা বাবা নেই। সে ধারণা বদলে ছাড়ছি সবাইয়ের। কবিতা লিখেছেন মেয়ে! সাধে কি আর হেমবাবু লিখেছিলো—'কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থলেখা সাধ!'

জ্যেঠিমা সুরে সুর মিলিয়ে বললেন—সত্যি বাপু, সাহসকেও বলিহারি যাই! আর—সাহস হবে নাই বা কেন? ওপর থেকে আস্কারা পায়।

সমস্ত দিন বাড়িতে আর কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা হ'লো না, প্রধান আলোচ্য বস্তু হয়ে রইলাম আমি। আমি এই পবিত্র বাড়ির মেয়ে হয়ে পদ্য লিখেছি! তাও আবার ভক্তিমূলক বা করুণ রসাত্মক নয়—প্রেমের পদ্য!

সমস্তক্ষণ মনে হ'তে লাগলো 'পৃথিবী দ্বিধা হও'! ঘোরতর একটা কুকাজ যে করে ফেলেছি তাতে আর সন্দেহ রইলো না! অথচ কি যে করেছি তাও ঠিক ধরতে পারছি না।

দিদির আনন্দকুটিল মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না একবারও।

কিন্তু তবু তো চরম পরীক্ষা বাকী!

বাড়ির যিনি প্রধান শাসনকর্তা, জ্যেঠামশাইয়ের ডান হাত—নতুন কাকা, সেদিন বাড়ি ছিলেন না। কি জানি কোথায় যেন গিয়েছিলেন। বাড়ি এলেন পরদিন।

নতুন কাকা এসেছেন পর্যন্ত কাঁটা হয়ে বেড়াচ্ছি, গলার আওয়াজ বার করছি না, জোরে হাঁটছি না, ওঁর সামনে তো বেরোচ্ছিই না। মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ডাকছি যাতে ও প্রসঙ্গটা না ওঠে।

সেই অভিশপ্ত কাগজখানা হাতে পেলে যে বাবার আদেশই শিরোধার্য করে কুচিকুচি করে ফেলে দিতাম তাতে আর সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু কোথাও তার ছায়া দেখতে পেলাম না। কে যে সরিয়ে রেখেছে দলিল হিসেবে!

দেবতারা যে কালা, এ আমি বাল্যাবস্থা থেকেই দেখে আসছি। নইলে এতো ডাক শুনতে পান না? আর যদি শুনতে পেয়ে চুপ করে থাকেন, বুঝতে হবে মহা হৃদয়হীন!

আমার সেই আকুল প্রার্থনার কোনো ফল ফললো না, যথাসময়ে নতুন

কাকার দরবারে তলব পড়লো।

বাড়িতে আরও যতো ছোট ছেলেমেয়ে ছিলো, সকলেই আমার বধ্যভূমিতে গিয়ে হাজির হ'লো। আর আমার চোখের সামনে বিশ্বভুবন দুলতে শুরু করলো।

দেখলাম নতুনকাকার হাতে সেই কাগজ।

—এদিকে আয়।

আমি স্থাণু!

—এ দিকে আয়।

আমি অচল!

—এদিকে সরে আয় বলছি!

আমি মন্ত্রাহতের মতো এগোলাম।

—এ লেখা তোর?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

– নিজে বানিয়েছিস তুই?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। বলেছি তো মন্ত্রাহত অবস্থা!

—আমার সঙ্গে মিছে কথা?···হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন নতুন কাকা—আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি? বল কোথা থেকে চুরি করে লিখেছিস?

—কোথাও থেকে চুরি করিনি।

ততক্ষণে শুধু শিশুবাহিনী নয়, বাড়িসুদ্ধ সকলেই প্রায় সে অঞ্চলে এসে হাজির হয়েছেন।

নতুন কাকার দৃকপাত নেই, আমার সাড়া নেই। তিনি মুহুর্মুহু গলা চড়াচ্ছেন—ফের মিছে কথা? সেজ বৌয়ের এই ধুরন্ধর মেয়েটি বাড়ির আর সব ছেলে-মেয়েকে উচ্ছন্ন দেবে! এ বাড়িব ছেলেমেয়ে কখনো মিছে কথা বলেনি।

এতোক্ষণে বাকশক্তি ফিরে পেলাম। আরক্ত মুখে বলে উঠলাম—কক্খনো মিছে কথা নয়, নিজেই লিখেছি আমি।

—নিজেই লিখেছো তুমি? বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছো? লিখেছিস তো, বল এর মানে বল!···ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছিস? বল মানে? —"হৃদয়ে তোমার পরশ যে পাই দিবস রাতে"—এ কাকে লিখেছিস? এ 'তুমি'টা কে? বল শীগগির লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!

- জানি না!

—জানি না? তোমার হৃদয়ের খবর তুমি জানবে না তো আমি জানবো? জানো না তো লিখেছো কি ভেবে?

—জানি না।

—নাঃ তোমার অদৃষ্টে আজ মার আছে। সেজ বৌ, জিগ্যেস করো তোমার মেয়েকে এই 'তুমি'টা কে?

মা বললেন—তুমি করো ভাই, আমার আর রুচি নেই।

নতুন কাকা বললেন—দেখ্ যদি ভালো চাস তো বল—'চুরি করে লিখেছি।'

তা'হলে এবারের মতো মাপ করবো।

—মিছে কথা বলবো কেন শুধু শুধু ?

—সবটা তুই বানিয়েছিস ?

—হ্যাঁ !

—এ রকম আরো একটা লিখতে পারিস ?

—কেন পারবো না ? লিখেছি তো আরো একটা।

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়লো ! কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। আমার দুঃসাহসের বজ্রাঘাতে সকলের যেন বাকরোধ হয়ে গেছে।

নতুন কাকা এক টিপ নস্যি নিয়ে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—লুকিয়ে নাটক নভেল পড়া হচ্ছে তা' হলে ? বল সত্যি কথা !

আমি নির্বাক।

প্রতি মুহূর্তে আশংকা করছি—ঘরভেদী বিভীষণ দিদি না বলে দেয়। কিন্তু না, দিদি চুপ করেই থাকলো। তখন আবার দিদিকে দেবী মনে হয়েছিলো, এবং কী কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছিলাম !

পরে অবশ্য বুঝেছি, অতোটা কৃতজ্ঞতার বাজে খরচ করবার দরকার ছিলো না। দিদি যে বলে দেয়নি সে শুধু কেঁচো খুঁড়তে সাপ ওঠার ভয়ে ! দুজনেই তো এক পাপে পাপী !

নতুন কাকা সকলের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে নিবদ্ধ করলেন আমার দিকে।

বললেন—চমৎকার !··· সেজ বৌ যাচ্ছো কোথা ? মেয়ের বিদ্যের বহরটা দেখে যাও ? শোনো—

"হৃদয়ে তোমার পরশ যে পাই
দিবসে—রাতে !
তবুও পরাণ উথলিতে চায়—
কী বেদনাতে।

ভদ্দর লোকের বাড়ির ঘাগরাপরা মেয়ের 'পরাণ উথলে উঠতে চায়' এমন কথা শুনেছো এর আগে ? ওই ঘাগরা পরিয়ে পরিয়েই এই হয়েছে !···কী সেজবৌ, আর ঘাগরা পরাবে ধাড়ী মেয়েকে ?

মা নির্বাক নত নয়ন।

নতুন কাকা তিক্ত ব্যঙ্গের স্বরে তৃতীয় লাইন থেকে শুরু করেন—

"সারাদিন যেন পথ চেয়ে থাকি
কাহার আশে।
হতাশায় ফের নিবিড় আঁধার
ঘনায়ে আসে !"

—আগাপাশতলা জলবিছুটি ! হ্যাঁ, আগাপাশতলা জলবিছুটিই এর একমাত্র ওষুধ !

—মারোনা নতুন ঠাকুরপো ! মেরে ধরে যা করে হো'ক সোজা করতে

হবে তো মেয়েকে !—মা বললেন কাঁদো কাঁদো হয়ে :

নতুন কাকা সহসা উঠে দাঁড়ালেন। আর একটিপ নস্যি নিলেন, বললেন—মার? এই মেয়েকে মারবো আমি? আমার দ্বারা হবে না। তবে হ্যাঁ, মার লাগানো দরকার বটে।...বলে আর একটু এগিয়ে এলেন।

ভাবছি নির্ঘাৎ একটা চড় এগিয়ে আসছে গালের দিকে। কিন্তু না। নতুন কাকা মারলেন না। না মেরে যে আবার অধিক করা যায় সেই উদাহরণ দেখালেন।

এগিয়ে এসে কবিতা লেখা কাগজখানা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হেসে মার দিকে তাকিয়ে বললেন—মেয়েকে একটু সাবধানে রেখো সেজ বৌ! এক বাক্যে বলে দিচ্ছি, এ মেয়েকে সাবধানে না রাখলে ভবিষ্যতে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে 'ভাব' করবে!

নতুন কাকার সেদিনের ভবিষ্যৎ বাণীটি ফলেছিলো কিনা সে গল্প আর এখন লেখা চলে না। বড়ো নাতিটা আজকাল আবার সব পড়তে শিখেছে ; যা পায় টেনে নিয়ে পড়ে। এ গল্পের উপসংহার অন্য।

এই সেদিনে—নতুন কাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, পরম আদরে কাছে বসিয়ে বললেন—"হবে না? লেখিকা হবে না? আমার ভবিষ্যৎ বাণী বিফলে যাবে? বলিনি সেদিন? যেদিন ঘাগরাপরা একফোটা মেয়ে কবিতা লিখে বাড়িসুদ্ধু লোককে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলো, সেদিন বলিনি?—এ মেয়ে ভবিষ্যতে একটা জিনিয়াস হবে।"

[১৯৬২]

সংক্রামক

বেটক্করে ভুল রাস্তায় আসিয়া পড়ার মতো হঠাৎ এক অভিজাত আসরে আসিয়া পড়িয়া দিশেহারা হইয়া বেড়াইতেছিলাম।

মজলিশটা গানের। গায়ক সম্প্রদায়ের বেশ [illegible] আবির্ভাব ঘোষিত হইয়াছিল, সেই প্রলোভনের বশে [illegible] প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

পয়সার ব্যাপার নয়—এ সব জায়গায় প্রবেশাধিকার মেলে কেবলমাত্র খ্যাতির অথবা খাতিরের টিকিটে! বলা বাহুল্য খ্যাতিও নাই, খাতিরও নাই। সংগ্রহ যে করিয়াছিলাম, সে নিতান্তই আকিঞ্চনের সাহায্যে।

আসিয়া পড়িয়া—ওই যা বলিলাম, দিশেহারা হইয়া বেড়াইতেছি।

একেবারে অচেনা পাড়া। ধারণা ছিলো না—সভাটা এহেন অভিজাত সম্প্রদায়ের! স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মুখের দিকে চোরা চাহনি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছি, আর উত্তরোত্তর নিজেকে নিতান্ত অসহায় ঠেকিতেছে।

নানা বর্ণের নানা গড়নের মুখ, কিন্তু প্রত্যেকের মুখেই কী সুন্দর একটা স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব! দেখিলে হিংসা হয়।...ওদের মোটরগাড়ির আলো-পিছলানো মসৃণ দেহে পালিশের যে গাম্ভীর্য, সেই গাম্ভীর্যের পালিশ ওদের

চেহারায়।

আর আমরা।

চেহারায় গাম্ভীর্য নাই বলিয়াই আপ্রাণ চেষ্টায় মুখ গম্ভীর করিয়া আছি। অথচ কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। হাত পা চারখানা লইয়াও অস্বস্তির শেষ নাই। মনে হইতেছে—কিছুতেই শোভনতা ও সঙ্গতি রক্ষা হইতেছে না, আর ঘরসুদ্ধ লোক বুঝি সেই অসঙ্গতির দিকেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া আছে।

অনুষ্ঠানটা শুরু হইলেও কিছুটা সুরাহা হয়, কিন্তু তাই বা কোথায়? সুবিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ 'যথানিয়মে' আসিয়া পৌঁছিতে 'অযথা' বিলম্ব করিতেছেন, এবং সভার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে প্রস্তাব উঠিতেছে তাঁহাদের আনিবার জন্য গাড়ি পাঠানো হোক।

আসর বজায় রাখিতে একটি তরুণী রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাইলেন, একটি তরুণ কিছুক্ষণ যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করিলেন, আর একটি তরুণীকে অনুরোধ জানানোয়, তিনি 'হঠাৎ ভাঙিয়া যাওয়া' গলার দোহাই পাড়িয়া সে অনুরোধ এড়াইলেন···এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

ইহার মধ্যে বন্ধু বার দুই কনুইয়ের ঠ্যালা দিয়াছে। অর্থাৎ 'আর কেন? আর কাজ কি?'

আমারও যে সে ইচ্ছা মনে জাগে নাই তা নয়, কিন্তু সভার মাঝখান হইতে হঠাৎ উঠিয়া পড়ার জন্যও তো বেশ কিছু মনোবল থাকার দরকার? ভীড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে সরিয়া পড়া এক, আর এতোগুলো দৃষ্টির সামনে দিয়া 'দৃশ্যমান প্রস্থান' আর।

সে যেন একটা বন্য বর্বরতা!

ধৈর্যের সীমা যখন চরমে উঠি উঠি করিতেছে তখন আচমকা শৈলেশ একটা অস্ফুট 'উঃ' করিয়া উঠিল।

সবিস্ময়ে তাকাইলাম। আমার দৃষ্টির উত্তরে সে প্রায় অস্ফুট স্বরেই যা বলিল তার তাৎপর্য এই -কার্পেটের উপর একটা পিন্ না কি যেন পড়িয়াছিলো, কেমন করিয়া যেন সেটা তাহার হাতের চেটোয় সজোর হুল ফুটাইয়া দিয়াছে!

হাতটা চিৎ করিয়া সে আমাকে দেখাইল।

স্বপ্নেও ভাবি নাই বন্ধুর হাত চিৎ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভাগ্যের পাশাও চিৎ হইল।

হয়তো বন্ধুপ্রীতির আতিশয্যে, হয়তো—নেহাৎ নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়াছিলাম বলিয়াই, পিন-ঘটিত সেই দুর্নিরীক্ষ্য ছিদ্রটি নিরীক্ষণ করিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দিয়া ফেলিয়াছিলাম, অকস্মাৎ লক্ষ্য করিলাম আমার নিকটবর্তী মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটি কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

আলপিনের দ্বারা যতোটুকু রক্তপাত সম্ভব তার বেশী নয়, তবু বন্ধুত্বের নিদর্শন দিতে হাতটা ছাড়িয়া দিবার আগে বোধহয় একবার 'ঈস্' উচ্চারণ

করিয়াছিলাম, পরক্ষণেই নিকটবর্তী ভদ্রলোকটি আরো নিকটবর্তী হইয়া চাপা গলায় প্রশ্ন করিলেন—হাত দেখাব অভ্যাস আছে নাকি ?

কি উত্তর দিয়া বসিতাম কে জানে, সহসা শৈলেশের কাছ হইতে অলক্ষ্যে একটা তীক্ষ্ন চিমটি আসিল। তীক্ষ্ন এবং অর্থপূর্ণ। সে অর্থ প্রাঞ্জল।

কাজেই মৃদু একটি হাসির দ্বারা উত্তরটা এড়াইলাম।

বলাবাহুল্য হাসিটা স্বীকারোক্তির প্রকারান্তর মাত্র।…সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক 'খপ্' করিয়া নিজের ডান হাতখানি বাড়াইয়া ধরিলেন।

—দেখুন তো আমারটা একবার—

আবার চিমটি। আরো পরিষ্কার অর্থপূর্ণ।

ভারী কৌতুক বোধ করিলাম। এই পর্যন্ত তো কেহ একবার ডাকিয়াও শুধায় নাই। অতএব—যা থাকে কপালে। তবে নাকি গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে দর বাড়ানোর একটা রীতি আছে, তাই হাতটা 'হাতস্থ' করিয়াও মৃদুকণ্ঠে কহিলাম —এতো ভীড়ের মধ্যে ? তা ছাড়া রাত্তির বেলা খুব ঠিক হয় না।

ভদ্রলোক নির্বেদ সহকারে কহিলেন—তা হোক, হ্যঁয়ে মোটামুটি একটু—

তবে দোষ কি ? ইচ্ছাকৃত প্রবঞ্চনা নয়, দৈবযোগে প্রাপ্ত একটু নির্মল আনন্দ বৈ তো নয় ?

শুরু করিলাম হাত আপনার মোটামুটি মন্দ নয়, বরং ভালোই বলা উচিত। তবে—মাঝে মাঝে একটু ইয়ে—অবিশ্যি অবিচ্ছিন্ন ভালো অবস্থা আর কার জীবনে ঘটে বলুন ? কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু মানে, খুবই আসন্ন বলা যায়—একটা বিশেষ রকম আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আমার মনে হয় এ সময়ে নতুন কোন ব্যবসায় টাকা ফেলা বা কাউকে ধার দেওয়া ঠিক নয় আপনার পক্ষে।

এতোগুলো কথা বলিয়া গেলাম কেমন করিয়া কে জানে! নিজের বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হই!

ভদ্রলোক অস্ফুট স্বরে শুধু উচ্চারণ করিলেন—নতুন ব্যবসা!

লক্ষ্য করিলাম মুখখানি 'আমসি মারিয়া' গিয়াছে।

বুঝিলাম ঝোপ বুঝিয়া কোপ্ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ কথার কেরামতি চালাইয়া যাই। কখনো অস্ফুট কখনো স্পষ্ট কণ্ঠে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন কায়দায় বেখা বিচার করিতে থাকি, অতীতের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ ধরা পড়িবার বিপদ না ঘটে।

তবু বেশ বুঝিলাম ভদ্রলোককে পাড়িয়া ফেলিয়াছি।

আর শুনিলে বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না—ভদ্রলোকটিকে ত্যাগ করিবার আগেই একটি রঞ্জিতাধরা তরুণী প্রায় তাঁহার হাতের উপর দিয়াই বাড়াইয়া দেন—একখানি রক্তকমল সদৃশ করকমল।

—আচ্ছা বলুন তো, আমি পরীক্ষায় কি করবো ? বলুন না ?

আদুরে আদুরে মিহি গলা।

বুকের ভিতর হাতুড়ীর ঘা পড়িল! এ কি খাল কাটিয়ে কুমীর আনিলাম! ভদ্রলোকের সঙ্গে মজা করা, আর ভদ্রমহিলার সঙ্গে ছলনা করা কি এক? এখন কি বলি, আর কি না বলি?

শৈলেশ হতভাগাকে বধ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেটা তো সম্ভবপর নয়! তাই স্বপ্নেও কখনো যে স্বর্গবাসিনীদের ছায়া মাড়াইবার স্পর্ধা করি নাই, তাহাদেরই একজনের কোমল করপল্লব নিজের হাতে তুলিয়া লই। অনায়াসে না হোক— অনায়াস ভাবে।

কথায় বলে সর্বনাশের পথ একবার কাটিলে আর সে পথ হইতে ফেরা যায় না। সে সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করি এবং দুষ্টু সরস্বতীকে স্কন্ধে লইয়া নাপবোঝা সেই কাটাপথে আগাইয়া যাই।…

বার বার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সেই করপল্লবকে নিরীক্ষণ করিতেছি এবং থাকিয়া থাকিয়া শৈলেশের কাছ হইতে অলক্ষিত চিমটি খাইতেছি। সংকেতের অর্থ আর কিছু নয়, সর্বনাশের পথ হইতে কিছুতেই যেন নিবৃত্ত না হই, তাহারই সংকেত। বন্ধু বন্ধুর স্বধর্ম পালন করিতেছে, সর্বনাশের দরজা চিনাইয়া দিয়া অলক্ষ্যে পিছন হইতে ঠেলা দিতেছে। কিন্তু শেষ রক্ষার উপায় কি? কপালে কাল ঘাম ফুটিয়া উঠিতেছে যে!

ঘামিতে ঘামিতে কি করিয়া কে জানে, সহসা আমিও কেমন যেন আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠি।

কিসের দ্বিধা? চালাইয়া যাইতে ক্ষতি কি? ভাঁওতার উপরই তো জগৎ!

গম্ভীর ভাবে বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর রায় দিই—পরীক্ষা সম্বন্ধে কিন্তু কিছু সন্দেহ রয়েছে আপনার। এ বছরটা আপনার· ·মানে—এই যে সূক্ষ্ম রেখাটা দেখছেন? নতুন উঠেছে এটা, এ রেখা অসাফল্য সূচিত করে। থাক্, তা' বলে আগে থাকতে ভেঙে পড়লে চলবে না, চেষ্টা করতে হবে—

কথা শেষ না হইতেই মেয়েটা সেই ভাঙিয়াই পড়ে! হতাশায় নয়, হাসিতে! বেয়াড়া হাসি হাসিতে হাসিতে যা বলে তার সারমর্ম এই—ফেল করিতেই নাকি ভীষণ মজা লাগে তার, অতএব সে জন্য চিন্তা নাই! তাহার হাতের কোনোখানে সমুদ্র যাত্রার রেখা আছে কি না সেইটুকুই জানা দরকার। সমুদ্র পার হইবার এতো সাধ তার, কিন্তু কিছুতেই নাকি ঘটিয়া উঠিতেছে না।

আদুরেপনা দেখিয়া গা জ্বালা করে, তবু আরো গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলি —সমুদ্র-পার আপনার ভাগ্যে নেই। একেবারেই না।

বলিতে বাধা কি? সঙ্গে সঙ্গে অপ্রমাণিত হইবার আশঙ্কা তো' নাই?… বলার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি মেয়ে সরিয়া আসিয়া বলে—আচ্ছা দেখুন তো, ওর বিয়ের রেখা উঠেছে কি না, বিয়ে করবারও ভীষণ সাধ ওর।

—এই মঞ্জু, খবরদার! চালাকি করিসনে বলছি। না না. আপনি বরং এই মঞ্জুর হাতটাই দেখুন, বিয়ের জন্যে ওরই ঘুম হচ্ছে না।

এদের আচরণে এমনভাব প্রকাশ পায় না যে, আমি একজন সম্পূর্ণ

অপরিচিত ব্যক্তি !

সাধে বলিয়াছি—ভাঁওতার ওপরই জগৎ। ইহারা আমাকে ডাকিয়া কথা কহিবে, কিছুক্ষণ আগে এ সম্ভাবনা কি ওদেরও মনের কোণে ছিল ?

অগত্যা মঞ্জুর করকমলখানিও বাগাইয়া ধরিতে হয়। নিরীক্ষণ করিবার ভান করিতে হয়. আর—বলিলে বিশ্বাস করিবেন কি না জানিনা—হঠাৎ এ সময় চেতনা পাইয়া দেখি, ডজনখানেক মঞ্জুহাসিনী, কলগুঞ্জন শুরু করিয়া দিয়াছেন আমারই আশে পাশে। আর—মৌমাছি পরিবেষ্টিত মধুচক্রের মতো, শ্যালিকা পরিবেষ্টিত বাসরের বরের মতো, বালক পরিবেষ্টিত দুগ নিওগার মতো, আমি বিরাজ করিতেছি তাঁহাদের মাঝখানে।

মাথা ঝিম [illegible] করিতে থাকে। চোখের সামনে সর্ষের ফুল ভাসিয়া ওঠে। অ[illegible] আগে যাঁহাদের মুখ দেখিয়া মনে হই[illegible] তা[illegible] [illegible]র বস্তু আর কিছুই নাই, সকলেই তাহারা আমার [illegible] আসিয়া [illegible] ছেন !

ঈশ[illegible] [illegible] রেখেছো আমার অপ[illegible] নাই

নির্বি[illegible] [illegible]নে বসিয়া [illegible] সেই ডজন খানেক মহিলা গ্রহণ করি। এবং [illegible] মুখে আসে বলিয়া যাই। নিজের [illegible]ঠস্বর অপ[illegible] ভ্রম হয়, তবু বলি ! শনি মঙ্গল রবি চন্দ্রের মুণ্ডপাত করি। 'একাদশে [illegible]' 'দশমে চন্দ্র' 'সপ্তমে রাহু' ইত্যাদি—আন্দাজমতো লাগসই শব্দগুলো বেপরোয়া ব্যবহার করিয়া যাই। [illegible] আশু সৌভাগ্যের আকাশে তুলি, কাহা[illegible] অদূরবর্তী [illegible]ঃসময়ের মাটিতে আছাড় দিই। কাহাকেও গোমেদ ধারণ করিতে বলি, কাহাকেও বা রক্তপ্রবাল।

কেমন করিয়া যে বলি কিছুতেই বুঝিতে পারি না, তবু বলি !

আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবে, এমন ভরসা কাহারও মুখের চেহারায় পাই না, তবু পরামর্শ দিই !

শুধু ভারী ভয় লাগিতেছে অদূরবর্তী ওই উন্নাসিকা ভদ্রমহিলার দিকে তাকাইয়া।

তরুণী বা প্রৌঢ়াও বলা চলে না, ভারী গড়নের 'ভারত্ব' লইয়া বেশ খানিকটা জমি দখল করিয়া বসিয়া আছেন যিনি ! কিন্তু শুধুই তো বসিয়া নাই, আমাদের দিকে এমন অবজ্ঞা ও বিরক্তিমিশ্রিত তীব্র দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া আছেন যে সে দিকে চোখ পড়িতেই বুক দুড়দুড় করিয়া উঠিতেছে।

আর—চোখ পড়িতেছেও ঘন ঘন। পড়িবেই যে ! নিঃসন্দেহ বুঝিতেছি উনি আমার ভাঁওতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

জানিনা সভার মধ্যে অপদস্থ হইবার জন্য কতোটা প্রস্তুত থাকা দরকার।

আচ্ছা উনি ধরিয়া ফেলিলেন কেমন করিয়া ? বিদ্যাটা ওঁর নিজেরই আয়ত্তে নাই তো ? না কি মেয়েদের এই বাচালতাগুলাই অপছন্দ করিতেছেন !··· কিন্তু দৃষ্টিবাণ কি এতো তীক্ষ্ণও হয় ?

আরো কতোক্ষণ কি হইত বলা যায় না, হঠাৎ বাহির হইতে একটা চাঞ্চল্যের ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিলো—'এসে গেছেন, এসে গেছেন !'

অর্থাৎ অধীর প্রতীক্ষার কিছুটা নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। সব ক'জনের না হোক, একজন শিল্পীরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

এই গোলমালে করকোষ্ঠি বিচারের প্রহসন শেষ হইল।

চুপি চুপি শৈলেশকে বলি—এই হতভাগা, ভালো চাসতো চল, এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালাই।

শৈলেশ এ প্রস্তাব দিব্য উড়াইয়া দিয়া বলে—সে কিরে ? এতোক্ষণ থাকার পর ? 'আনার হোসেন' এসে গেছে যে !

—বেঁচে থাকলে আনার হোসেনের খেয়াল ঢের শোনা যাবে ! এদিকে যা বদখেয়াল করা হলো, তার 'ম্যাও' সামলাবে কে ?…উঃ এতোক্ষণ ধরে কী মারাত্মক কাণ্ড যে চালিয়ে যাচ্ছিলাম—

শৈলেশ মুচকি হাসির সঙ্গে বলে—বড্ডো যে বলিস ভারী না কি মুখচোরা তুই ? কাণ্ড দেখে তো মনে হচ্ছিল না বাপু ? "মুখচোরা" ! মুখে তো ডাকাতি চালাচ্ছিলে বাবা !

গম্ভীর ভাবে বলি—সে কি আমি চালাচ্ছিলাম ? চালাচ্ছিলেন স্বয়ং গ্রহরাজ শনি। কিন্তু এখন এখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয় মনে হচ্ছে।

—ক্ষেপেছিস।—শৈলেশ আত্মস্থভাবে বলে—ধরে তো মারবে না কেউ ? কিন্তু কেমন পসার জমে গেলো দেখ দিকি ? আমার দস্তুরমতো ঈর্ষা হচ্ছিলো তোর ওপর। নীচু সুরে তর্জন করিয়া বলি—বটে ? ঈর্ষা ? দয়া নয় ? ওই মহিলাটিকে দেখেছিলি ?…ইসারায় তাঁহাকে দেখাইয়া বলি—কী কটাক্ষ করেছিস ? বুকের ভেতর হিম হয়ে যাচ্ছিল।

শৈলেশ বলে—লক্ষ্য করেছি। মাঝে মাঝে পাশের লোকটিকে বলছিলেন শুনছিলাম—'যতো সব বোগাস্ ! ছেলেটা ? স্রেফ্ বাজে কথা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব মেয়েরা হয়েছে তেমনি, প্রেষ্টিজ বলে কিচ্ছু নেই।…আমি তো ভাবতে পারিনে কী করে এই সব বিশ্বাস করে মানুষ।' মন্তব্যগুলি কানে আসছিলো এক একটা।

—দেখ্ এখনো এই ফাঁকে গোলেমালে পালানো যেতো।

—দূর, তা' হলে সন্দেহ আরো বেড়ে যাবে। তা' ছাড়া আমি তো বাবা ফাঁসি গেলেও আনার হোসেনের খেয়াল না শুনে নড়বো না।

অগত্যা আমারও সেই গতি ছাড়া আর কি ?

আনার হোসেনের খেয়াল, শশী ভট্টাচার্যের ধ্রুপদ, মহেশ্বর লালের সরোদ, মণিমালিকা সমাদ্দারের রবীন্দ্র সঙ্গীত, সাধনা সেনের নৃত্য ! ঘড়ির কাঁটা সরিতে সরিতে কোথায় ঠেকিয়াছে খেয়াল থাকে না, কিছু পূর্বের দুষ্কৃতির কথা স্মরণ মাত্র নাই—হঠাৎ "সবখেলা সাঙ্গ" হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া বজ্রাহত হইয়া গেলাম !

এতো রাত হইয়াছে !

ট্রাম বাস পাইবার কোনো আশা কি আর আছে ?

আমরা এই দু'টো হতভাগা ভিন্ন প্রত্যেকেরই "দোরে বাঁধা হাতী !" তাদের চিত্ত নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমরা এতোক্ষণ কোন আক্কেলে নিশ্চিন্ত চিত্তে বসিয়া আছি ?

উঠি তো পড়ি করিয়া চকচকে ঝকমকে জুতার সারি হইতে ছেঁড়া চপ্পল দু' জোড়া উদ্ধার করিয়া ছুটিতে ছুটিতে মোড়ের মাথায় গিয়া দাঁড়াই। যদি কোনো আত্মভোলা ট্রাম গাড়ির দর্শন মেলে এই আশায় !

কিন্তু কই ?

আমাদের নাকের উপর দিয়া পর পর মোটরগাড়িগুলো সোজা বাহির হইয়া যাইতেছে, একটি আধটি আরোহী হৃদয়ে ধারণ করিয়া। দেখিয়া সর্বশরীর 'রি রি' করিতে থাকে।···হায় ! এমন হৃদয়বান গাড়ি কি জগতে একখানিও থাকিতে নাই, যে গাড়ি বারোটা রাত্রে ট্রাম বাসের আশায় পথ পানে চাহিয়া থাকা পথিককে ডাকিয়া বলে—"আছে আছে স্থান !"

বলে না বলিয়াই জানি। কখনো তেমন মহানহৃদয় গাড়ি দেখি নাই !

কিন্তু বিধাতা কি পরিহাস করিলেন ?

যখন শৈলেশ লক্ষ্মীছাড়া সহসা নির্দয় ভাবে প্রস্তাব করিয়াছে—"কি আর করা যাবে ? হণ্টন দেওয়া যাক—", আর চমকিত আমি বড়লোকপাড়ার সুদূর বিস্তৃত নির্জন পথের পানে হতাশ দৃষ্টি বিছাইয়া দিয়া সে প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বিচার করিতেছি, তখন সহসা একখানি গাড়ি আমাদের সামনে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।

তারপরই স্পষ্ট একটি কণ্ঠস্বর।—বাচ্চু, জিগ্যেস কর না ওঁরা কোনদিকে যাবেন ?

ভগবান ! তুমি কি তবে সত্যই আছো ?

বানানো গল্প ভাবিতে পারেন, কিন্তু সত্য সত্যই ঘটনাস্রোত এইভাবে রূপায়িত হইতে থাকে।

"বাচ্চু" নামক বালিকা অথবা বালকটির প্রশ্নে আমরা যা জবাব দিই, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ভিতর হইতে একটি বিনীত অনুরোধ আসে।·· গাড়িতে আরোহণের অনুরোধ !

একি স্বপ্ন ? একি মায়া ?

আমরা হাতে চাঁদ পাওয়ার মনোভাব লইয়াও—"না না কিছু দরকার নেই, ট্রাম পেয়ে যাবো" ইত্যাদি কতকগুলো ছেঁদো কথা বলার পরে নিমরাজী হই ! গাড়ির দরজা খুলিয়া যায় এবং তালিমারা চপ্পলপরা কম্পিত চরণ দু'জোড়া লইয়া এক সময় ঢুকিয়াও পড়ি।

আর—আর—সাজানো-ঘটনার মতো, নিতান্তই সত্য-ঘটনা স্রোতের তাড়নায় স্তম্ভিত হইয়া যাই !···আমি হতভাগ্য ঠিক যাঁহার পার্শ্বস্থ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম তিনি আর কেউ নন, সেই—"তিনি !"

যাঁহার ধারালো দৃষ্টির সুতীক্ষ্ন ফলা কিছু পূর্বে মর্মস্থলে কাটিয়া

কাটিয়া বসিতেছিলো!

নাঃ চিনিতে ভুল হয় না, গাড়ির মধ্যে তীব্রবেগে বিদ্যুৎবাতি জ্বলিতেছে!

অতঃপর?

কি ভাবিতেছেন আপনারা?

কানমলা খাইলাম?

না। কানমলা নয়, খাইলাম আছাড়! মানে—মানসিক আছাড়!

গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পার্শ্ববর্তিনী অলঙ্কারের মৃদু শিঞ্জণ তুলিয়া রেশমী শাড়ির আঁচলের নীচে হইতে ডান হাতখানি বাহির করিয়া আমার সামনে বাড়াইয়া দিলেন।

—খুব তো 'ইয়ে' করছিলেন তখন? দেখুন দিকি একবার আমার হাতটা? আমার অবশ্য বিশ্বাসটিশ্বাস মোটেই নেই, শুধু একটু কৌতূহল!

[১৩৬২]

বদ্ধপাগল

গাড়ি ফেরৎ দিতে হলো।

ছেলে হয়ে এতো শত্রুতা করবে বিলটু, একথা শকুন্তলা ভাবতেই পারেনি আগে। দীর্ঘ সাধনার শেষে সিদ্ধি হাতে এসে কিনা, পড়ে গেলো হাত ফস্কে, দুস্তর নদী পার করে আনা তীরে ঠেকা নৌকো পুঁতে গেলো পাঁকে, পূর্ণ পানপাত্রখানি মুখে তুলতে গিয়ে রাখতে হলো নামিয়ে! আর এর কারণ হলো কে? না শকুন্তলার নিজেরই পেটের ছেলে! এ ক্ষোভ রাখবার জায়গা কোথা?

গাড়ি ফেরৎ যাবার পর নাতি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন নিশিকান্ত, ভয়ে লজ্জায় আর দুঃখে মর্মাহত সন্তোষ কোথায় পালিয়েছে কে জানে, ননীবালা মনের আনন্দ গোপন করতে ভাঁড়ারে ঢুকে অকারণে শিশি বোতল হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লেগে গেছেন, আর শকুন্তলা কোনো দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরে এসে গুম্ হয়ে বসেছে।

কার উপর রাগ ফলিয়ে মনের জ্বালা প্রশমিত করবে সে? নিজের ছেলেকে একটা চড় বসিয়ে দেবারও অধিকার নেই বেচারার। মারা তো দূরের কথা, একটু ধমকে দেবারই জো আছে না কি? তা হ'লে—ছেলের ঠাকুমা ঠাকুর্দা দু'জনে দু'দিক থেকে তেড়ে আসবেন শকুন্তলার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে! কারণ তাঁরা নাকি নাতিকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন।

গাড়ি ফেরৎ দেবার সময় ছেলেটাকে ধরে তালগোল পাকিয়ে আছড়ে ছুঁড়ে ফেলবার অদম্য ইচ্ছেটা কী ভাবে যে দমন করতে হয়েছে শকুন্তলাকে, সে শুধু তার অন্তর্যামীই জানেন।

অনেকক্ষণ ধরে নীরবে বসে ফুঁসতে থাকে শকুন্তলা, তারপর চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। দাদাশ্বশুরের আমলের বাড়ি, কালের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে জানালায়, দরজায়, দেওয়ালে। তবু ওই দেওয়ালেরই সর্বাঙ্গে পেরেক পুঁতে পুঁতে টাঙানো আছে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পট। যদিও কালের হাওয়ায় আর ধুলোয় ধোঁয়ায় দেবতারা প্রায় বিলুপ্ত, কে কোন মূর্তি বোঝা দায়!

তাকিয়ে দেখলো শকুন্তলা।

দেওয়ালগুলো ক্ষত বিক্ষত, মাথার উপর দোদুল্যমান বিছানার 'চাল', দেওয়ালের কোণে কোণে জলচৌকী, আর বেঞ্চের উপর থাকে থাকে সাজানো ট্রাংক সুটকেস ক্যাশবাক্স। এপাশে চৌকীতে এই বিছানা, শকুন্তলা বসে আছে যেখানে। কয়েকটা দিন সন্তোষ এসে রয়েছে বলে আপাততঃ সে শয্যায় কিছুটা সমারোহের আভাস, কিন্তু সে সমারোহ মিলিয়ে যাবে, আজ নয়তো কাল। সন্তোষ চলে যাবে, পড়ে থাকবে শকুন্তলা। পড়ে থাকবে শকুন্তলার শ্রীহীন সজ্জাহীন একক শয্যা।

বিলটু' অর্থাৎ যে ছেলের জন্যে এই বিরক্তিকর পরিবেশে আটকে থাকা, সেও তো মায়ের বিছানার ধারে কাছে ঘেঁসে না। 'দাদু' 'দিদা' নইলে তার সব কিছু অচল।

ঈর্ষা?

হ্যাঁ ঈর্ষাই হয় শকুন্তলার। শ্বশুর শ্বাশুড়ী যে তাঁর ছেলেটিকে প্রাণতুল্য দেখেন এতে তার আনন্দ নেই, ছেলেও যে তাঁদের প্রাণতুল্য দেখে এইতেই শকুন্তলার জীবনের স্বাদ তিক্ত। মা কোলে নিতে গেলেই যে ছেলে মাকে মেরে চুল ছিঁড়ে দিয়ে "তুমি থাই বিথ্থিরি পচা—" বলে পালিয়ে যায়, সে ছেলে নিয়ে বুকটা ভরে ওঠবার অবকাশ কোথায়? অথচ তার জন্যেই এইখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে শকুন্তলাকে। তার জন্যেই শকুন্তলার স্বর্গে যাবার গাড়ি ফেরৎ দিতে হলো।

স্বর্গে? তাছাড়া আর কি?

পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে শকুন্তলার, পাঁচ বছর এইখানেই পড়ে আছে। সন্তোষ থাকে কলকাতায় মেসে, ছুটিছাটায় বাড়ি আসে।

গতানুগতিক পল্লীবধূর ভূমিকা!

বরাবর এই ভূমিকাই অভিনয় করে যেতে হবে শকুন্তলাকে? যে শকুন্তলা একদা কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠের একটি চৌকস মেয়ে ছিলো! দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ে হতে হতেই বাপ গেলেন মারা, মা তো শৈশবেই গেছেন। অতএব পিত্রালয়ের পথ আর কুসুমাস্তীর্ণ রইলো না। এদিকে আবার বিয়ে হতে না হতেই বৌকে বাসায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করতে পারবে এমন চৌকস ছেলে সন্তোষ নয়। মা বাপের একছেলে, নিতান্তই নম্র বিনীত ভালো ছেলে। যদিও উপার্জন ভালোই করে, সহরে আলাদা সংসার পাতা শক্ত নয় তার পক্ষে, আর সেইখানেই শকুন্তলার যতো আক্ষেপ। যেখানে সুখী হবার পক্ষে সত্যকার কোনো বাধা নেই, সেখানে কল্পিত একটা বাধা সৃষ্টি করে জীবনটা বরবাদ দিয়ে যাচ্ছে সন্তোষ, সঙ্গে সঙ্গে বরবাদ যাচ্ছে শকুন্তলার, এ ব্যবস্থা সত্যিই অসহ্য।

বিয়ের পর প্রথমেই শকুন্তলা ঘোষণা করেছিলো 'আমি এখানে থাকতে

পারবো না, হাঁপিয়ে মারা যাবো।' তখন সন্তোষ আশ্বাস দিয়েছিলো 'কিছুটা দিন মা বাবার কাছে থাকো, নইলে ওঁরা বড়ো দুঃখ পাবেন। তারপর তো তুমি, আর আমি।'

কিন্তু সন্তোষের হিসাব মতো 'কিছুটা দিন' সাঙ্গ না হতেই এলো বিলটু। এ ছেলের নাম বিলটু না রেখে 'বিচ্ছু' রাখাই উচিৎ ছিলো। ছেলে তো নয় শকুন্তলার, যেন পূর্বজন্মের শত্রু। কী যে 'দাদু দিদা' চিনলো, তাঁদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন যেন উঠতেই পারে না।

শকুন্তলা রাগ করে বলে—বেশ, তবে সকলকেই কলকাতায় নিয়ে যাও?

সন্তোষ হেসে ওঠে—ওঁরা যাবেন দেশ ছেড়ে কলকাতার পায়রার খুপ্‌রি বাসায়? তা'হলেই হয়েছে!

—কেন? দেশ ছেড়ে সহরে যায় না কেউ?

—যাবেনা কেন? সবাই যাচ্ছে। কিন্তু ওঁরা? অসম্ভব!

এতে শকুন্তলার আরো গাত্রদাহ হতে পারে কি না? ওঁরা? অসম্ভব!' কেন, ওঁরা কি? সবাই যা পারে, তা ওঁরা পারবেন না! কারণ? কারণ— 'ওঁরা হচ্ছেন 'ওঁরা!'…এ ছাড়া কারণ আর কি থাকতে পারে? ওরা পায়রার খুপরিতে গিয়ে থাকতে পারবেন না, তাই শকুন্তলাকেই চিরকাল পড়ে থাকতে হবে এই কবরখানায়। তা'ছাড়া আর কি?

সন্তোষ তো তা'কে কবরে পুঁতে রেখে দিয়েছে।

না শকুন্তলা লড়বে।

সন্তোষের 'ভালোছেলে'গিরি ঘুচিয়ে, যাবেই কলকাতায়। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলো শকুন্তলা। দিনে দিনে কাগজের গায়ে কালির আখর আর অশ্রুজলের আঁচড় টেনে টেনে অবশেষে মন টলিয়েছিলো সন্তোষের।

তাই মা বাপকে চিঠি লিখে, ছুটি নিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিতে এসেছিলো সন্তোষ।

অবশ্য স্ত্রী-পুত্রকে কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাবের সঙ্গে একথা লিখতে হয়েছিলো সন্তোষকে, ঠিক তা'র পাশের ঘরেই এমন একটা লোক এসে ভর্তি হয়েছে, যে হরদম কাসে। আর কাসিটা কেমন সন্দেহজনক। অতএব প্রাণভয়ে ভীত সন্তোষ মেসের বাস তুলে দিয়ে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ফেলেছে। আর তার প্রতিফল স্বরূপ খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কষ্টের একশেষ হচ্ছে। অতএব—

ছেলের কাছে বৌকে পাঠাবার ব্যাপারে যতোই বিপক্ষে থাকুন, তথাপি ছেলেকে 'সন্দেহজনক কাসি'র পাশাপাশি থাকতে বলবেন, এমন হৃদয়হীন বাপ মা অবশ্য নিশিকান্তে ননীবালা নন। অতএব তাঁদেরও বলতে হয়েছিলো, 'তা বেশ! তুমি যাহাতে সুখে থাকো, আমাদের তাহাতেই সুখ।'

এতোটা অনুকুল অবস্থাকে ভেঙ্গেচুরে ছত্রখান করে দিলো শকুন্তলার নিজের ছেলে!

'গাড়ি চড়ে শুধু মা-বাবা আর বিলটু যাবে, দাদু দিদা যাবে না' এই শুনেই হতভাগা ছেলে যা তাণ্ডব শুরু করে দিলো, তা' অবর্ণনীয়। তিন বছরের ছেলের গায়ে যেন তিরিশ বছরের জোয়ান লোকের শক্তি। সে শক্তির দাপট দেখে সন্তোষ হতভম্ব, শকুন্তলা প্রস্তর প্রতিমা, নিশিকান্ত বিব্রত, আর ননীবালা পুলকিত। কে জানে এই 'নটরাজ লীলা'র মধ্যে তাঁর নিজের হাতের অদৃশ্য কোনো কলকাঠি নিহিত আছে কি না! 'শুধু বিলটু যাবে, দাদু দিদা এখানে পড়ে থাকবে' এ কথাটা নিতান্ত গভীরভাবে শিশুর মর্মে প্রবেশ করিয়ে দেবার ভারটা কি আর নেননি ননীবালা?

গাড়ি আসতে দেখেই বিলটু 'কেন আমায় নিয়ে যাবি? কেন আমায় নিয়ে যাবি?' এই অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে মাকে মেরে শেষ করলো, তা'র চুল ছিঁড়লো, শাড়ি ছিঁড়ে দিলো, পা ছুঁড়ে ধাক্কা মেরে ভাঙলো চায়ের পেয়ালা, কাঁচের গেলাস। দুধের বাটি ফেললো উল্টে, শেষ পর্যন্ত বাপের হাত কামড়ে দিয়ে ছিটকে নেমে ভেলভেটের সুট পরে উঠোনের কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে চেচাঁতে লাগলো—'আমি যাবো না! আমি যাবো না।'

একটি মাত্র কথা!

যুক্তি-তর্কহীন একটি মাত্র প্রতিবাদ!

তবু কী প্রবল শক্তি তার!

পাড়ার লোক জড়ো হয়েছিলেন বিস্তর, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা দেখতে নয়, বিলটুর তারস্বর চীৎকারে। তাঁরাই শেষকালে বললেন—ক্ষ্যামা দাও বাবা সন্তোষ! ও হবে না।

অতঃপর কেঁদে ফুলে ওঠা মুখে বিজয় গৌরবের দর্পিত হাসি হেসে দাদুর কোলে চড়ে বেড়াতে গেলো বিলটু, সন্তোষ পালালো, ননীবালা হাসি গোপন করতে ঢুকলেন ভাঁড়ার ঘরে, আর শকুন্তলা গুম্ হয়ে বসে ভাবতে থাকলো···আবার এই ঘরেই থেকে যেতে হবে তা'কে, বাঁধা বিছানা খুলে গোছানো বাক্স ছড়িয়ে ফেলে।

আর?

আর আবার সেই নিঃসঙ্গ রাত্রি, সেই ঘুম থেকে উঠেই সামনের দেওয়ালের ওই রং জ্বলে যাওয়া অনন্ত শয্যার পট, সেই ঘর থেকে বেরিয়েই চোখে পড়বে ননীবালার 'নিত্য-কর্ম কৌমুদী'র প্রথম পাঠ। সকাল হ'তেই সারাবাড়িতে গোবর গোলা জল ছড়িয়ে বেড়ান ননীবালা। বিরক্তিকর কুশ্রী দৃশ্য।

অথচ দিনের পর দিন ঘুম থেকে উঠে এই কুশ্রী দৃশ্যটা দেখতেই হবে শকুন্তলাকে।

কোথায় সেই কল্পনার স্বর্গ শকুন্তলার!

যেখানে সকালের আলো এসে পড়া জানালার ধারে ছোট্ট একটি বেতের টেবল্ আর দু'খানি বেতের চেয়ার পেতে বসবে চায়ের আসর! যেখানে ভরন্ত পেয়ালার সোনালি চায়ের মতোই ছলকে উঠবে ভরন্ত হৃদয়ের সোনালী চাঞ্চল্য।

কোথায় সেই স্বর্গলোক, যেখানে নীল বিদ্যুৎ জ্বালা ঘরে বিদ্যুৎ বাতাসে উড়বে বালিশের ঝালর, উড়বে রঙিন বেড্‌কভারের তেরছা কোণটুকু। বাতাসে কাঁপবে মশারীর চাল, সুখের বেদনায় কাঁপবে শকুন্তলার বুক!

সাদা দেওয়ালের কোথাও কোনোখানে থাকবে না চিহ্ন। সেখানে শুধু ঘুম থেকে উঠে সামনেই রবীন্দ্রনাথের আজানুলম্বিত আলখাল্লা পরা দাঁড়ানো ছবি একখানি, আর কোণের দিকে শকুন্তলার সেতার—যে সেতারটা এখানে মাকড়সার ঝুলে ভর্তি হয়ে চৌকীর তলায় পড়ে আছে।

এ স্বর্গ এখনি গড়া যায়।

এ স্বর্গের চাবি আছে সন্তোষের হাতে।

—আলো জ্বালা হয়নি?

ছোট্ট এই প্রশ্নটুকু ধ্বনিত হলো অন্ধকার ঘরে।…ওঃ তাইতো, কোন ফাঁকে গোধূলির আলো নিভে গিয়ে রাত নেমেছে পৃথিবীতে। খেয়াল হয়নি! যাক—তবু এতোটুকু ব্যস্ততা দেখালো না শকুন্তলা। বসে থাকলো নিশ্চল হয়ে।

বাইরে থেকে ঘরে এসে চৌকীর ওপর বসে পড়ে সন্তোষ।

'কি করবে? তোমার কপাল!' এই সুরে সান্ত্বনা দেয়—রাগ করে আর কি হবে, নিজের ছেলেকেই যখন কন্ট্রোলে আনতে পারো না।

শকুন্তলা দাঁতে দাঁত চেপে বলে—আমার ছেলে বলে কেউ নেই।

—ছি ছি ছি! সন্তোষ শিউরে ওঠে—কী যা তা বলছো?

—ঠিকই বলেছি। ছেলে তো আমার নয়।

সন্তোষ ওর পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বলে—অনেক ছেলেই অমন ঠাকুর্দা ঠাকুমার অনুগত হয়, ওতে রাগ করে লাভ কি? কষ্ট কী আমারই হচ্ছে না? কী চমৎকার বাড়িটা পেয়েছি, কতো আশা করে ছুটি নিয়ে এলাম—একলা ফিরে যেতে হবে ভাবছি, আর—

পিঠ থেকে ওর হাতটা ঠেলে দিয়ে শকুন্তলা ঠিকরে উঠে বলে—কাল সকালের গাড়িতে আমি যাবোই।

—কাল সকালে কি আর তোমার ছেলে বদলে যাবে?

—ওকে তো নিয়ে যাবো না, ও থাক্ না ওর ভালোবাসার লোকের কাছে।

সন্তোষ ম্লান হাস্যে বলে—সেটা তো আর সম্ভব নয়?

—না, কোন কিছুই সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু আমাকে নিয়ে যা খুসি করা, কেমন?

—কিন্তু শকুন্তলা, তুমিই কি পারবে বিলটুকে ছেড়ে থাকতে?

—ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

—সম্পর্ক নাড়ির! সম্পর্ক হৃদয়ের! রাগ করে চলে গিয়ে মন কেমন করবে না?

—ও কথাটা অবান্তর। তোমার মন কেমন করে না আমাদের ছেড়ে থাকতে?

—মন কেমন করে না?—সন্তোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'সখী! বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়, বাহিরে তা' কেমনে দেখাবো?'

শকুন্তলা ঝঙ্কার দিয়ে বলে—শুধু মর্ম নিয়ে তো আর পৃথিবীর কাজকর্ম চলে না, কিছু দয়াধর্মও দেখাতে হয়। যাক্ তুমি যখন আমাদের ছেড়ে থাকতে পারো, আমিও খুব পারবো খোকাকে ছেড়ে থাকতে!

—আমাকে যেতে হয় নিরুপায় হয়ে।

—ওটা বাজে কথা। এ নিরুপায়তা তোমার ইচ্ছাকৃত। নিজের স্ত্রী পুত্রকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাওয়ার মধ্যে যদি অপরাধ দেখে শিউরে ওঠো, সেটাই অপরাধ।

—বুঝিতো সবই। কিন্তু—

—কিন্তুর কিছুই নেই। বেশ, তাহলে ছেলেকে হাত পা বেঁধেই নিয়ে চলো। তারপর দেখো ছেলে বশ করতে পারি কি না! এই আওতার মধ্যে, ক্রমাগত আমার বিরুদ্ধে মন্তব্য শুনে শুনে শিশুচিত্ত বিগড়ে গেছে, এ আওতা থেকে মুক্ত করে নিতে পারলে তা'রও কল্যাণ।

—কি মুস্কিল! বিরুদ্ধ আবার কি?

—'কি' যে, তা বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, কারণ সে অভিজ্ঞতাই নেই। আমি ওঁদের ছেলের মন অধিকার করে নিয়েছি, সেই আক্রোশে ওঁরা আমার ছেলের মন এমন অধিকার করে নিতে চান, যাতে মাকে 'মা' বলে ডাকতেও না চায় ছেলে! যখনি বিলটু 'মা' বলে, তখনই ওরা বলবেন 'ওমা মা কি রে? ওতো বৌমা।'

সন্তোষ বিস্ময় প্রকাশ করে—তা'তে লাভ?

—সে কথা তো বললামই। 'মা' ডাক ভোলানোটাই লাভ।

—ছেড়ে চলে গেলে তো সেটা আরোই সফল হবে।

—তবে ধরে বেঁধে জবরদস্তি করে নিয়ে চলো। মোটকথা আব আমি এখানে থাকবো না, থাকবো না, থাকবো না—ব্যস! আর যদি তা'র ব্যতিক্রম হয়, জেনো ঢের পুকুর আছে তোমাদের দেশে।

কণ্টকশয্যায় রাত্রি কাটে সন্তোষের।

চিন্তার কণ্টক!

যে অভিমানী মেয়ে শকুন্তলা, আর যা দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে এবার, না নিয়ে গেলে নিশ্চিত ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে বসবে। অথচ—মনে পড়ে যায় ভেলভেটের সুট পরে কাদায় গড়াগড়ি দেওয়া বিলটুকে। সেও আর এক ভয়ঙ্কর।

কিন্তু রাত্রে কি সন্তোষ ভগবানকে এমনই আপ্রাণ ডাক ডেকেছিলো যে ভগবান ঘুম ছেড়ে উঠে বসেছিলেন? তাই অতোবড়ো দুস্তর সমস্যা এতো সহজে সমাধান হয়ে গেলো। সন্তোষ কি আড়ালে গিয়ে খানিক নেচে নেবে?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! সক্কালবেলা শকুন্তলা উঠে গেছে, বিলটু ওঘর থেকে এঘরে এসে বাপের বিছানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বললো—আমি রেল-গাড়ি চড়ে কলকাতা যাবো।

কে বললো এ কথা?

স্বয়ং ঈশ্বর?

লাফিয়ে উঠে বসলো সন্তোষ, ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে বললো—যাবি? সত্যি?

বিলটু ঘাড়ে নেড়ে স্বীকৃতি জানালো।

—ঠিক বলছিস?

—হাঁ।

—কাঁদবি না?

—না।

—তা'লে দিদাকে বলে আয়। তারপর জুতো প—রে ভালো জামা প—রে—

বিলটু মহোৎসাহে ছুটলো—দিদা, আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা যাবো। জুতো প—রে ভালো জামা প—রে—

অদ্ভুত শিশু চরিত্র!

গতকালকের কীর্তিকলাপে নিজেই লজ্জিত হয়েছে নাকি বিলটু? তিন চার বছরের ছেলের অনুতাপ হয়? না কি এ শুধুই খেয়াল? তা খেয়ালই বটে। অতঃপর এমন হৈ হৈ করতে শুরু করে দিলো বিলটু, দেখে মনে হলো বুঝি আর একমিনিটও এখানে থাকতে রাজী নয় সে। নিজের ছেঁড়া জুতো থেকে শুরু করে ভাঙা পুতুল পর্যন্ত সমস্ত এনে এনে জড়ো করতে লেগে গেলো মায়ের ট্রাঙ্কের কাছে। এ সমস্তই নিয়ে যাবে সে।

শকুন্তলা বিশেষ কিছু মন্তব্য করলো না, যাওয়াটাই সাব্যস্ত এইভাবে গোছাতে লাগলো। গরুর গাড়ি করে খানিক দূর এগিয়ে পারঘাটে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সেখানে খেয়ায় পার হয়ে বাসে চড়ে মাইল দশেক—তারপর ট্রেন। কাজেই খাদ্যবস্তু নিতে হবে সঙ্গে। ননীবালার সক্রিয় সমর্থন নেই, শকুন্তলাকেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

বিলটুর নেত্য দেখে অপমানে খানখান্ ননীবালা মুখ কুঁচকে বলেন—দেখিস! আর যে তর সইছে না। রাতারাতি মা গুণ করলো, না তুক্ করলো?

নিশিকান্ত কিন্তু চুপচাপ! বরং যেন অপ্রতিভ ম্রিয়মান ভাব! কোথায় যেন পরাজয় ঘটেছে তাঁর।

গরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে ঢুকে বসা চলে না, নিশিকান্ত গাড়োয়ানের পাশে উঠে বসলেন। সন্তোষ ভাবেনি বাবা যাবেন, ব্যস্ত হয়ে বলে—আপনি আর কেন কষ্ট করে—স্নান-আহ্নিক হয়নি—

নিশিকান্ত নিষ্প্রভভাবে মৃদুস্বরে বলেন—পার পর্যন্ত যাই—দাদুভাইটার সঙ্গে!

পারঘাটে দেরী হয়।

নৌকোয় উপযুক্ত লোক বোঝাই না হলে তিনি নড়বেন না। অবশ্য বাসের ব্যাপারেও তদ্রূপ। এবং এতো কাণ্ড করেও দুধে হাত পড়ে না, জলের ওপর দিয়ে যায়। অর্থাৎ বাস থেকে নেমে ঘণ্টা দু'তিন অপেক্ষা করতে হয় ট্রেণের জন্যে।

পারঘাটে পৌঁছেই নিশিকান্ত—'একটু ঘুরে আসি'—বলে কোথায় যেন চলে গেলেন, শকুন্তলা চুপচাপ বসে রইলো ট্রাঙ্কটার উপর, এবং পিতাপুত্রে কলকাতার মজা সম্বন্ধে প্রবল আলোচনা চলতে থাকলো।

বোঝাই হলো নৌকো, যে যার মালপত্রের হিসাবে ব্যস্ত। নিশিকান্ত ফিরলেন বড়ো একটা শালপাতার 'দোনা' হাতে। কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন পক্কান্ন আর মেঠাই! 'নাও দাদু' বলে নাতির হাতে ধরিয়ে দেন। ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখ। মন্থর গতি। একি শুধুই মন কেমন? না—কালকের বিজয় গৌরব আজকে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে বলে এতো মর্মাহত হয়ে পড়েছেন নিশিকান্ত?

নৌকো ছাড়ার সময় হয়, কুণ্ঠিত ভাবে নিজে প্রণাম সেরে সন্তোষ ছেলেকে শিক্ষা দেয়—দাদুকে প্রণাম করো বিলটু—

কিন্তু মুহূর্তে কি যে হয়, নাতির প্রণামের অপেক্ষা ছেড়ে দিয়ে নিশিকান্ত সহসা দ্রুতপদে উল্টোমুখো চলতে শুরু করেন।

হ্যাঁ যতোটা পারছেন দ্রুতপদেই যাচ্ছেন নিশিকান্ত, তবু বারবার গতি কমাতে হচ্ছে তাঁকে, জামার হাতায় চোখ মুছতে!

—কই উঠে পড়ো?

সন্তোষ তাড়া দেয়।

শকুন্তলা পলায়নপর ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়েছিলো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে, চমকে চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—কি বলছো?

—বলছি উঠে পড়ো? শেষে জায়গা পাবে না। হাঁ করে কি ভাবছো?

—কি ভাবছি? শকুন্তলা কেমন এক রকম একটু ফিকে হাসি হেসে বলে—ভাবছি—আর একটা দিন কামাই হয়ে যাবে তোমার।

—একটা দিন তো হচ্ছেই—সন্তোষ বিস্মিত ভাবে বলে—আর একদিন কেন?

—আমাদের আবার বাড়ি ফিরিয়ে রাখতে যেতে হবে, এই আর কি!

সন্তোষ এবার নিজে হাঁ করে বলে—মানে?

—মানে আমার আর যাওয়া হলো না।

—তোমার যাওয়া হলো না?

—কই আর হলো? শকুন্তলা অপ্রতিভ হাসি হাসে—নাও নৌকো থেকে মালপত্র নামিয়ে নাও, তারাচরণের গাড়িটা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে—

সন্তোষ তীক্ষ্নস্বরে বলে—জিজ্ঞাসা করি, আমি পাগল না তুমি পাগল?

—তা' পাগল বোধকরি আমিই ! বদ্ধ পাগল ! কিন্তু শোনো আর দেরী কোরো না। বাবা হেঁটে ফিরছেন, আটকাও ওঁকে। সেই তো ফিরবোই আমরা, উনি কেন আর শুধু শুধু একলা একলা—

—এতো কাণ্ড, এতো জোর জবরদস্তি করবার দরকার কি ছিলো তা'হলে ?

—দরকার ছিলোই, এখনো সে দরকার ফুরোয় নি। কিন্তু—শকুন্তলা আর একবার একটু ফিকে হাসি হেসে—মনের মধ্যে আর যেন মোটেই জোর পাচ্ছি না।

[১৩৬৩]

মধ্যবিত্ত

রবিবারের বাজারটা করতে সময় একটু বেশী লাগেই।

অন্ততঃ শচীনের তো লাগে।···দশ বিশ টাকা খরচ না করুক, প্রত্যেকটি জিনিস নেড়ে চেড়ে দেখে শুনে দর করে করে কিনতে তৃপ্তি আছে।

আর ওই পর্যন্তই তো দৌড় ! ভালো লাগবার—বেশ লাগবার মতো ঘটনা, আছেই বা কি ? বাজার আর অফিস এই। এইটুকুর মধ্যেই টানা পোড়েন চলছে জীবন-মাকুর। রবিবারের মধুর সকালটা মাছ তরকারির বাজারে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া চিত্তবিনোদনের আর কিইবা উপায় করতে পারে এরা ? এই শচীনরা—যারা আটক পড়েছে তাঁতের খোঁটায় !

দেরী প্রত্যেক রবিবারেই হয়—আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবু আজকে আসতে না আসতেই নির্মলা গরগর করে উঠলো—বাজারে গেলে সময়ের জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, কেমন ? কোন কালে গিয়েছো আর এই এখন আসা হলো ? কি যে ন'শোপঞ্চাশ টাকার মাল কেনা হচ্ছিল তা'ও জানি না ! সারা সকালটা —পচা মাছের হাওয়া খেয়ে নষ্ট করতে ভালোও লাগে, আশ্চর্য্য !

আজকালকার দিনে গেরস্থ লোকের 'বাজার ফেরৎ মেজাজ' আর যাই হোক বরফের কাছাকাছি অবশ্যই থাকে না, কাজেই দশ পয়সার ডেঙোডাঁটাগাছটা হাত থেকে ঝপাৎ করে ফেলে শচীন বিরক্ত স্বরে বললে—কেন কী রাজকার্য বয়ে যাচ্ছিল এর মধ্যে ?

—রাজকার্য আবার কি, মা বাবা এসেছিলেন, দেখা হলো না তোমার সঙ্গে। ···অথচ ওই জন্যেই রবিবার দেখে এসেছেন—

শচীন বেচারা নেহাৎই নিভে গেল এবার। বড়লোক শ্বশুর শাশুড়ী বাড়ি বয়ে এসে জামাইয়ের দেখা পেলেন না—এর চাইতে শোচনীয় লজ্জার ঘটনা আর কি আছে !

কিন্তু হঠাৎ তাঁরাই বা কেন ?

শ্বশুর অবশ্য আসেন কালে কস্মিনে, কিন্তু সস্ত্রীক ? কেন ! হঠাৎ !

ধীরে সুস্থে হাতের থলিটা নামিয়ে একখানা তেলচিটে পাখা নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে সেই প্রশ্নটাই করে শচীন—হঠাৎ ওঁরা ? সকাল বেলা !

—শামুর বিয়ে।

গম্ভীর উত্তর নির্মলার। যেন নিষ্প্রয়োজনে কথা বলতে নেহাৎই নারাজ সে।

কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠেছে শচীন। ব্যস্ত সুরে বলে—তাই নাকি? বলো কি! ভীষ্মদেবের পণ ভাঙলো তা'হলে?

—তাই তো দেখছি!

—তা' তুমি অমন মিইয়ে গেলে কেন? ভাবী ভাজের হিংসেয় নাকি?

শচীন রহস্যপ্রিয়, কথাকে সরস করে বলতেই সে ভালোবাসে, কিন্তু এর বেশী পারে না। পরিহাসের ভাষাটা তার এই রকমই স্থূল, বিষয়বস্তুগুলো এই ধরণেরই জোলো।

কেনই বা হবে জোরালো? শুধু 'বিত্ত'টাই তো 'মধ্য' নয় এদের, প্রত্যেকটি বিষয়েই যে এরা মাঝারি।···বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মার্জিত ভঙ্গীর ভাষা আয়ত্ত করবে কোথা থেকে—সহকর্মীদের ছাড়িয়ে? পারিপার্শ্বিকতাকে ছাড়িয়ে?

নির্মলা বঁটিটা টেনে এনে আলু ছাড়াতে ছাড়াতে বলে—হবে না কেন? বরাবরের হিংসুটে স্বভাব আমার, কে না জানে?

—ব্যাপার কি? মেজাজ অতো খাপ্পা কেন?···আচ্ছা আমি কি ছাই জানতাম ওঁরা আসবেন? জল টল খাওয়ানো হলো না একটু, সত্যি 'ইয়ে' হয়ে গেল!

বাজার থেকে এসে শাক পাতা, কচু কুমড়ো, প্রত্যেকটি জিনিসের আলাদা আলাদা দাম উল্লেখ করে আলাদা আলাদা করে চমকে দেবার প্রাত্যহিক অভ্যাসটা বিস্মৃত হয়ে অতঃপর শ্যালকপ্রবরের বিবাহ আলোচনাতেই মন দেয় শচীন।

কবে বিয়ে, কোথায় বিয়ে, হঠাৎ মত পরিবর্তনের হেতু কি বাবুর, কনে ডানাবিহীনা পরীসমাজভুক্ত কি না···ইত্যাদি ইত্যাদি।···সত্যিই স্ফূর্তি লাগছে তার। আত্মীয় বন্ধুর বাড়ি উৎসব সমারোহ তো উঠেই গেছে আজকাল।··· নিতান্তই যাঁরা কন্যা অথবা পুত্রদায় উদ্ধার হন, তাঁরা "বর্তমান পরিস্থিতি" দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রিত আত্মীয়দের আর যে বস্তুটি দেখান সেটির নাম হচ্ছে কদলী ফল। কাজেই উৎসবের আস্বাদ জীবন থেকে যেন মুছেই গেছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে—'পরিস্থিতিটা' স্বতন্ত্র।

একেই তো শ্বশুরবাড়ি বলে কথা! অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনের দোহাই পেড়ে জামাইদের আসা আটকানো? অতো দূর এখনো গড়ায়নি বোধ হয় কোনোখানে। তাছাড়া শচীনের শ্বশুর একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। "সংভরণ বিভাগে"র এমন একটি 'ভাগে' তাঁর অবস্থিতি যে, পরিস্থিতির প্যাঁচ কাবু করতে পারবে না তাঁকে। তাই অবাধে মেয়েজামাইকে বেশ দীর্ঘমেয়াদী নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন তাঁরা।

অতএব আশা করা যাচ্ছে কিছুটা মুখ বদলাতে পাওয়া যাবে দু'চার দিন।

কিন্তু নির্মলার ভাবটা তেমন সুবিধের নয় কেন?

একমাত্র ভাইয়ের বিয়ে, তার উপর আবার কতো আরাধনার বিয়ে ! ভাই বিয়ে করতে চায় না বলে তো দুঃখে মরে যেতো এতোদিন। অথচ বিয়েটা সত্যই হচ্ছে দেখে রেগেই গেছে সে !

স্ত্রী জাতির যে অন্ত পাওয়া ভার, এ কথা মিথ্যা নয় !

অথচ শচীনের ইচ্ছে এই মুখরোচক আলোচনাটা বেশ কিছুক্ষণ চালায়। বাজারদর ছাড়া আলোচনার বিষয়বস্তু তো নেই-ই আর আজকাল।

ভেবে চিন্তে বললো—বিয়ে করবার আর দিন পেলো না তোমার ভাই ! মাসের শেষ হয়ে এলো, এখন !…কবে বললে যেন ? সামনের শনিবারে ? ঠিক দু'দিন বাকী থাকে মাসের। যাই হোক কিছু উপহার বা আশীর্বাদী দিতে তো হবে ?…কি দেওয়া যায় বলো তো ? কি দিলে ভালো দেখায় ?

—যা দিলে ভালো দেখায় তাই দিতে পারবে তুমি ? নির্মলার মুখে তিক্ত হাসি।

—আহা তাই কি আর বলছি—শচীন বোধকরি হাসির তিক্ত আস্বাদটা অনুভব করতে পারে না, সহজ ভাবেই বলে—দিলে তো এখন একখানা নেকলেস দিলেও ভালো দেখায়, বড়ো বোন তুমি ! তবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে অবস্থার অতিরিক্তই করতে হয় অনেক সময়। বিশেষ তো—এই পাঁচ ছ'টা মানুষকে যখন পাঁচ সাত দিনের জন্যে নেমন্তন্ন করে গেলেন। পঁচিশ তিরিশ টাকার কম আর উদ্ধার হওয়া যাবে না, কি বলো ?

—আমার আবার বলাবলি, তোমার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা—বলে কোটা আলুগুলো নিয়ে চলে যায় নির্মলা।

মেজাজ দেখছি সুবিধের নয়, তিরিশের এক পয়সা কমে হবে বলেও মনে হচ্ছে না।…

এইটুকু স্বগতোক্তি করে শচীনও ওঠে দাড়ি কামাতে।

শালার বিয়ের খবরে একরাশ টাকা খরচা হয়ে যাবার আশঙ্কা সত্ত্বেও কেমন যেন স্ফূর্তি লাগছে তার।

এই স্ফূর্তির কারণ হয়তো নির্মলার উপর সহানুভূতি, ছেলে মেয়েদের উপর মমতা। কয়েকটা দিন তবু ভালো কাটবে ওদের। জিরিয়ে বাঁচবে নির্মলা। একলার সংসার ফেলে বাপের বাড়ি যাওয়া তো হয় না বড় একটা !

ওদিকে নির্মলার চিন্তা স্বতন্ত্র। 'কুড়ি পঁচিশ টাকা' ! শালার বিয়েতে লৌকিকতা বজায় রাখতে এই দমকা খরচার প্রস্তাবটা করে ফেলে ভারী যেন উদারতা দেখালো শচীন। 'অবস্থার অতিরিক্ত' করলো।

কিন্তু ও ক'টা টাকায় কি হবে ?

এক জোড়া কানপাশা ? একটা আংটি ? নিদেন পক্ষে ভালো একখানা শাড়ি ? কিচ্ছু না ! কিচ্ছু না !

অথচ একথা নিশ্চিত যে, বড়দি কমলা, আর ছোটবোন রমলা, সোনা একটু আধটু দেবেই। তা'ছাড়া আইবুড়ো ভাতের ধুতি চাদর, মাছ মিষ্টি। ভাই-

ফোঁটায় জরিপাড় শান্তিপুরে ধুতি ভিন্ন দেয় না ওরা। আর মিলের কাপড়ও একখানা [illegible] দিতে পারলো না নির্মলা—মোটে একটি মাত্র ভাই, তাও না।

তবু—নিজের অবস্থাকে মেনে নিয়ে কোনো রকমে আছেই এক রকম। অন্য বোনেদের মতন তারও গাড়ি বাড়ি নেই বলে সর্বদাই কিছু আর হা হুতাশ করছে না। পাছে শচীন ধারে কর্জে পড়ে যায় বলে কতো হিসেব করে সংসার করে।…শচীনের যে কি আয় আর কি ব্যয় তার তো আর অজানা নেই? তবু আজকের ব্যাপারটা কিছুতেই বরদাস্ত হয় না যেন। খুব একচোট শুনিয়ে দিতে পারলে তবে যেন শান্তি পায় নির্মলা।

কেন? এতোকাল বিয়ে হয়েছে নির্মলার, কবে তার বাপের বাড়ির দিকে কি খরচ করেছে শচীন?…বাপভাইকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার ইচ্ছে [illegible] শ করতেও কখনো সাহস হয়নি নির্মলার।

কিন্তু চিরদিনই কি হেয় হয়ে থাকবে সে?

[illegible] কার অপরাধে?

[illegible] মাথায় হঠাৎ একটা অপ্রীতিকর বচসা হয়ে গেল খাওয়ার সময়।…

[illegible] বিক্কার দিয়ে কবে এমন কটু মন্তব্য প্রকাশ করেছে নির্মলা?

[illegible] করেছে তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে শচীনের মতো অপদার্থের

[illegible] মামার বাড়ি যাওয়ার আনন্দে মসগুল ছেলেমেয়েদের বুড় কঠোর

[illegible] ঠাণ্ডা করে দিয়ে, নিজের বাড়া ভাত ফেলে রেখে ভাঁড়ার

[illegible] ঘুমিয়েছে কবে?

রবিবার [illegible] বার। ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো। আজকের রবিবারের [illegible] এমন মাটি হবে—একি সকাল বেলা উঠে কল্পনাও করেছিল শচীন?

কী কুক্ষণেই শ্বশুর শাশুড়ী এসেছিলেন নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে!

সারা দুপুর কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে টাকার স্বপ্ন দেখলো শচীন! কোথায় পাওয়া যায় টাকা? একমুঠো টাকা নয়—এক থলে টাকা! যাতে তার আহত পৌরুষকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় গৌরবের সিংহাসনে। যার থেকে গোছা গোছা নোট ফর ফর করে উড়িয়ে দিতে পারা যায় নির্মলার দিকে—ভাইয়ের বিয়ের লৌকিকতা করতে, বড়লোক বাপের বাড়ির মুখ উজ্জ্বল করতে!

কোথায় পাওয়া যায়?

ভগবানের কাছে মাথা খুঁড়ে?

শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করে?

নাঃ, কিছুই সম্ভব নয় শচীনের পক্ষে। ভয়ানক একটা কিছু নৈতিক অপরাধ করে বসবার মতো সাহসের অভাবই শুধু নয়, সুযোগেরও একান্ত অভাব।

ট্রেন ডাকাতি, ব্যাঙ্ক লুঠ, এসব চিন্তা তো সুদূরপরাহত…অফিসের তহবিল তছরুপের মতো সামান্য অপরাধ করবার সামর্থ্যই কি আছে? বিবেকটা

প্রবল বলেই নয়, তহবিলের দূরত্বটাও বড়ো বেশী প্রবল তাদের চেয়ারের কাছ থেকে।

অতএব দীর্ঘশ্বাস।

এই একটি জায়গায় জিতে আছে মধ্যবিত্তরা। দীর্ঘশ্বাসের ওজনে ভারী হয়ে আছে সবাইয়ের থেকে। হয়তো ফুটপাতে বসে যারা শীর্ণ আঙ্গুল বাড়িয়ে ফ্যান চায় তাদের চাইতেও বেশী। কারণ চাইবার জন্য হাত বাড়াবার ক্ষমতা মধ্যবিত্তদের নেই, ক্ষমতা নেই শালার বিয়েকে অগ্রাহ্য করবার।

মুস্কিল এই—দীর্ঘশ্বাস জিনিসটার ভারই আছে, ধার নেই। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দু'চার হাজার নিঃশ্বাস ফেল্লেও একটা আধুলি পড়বে না তার থেকে।

এক সময় উঠে পড়লো শচীন।

নির্মলা এখনো ভাঁড়ার ঘরে পড়ে ঘুমুচ্ছে, ছেলেমেয়ে তিনটে শুকনো মুখে বসে আছে গলির দিকের জানলায়।··দেরাজের চাবিটা পড়ে রয়েছে তাকের উপর।

নিজের বিয়ের আংটিটা!

এর বেশী তছরূপ করবার সাহস শচীনের নেই।

অবিশ্যি ভয়ানক একটা দামী কিছু নয়। তখন শচীনের বিয়ের আমলে নির্মলার বাবার গাড়ি ছিল না, ব্লাড প্রেসার ছিল না, নির্মলার মার ছিল না হার্টের অসুখ। কাজেই আংটিটা হীরে জড়োয়া কিছুই নয়, নিতান্তই একটা মামুলি পাথর বসানো সোনার আংটি। তবে সোনাটা আছে অনেকখানি।

আটাশটাকা ভরি ছিল তখন সোনার!

আধুনিক ডিজাইনের কানপাশা একজোড়া হবে এর থেকে। 'বাণী' সমেতই হয়ে যাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে আংটিটা একবার আঙ্গুলে ঢুকিয়ে দেখলো, আলগা হচ্ছে। ···আশ্চর্য! এতো বছরের মধ্যে একবারও এটা পরার কথা মনে পড়েনি কেন? জিনিসটা আছে, তাই কি মনে ছিল?

আজকেই শুধু মনে পড়লো।

কোথা থেকে টাকা পেয়েছে কে জানে—ছেলেমেয়েদের জন্যে নতুন জামা কিনে এনেছে শচীন, কানপাশা কিনে এনেছে একজোড়া। বিনা বাক্যে নির্মলার কাছে ফেলে দিয়ে জিনিসগুলো, বেরিয়ে গেছে সক্কালবেলা।

ঘর বার করছে ছেলেরা, ছট্‌ফট্‌ করছে সকাল থেকে।

মামার বিয়ের সব কিছুই হয়ে গেলো হয়তো, মার যেন যাবার চেষ্টাই নেই। মুখাকৃতি দেখে প্রশ্ন করবার সাহসও হয় না।··শচীনও যে কোথায় গেছে কে জানে। অথচ অফিস যাবার আগে তাদের পৌঁছে দিয়ে যাবার কথা।

নতুন জামাগুলো গায়ে ঠিক হলো কিনা তা পর্যন্ত দেখতে পায়নি

বেচারারা।

আর্ট সিল্কের সেই জামা তিনটে আর কানপাশার কেসটা কোলে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে নির্মলা গলির দিকের জানলায়, ডাকবার সাহস হচ্ছে না রাণু মনু খোকার।···মার এই মুখ যেন ওদের অচেনা।

কিন্তু নির্মলাই বা ভাবছে কি ?

কোথায় পেলো শচীন অতগুলো টাকা ?···নাকি আরো দূরে—অনেক দূরে চলে গিয়েছে তার চিন্তার স্রোত ?···যেখানে শচীন পেঁছিতে পারে না, উঁকি মারতে পারে না ছেলেমেয়েদের হতাশ মুখ।

একটি মাত্র ভাইয়ের অনেক আরাধনার বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটাও যেখানে অর্থহীন অবাস্তব।···

ওই দূরলোক থেকে টেনে আনবে কে নির্মলাকে ?

কে পারবে ?

রাণু মনু পারেনি, পারলো শচীনই। কারণ ও এসেছে ঝড়ের বেগে, ওই দূরলোকবাসিনী অপরিচিতা নারীকে দেখবার অবসরই ঘটলো না ওর।

—একি এখনো বসে আছো ? তৈরি হয়ে নাওনি ? চটপট নাও, যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে আমার।

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি যাচ্ছি না কোথাও।

মুখ না ফিরিয়েই বললো নির্মলা।

—যাচ্ছি না মানে ? একি খেলার কথা নাকি ?

—শরীরটা ভারী খারাপ লাগছে সত্যি, পারছি না। তুমি বরং ওবেলা এদের নিয়ে বরযাত্রী যেও।

—কি হয়েছে ! তুমি যাবে না—আমি যাবো নেমন্তন্ন ?

—কি করবো, আমার যে হঠাৎ ভারী অসুখ করছে।

অনেক পরিশ্রম করে এসে এইমাত্র যেন বসেছে নির্মলা, এমনি শ্রান্ত লাগে তার কণ্ঠস্বর।

কিন্তু শচীনের বোধশক্তি এতো সূক্ষ্ম নয় যে এই অপরিসীম ক্লান্তির সুর ধরা পড়বে ওর কানে। তাই উত্তর দেয় নিজের মেজাজের বশেই—বললে তাঁরা বিশ্বাস করবেন একথা ?

—কেন করবেন না ? অসুখ করে না মানুষের ?

—তাল বুঝে অসুখ করলে অবিশ্বাস একটু আসে বৈকি—শচীনের স্বর হিংস্র—আমারই এসে যাচ্ছে যে !···আবার কিসের খোঁচ উঠলো মনে ? নিজের বেনারসী শাড়ি নেই, তাই ?

—কি বললে ? কি বললে তুমি ?

হঠাৎ যেন ফেটে পড়লো নির্মলা।

—যা বলেছি ঠিকই শুনেছো। কিন্তু মনকে অতো ছোটো, অতো সংকীর্ণ করতে নেই নির্মলা, গয়নাই মানুষের আসল পরিচয় নয় !

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল শচীন···নির্মলা অমন করে পথ আটকালো কেন ?

ওকি পাগল হয়ে গেল ? নয়তো দেরাজ খুলে নিজের একমাত্র পোষাকী পোষাক —গতবার পুজোয় বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া সাধারণ ধনেখালির শাড়িখানা —ছুঁড়ে মারলো কেন শচীনের গায়ের উপর ? কেন অমন চীৎকার করে উঠলো —না তা' কেন ! মানুষের পরিচয় শুধু লম্বা লম্বা কথায় ! এই একখানা শাড়ি পরে বিয়ে বাড়িতে পাঁচদিন ঘুরে বেড়াতে পারলেই খুব মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, কেমন ? গৌরবে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তোমার ! লজ্জা করে না বড়ো বড়ো কথা কইতে ?

দ্বিতীয় কথা কইলো না শচীন, শুধু এমন দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে গেলো স্ত্রীর মুখের দিকে—বোঝা শক্ত, সে দৃষ্টি ক্রোধের না ঘৃণার ! আহত অভিমানের না শ্রদ্ধাহীন ধিক্কারের !

না, সত্যিই বরদাস্ত করতে পারছে না শচীন, নির্মলার এই জঘন্য মনোবৃত্তি। · উপহার সামগ্রী ভালো দিতে না পারার যে ক্ষোভ—তার তবু মানে আছে। সহ্য করা যায় সে দুর্বলতা। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সে একখানা ভালো শাড়ির অভাবে একটি মাত্র ছোট ভাইয়ের বিয়েতে যেতে না পারার মতো মানসিক দৈন্য অসহ্য !

দুর্বলতা নয়, দৈন্য নয়, এ হচ্ছে মানসিক ব্যাধি। কুৎসিত নোংরা ব্যাধি !

কিন্তু সকাল থেকে কি শাড়ির চিন্তাই করছিল নির্মলা ? শচীন আসার এক মুহূর্ত আগেও কি করেছিল ?···নির্মলার অজ্ঞাত অর্থ দিয়ে কেনা এই টিনের মতো পাতলা কানপাশা জোড়া আর আর্ট সিল্কের জামা তিনটে শচীন যখন অগ্রাহ্য অবহেলার ভঙ্গীতে ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে চলে গেল সকালবেলা, তারপর থেকে কি নিজের শাড়ির দুর্ভাবনাতেই এতো ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সে ?

গলির সামনের ওই ইঁট বার করা বালি খসা দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চিন্তাশক্তিটাই কি তার হারিয়ে যায়নি হঠাৎ ? এতোক্ষণ ধরে ওকি শুধু এই কথাই ভাবছিলো না—ওর ঘরের একটি মাত্র যে জানলা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই ইঁট বার করা দেওয়ালটা ? কিন্তু দেওয়ালটাকেও তো আমরা ধিক্কার দিতে পারি না ; বছরের পর বছর ওতে শুধু জল আর ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কোনোদিন তো পড়ছে না নতুন কোনো পলস্তারা !

[১৩৬৩]

যুগলপাত্র

পাতলা কাগজের মোড়ক খুলে ফুলকাটা ছোট্ট চা-দানীটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে স্নেহাংশু হাস্যোৎফুল্ল মুখে বলে—এই নাও তোমার চায়ের সরঞ্জাম সম্পূর্ণ হলো। এর নাম হচ্ছে যুগলপাত্র।

শিপ্রা জিনিসটা তুলে নিয়ে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখছিলো, অবাক মাথা

চোখে বলে—সেটা কি হলো ?

—কি হ'লো বুঝছো না ? দু'টি পেয়ালার বেশী চা ধরানো যাবে না এতে। অতএব—! যাক পছন্দ হয়েছে তো ?

—খু—ব। কিন্তু মার্কেটিঙ্ তা বলে শেষ হয়ে যায়নি তোমার এখনো। বিস্কুটের টিনটা বাকী আছে, মাখন নেবে একটা, আর সেই কাজুবাদাম আর ডালমুট।

স্নেহাংশু খুব হাসতে থাকে—সাতদিনে এতো রকমারি জিনিস খাবার সময় পাওয়া যাবে কখন ? ভাত ডাল খাওয়াই হবে না নাকি ?

—ভাত ডাল ! শিপ্রা ঝিরঝিরে হাসির সঙ্গে বলে—হায় হায় হায়, ওই তুচ্ছ জিনিসগুলোর নাম মনে রেখেছো এখনো ? আমি কিন্তু ওই স্থূল গদ্যের দিকে নেই, বুঝলে ?

—দিকে যেতে দিচ্ছেই বা কে ? তুমি শুধু কাব্যে থেকো মহারাণী, স্থূল গদ্যের জন্যে আমি আছি আর আমার কুকার আছে।

—ঈস ! তাই না আর কিছু ! নতুন কুকারে আমি রাঁধবো না যেন।

—বাঃ তুমি তো কবিতা পড়বে, গান গাইবে, বাদাম খাবে, আর সাতদিনে চোদ্দখানা সিল্কের শাড়ি পরবে—

—তার সঙ্গে কুটনো কুটবো, রান্না করবো, বাসন ধোবো, সব করবো দেখো। পারি গো পারি সবই পারি, শুধু তোমার পিসিমার ওই শুচিবাইয়ের জন্যেই যেন হাত পা গুটিয়ে যায়।

পিসিমার উল্লেখেই প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়।

পিসিমাকে কে আগলাবে, বুড়োমানুষকে তো আর একা একটা বাড়িতে রেখে যাওয়া যায় না !

—বলেছিলে ঝিটাকে ?

—বলেছিলাম তো, ও কিছুতেই রাতে থাকতে রাজী নয়, বলে ওর বর তা'হলে আস্ত রাখবে না, মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে।

—আদর্শ প্রেমিক বটে ! 'তা' সে নিজেও এসে থাকুক না।

—আহা, তারপর তোমার যথাসর্বস্ব চুরি করে পালাক আর কি ! কে কেমন লোক কে জানে !

—আমার যথাসর্বস্ব, সে তো আমি সঙ্গে করে নিয়েই যাচ্ছি—হেসে ওঠে স্নেহাংশু।

হাসির প্রত্যুত্তরে হাসি মেলে।

ব্যাপারটা এই—বিয়ে হয়ে পর্যন্ত ওদের ইচ্ছে একবার দু'জনে কোথাও বেড়াতে যায়, অন্ততঃ সাতটা দিনও মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের সুখটা আস্বাদ করে আসে। এখানে দেড়খানি ঘর, তার আধখানিতে থাকেন পিসিমা, বাকী একখানিতে স্নেহাংশু আর শিপ্রা। ডানা মেলবার আকাশ তো দূরের কথা, নিতান্ত নিবিড় হয়ে বক্‌বকমের আশ্রয়ও নেই।

একবার একটু সরে যেতে ইচ্ছে করে না এখান থেকে ?

স্নেহাংশুর শুধুই সাধ, শিপ্রার আবার ওর সঙ্গে জড়িত আছে কিছু বাসনা। অন্ততঃ এক সপ্তাহ একা সংসার করে দেখিয়ে দেবে শিপ্রা—'শুধু দু'জনে'র সংসার কতো হালকা, সুরুচি সম্পন্নভাবে সংসার চালনায় কতো আনন্দ!

তা' এই চার বছর ধরে জল্পনা কল্পনাই সার ছিলো। প্রতিবন্ধকের শেষ নেই, অফিসে ছুটি মেলে না স্নেহাংশুর, বাড়িতেও নানান অসুবিধে। বুড়ি পিসি আছেন, তাঁকে কোথায় রেখে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি!

কিন্তু এবারে স্নেহাংশু বদ্ধপরিকর হয়ে অনেক চেষ্টায় এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। এখনো না হ'লে বাসনার এখানেই ইতি, কারণ সহসা তৃতীয় ব্যক্তির আগমন সংবাদ ঘোষিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী জীবনের গতি তো প্রবাহিত হবে অন্য ধারায়, তখন তো আর যুগলপাত্রে কুলোবে না। সে জীবনে যে দু'জনে মুখোমুখি বসে 'জগতে কেহ যেন নাহি আর' ভাবতে পারার অবকাশ মিলবে না, এ বোধ ওদের আছে।

ছুটির দরখাস্ত করে পর্যন্ত গোছগাছ চলছে গোপনে। পিসিমাকে বলবার সাহস এখনো হয়নি। 'তোমাকে একা বাড়িতে রেখে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি' এ কথাটা উচ্চারণ করবে কে, এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছে।

স্নেহাংশু বলে—তুমি একটু গুছিয়ে বুঝিয়ে সময়মতো বলে রাখো না, আমার তো সব সময় তাড়াতাড়ি, হঠাৎ বলে বসলে ঠিক হবে কি? রাতে যখন আমার সময় হয়, পিসিমা তো তখন স্বপ্নরাজ্যে।

শিপ্রা বলে—এতো ভয় এতো লজ্জার কারণ কি তাও তো বুঝি না, কোনো অন্যায় কাজ করছি না নিশ্চয়ই! অতো গুছিয়ে বলা আমার দ্বারা হবে না, তুমিই বলবে।

কাজেই বলাটা বাদে আর সব এগোচ্ছে।

এদিকে দেওঘরে বন্ধুর যে খালি বাড়িখানি পাবার কথা ছিলো, তার রূপ গুণ বর্ণনা সম্বলিত এক পত্র এসে গেছে বন্ধুর কাছ থেকে। তিনি মধুপুরে থাকেন, আশ্বাস দিয়েছেন এদের যাবার আগে একদিন নিজে গিয়ে বাড়ি ধুইয়ে রেখে আসবেন।

স্পন্দিতবক্ষ শিপ্রা ভাবে—দিনগুলো এতো মন্থর কেন? স্নেহাংশুর মনে হয়—অফিসের ফাইলগুলো হঠাৎ এতো ভারী লাগছে কেন?

ছুটির আর্জি মঞ্জুর হয়ে গেলো।

অফিসের পোষাক বদলাতে বদলাতে স্নেহাংশু বলে—পরশুই রওনা দেওয়া যাবে, কি বলো? সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে ফিরবো, ন'টায় গাড়ি, হবে না?

—খুব হবে, অগাধ হবে।

—সে তো হলো, কিন্তু পিসিমার কি করলে?

—গৌরীর মাকে অনেক করে রাজী করিয়েছি—ওর বরকে ডাকিয়ে আনিয়ে নিজে মুখে তার কাছে আবেদন করে সব ব্যবস্থা কম্‌প্লীট্‌!

—বলো কি ? এতো সব করেছো ? এ বুদ্ধিটা তো মন্দ করোনি। যাক, পিসিমাকে কিছু বলতে পেরেছো ?

—ওইটি পারিনি, বলেইছি তো আমার দ্বারা হবে না।

—যাক আমিই বলবো রাত্রে। একটু রাত অবধি জেগে থাকেন যাতে চেষ্টা কোরো।

বুড়ি পিসিমা দিনের বেলা দিব্যি আস্ত মানুষ, কিন্তু সন্ধ্যে হ'লেই ছেলেমানুষের মতো ঘুমিয়ে পড়েন।

—পিসিমা, তোমার গোপাল অনেকদিন সন্দেশ খাননি।...সন্দেশের ছোটো কাগজের বাক্সটা পিসিমার আধখানি ঘরের একাংশে অবস্থিত ঠাকুরের চৌকীর সামনে নামিয়ে দিয়ে স্নেহাংশু পিসির চৌকীর একাংশে চেপে বসে।

—ওমা, আবার সন্দেশ কেনরে ছেনু ? তোর যেন খরচ করা এক বাই।

পিসিমা পরিতৃপ্ত সুরে কথাটি উচ্চারণ করে 'ছেনু'র গায়ে হাত রাখেন।

—খরচ আর করি কোথায় গো পিসিমা, গোপাল বেচারা তো বাতাসা খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গেলেন। আমার মনেই থাকে না।

পিসিমা বিগলিত স্নেহে বলেন—মনে থাকবে কোথা থেকে, অতো বড়ো একটা আপিসের ভার তোর মাথায় !

স্নেহাংশুর ছুটি না পাওয়ার কারণ সম্বন্ধে পিসিমার ধারণা স্নেহাংশু বিহনে অফিস অচল বলেই তার এহেন অবস্থা। অবশ্য এ অবস্থাটিকে পিসিমা খুব গৌরবজনকই মনে করেন !

ভালোই হলো, স্নেহাংশু ভাবে এই প্রসঙ্গে ছুটি পাওয়ার সংবাদ পরিবেশন করে কথাটা তোলা যাবে। তাই তাড়াতাড়ি বলে—অফিসটাকে অন্ধকার করে দিয়ে সাতদিনের ছুটি নিয়ে ফেললাম পিসিমা।

—কেন ? শরীর ভালো আছে তো ?

চমকে ওঠেন পিসিমা।

—শরীর খুব ভালো আছে। ভাবলাম কেবলি খাটছি—

—আহা তা বেশ করেছিস। রোগবালাই শত্রুর হোক।

—ফের পিসিমা, আবার ওই সব বিচ্ছিরি কথা ?

পিসিমা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—আচ্ছা বাপু আচ্ছা, শত্রু নীরোগ হোক।

—উঁহু তাও হ'লো না। শত্রু থাকবেই বা কেন ?

পিসিমা এবার ফোকলা দাঁতে হেসে ফেলে বলেন—তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বাছা !

আর উত্তর জোগায় না স্নেহাংশুর, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে তার। এই যাঃ, আলোচনার ধারা যে অন্য মোড় নিচ্ছে, এ ধারাকে আবার পূর্বপথে ফেরানো যায় কি করে ? কি বলবে ? 'দেখো পিসিমা, তোমার বৌমার অনেক দিনের ইচ্ছে'—নাঃ এ ভনিতা ঠিক হবে না।...তবে—'পিসিমা, ভাবছি—ছুটিটা বাজে খরচ না করে—'...কই শুনতে তো তেমন ভালো ঠেকছে না ? আচ্ছা

এমন যদি বলা যায়—'পিসিমা, আমার এক বন্ধু অনেকদিন থেকে বলছে দেওঘরে তার একটা বাড়ি খালি পড়ে রয়েছে, আমরা যদি—'...ভাবতে গিয়ে থমকে যেতে হলো, দেওঘর যে বৈদ্যনাথধাম এটা তো আর পিসিমার অজানা নয়। পিসিমাকে গৌরীর মার হেফাজতে ফেলে রেখে শিপ্রাকে নিয়ে বৈদ্যনাথে যাওয়ার সংকল্পটা নিজের কাছেই হঠাৎ কেমন বিসদৃশ ঠেকলো স্নেহাংশুর।

আর তা'র এই নীরবতার অবসরে পিসিমা তাঁর একটি আবেদন পেশ করবার সুযোগ পেলেন—একটা কথা তোকে বলবো ছেনু ?

—কি কথা পিসিমা ?

অন্যমনস্কের মতো উচ্চারণ করে স্নেহাংশু।

—যদি রাখিস তো বলি।

স্নেহাংশুর মনের মধ্যে তখন ধ্বনিত হয়ে চলেছে...'তাই তো কি করে বলা যাবে'...'তবে না হয় এখন থাক'...'শিপ্রা যে একেবারে অসহযোগ করে বসলো, ও যদি বলার ভারটা নিতো'—ততোক্ষণে পিসিমার কণ্ঠ ধ্বনিত হয় —তোর কাছে কখনো কোনো অন্যায় আবদার করিনি বাপু, তা মনে রাখিস। ...অনেক দিনের সাধ, তোর সময় নেই তাই সাহস করে বলতে পারি না।

এতোক্ষণে একটু সচেতন হয়ে ওঠে স্নেহাংশু, বলে—কি তাই বলোনা গো, এতো গৌরচন্দ্রিকা কিসের ?

ঠিক কিছু অনুমান করতেও পারে না স্নেহাংশু।

—বলছি কি, ক'দিনের ছুটি তো পেলি, আমাকে এক ঠাঁই নিয়ে যাবি ?

বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলো স্নেহাংশুর!

এ কী প্রস্তাব!

পিসিমার কাছ থেকে এই প্রস্তাব আসবে এ যে স্বপ্নের অগোচর। 'একঠাঁই!' কোন সে ঠাঁই ? পিসিমার ঠাঁই বলতে কি আছে ? কোন তীর্থস্থানের আশায় মন তৃষিত হয়ে উঠেছে স্বর্ণলতার ?

আলগাভাবে উচ্চারণ করে স্নেহাংশু—কোথায় ?

—বলছিলাম—আমায় একটিবার ভগবানগোলায় নিয়ে যাবি ? বুড়ো হয়েছি, শরীরে নানা ব্যাধিও ঢুকেছে, কোনদিন মরে যাবো, জন্মের শেষ একবার শ্বশুরের ভিটেটা দেখতে বড়ো সাধ যায়!

একি সর্বনাশ! বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে স্নেহাংশু,—পিসিমার দিকে নয়, সামনের সাদা দেওয়ালটার দিকে। কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারে না।

—কই কিছু উত্তর দিলিনি যে ? বুড়িকে নিয়ে কষ্ট একটু পোহাতে হবে তোকে বুঝি, তা আজন্মই তো আমার ভোগ ভুগলি!

স্নেহাংশু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে, না বিহ্বলতাটা কাটিয়ে ওঠা দরকার, কথাটাকে আর বেশী বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। তাই সহসা হেসে উঠে বলে—উত্তর দেওয়ার মতো কথাই বটে, শেষ পর্যন্ত শ্বশুরের ভিটেয় দেহরক্ষা করতে যাবার বাসনা হলো তোমার ?

—এমন ভাগ্যি কি আর আমি করেছি বাবা!

বাঃ—এতে আর বেশী ভাগ্যির দরকার কি? তোমার শ্বশুরের ভিটেয় সাপখোপের অভাব আছে বলে তো মনে হয় না, বাঘ থাকাও বিচিত্র নয়, কাজেই ভাগ্য ফলতে কতোক্ষণ? না বাপু, এতো শীগ্‌গির পিসিহারা হতে রাজী নই আমি।

—কি যে বলে পাগলা ছেলে! পিসি আর তোর একখুনি মরছে না রে বাছা, সে দিকে নিশ্চিন্দি। অনেক কালের ইচ্ছে মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলাম, আজ এই তোর কাছে ব্যক্ত করলাম। এখন তুই যদি—

—আহা আমি নয় নিয়ে গেলাম, কিন্তু সেখানে উঠবে কোথায়? সেখানে তোমার আছে কে?

—আছে আর কে—পিসিমা সনিশ্বাসে বলেন—তুই ছাড়া ত্রিজগতে আর আমার কোথায় কে আছে ছেন?

বুকের মধ্যে আর একবার ধ্বক করে ওঠে স্নেহাংশুর, তবু সহজভাবে বলে—

—বলছি উঠতে তো হবে একটা জায়গায়? তোমার পূজনীয় শ্বশুর-মশাইয়ের ভিটেখানি কি এখনো দাঁড়িয়ে আছে?

—ভাঙা ইঁটের বোঝাটাও তো আছে। অতো বড়ো দোতলা ইমারতখানা সবটাই কি পড়ে গেছে? চাল চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে যাবো, পিসি ভাইপোতে মিলে দু'দিন চড়ুইভাতির মতন চালিয়ে দেবো।...বৌমাকেই ভয়, ও মোটে কষ্ট সইতে পারে না, তোকে ভয় করি না। আমি বলি কি, বৌমাকে দু'দিন ওর ভাইদের কাছে রেখে যা। আহা যেতেও তো পায় না!

শিপ্রার বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছেকে স্বর্ণলতা কোনোদিনই সমর্থন করেন না, কিন্তু আজ তিনি ভারী উদার।

স্নেহাংশু একটু চুপ করে থেকে অন্য একটা অস্ত্র আমদানী করে—যদি এতে স্বর্ণলতা লজ্জিত হয়ে নিবৃত্ত হন।

—আচ্ছা পিসিমা, শ্বশুরের ভিটের ওপর তোমার কিসের এতো টান বলো তো? জন্মে কখনো ঘর তো করলে না। যে কোনো পরের বাড়ির সঙ্গে তফাৎ কি?

পিসিমা একটু চুপ করে যান, স্নেহাংশু ভাবে ওষুধ ধরেছে, কিন্তু তার আশার গোড়ায় ছাই দিয়ে স্বর্ণলতা ফিক্ করে একটু হেসে ফেলে বলেন—

—ঘর করিনি সত্যি, কিন্তু ওই ভিটেতেই তো একদিন ধানের কাঠা মাথায় নিয়ে তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ঢুকেছিলাম। ওর তুল্য ঠাঁই কি আর জগতে আছে রে?

দশ বছরে বিয়ে হয়েছিলো স্বর্ণলতার, আর বছর তেরোয় বিধবা হন। তখনো পর্যন্ত পিত্রালয়েই ছিলেন, আজীবন পিত্রালয়েই রয়ে গেলেন। তবু তাঁর অন্তরের সঞ্চিত শ্রদ্ধার সম্পদটুকু জমা করে রেখেছেন তাঁর সেই অপরিচিত শ্বশুরের ভিটেয়, তাঁর সেই ভগবানগোলায়।

আশ্চর্য!

চুপ করে যায় স্নেহাংশু। শুধু ওর সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা চোখের সামনে দিয়ে কতকগুলো তুচ্ছ জিনিস ছায়া ফেলে ফেলে সরে যেতে থাকে।…রঙিন ফুলকাটা ছোট্ট চা-দানী, নতুন ঝকঝকে ইকমিক কুকার… মাখনের কৌটো, বিস্কুটের টিন…মাদ্রাজী বেড্-কভার· লেসের বালিশঢাকা …শান্তিনিকেতনী পর্দা।…ধীরে ধীরে অনেকদিন ধরে যেগুলি সংগ্রহ করেছে শিপ্রা—আবদার করে, ঝগড়া করে।

যেমন তেমন করে 'শুধু বেঁচে' আসতে চায় না শিপ্রা, চায় অন্ততঃ সে ক'টাদিনও মানুষের মতো করে সভ্য ভব্য হয়ে থাকতে—যেটুকু এই দেড়খানা ঘরে আর শুদ্ধাচারিনী পিসশাশুড়ীর আওতায় পাওয়া অসম্ভব, চাওয়াটা ধৃষ্টতা।

তবু চাওয়াটা মরে যায় না, চাওয়াই যে মানবধর্মের একমাত্র লক্ষণ। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ তো এইখানেই, পশু শুধুই 'থাকতে' চায়, মানুষ 'ভালো ভাবে' থাকতে চায়। মানুষ আরো অনেক কিছুই চায়, তার চাওয়ার আর শেষ নেই।

কিন্তু চাওয়ারও তো একটা মূল্যমান আছে ?

যারা শিক্ষিত, যারা ভদ্র, তারা পারবে না কি সে মান নির্ণয় করতে ? তারা বুঝতে পারবে না কোন চাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া মনুষ্য ধর্ম ?

বুঝতেই হবে যে !

সেই জন্যেই স্নেহাংশুকে বলতে হয়—

—বেশ তা যেন হ'লো, কিন্তু পারবে তো ? কষ্ট হবে না ?

—না রে বাপু না, দেখিস তোকে কিছুটি বেগ পেতে দেবো না।…আর কষ্ট যদি একটু হয়ই, কষ্ট বলে মানবো কেন ? অমনি অমনি কি আর 'কেষ্ট' মেলে ?

বিছানার ওপর সুটকেসটাকে বসিয়ে কাপড় জামা গুছিয়ে তুলছিলো শিপ্রা, স্নেহাংশু ঘরে ঢুকতেই সহাস্যে বলে—তোমার একটিও সার্ট প্যান্ট নিচ্ছি না কিন্তু তা' বলে রাখছি, শুধু মিহি ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবী বুঝলে ?

—মিহি ধুতি থাক, আমার দু'টো মোটা ধুতি আর দু'টো সার্ট আলাদা করে রাখো।

বিছানার অপর প্রান্তে বসে পড়ে স্নেহাংশু।

—মোটা ধুতি আর সার্ট, আর কিছু না ? ওখানে ওই বিশ্রী সাজ তোমায় করতে দেবো যে !

—ওখানে তো যাচ্ছি না।

—ও আবার কি কথার শ্রী ?

—সব কথাই কি শ্রীসম্পন্ন হয় ?

—তুমি কি বলতে চাইছো বলো তো ?

—বলছি দেওঘর যাওয়া হবে না, পিসিমাকে নিয়ে ভগবানগোলায় যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছে করো তো আমাদের সঙ্গে যেতে পারো, নইলে শাঁখারীটোলায় গিয়ে থাকতে পারো দিন তিনেক।

পিসিমাকে নিয়ে যেতে যে স্নেহাংশু মোটেই বেজার হয়নি এইটুকু বোঝাতে ট্রেনে উঠে স্নেহাংশুকে প্রথমটা অনেক বেশী কথা কইতে হয়েছে, অনেক বেশী হাসতে হয়েছে, কারণে অকারণে পিসিমার 'শ্বশুর তুলে' সরস পরিহাসে পিসিমাকেও হাসিয়ে মারতে হয়েছে, নইলে আর সৌজন্য কথাটার মানে কি?

'তোমাকে যা দিলাম, সেটা নিরুপায় হয়ে বিরক্ত চিত্তে দিলাম', গ্রহীতাকে একথা বুঝতে দেওয়ার মতো নীচতা জগতে আর কি আছে? না, তেমন স্নেহাংশু নীচ নয়।

কিন্তু মজা এই, চেষ্টাকৃত প্রসন্নতা কখন একসময় সহজ হয়ে গেলো। রোদে ঝল্‌মল্‌ উন্মুক্ত পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে দুরন্তবেগে ছুটে যেতে যেতে মনটাও বুঝি মুক্তি পেয়েছে। তাই ছেলেমানুষের মতো খুসিতে ভরে ওঠে স্নেহাংশু—ছুটন্ত গাছপালা ক্ষেত খামার পুকুর গ্রাম দেখে।

সত্যি, কতোকাল ট্রেনে চড়া হয়নি! ট্রেনে চড়তে এতো ভালো লাগে!

—তুই বরং একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আয়, দেখ্‌ যদি মিষ্টির দোকান-টোকান কোথাও পাস। এখানের ছানাবড়া বিখ্যাত ছিলো।

—ছানাবড়া! স্নেহাংশু হেসে ওঠে—তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশের বিখ্যাত খাবারের নাম শুনে যে আমার চোখ তাই হয়ে উঠছে পিসিমা!

—তোর খালি বাক্যি! নে একটু বেড়িয়ে আয়, আমি ততোক্ষণ ইদিকটা গোছগাছ করে নিই। দেখিস তা' বলে যেন যেখানে সেখানে যাসনি, বিদেশ বিভুঁই জায়গা—বলে পিসিমা ভাঙা ইঁটের স্তূপের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে যান।

পিসিমার নিজস্ব অংশটুকুর চাবিতালা সব পিসিমার জিম্মাতেই ছিলো, আর তাঁর ধারণা ছিলো জ্ঞাতিদের মধ্যে কেউ না কেউ দেশে আছে।

এসে দেখা যাচ্ছে জ্ঞাতিরা কেউই নেই, আর চাবিগুলো বয়ে আনা নিষ্প্রয়োজন হয়েছে। কারণ সদর বাড়ি ভেঙে পড়ে গেছে এবং ভিতর ঘরের দরজার কপাট দু'খানা বোধ করি পড়শীরা নিজস্ব প্রয়োজনে না বলে চেয়ে নিয়ে গেছে।

তবু স্বর্ণলতা দমে গেলেন না, কে জানে কোথা থেকে একটা ঝাড়ু সংগ্রহ করে ভাঙা কোমর নিয়ে লেগে গেলেন ভাঙা দেয়ালের রাবিশ সাফ করতে।

অভিজ্ঞ চোখ ঠিক ধরে ফেলে কোথায় কি জোটা সম্ভব। খুব খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করে স্নেহাংশু যখন ফিরলো, তখন দেখা গেলো তার হাতে খাবারের শালপাতার ঠোঙা।

বাড়ি ঢুকে স্নেহাংশু অবাক !

নাঃ, চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। ইতিমধ্যেই স্বর্ণলতা দাওয়ার একাংশ দিব্যি সাফ করে ফেলেছেন এবং স্নেহাংশুর জন্য এক গেলাশ জল ও একখানি আসন ঠিক করে রেখেছেন।

—পিসিমা, তুমি এখনও টিঁকে আছো ? দেয়ালচাপা পড়োনি ?…হৈ হৈ করে ঢোকে স্নেহাংশু।

—দেয়ালচাপা শত্রুতে পড়ুক—না বাপু না, কেউ না পড়ুক। যাক তুই এলি আমি বাঁচলাম। বললাম তো বেড়িয়ে আয়, আবার গিয়েছিস অবধি সোয়াস্তি নেই।

—কেন, আসোয়াস্তি কিসের ?

—কি জানি বাপু, অচেনা অজানা জায়গা…ও মা খাবার পেয়েছিস নাকি ? আয় তবে বোস।

—এ খাবার তুমি খাবে না ? ভালো সন্দেশ।

—শোনো কথা, সন্দেশ না হয় ভালো, তুই ভালো ?…রেলের কাপড় না ? সে তখন কাল চান করে এনে দিস। নে এখন বোস তো। তুই খেলেই আমার খাওয়া হ'লো।

—এ নবাবী আসনটি কোথায় পেলে গো পিসিমা, তোমার শ্বশুরের ঘরের মেঝেয় পোঁতা ছিলো নাকি ?

পিসিমা পশমের ফুলতোলা কার্পেটের আসনখানির দিকে একটি স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন—তাই বৈকি। এ আসন আমি এনেছি তুই বসবি বলে।

—পেলে কোথায় ?

—বাক্সোয় তোলা ছিলো রে, এখানা বুনেছিলাম কবে জানিস ? তুই তখন দামাল ছেলে, পশমের তাল নিয়ে বল খেলবি বলে কি কাড়াকাড়িই করতিস !

দামাল ছেলের কাছে সামাল করে এই সৌখিন বস্তুটি এতকাল ধরে সযত্নে তুলে রেখেছিলেন কি স্বর্ণলতা এই সার্থকতাটুকুর আশায় ? তা নইলে চোখে মুখে তাঁর এমন পরিতৃপ্তির ছাপ কেন ?

এ যেন স্বর্ণলতার শ্বশুরবাড়িতে তাঁর পিত্রালয়ের কুটুম্ব এসেছে, তার জন্যে এই সযত্ন আয়োজন।

তবু অবাক হবার আরো কিছু বাকী ছিলো, কোণ-ভাঙা ইঁটের অন্তরাল থেকে এ বস্তুটি এনে হাজির করলেন স্বর্ণলতা।

একটি পলকাটা মোটা কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস ধূমায়মান চা।

—ও পিসিমা, তুমি হঠাৎ মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে উঠলে নাকি ? এ কী ব্যাপার ! চা কোথায় পেলে গো ?

পিসিমা বাহাদুরীর হাসি হেসে বলেন—ইঁদারা থেকে ঘটি ডুবিয়ে তুললাম ! চায়ের সাজ আমি আনিনি বুঝি ? পিসি ভাইপো কারুরই তো নেশাটি কম নয় !

—তা' কই তোমার কই ?

স্নেহাংশু জিজ্ঞাসা করে।

—এই যে আমারটুকু ছেঁকে আনি। তৎপরতার সঙ্গে একটা দেয়ালের অন্তরাল থেকে একটি পাথর বাটি আচলে চেপে ধরে নিয়ে এসে অদূরে বসে পড়েন স্বর্ণলতা।

তাঁর মুখে অদ্ভুত একটু স্বর্ণাভা।

এ আভা পড়ন্তবেলার সোনালি আলোর, না অনেকদিনের বাসনা পরিতৃপ্তির ?

—সাজ তো এনেছো, আগুন কোথায় পেলে ?

—আগুনের আবার অভাব !···দু'খান ইঁট পেতে চারটি পাতা জেবলে দিলাম, হয়ে গেলো একদণ্ডে।

চায়ে চুমুক দিয়ে অবশ্য পাতা জ্বালার ইতিহাস আপনিই ধরা পড়ে, তবু পরম পরিতোষ সহকারে তারিয়ে তারিয়ে সেই তেতো কষা আর ধোঁয়াগন্ধ চা গলাধঃকরণ করতে থাকে স্নেহাংশু। আর ভাবে···শিপ্রাও যদি সামনের ওইখানটায় বসতো—পলকাটা মোটা কাঁচের একটা গ্লাস নিয়ে !

শাঁখারিটোলায় যাবার আগে কেন কে জানে হঠাৎ ছোট সেই চা-দানীটাকে টেবিল থেকে তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে আছড়ে ফুটপাতে ফেলে দিয়েছিল শিপ্রা ? তা'র সমস্ত রাগ অভিমান আর হতাশার আক্রোশ ওই ছোট জিনিস-টুকুর উপরেই ভেঙে পড়লো কেন, কে বলতে পারে ?

শিপ্রার মেজাজ দেখে একটি বারও বলতে সাহস হয়নি, কিন্তু এখন স্নেহাংশু ভাবতে থাকে—একটু তোষামোদ করে দেখলেই হতো, হয়তো রাজী হয়ে যেতো শিপ্রা। আর স্নেহাংশুর মনে হয়, এলে হয়তো ওর ভালোই লাগতো !···হয়তো শিপ্রাও বুঝতো যুগল-পাত্র ব্যতিরেকেও আনন্দ পাওয়া অসম্ভব নয়, যদি তার বিনিময়ে অপরের মুখে ফুটিয়ে তোলা যায়—আনন্দের স্বর্ণদ্যুতি !

[১৩৬৩]

কাঠামো

খবরটা কেশব রায় প্রথম পেলেন নীলকণ্ঠের কাছে। পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, শুনে প্রথমটা রাগ আসবারও অবস্থা হয় নি। এসেছিল বিস্ময়। নতুন গিন্নীর স্পর্ধা দেখে অসহ্য বিস্ময়ে প্রথমটা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন কেশব রায়, তারপর ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন। বলেছিলেন—বটে ! ওর ওই শুঁট্কো কোলকুঁজো ভাইটার ভরসায় হারামজাদী কেউটের গর্তয় হাত দিতে এসেছে ? আচ্ছা, আমিও রাঘব রায়ের ব্যাটা কেশব রায়।

কেশব রায় যাকে হারামজাদীরূপ সভ্য বিশেষণটিতে অভিহিত করলেন, সেই নতুন গিন্নী কিন্তু আইনত কেশব রায়ের রীতিমত মাননীয়া গুরুজন।

মহিলাটি হচ্ছেন পিতা রাঘব রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কদম। ব্যাপারটা এই —বুড়ো বয়সে রাঘব রায় এক বন্ধুর পৌত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে, বন্ধুর মা-বাপ-মরা ঘাড়ে-পড়া ভাগ্নীটিকে করে বসেছিলেন বিয়ে এবং বিনা নোটিশে বাড়িতে এনে উপস্থিত করেছিলেন! স্ত্রীবিয়োগের আঠার বছর পরে এই অধঃপতন!

ছেলে কেশবের তখন চার-পাঁচটি ছেলে মেয়ে।

কদম কেশবের চাইতে বছর পনের-ষোলর ছোট।

একেই তো এই অভাবনীয় এবং অসহনীয় বিয়ে। তার উপর শুনতে পাওয়া গেল, কদমের বাপ নাকি রাঘব রায়েদের চাইতে অনেক নিচু ঘর। কাজে কাজেই কেশব বাপের এই বুড়ো বয়সের কীর্তিটিকে কোনদিনই যথোপযুক্ত সম্মান দিতে রাজী হল না! ঠাকুর্দা মাধব রায় গ্রাম-প্রান্তের যে বাগ্দী মহিলাটিকে নেক্‌নজরে দেখতেন, কদমের আসন তার সমতুল্যই হল কেশবের মনোরাজ্যে।

কিন্তু মুস্কিল এই একে রাঘব রায় একেবারে অন্দর মহলে এনে তুলেছেন। তাই আক্রোশ আর ঘৃণাটা বরং আরও বেশি।

হয়তো কদম যদি নম্র নত স্বভাবের হত আপনার এই উড়ে এসে জুড়ে বসাটাকে অনধিকার প্রবেশ মনে করে কুণ্ঠিত হত, কেশবের বৌকে শাশুড়ীর মত শ্রদ্ধা সম্মান করে চলত, কালেখ্যে কেশবের মন কিছুটা নরম হত। কিন্তু হয়েছিল বিপরীত।

পঁচিশ বছর বয়েস অবধি মামার বাড়ির অনেক লাঞ্ছনার ভাত নীরবে হজম করেছে কদম, নিজের দিন-আসার অপেক্ষায়। আর, পাঁচটা নাতি-নাতনীওলা বুড়োকে বিয়ে করতে এক কথায় রাজী হয়েছিল শুধু প্রতিষ্ঠার আশায়! তাছাড়া —মামী ভাগ্নীকে পতিগৃহে পাঠাবার কালে গহনা কাপড়ের মত অসার বস্তু না দিয়ে, দিয়েছিল কিছু সারালো উপদেশ।

সেই উপদেশ অনুসারে অষ্টমঙ্গলার কনে কদম বাড়ির ঝি রাঁধুনী আশ্রিতা অনুগৃহীতাদের প্রতি ভ্রূকুটি করে বলেছিল—তোমরা আমায় 'নতুন বৌ' 'নতুন বৌ' কর কি জন্যে? আমি কি এ সংসারের বৌ?

থতমত হয়ে রাঁধুনীটা বলেছিল—তাহলে কি নতুন বৌমা বলব?

—কেন বৌমাই বা বলবে কেন? তুমি তো শুনলাম পুরনো কালের লোক! কেশবের মা—মানে বাবুর প্রথম পক্ষকে কি বলতে?

রাঁধুনী বিস্ফারিত-নেত্রে বলেছিল—তাঁকে? তাঁকে তো সকলেই গিন্নীমা বলত।

—বেশ, আমাকে তাহলে নতুন গিন্নীমা বলবে।

বলাবাহুল্য এহেন সরস ব্যাপারটি আরো সরস আর পল্লবিত হযে সারা সংসারে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর ব্যঙ্গোক্তি হিসেবে 'নতুন গিন্নী' 'নতুন গিন্নী' উচ্চারিত হতে হতে, সেই শব্দটাই কায়েমী হয়ে গেল। তবে মা কথাটা নিতান্ত মুখোমুখি সম্বোধনের ক্ষেত্র ব্যতীত কেউই উচ্চারণ করতে রাজী হত না।

যাক, তার জন্যে কদমের কিছু এসে যায় না।

সে অক্লেশে কেশবকে 'কেশব' ও তার বৌকে 'বৌমা' বলে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিল। কেশব অবশ্য জীবনে কদমের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি, কিন্তু বয়সে পাঁচ সাত বছরের ছোট শাশুড়ীকে কেশবের বৌ একদিন বলেছিল —অতবড় মানুষটাকে নাম ধরে ধরে কথা কও, তোমার লজ্জা করে না ?

কদম ঠোঁট উল্টে উত্তর দিয়েছিল—লজ্জা আবার কিসের ? অতবড় মানুষটার বাপকে কানে ধরে ওঠাচ্ছি বসাচ্ছি, আর তার ছেলেব নামটুকু করতে লজ্জা ?

বৌ নিজের কানের রক্তিমা লুকোতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

বলাবাহুল্য ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বাঁধতেও দেবি হয় নি কদমের। তার আচার আচরণ দেখে বেশ বোঝা গিয়েছিল, সে একেবাবে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েই রণক্ষেত্রে নেমেছে।

তা' এসব হল সাত আট বছর আগের কথা।

এখন অন্য হাল।

বছর দুই হল রাঘব রায় গত হয়েছেন, অতএব কদমের সৌভাগ্যশশীও অস্ত গেছে। কেশবের বৌ হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধারে লেগেছে, এবং কেশব ভাবছেন পাঁচ বছরের ছেলেটা সমেত কদমকে কিছু মাসোহারার বন্দোবস্ত করে তার মামাতো ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এমন সময় এই সংবাদ! শুনে মনের গায়ে জলবিছুটির যন্ত্রণা জাগল!

নাবালক ছেলের পক্ষ থেকে কদম সম্পত্তি ভাগেব মামলা তুলেছে। কেশব রায়ের সঙ্গে আট-আনা বখরা!

নাকে সর্দি, পেটে পিলে, হাতে মাদুলি, গলায় বাঘনখ, পুঁইয়ে-পাওয়া সেই ছেলেটার সঙ্গে আট-আনা বখরার কথা শুনে কেশব রায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—বটে! ভেবেছিলমে কিছু মাসোহারা দেব। এক পয়সাও দেব না। দেখি নতুন গিন্নীর হিম্মত। কোর্টে প্রমাণ করব রাঘব রায়ের ও বিয়ে বিয়েই নয়,—'নিকে'। কিসের বিয়ে ? এ বংশের কেউ সাক্ষী আছে ? পুরুত গিয়েছিল এ বাড়ির ? পাকা দেখা হয়েছিল ? আগে থেকে কানে শুনেছিল কেউ ? কিছু না! ও ছেলে রাঘব রায়ের অবৈধ ছেলে!

কেশবের বৌ সকৌতূহলে বলে—আব এই যে এতকাল ধরে নতুন গিন্নী এ বাড়িতে রয়েছে, তার কি যুক্তি দেবে ?

কেশব রায় অগ্রাহ্য ভরে বলেছিলেন—ফুঃ! বেঁচে থাকতে ঢের পুরুষ-বেটাছেলে অমন ঢের কুকীর্তি করে থাকে। হাড়ী বাগ্দীর মেয়ে এনে ঘরে তুলছে, এ তো তবু বামুন! তোমার স্বামীর মতন নিষ্কলঙ্ক চাঁদ তো সবাই হয় না ?

নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মহিমায় বিগলিত বৌ কৃতার্থের হাসি হেসে বলেছিল—হ্যাঁগো, তাহলে আদালতে প্রমাণ হবে, ওদের সত্যি কোন দাবি-দাওয়া নেই ?

—নিশ্চয়! বামুন হলেও, কি শ্রেণীর বামুন ওরা ? আচার্যি বামুন! ওদের সঙ্গে আমাদের কাজ হয় ? এই তো—এক মস্ত প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে। তা'পর গাঁ-সুদ্ধু সাক্ষীও আমার হাতে।

কেশব রায়ের গুষ্টি সাতপুরুষে ডাকসাইটে মামলাবাজ। কাজেকাজেই কদমের এই আকাশ-স্পর্শী স্পর্ধায় রেগেই জ্বলে মরেছিলেন কেশব রায়, ভয়ে মরেন নি। কিন্তু কাল বদলেছে ; এখন নাকি আইন সব সময় দুর্বলের পক্ষে।

ক্রমশই দেখা যাচ্ছে যতটা অবহেলায় এ মামলা নস্যাবৎ করে দেবেন ভেবেছিলেন কেশব রায়, তেমনটি ঠিক হচ্ছে না। বরং কেস ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়ছে, অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

ওদিকে কদমের মামাতো ভাই, তস্য শালা এবং তস্য স্যাঙাৎ এসে এ সংসারে কায়েমী আসন গেড়েছে। সে নাকি আবার সদ্য-পাসকরা উকিল। তাদের খাওয়া-মাখা স্ফূর্তি-আমোদে এ পক্ষের চোখের তারা ট্যারা হয়ে যাচ্ছে। তাদের হাসির হুহুংকারে এ পক্ষের কানের পর্দা ফাটছে। বাড়ি ভাগ হয় নি বটে, তবে রাঘব রায় মরতে মরতে হাঁড়ি ভেন্ন হয়েছিল, এবং জানলাদরজার কপাটের সাহায্যে পাঁচিল তোলার কাজ যতটা সম্ভব চালানো হচ্ছিল।

আজকাল প্রায়ই কোর্ট থেকে এসে শয্যা নিচ্ছেন কেশব। গরমে আনাগোনা করে ভীষণ নাকি মাথা ধরে।

বৌ ছুটে এসে প্রশ্ন করে—হ্যাঁ গো কি হল ?

কেশব রায় গম্ভীরভাবে বলেন—সে তুমি বুঝবে না।

—আহা, হার-জিত তো বুঝতে পারি ? কারা হারছে, কারা জিতছে ?

—শেষ রায় বেরোবার আগেও বোঝা যায় না! ধর্মের ধুরন্ধর এক জজ এসেছেন এখন, সেই ভয়। সর্বদিক সুরাহা হয়, যদি ওই লক্ষ্মীছাড়া হারামজাদাটা ওলাউঠো হয়ে মরে।

বলে উঠে বসেন কেশব রায়।

বলা-বাহুল্য এই লক্ষ্মীছাড়া হারামজাদাটি আর কেউ নয়, কদমের পাঁচ বছরের পুত্র মানিকলাল। মানিক কেশবের পরম পূজনীয় পিতৃদেবের পুত্র হলেও তার উল্লেখে উক্ত সভ্য বিশেষণটি ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করেন না কেশব রায়। কদমের ক্ষেত্রে তারই স্ত্রী-সংস্করণ। ও ছাড়া ওদের বিষয়ে আর কোন শব্দ মুখে আসেই না কেশবের।

ছেলেপুলের মা কেশব-পত্নী মনে মনে একবার শিউরে উঠে নিরুচ্চার উচ্চারণে 'ষাট' বানায়। তারপর বেজার মুখে বলে—মামলার হার-জিতে মরণ বাঁচনের কথা কেন ?

কেন ? কেন, তার তুমি কি বুঝবে! তোমার তো বাপের বিষয় নয়! তোমার তো আর কোর্টে দাঁড়িয়ে উঁচু মাথাটা হেঁট হচ্ছে না।

—তা তুমি যে বলেছিলে ওদের নেয্য পাওনা কিছু নেই ?

—নেই-ই তো!—রক্ত চক্ষে ঘরের মাঝখানে পায়চারি করে বেড়ান কেশব রায়।

বৌ সভয়ে বলে—উকিল ব্যারিস্টার নেয্য-অনেয্য বুঝবে না ?

—না। বুঝবে না! ধমক দিয়ে ওঠেন কেশব রায়—যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কইতে এস না।...উঃ! এখন ভাবছি ছোঁড়া যখন জন্মেছিল, ধাই মাগীকে

হাত করে নুন খাইয়ে মারি নি কেন !

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ !

কী রোগীর বেলায়, কী মোকদ্দমার বেলায়।

রোগী মরমর হলে লোকে দূরদূরান্তর থেকে বড় ডাক্তার আনতে ছোটে, কেস মরমর হলে দূরদূরান্তরে ছোটে উকিল ব্যারিস্টার আনতে। গোয়াড়ীর উকিলে আর কুলোয় না, এখন কলকাতা থেকে উকিল আনাচ্ছেন কেশব রায়। কিন্তু তেমন ভরসা কেউই দিচ্ছে না। কদমের সঙ্গে রাঘব রায়ের বিবাহটা বৈধ প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং অবলা বিধবা ও নাবালক শিশুটির প্রতিই আদালতের ষোল আনা সহানুভূতি দেখা যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টার ত্রুটিও হয়নি কদমের পক্ষ থেকে। আদালতে হাজির হওয়ার দিন হলেই সেদিন সোডা দিয়ে মাথা ঘষে, বেছে বেছে আধ-ময়লা থান পরে এবং মুখের ভাব যতটা ক্লান্ত ক্লিষ্ট করে তোলা সম্ভব তা' করে।

যতক্ষণ শ্বাস, সেই হিসেবেই বড় এক আইনজ্ঞ পুরুষের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন কেশব, ফিরলেন দেড়টার গাড়িতে। মন-মেজাজ যতটা সম্ভব তিক্ত।

সেই ভোর থেকে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ! স্টেশনে নেমে দেখলেন বৃষ্টিটা ধরেছে মাত্র, আকাশের অবস্থা একই। কোন ট্রেনে ফিরবেন বলে যাননি কাজেই স্টেশনে গাড়ি প্রস্তুত নেই ; মনে করলেন, দূর ছাই আর ভাড়াটে গাড়িতে কাজ নেই, হেঁটেই চলে যাই। ঠিক এই মুহূর্তে মানুষ এবং কথা আদৌ ভালো লাগছিল না বলেও হয়তো এই সিদ্ধান্ত।

বড় রাস্তা ছেড়ে ঘোষের পুকুরের পাড়-বরাবর বাঁকা রাস্তাটা ধরলেন কেশব রায় শর্টকাটের জন্যে নয়, নির্জনতার জন্যে। যাচ্ছিলেন আপন মনে, হঠাৎ অদূরে তাকিয়ে দুই চোখ কপালে উঠে গেল ; একেবারে পুকুরের ধার ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে ও ? গোপ্‌লা না ? এর মানে ? এরা ভেবেছে কি ? আজকের দিনে—ছেলে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে ! 'এরা' অর্থে অবশ্য কেশবের বৌ। গোপ্‌লা বা গোপাল কেশবের ছোটছেলে। বাড়ি থেকে এতটা এলই বা কেন ?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান কেশব ছেলেটাকে ধরবার জন্যে। কিন্তু এসেই দাঁড়িয়ে পড়েন আর যেন তীব্র একটা ঘৃণার শিহরণে সমস্ত শরীর সিরসিরিয়ে ওঠে তাঁর ! মনে হল একসঙ্গে একমুঠো কেঁচো দেখেছেন যেন !

গোপাল নয়, মানিক।

মানিক ঝড়ে-পড়া কাঁচা তেঁতুল সংগ্রহ করছে। পথচারীর প্রতি দৃক্‌পাত নেই তার।

ঘৃণার শিহরণের সঙ্গে সঙ্গেই একটা আক্রোশের আগুন জ্বালা ধরিয়ে দেয় সর্বাঙ্গে। এই, এইটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ! তাঁর আট-আনার ভাগীদার ! পূর্ব-

জন্মের মহা-মহাশত্রু! কেশব রায়ের মনে পড়ে বেশ কিছুকালের মধ্যে ছেলেটাকে, তিনি দেখেন নি। অর্থাৎ দেখতে পান নি। পরমশত্রুর নজর থেকে কদম ছেলেকে ভয়ে ভয়ে সরিয়ে রাখে। বোধকরি আজ কেশবের কলকাতা যাওয়ার খবর ও-তরফে পেঁীছেছে। তাই মানিকের এই ছুটি। তাছাড়া আরও কারণ, মামলা জেতার মানত করে মা আনন্দময়ীর বাড়ি হোম বসাতে গেছে কদম। তিনদিন তিনরাত সেই হোমের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারলে জয় অবশ্যম্ভাবী।

কেশব রায় অবশ্য এতকথা জানতেন না।

তিনি শুধু দেখলেন ছেলেটা কি ভাবে কে জানে মার আওতা থেকে ছিটকে এখানে এসে পড়েছে!

নাকে সর্দি, পেটে পিলে, হাতে মাদুলি, গলায় বাঘনখ।

সহসা একটা ভয়াবহ হিংস্র ইচ্ছে পেয়ে বসে কেশব রায়কে! আইন-বিরোধী, সভ্যতা-বিরোধী, মানবতা-বিরোধী সাংঘাতিক একটা ইচ্ছে!...... বাঘনখ-লটকানো চড়াই পাখির মত ওই শীর্ণ গলাটা নিজের নখে বিঁধে ছিঁড়ে ফেলতেন ইচ্ছে করে।

আধ মিনিটের কাজ!

আধ মিনিটেই পরমশত্রু নিপাত হয়ে যায়!

চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন কেশব রায়। বাদলা-দুপুরের অস্বস্তিকর আবহাওয়া দেশসুদ্ধ লোককে বোধকরি ঘরে পুরে রেখেছে। রাস্তায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। এমনিতেই এ রাস্তাটা জনবিরল, আজ একেবারেই জনশূন্য। দাঁতের পাটি দুটো কিড়মিড়িয়ে ওঠে কেশবের, দশটা নখ সমেত হাত দুটো যেন নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে! হাতের যে ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে ওঠে সে হচ্ছে প্যাকাটির মতো ওই কুৎসিত দেহটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার।

এই ত সুযোগ।

কে টের পাবে?

কেঁচোটাকে চটকে পিষে টান্‌ মেরে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে, ফের যদি কেশব ফিরতি-ট্রেন ধরে কলকাতায় ফেরেন? সেখানে গিয়ে কাজের অছিলা দেখিয়ে কোন এক আস্থাভাজন আত্মীয়ের বাড়িতে রাতটা কাটাতে পারলেই কেল্লা ফতে!

ভোরের গাড়িতে তিনি যে এখান থেকে গেছেন সেকথা অনেকেই জানে। বেলা বারোটা অবধি উকিলের বাড়ি ছিলেন, কাজেই সেটা পাকা দলিলে উঠে আছে। সন্ধ্যা থেকে বাকী রাত্তিরটার প্রত্যেক্ষ সাক্ষী যোগাড় করতে পারলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, সকাল থেকে পরদিন সকাল অবধি কেশব রায় কেষ্টনগর ছাড়া।

কে তাহলে খুনের দায়ে ফেলতে পারবে কেশব রায়কে?

'লক্ষ্মীছাড়া হারামজাদা'টার কণ্ঠনালীটুকুর দিকে তাকিয়ে দেখেন কেশব রায়। একমাত্র চড়াই পাখির তুলনাই চলে। নিজের এই সাঁড়াশী-সদৃশ আঙুলগুলোর দিকেও তাকান। আধমিনিটও নয়, সেকেণ্ড কয়েক!···

ন্যালা-ক্ষ্যাপা ছেলেটা তখন হাঁ করে পুকুরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁচা তেতুল চুষছে!

এক পা এক পা করে এগোতে থাকেন কেশব রায়!

পরবর্তী দৃশ্যগুলো পর পর ভেসে ওঠে মনের মধ্যে।

বুক চাপড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদছে কদম···তারপর থোঁতামুখ ভোঁতা করে নীরবে মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠেছে!

নাবালক ছেলেই যদি পটল তুলল, কার দাবী নিয়ে তবে মামলা চালাবে সে?

চূর্ণ-দর্প কদমের সেই পরাজিত মুখ কল্পনা করে পুলকে প্রাণ উথলে ওঠে কেশবের! নিঃশব্দে আর দু'পা এগিয়ে যান।

কিন্তু সহসা বিদ্যুৎ-বিকাশের মত একটা কথা খেয়াল হয়। গলাটেপার দাগ, বড় সর্বনেশে দাগ! ওই দাগ থেকেই শেষ পর্যন্ত দাগা আসামীকে টেনে বার করে পুলিশ ব্যাটারা। তার চাইতে ঠেলে পুকুরের জলে ফেলে দিলেই তো—

ঠিক ঠিক!

এই হচ্ছে উত্তম! একেবারে পাড়ের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে হতচ্ছাড়া ছোঁড়া পেছন থেকে এতটুকু একটু ধাক্কা। ব্যস···শব্দও হবে না, এত হালকা। আর হলেই বা টের পাচ্ছে কে?

অসাবধানে জলে ডুবে যাওয়া ছাড়া এর আর অপর কোন ব্যাখ্যা হবে না!···চমৎকার।

এগোতে থাকেন কেশব রায়। কাছে, আরো কাছে। ঘন ঘন নিশ্বাস বইতে থাকে। ওঠা-পড়া করে বুক!···কে জানে হত্যাউদ্যত চেহারা কি রকম হয়! কে জানে কি ভয়াবহ মূর্তি হয়ে উঠেছিল কেশবের। কে জানে অস্ফুট কোন শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল কিনা! হঠাৎ মানিক পুকুরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরে দাঁড়ায়—আর সামনে এই যমরাজ-মূর্তি দেখেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পিছু হাঁটতে সুরু করে!

এক পা দু'পা! একেবারে পুকুরের কানায়।

সত্যিই বড় দাদাকে সে যমের মতই ভয় করে।

এদিকে কেশব?

প্রত্যেকটি লোমকূপে তাঁর পুলক-রোমাঞ্চ!

নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে না। ছেলেটা নিজেই কাজ হাল্‌কা করে দিচ্ছে কেশবের! আর দু'তিন পা!

হাঁ করে একটা ভয় দেখালেই তো ব্যস্! ফিনিশ!

না, চীৎকারও দরকার নেই।

বাতাসে শত্রু থাকে !

চোখ গোল করলেই হবে। কেশবের "চোখ গোল" দেখলেই মাথা গোল-মাল হয়ে যায় মানুকের। পরীক্ষিত ব্যাপার !

আগুনের ভাঁটার মত গোল গোল দুটো ভাঁটাকে আরও বিস্ফারিত করে এগিয়ে যেতে থাকেন কেশব, সভয়ে ছেলেটাও এক পা এক পা পিছু হটতে থাকে।

সারাদিনের বৃষ্টির ফলে ফস করে কর্দমাক্ত পুকুরপাড়ের একটা ধ্বস ভেঙে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে এক ঝটকান দিয়ে টেনে এনে গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড হুঙ্কারে ধমকে ওঠেন কেশব রায়—কোন চুলোয় যাচ্ছিস হারামজাদা ? মরবি না কি ?

[১৩৬৩]

মৃত্তিকা

নড়বড়ে চৌকি, ছেঁড়া তোশক, তেলচিটে বালিশ। আর মাথার কাছে দুরূহ বিজ্ঞানের বই !

পুরো দশহাত মাপের ধুতি দু'খানার বেশি নেই, সত্যিকার আস্ত শার্ট আছে মাত্র একটা।···সেগুলো ব্যবহার হয় বাইরে বেরোতে। এ ঘরের চৌকাঠের ভিতর ঢুকলেই সেগুলো তুলে রাখা হয় সযত্নে, বাজে খরচ করবার মত দুঃসাহস নেই।

এ ঘরে ঢোকার পর যাতে লজ্জা নিবারণ হয়, সে হচ্ছে—ছেঁড়া ধুতির ভগ্নাংশ দিয়ে তৈরি অভিনব লুঙ্গি। আর 'গেঞ্জি' বলে এখনও যেটাকে চালানো হচ্ছে—সেটা হয় তো এক সময় ঠাশ-বুনুনি ছিলো, এখন 'সামারকুল্' হয়ে গেছে। অন্ততঃ এ বাড়ির চাকর যতীন তাই বলে।

সেই গেঞ্জি আর সেই ধুতি পরেই ত্রস্তেব্যস্তে ঘরের ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে এল কাঞ্চন। অবাক হয়ে বলল—ডাক্তারবাবু ! আপনি ?

ডাক্তার বিশ্বাস গম্ভীর মৃদুস্বরে বললেন—তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে কাঞ্চন !

বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল কাঞ্চনের। কথা ! তার সঙ্গে আর ডাক্তারের কি এমন কথা থাকতে পারে, যার জন্যে তিনি নিজে এই রাত্রে তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন ? তবে কি এই শেষ আশ্রয়টুকুও খসল ? ডাক্তার বিশ্বাসের মাধ্যমেই কি সেই সংবাদটা শুনতে হবে ?

নাকি, কাঞ্চনের সেই 'মরীয়া প্রস্তাবে'র প্রতিক্রিয়া এটা ?···হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে প্রস্তাব করেছিল কাঞ্চন, অর্থের বিনিময়ে ব্লাড্-ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে প্রস্তুত সে। টাকার বড় দরকার তা'র। টাকা চাই—টাকা। অথচ সে চাহিদা প্রচুর নয়, মাসে মাসে সামান্য কয়েকটি করে টাকা। যাতে

কাঞ্চনের পড়ার খরচটা চলে যায়।

ডাক্তার একবার তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আরও মৃদু এবং কিঞ্চিৎ কোমল গলায় বলেন—একটা বিশেষ গোপনীয় কথা, সময় হবে তোমার এখন ?

সময় হবে !

কাঞ্চন তটস্থ হয়ে ওঠে। তা'র আবার সময়ের মূল্য ! ডাক্তার বিশ্বাস নিজে তা'র কাছে এসে, বিনীত প্রশ্ন করছেন, দুটো কথা কইবার মত সময় কাঞ্চনের হবে কি না।···পৃথিবী কি উল্টে গেল নাকি ?

—কী আশ্চর্য, কি যে বলেন ? আসুন।···বলেই নিজের ঘরের দিকে তাকায় কাঞ্চন এবং পরবর্তী কথা দিয়ে কথাটা শেষ করে—কোথায় যে বসবেন !

—না বসব না—ডাক্তার বিশ্বাস কাঞ্চনের ছেঁড়া গেঞ্জি পরা কাঁধের উপর ডান হাতের থাবাখানি চাপিয়ে বলেন—এখানে হবে না—এস আমার সঙ্গে, গাড়িতে কথা হবে।

গাড়িতে !

ডাক্তার বিশ্বাসের গাড়িখানাকে মনশ্চক্ষে একবার দেখে নেয় কাঞ্চন। সেই ডেস পিছলোনো বিরাট গাড়িখানার মধ্যে ঢুকতে হবে কাঞ্চনকে, বসতে হবে সেই স্প্রীঙের গদির উপর ! কেন এই অঘটন ?

ডাক্তার তাকে কিঞ্চিৎ স্নেহ করেন বটে, কিন্তু সে স্নেহ করুণা-মিশ্রিত। এমন অন্তরঙ্গতা দেখাননি কোনদিন।···যাক্, আজ কেন যে দেখাচ্ছেন সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই। এখন শুধু আদেশ-পালন। কুণ্ঠিতভাবে বলে—আচ্ছা যাচ্ছি, কাপড়টা বদলে নিই—

ডাক্তার সস্নেহ-হাস্যে বলেন—থাক থাক্, কাপড় বদলাবার দরকার নেই, গাড়ি থেকে তো নামছি না আমরা ! খানিকটা চক্কর দিয়ে আসা যাক, যেতে যেতেই কথা হবে !

অগত্যাই ছেঁড়া চটিটার মধ্যে পা গলিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে ডাক্তারের অনুসরণ করে কাঞ্চন।···ঘরে চুরি যাবার মত জিনিস আছে বলে এ সাবধানতা নয়, খোলা দরজা দিয়ে পাছে তার ভিতরের শ্রীহীনতা লোকের চোখে পড়ে যায় এই ভয় ! অথচ এহ নিয়ে বাড়ির বামুন-চাকরে মিলে শুনিয়ে শুনিয়ে কত হাসাহাসি করে। নাম দিয়েছে 'লাখ-টাকার বাবু'।

তবু সে উপহাস না শোনার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে হয়, তবু তাদের মনিববাড়ির করুণার দান—দুবেলা দু-পাত ভাত খেয়ে আসতে হয় মাথা হেঁট করে গিয়ে ! এ অপমানে বিচলিত হবার উপায় কাঞ্চনের নেই।··· তাকে টিঁকে থাকতে হবে আপন সাধনায়।

অপমানে যখন চোখ ফেটে জল আসতে চায়, এ আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, তখন কষ্টে নিজেকে দমন করে, মনে মনে জপ করে—"এ আমার তপস্যার বিঘ্ন, এ আমার একাগ্রতার পরীক্ষা।...আমাকে টিঁকতেই হবে, বাঁচতেই হবে, জ্ঞান অর্জন করতেই হবে।"

বড়লোকের বাড়ি, গেটে ঢুকতেই বাঁধারে নিচু নিচু কখানা ঘর, চাকর-বাকরদের জন্য। তারই একখানায় আশ্রয় পেয়েছে আকাশকুসুম-স্বপ্নে বিভোর জ্ঞানতপস্বী কাঞ্চনকুমার।

মা-বাপ হারা গ্রাম্যবালক কাঞ্চন, কেমন করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ছেঁড়া চটি আর ছেঁড়া প্যান্ট সম্বল করে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হল, কেমন করে তিনটে পাশ করল স্কলার-শিপ নিয়ে, সে ইতিহাস নতুন নয়।…সেই দুঃসাধ্য সংগ্রাম আর অসাধ্যসাধনের ইতিহাস এই হতভাগ্য দেশের অনেক অসহায় ছাত্রের জীবনের খাতায় লেখা আছে। কিন্তু কাঞ্চনের আশা আরও উচ্চ! আরও সুদূর বিস্তারী। সে ডক্টরেট পাবার দুরন্ত ইচ্ছা নিয়ে 'থিসিস' লিখতে চায়…চায় সমুদ্র-পাড়ি দিয়ে নব নব বিদ্যার অনুশীলন করতে। সে যাই হোক—কথা হচ্ছে আশ্রয়দাতার উপকারের সূত্রে 'ডাক্তার-বাড়ি যাওয়া আসা' করতে করতে ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হয় কাঞ্চনের এবং কেন কে জানে তদবধি এই দরিদ্র ছেলেটিকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখে থাকেন ডাক্তার। দেখা হলেই ডেকে দুটো কথা বলেন। কয়েকখানি মূল্যবান বই দিয়ে সাহায্যও করেছেন একবার। কিন্তু সে সবই করুণার চিহ্ন! এখন নিজে এসে গাড়িতে তুলে নিয়ে গোপনীয় কথা বলার মত অন্তরঙ্গতার সুযোগ দেন নি কোনদিন।

প্রথমে খুব খানিকক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে গেলেন ডাক্তার, সত্যিই চক্কর খেলেন লেক-এর রাস্তায়!…আর মৌন প্রতীক্ষারত কাঞ্চন ভাবতে লাগল আকাশ-পাতাল!

কি কথা! কেমন কথা?

…যা বলতে ডাক্তার বিশ্বাসকেও সাহস সঞ্চয় করতে হচ্ছে!…সে কথার সঙ্গে কাঞ্চনের কি সম্পর্ক?

অনেক প্রতীক্ষার শেষে, প্রায় ফেরার মুখে ডাক্তার বিশ্বাস তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলেন!…না, আর নার্ভাস নেই ডাক্তার, সহজ শান্ত গলায় বলে ফেললেন সাধারণ একটা কথার মত!

বিয়ে করবে কাঞ্চন?

অগাধ বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে?…না, কানা-খোঁড়া কিছু নয়, আস্ত মেয়ে! কুশ্রী? মোটেই না, রূপসীই বলা চলে বরং। সুখের ঘরেই তো রূপের বাসা!…এক কথায় অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা! কাঞ্চন হাত বাড়ালেই সেই স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য হাতে আসে কাঞ্চনের, শুধু—

হ্যাঁ শুধু—

শুধু সেইটুকু যদি স্বীকার করে নেয় কাঞ্চন, আধুনিক উদারতা নিয়ে, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে! আর বাস্তববুদ্ধি নিয়ে! বরাত একেবারে ফিরে যাবে কাঞ্চনের, শেষ হবে এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রামের! জ্ঞানের তপস্যায়, বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে।

আত্মচিন্তা চোখ রাঙাবে না কোনদিন, অন্য কোন চিন্তাই থাকবে না। নিজের লাইব্রেরী, নিজের গবেষণাগার···এককথায় বহির্জগতের সকল সুখ-সুবিধা করায়ত্ত করে অন্তর্জগতের মধ্যে বাস করতে পারবে সে!···শুধু যদি—

গাড়ি থেকে নামবার সময় ডাক্তার ওর সেই জালিগেঞ্জি-ঢাকা পিঠটা একবার চাপড়ে দিয়ে বলেন—আজই এক্ষুনি তোমার উত্তর চাইছি না আমি, চট্ করে বলতে পারবে না জানি। ভাববার জন্যে সময় দিচ্ছি!···কত চাও? চব্বিশ ঘণ্টা? আটচল্লিশ ঘণ্টা।

এতক্ষণের স্তব্ধ বির্বাক ছেলেটা, এই প্রথম কথা বলে, প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে—তিনটে দিন সময় দিন আমায়—

ডাক্তার বিশ্বাস কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে বলেন—বেশ! তাই হবে! আমার অবশ্য ধারণা, যে কোন বিষয় ডিসাইড করতে একটা রাতই যথেষ্ট।···তা ছাড়া—দুটোদিন অপেক্ষা করতেও ইচ্ছুক নয় তারা, তবু তোমার কথাই থাক। তিনদিন পরেই আসব আমি। এই সময়ই আসব।···আশা করি তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির অনুকূলেই রায় দেবে তুমি। তোমার মা-বাপ নেই, কোন অভিভাবকের রক্তচক্ষু নেই, বিয়ে দেবার মত বোন নেই, আসলে সমাজের কোন দায়ই তোমার নেই! একটা বদ্ধমূল পুরনো কুসংস্কারকে আঁকড়ে থেকে, তাকে তোমার উপর প্রভুত্ব করতে দিলে, নির্জলা বোকামিই হবে।···আচ্ছা ভেবে দেখ—একদিকে তোমার স্বপ্ন, সাধনা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আর অপরদিকে একটা তুচ্ছ কুসংস্কার!···দেখ কাকে প্রাধান্য দেবে।...আচ্ছা···গুড্‌নাইট।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ-দেহী ডাক্তার দৃঢ় পদক্ষেপে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন, আর স্টিয়ারিঙে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্খলিত পদে এগিয়ে গিয়ে জানলার নিচেটা চেপে ধরে কাঞ্চন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

কি হল! এখনই কি উত্তর ঘোষণা করে ফেলতে চায় কাঞ্চন এত বড় একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মূলে কুঠারাঘাত করে?

—কিছু বলতে চাও?

—হ্যাঁ!···কণ্ঠস্বর কিন্তু এখন আব স্খলিত নয়, দৃঢ়ই। দৃঢ় স্থির কণ্ঠে বলে কাঞ্চন—সময় নেবার দরকার নেই, আমি রাজী!

ডাক্তার গম্ভীর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন—ভালো করে ভেবে বলছ?

—হ্যাঁ!

—কিন্তু একটু আগেই তুমি ভাববার জন্যে অনেকটা সময় চাইছিলে কাঞ্চন।

—তার আর দরকার নেই! মনস্থির করে ফেলেছি আমি।

—দেখ, আমি কিন্তু কোন তাড়াহুড়ো করি নি?

—তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে!

—তাহলে রাজী? বলতে পারি তাদের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ! শুনে খুশীই হলাম! শুধু সে পক্ষ আমার বন্ধুলোক বলেই

নয় কাঞ্চন, বুঝলে ? আমি তোমারও ভাল চাই ! যে সাধনায় ব্রতী হয়েছ তুমি, সে সাধনা দরিদ্রের নয় ! অভাব অনটন, প্রতিকূল অবস্থা সব কিছু অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করার যে প্রতিভা, সে হল দুর্লভ জিনিস ! দৈবাৎ দেখা মেলে তার।…তা নইলে—অর্থের প্রাচুর্যই হচ্ছে সাফল্যের সহায় !…তুমি মনস্থির করে ফেলতে পারলে দেখে সত্যিই খুশী হয়েছি !…আমার যৌবনে, আমিও যদি এ রকম কোন চান্স পেতাম, হয়তো অবহেলা করতাম না। ভাগ্যের দান বলেই গ্রহণ করতাম !

…আচ্ছা যাও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোওগে !

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন ডাক্তার !

কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ মানা কি এতই সহজ ?

ঘুম আসবে আজ কাঞ্চনের ?

একদিকে সহস্রবাহু প্রসারিত প্রলোভন দুর্বার আকর্ষণে টানতে চায়, আর এক দিকে মুমূর্ষুর ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বানের মত তুচ্ছ একটু সংস্কারের নিষেধ ! …তবু এক কথায় নিক্তির পাল্লাটা নেমে পড়ে না কেন ?…এত চিন্তা কিসের ? সত্যিই তো—সমাজশাসন মানবার কোন দায়ই তো তার নেই !…কেন তবে সে রাজী হবে না ? সে শিক্ষিত, সভ্য, আধুনিক !…এটুকু উদারতা থাকবে না তার ? এক অসতর্ক কুমারী মেয়ের অজ্ঞাত সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মত উদারতা !

কাঞ্চনের এই উদারতায় সেই বেচারী মেয়েটার জীবন রক্ষা হবে, রক্ষা হবে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের মান-সম্ভ্রম !

মানুষ কি ভুল করে না ?

সে ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে না অপর মানুষ ?

ছোট্ট একটা জিনিসকে অনেক বড় করে দেখবার দরকার কি ?

বরকর্তা ডাক্তার বিশ্বাস।

কন্যাকর্তা তাঁর একান্ত সুহৃদ ডাক্তার মজুমদার ! বরকন্যা বিদায়ের কালে, বিশ্বাস মজুমদারের কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন—তুমিও চল না ?

মজুমদার আরও গম্ভীর আরও মৃদুস্বরে বললেন—পারছি না ! বড় টায়ার্ড লাগছে ! তুমি গেলেই হবে—তুমিই তো সব।

গাড়ি হুস্ করে বেরিয়ে গেল—বরকনে, একটা দাসী, আর ডাক্তার বিশ্বাসকে নিয়ে।

না, সেই নড়বড়ে-চৌকি-পাতা কাঞ্চনের পরিচিত আস্তানায় নয়, এক অচেনা রাজপ্রাসাদে !

ডাক্তার বিশ্বাস অভিনব সজ্জায় সজ্জিত একখানা ঘরে ওদের বসিয়ে প্রসন্ন-মুখে বলেন—নাও এই তোমাদের বাড়িঘর। সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর এবার !

অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে দুটি কুণ্ঠিত চোখ তার 'কাকাবাবু'র মুখের

দিকে চাইতে গিয়ে নিজেকে নিচু করে নিল।

ডাক্তার বিশ্বাস সহজভাবে বলেন—বাড়িটা বিরাট, বুঝলে কাঞ্চন, এখানে স্বচ্ছন্দে তোমার লাইব্রেরী ল্যাবরেটরী সব কিছুই করা চলবে! আর কোন ঝক্কিই পোহাতে হবে না তোমাকে। বুঝতেই তো পারছ, মজুমদারের অনেক সন্তান মারা গিয়ে এই একমাত্র মেয়ে, মা-বাপের প্রাণের পুতুল।…আশা করি সেই স্নেহের উপযুক্ত মর্যাদা তোমার কাছেও পাবে মনু!…আচ্ছা মনুমা, তুমি বরং একটু বিশ্রাম কর। আমি কাঞ্চনকে তার বাড়িটা দেখিয়ে নিই!…এখানে আছে কে?…মানে কে কে এসেছে?

নববধূ মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলে—জানি না! মা আসবেন বোধ হয়।

কাঞ্চনকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান ডাক্তার বিশ্বাস। স্বপ্নাহতের মতই অনুসরণ করে চলে কাঞ্চন।…কাল থেকে তো স্বপ্নাহত হয়েই আছে সে! যা কিছু ঘটে যাচ্ছে, তার কোনটাই যে সত্য বলে বিশ্বাস হবার মত নয়!…এই উপকরণ আর আসবাবে ঠাসা বাড়িটা নাকি তার নিজস্ব!

এত প্রাচুর্য! এত উপকরণ! এত জিনিস মানুষের ব্যবহারে লাগে? এ সবের ব্যবহার-পদ্ধতিই বা কি?

আবু হোসেনের মত হঠাৎ-রাজা কাঞ্চনকে আর ডাক্তারবাবুকে দেখছে, আর দাস-দাসীরা সসম্ভ্রমে সেলাম করে সরে দাঁড়াচ্ছে!

আত্মীয়-স্বজনের অভাব থাকলেও দাসদাসীর অভাব নেই বাড়িতে।

ঘুরতে ঘুরতে ক্ষণে ক্ষণেই মনে হতে থাকে কাঞ্চনের, দু-দুজন বুদ্ধিমান ডাক্তার এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগে পারিবারিক সম্ভ্রম রক্ষার অন্য কোন উপায় খুঁজে পেলেন না? পথের ভিখিরীকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করলেন? এটা একটা আশ্চর্য বৈকি!

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন মনুর মা, স্বয়ং মজুমদার-গৃহিণী!…একান্তে কাছে ডেকে চোখের জলে ভেসে কাঞ্চনের হাত ধরে বললেন—তোমাকে আর কি বলব বাবা, দেবতা তুমি! সব জেনেশুনেই আমার মনুকে নিয়েছ!…তোমার কাছে লুকোছাপা করবো না, ডাক্তারী বুদ্ধিতে অনেক পরামর্শই করেছিলেন দুই বন্ধুতে মিলে, আমি কেঁদেকেটে নিবৃত্ত করেছি—। বলি এত বড় পাপ আমি হতে দেব না। আর—শুধু তোমাদের মান-সম্মান বজায় হলেই তো চলবে না, মনু আমার মনভাঙা হয়ে গেলে বাঁচবে না!…তুমি আমার মনুর মনের দিকে তাকিও বাবা! ওকে যেন হেনস্থা কোর না! ওর দোষ নেই, ও অবোধ! দোষ আমারই অসাবধানতার।

অভিজাত ঘরের ধনী একটি মহিলা, করুণা ভিক্ষা করেন কাঞ্চনের কাছে—পরশু পর্যন্ত যে কাঞ্চন যতীন চাকর আর বামুন ঠাকুরের পাশের ঘরে শুয়েছিল, নড়বড়ে সেই চৌকিটার উপর।

আচার-অনুষ্ঠানের পালা শেষ হলে নবদম্পতি যখন নির্জন হল, প্রথম কথা কয়ে উঠল কনে। মৃদু স্বরে বলে উঠল—আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে!

ঘুমের জন্য অনুমতি চাওয়া নয় শুধু জানিয়ে দেওয়া।

ত্রস্তব্যস্তে কাঞ্চন যে উত্তরটা দিল, তার ভাষাটা শোনা গেল না, ভাবে মনে হল—'সে কি ? নিশ্চয় ! ঘুমিয়ে পড়।'

মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ল বৌ।

কাঞ্চন ভাবল নিশ্চয় খুবই ঘুম পেয়েছিল, না হলে এত চড়া আলার নিচে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারে ?

কাঞ্চনের অত তাড়াতাড়ি ঘুম এল না, চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। ভাবল …ঘুমিয়ে পড়ে কাঞ্চনকে বরং বাঁচিয়েই দিয়েছে বৌ, নইলে কি কথা বলত সে ?

নিদ্রিতার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল।

বিষণ্ণ ক্লান্ত পাণ্ডুর। তবু ভারি সুন্দর।

ভাবল এই মুখের অধিকারিণীকে কখনো 'হেনস্থা' করা যায় ?

মনে মনে বলে—স্নেহ আর সহানুভূতি দিয়ে তোমার সমস্ত গ্লানি মুছে নেব আমি।

তা নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে কাঞ্চন, স্নেহে ভালবাসায় ডুবিয়ে দেয় স্ত্রীকে !…

দারিদ্র্য আজীবনেও অভ্যাস হয় না, কিন্তু প্রাচুর্যের অভ্যাসে দেরি লাগে না ! সেদিনের স্বপ্নাহত কুণ্ঠিত কাঞ্চন, এখন স্বচ্ছন্দেই গৃহকর্তার ভূমিকা অভিনয় করে চলেছে।…মনুর স্বাস্থ্যের জন্য উৎকণ্ঠার অবধি নেই তার—বকে, শাসন করে, মমতায় বিগলিত হয়।

মজুমদার গৃহিণী বলেন—'দেবতা'। শুধু আড়ালে নয়, সামনেও।

দুই ডাক্তার বন্ধু আড়ালে সপ্রশংস সুরে বলেন—সত্যিই ছেলেটা মহাপ্রাণ ! এতটা আশা করা যায় নি।

আবার মৌখিক প্রশংসাতেই কর্তব্য শেষ করেন না তাঁরা, নিজেদের প্রতিশ্রুতিও পালন করেন। নিচের তলার প্রকাণ্ড হলটা পরিণত হয়েছে কাঞ্চনের লাইব্রেরী ঘরে। প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু করে সংগৃহীত হচ্ছে মূল্যবান গ্রন্থরাজি। ভরে উঠছে কাঞ্চনের ঘর, ভরে উঠছে কাঞ্চনের মন !

এদিকে তিলে তিলে ভরে উঠছে একখানি দেহ, লাবণ্যে আর সুষমায়… ক্লান্তিতে আর কোমলতায় !

মনুর মা এসে চুপি চুপি মেয়েকে শিক্ষা দিয়ে যান—বেশি শুয়ে বসে থাকিস নে মা, যতটা পারবি কাজ করবি, তাতে ভাল হবে।

মেয়েকে তিনি সমানেই এখানে রেখে দিয়েছেন, নিয়ে যান নি নিজের কাছে, জামাইয়ের মন বাঁধবার কৌশল হিসেবেই বোধ হয় ! যত কাছে কাছে থাকবে, ততই তো কাছাকাছি হবে। মনের কাছাকাছি, আত্মার কাছাকাছি !

নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার উঠে আসে কাঞ্চন, স্তম্ভিত বিস্ময়ে 'হাঁ হাঁ' করে বলে—ঘর ঝাড়ছ তুমি ? বিছানা পাতছ তুমি ? এই ভিজে কাপড়গুলো মেলে দেবার লোক খুঁজে পেলে না বাড়িতে ? তোমার ঝি-চাকর-গুলো সব একযোগে ধর্মঘট করেছে না কি ?…রেখে দাও রেখে দাও শীগগির।

শুয়ে পড় লক্ষ্মীমেয়ের মত !···

মনু হাসে। মধুর ম্লান হাসি।

—মা বলেছেন কাজ করতে।

কাঞ্চন উদ্বিগ্ন আর অবাক হয়ে বলে—মা বলেছেন ? তোমার মা ? বল কি ? কেন বল তো ? গরীবের বৌ হয়েছ বলে নাকি গো ?

—জানি না।—বলে পালাতে চেষ্টা করে মনু।

কাঞ্চন অবশ্য যেতে দেয় না, হাত ধরে ফেলে কাছে বসিয়ে বলে—তোমার শরীরের এই অবস্থা, এখন কাজ করতে বলেছেন কেন, বললে না যে ?

—বাঃ বলছি তো জানি না। বললেন 'ভালো হবে'।

—কি জানি বাবা ! কাঞ্চন দুই হাত উল্টে বলে—মেয়েদের ব্যাপারই আলাদা !

কাঞ্চনের কথার উত্তরে কি একটা পরিহাসের কথা মুখে আসে মনুর, কিন্তু চুপ করে যায় ! তার যে প্রতিপদে বাধা, প্রতিপদে সঙ্কোচ।

কাঞ্চন তার স্বাস্থ্যের জন্য অহরহ উদ্বেগ প্রকাশ করে, কিন্তু তার বাইরে তার বেশি আর নয়। মনুর প্রাণের অন্তরালে আর একটি যে প্রাণ-স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে, সে কথা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করে না কাঞ্চন। মনুর যেন একটা রোগ হয়েছে, সেই রোগের জন্যই স্নেহময় স্বামী হিসেবে সতর্ক করে, শাসন করে, মমতা করে !

অবশেষে একদিন মজুমদার-গৃহিণী এসে বলেন—এবার তো ওকে নিয়ে যেতে হয় বাবা ! আর আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে ভরসা হয় না। তুমি কি বল ?

মৃদু হেসে কাঞ্চন বলে—কী মুস্কিল, এর জন্যে আমার অনুমতি নিতে হবে নাকি ?

—তুমি দেবতা, বলবার কিছু নেই আমার, তবু ওটা বলা নিয়ম। তাহলে একটা ভালো সময় দেখে, কাল পরশুর মধ্যেই—

কিন্তু যে অন্ধকারের জীব পৃথিবীর আলো দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে কি পাঁজীর 'ভালো সময়ের' জন্য অপেক্ষা করে ?···সেই রাত্রেই ঝনঝনিয়ে টেলিফোন বেজে ওঠে চারিদিকে···দু-তিনখানা গাড়ি ছুটোছুটি করতে থাকে এবাড়ি থেকে ওবাড়ি···ওবাড়ি থেকে লেডি ডাক্তার আর নার্সের বাড়ি !

ছুটোছুটি করেন মজুমদার গিন্নী...উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে।

আর শিক্ষিত সভ্য জ্ঞানতপস্বী কাঞ্চন নিচের তলায় নিজের গ্রন্থাগারে নির্লিপ্তের মত একা চুপচাপ বসে বসে ভাবতে থাকে···বাঙলা দেশে শিশুমৃত্যুর হার নাকি ভয়াবহ, লক্ষ লক্ষ শিশু নাকি পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই অন্ধকারের রাজ্যে নির্বাসিত হয় !

সহস্রধার মনকে চোখ রাঙালেও ঘুরে ফিরে শুধু ওই এক কথাই মনে পড়ে।

কিন্তু যে অশ্বত্থের বীজ ভাঙা ইঁটের খাঁজে বাসা বাঁধে, সে ঝড়ে উড়ে যায় না, টিঁকে থেকে, বিরাট দেয়ালে ফাটল ধরায়!

কাঞ্চনের সমস্ত চিন্তা ডুবিয়ে দিয়ে শাঁখ বেজে ওঠে ওপরতলায়। দাসীটা বাজাচ্ছে, বেপরোয়া জোরে।

শাঁখের শব্দ রাত্রে এতো চড়া লাগে?...বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা মারে?

শাঁখ হাতে করেই ছুটে এসেছে ঝিটা। একেবারে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ডাক দেয়—জামাইবাবু, সন্দেশ কই? সন্দেশ? রাত পোয়ালে একশটাকার সন্দেশ আনাতে হবে, অমনি না!...চলুন এখন দেখবেন—ফুটফুটে সোন্দর খোকা! সদ্য দেখলে দিন ক্ষ্যাণ দেখতে হয় না!...ওমা চুপচাপ বসে যে? আহ্লাদে হাত-পা উঠছে না নাকি? চলুন? এখনকার কালে এ্যাতো লজ্জা কেউ করে নাকি?

চমকে ওঠে কাঞ্চন, ওঃ, এতক্ষণ মনে আসছিল না এই শব্দটা! লজ্জা! লজ্জা! যে বোবা বিদ্রোহ মনের মধ্যে ঝড় বহাচ্ছিল তার অপর একটা নাম লজ্জা! এখন এই দাসদাসী, নার্স ডাক্তার, মজুমদার পরিবারের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে প্রসন্নমুখে, প্রথম পিতৃত্বের খুশির ভূমিকা অভিনয় করতে?...শুধু আজ নয়, আজ থেকে আজীবন চালিয়ে যেতে হবে সে অভিনয়।

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

কেমন করে যে সে উপরে উঠে সেই নীল-আলো-জ্বালা ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, নিজেই জানে না কাঞ্চন।...হয়ত বাচাল ঝিটা একরকম ঠেলতে ঠেলতেই নিয়ে গিয়েছিল।

কোলাহল শান্ত হয়ে গেছে, তাই চড়া আলোটা নিভিয়ে দিয়ে মৃদু নীল আলোটা জেলে দেওয়া হয়েছে।

ঘরে আর যারা আছে তাদের দিকে বুঝি চোখও পড়ে না কাঞ্চনের, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে...মুদ্রিত-চক্ষু নিদ্রিত নিথর এক নারীমূর্তির দিকে, যার শয্যার একাংশে তেমনি নিঃঝুম একটু মাংসপিণ্ড!

কে এরা?

এদের কাউকেই কি চেনে কাঞ্চন? এদের সঙ্গে কোথাও কোন যোগ আছে তার?...এই কি সেই মনু? যাকে এই পাঁচ ছ-টা মাস স্নেহে সোহাগে ডুবিয়ে রেখেছিল সে, নিতান্ত প্রেমময় স্বামীর মতই!

কাঞ্চন কি জানত না ওর অন্তরালে এক অদৃশ্য সত্তা তিলে তিলে আপন মূর্তি রচনা করে চলেছে?

তবে?

তবে কেন এত অপরিচিত লাগছে ওকে? এত দূরবর্তী?···না না, এরা কাঞ্চনের কেউ নয়, কাঞ্চনের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। ওরা অচেনা ওরা অসহ্য!

হ্যাঁ হ্যাঁ অসহ্য!

নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দাসীটা হেসে হেসে বলে—যাই বলুন মা, আপনার জামাই যেন কেমন কেমন! জানেও না কিছু, আঙ্গুলে দুটো তিনটে আঙটি, তার থেকেই নয় একটা খুলে দিয়ে ছেলের মুখ দেখতে হয়? না টাকা, না সোনা, অমনি ছেলের মুখ দেখল। আবার নেবে গেল দেখ, যেন ছুটে পালাল! পাছে আবার আমরা 'সন্দেশ সন্দেশ' করে আবদার করি তাই!

মজুমদার গৃহিণী শ্রান্ত কণ্ঠে বলেন—থাম্ বাবু, মেলা চেঁচাসনি, মনু চমকে উঠবে।···জামাই আমার বরাবরই অমনি লাজুক!

বরাবরই লাজুক?

না, এইমাত্র টের পেয়েছে কাঞ্চন—'লজ্জা' কি বস্তু?

তা নইলে—এখনই বা অমন পালাতে শুরু করেছে কেন, রাতের নির্জন রাস্তা ধরে—নিঃসম্বল শূন্য হাতে?

শুধু নিচে নেমে একবার যেন সেই বড় হলটার দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল না?···একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কি ছড়িয়ে পড়েছিল নির্জন ঘরের থমথমে বাতাসে?

না না! নিশ্বাস নয়! নিশ্বাস নয়। মুছে যাক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মুছে যাক সাফল্যের স্বপ্ন।···ধুয়ে মুছে যাক নির্ভাবনায় জ্ঞান-চর্চার সুযোগ! এখন শুধু পালাতে হবে, অনড় অসহায় ছোট্ট ওই মাংসপিণ্ডটার কাছ থেকে। ···যত দূরে পারা যায়!···দ্বিতীয়বার যাতে দেখতে না হয় ওকে।

হয়তো আবার দেখা দেবে দুঃসহ বেকার জীবন, হয়তো—গায়ে পরা থাকা এই শার্টটাই একমাত্র হয়ে উঠবে, হয়তো আবার একচা নড়বড়ে চৌকি জোটাও দুষ্কর হবে, তবু পালান ছাড়া উপায় নেই!···এতটুকু একটা মাংসপিণ্ড যে এতবড় হয়ে দেখা দেবে, এ ধারণা কি আগে ছিল কাঞ্চনের?

[১৩৬৩]

নির্ভেজাল

সুরমা কিছুক্ষণ আগে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি বইটা শেষ করিয়া বিছানায় পিঠ পাতিয়াছি মাত্র। ঘুম তখনো আসে নাই, হঠাৎ পাশের বাড়ি হইতে একটা তীব্র চীৎকার ধ্বনিতে সচকিত হইয়া উঠিলাম। উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে কথাটি কানের মধ্যে নিঃশব্দে উচ্চারিত হইল, তাহা এই—সর্বনাশ করেছে! এই

বর্ষার রাতে—শ্মশানে যাইয়ে ছাড়লো—!

মনের অগোচর পাপ নাই।

পাশের বাড়ির গৃহকর্তা দিবাকরবাবুর সদ্বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ভদ্রলোক ঘণ্টাকতক কাটাইয়া সকালে মারা গেলেই পারিতেন। মরণকালেও প্রতিবেশীকে ফাঁসাইয়া যাওয়ার বুদ্ধিটি ঠিক আছে।

চীৎকারে সুরমারও ঘুম ভাঙিয়াছে, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল,—সর্বনাশ হয়ে গেলো যাঃ। হায়! হায়! এই বর্ষার রাতে—আহা!

উঠিয়া আলো জ্বালিলাম।

'আহা'টা কাহার জন্য ঠিক ধরিতে পারিলাম না। পরলোকযাত্রীর জন্য, না শ্মশানযাত্রীদের জন্য? কিন্তু পরলোকযাত্রীর আর 'আহা'র প্রয়োজন কি? পার্থিব রক্ত-মাংসের দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে আত্মা ঊর্ধ্বলোকের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছে, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় আবরণটুকুর গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগে কিনা, লাগিলেও প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস, নিমোনিয়ার ভয় থাকে কিনা, অবশ্যই কাহারও জানা নাই। কাজেই অনুমান করিতেছিলাম এ সমবেদনা শ্মশানযাত্রীদের জন্য। কিন্তু ভুল ভাঙিল! ভালো করিয়াই ভাঙিল।

যেই মাত্র তাহারই কথায় সায় দিয়া বলিয়াছি—সত্যি, মরবার আর সময় পেলেন না ভদ্রলোক, এখন ওঁর সঙ্গে পাড়াপড়শীও মরুক—তদ্দণ্ডেই বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো শিহরিয়া উঠিল সুরমা।

কথাটা যে শেষ করিতে পারিয়াছিলাম, সে বোধকরি বিদ্যুৎ-শিহরণের ক্ষণিক স্তব্ধতার সুযোগেই।

সুরমা ঘৃণার সঙ্গে ঝাঁজ মিশাইয়া শ্লেষের সুরে ধিক্কার দিল—তা' সত্যি, ঘড়ি দেখে মরা উচিত ছিলো বটে ভদ্রলোকের। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন বোধহয়, তাই সময়টা ঠিক ঠাহর করতে পারেন নি।...উঃ ধন্যি প্রাণ বটে! মানুষটা এই জলঝড়ের রাতে চিরদিনের মতো চলে গেলো—আর তোমার এখন চিন্তা হচ্ছে পাড়াপড়শীর কষ্ট! হায় হায়! আমি শুধু ভাবছি, ও বাড়ির দিদির কী সর্বনাশটাই না হয়ে গেলো!

যথেষ্ট অপ্রতিভ বোধ করিতেছি—তবু খাটো হইলাম না। "বোধ"টাকে শোধ দিবার উদ্দেশ্যে গম্ভীরভাবে বলিলাম—চিন্তা আমার নিজের জন্যে নয়। পাছে রাত-দুপুরে নতুন বর্ষার জলে ভিজে, তোমারও 'ও বাড়ির দিদির' মতো সর্বনাশ ঘটাই, সেই ভয়!

বলা বাহুল্য সুরমা আর উত্তর করিল না। শুধু একটা জ্বলন্ত দৃষ্টির সাহায্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া জানলার ধারে সরিয়া গেলো। এই জানলাটা হইতে দিবাকরবাবুর ঘরের কিয়দংশ দেখা যায়।

নিজের বিছানা হইতেই উঁকি মারিয়া দিবাকরবাবুর জীবনের শেষ অঙ্কের শেষ-দৃশ্য দেখিবার চেষ্টা করিতেছি—

দিবাকরবাবুর বিছানাটা—না না, দিবাকরবাবু তো আর নাই—দিবাকর-বাবুর মৃতদেহের বিছানাটা ঘরের ওদিকে, জানলার আড়ালে। দেখিবার উপায়

নাই। এদিকে যা দেখা যাইতেছে—সে কেবল অনেকগুলো মানুষের বিশৃঙ্খল ঠেলাঠেলি, আর কানে আসিতেছে নানা কণ্ঠের বহুবিধ টুকরা টুকরা মন্তব্য।

*　　　*　　　*

বৃষ্টির প্রবল বেগ আর নাই, মেঘাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকার আকাশের গা হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি জল ঝরিতেছে।···পৃথিবীর কোথাও কোনোখানে যেন জীবনের স্পন্দন নাই। এই বিষণ্ন বিধুর প্রকৃতির মাঝখানে মৃত্যু জিনিসটা কী সুন্দর মানানসই!

জানলার বাহিরে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে মনে হইল প্রকৃতির এই পট-ভূমিকায় একখানি মৃত্যুর ছবির যেন একান্তই প্রয়োজন ছিল।

দিবাকরবাবু মারা না গেলে হয়তো শিল্পীর আয়োজনকে সম্পূর্ণতার রূপ দিতে আমারই মারা যাইতে ইচ্ছা হইত, এবং মরণকালে সুরমাকে আদেশ দিয়া যাইতাম—"গুঞ্জরি করুণ তান, ধীরে ধীরে করো গান, বসিয়া শিয়রে। যদি কোথা থাকে লেশ, জীবন স্বপ্নের শেষ, তা'ও যাক মরে"।

কিন্তু অতোটা করিবার প্রয়োজন হইবে না। দিবাকরবাবু আমার কাজ কমাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

তা' ছাড়া ব্যাপারটা এই, দিবাকরবাবুর আত্মীয়বর্গ আমার মতো কবি নয়, তাই—ক্যানভাসের গায়ে খোঁচা লাগিয়া যাওয়া নির্লজ্জ একটা ছেঁদার মতো, এই শান্ত-গম্ভীর পটভূমিকার গায়ে দিবাকরবাবুর ঘরের প্রখর বিদ্যুতালোকিত জানলাটা নির্লজ্জের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। আর তাহারই ভিতর হইতে শোকের উদ্দাম ঝড়ের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।

নানা কণ্ঠের কলকাকলীর বিচ্ছিন্ন অংশ জোড়া দিয়া দিয়া অনুমান করিতেছি কোন একটি ভদ্রমহিলা মূর্ছা গিয়াছেন।

'ও বাড়ির দিদি', অর্থাৎ স্বয়ং দিবাকরবাবুর স্ত্রী হওয়াই সম্ভব। সম্পূর্ণ বাজে-লোক হওয়াও অসম্ভব নয়।

বয়স কম হয় নাই, জীবনে অনেক মৃত্যুর দৃশ্য দেখিবার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, বিসদৃশ ঘটনাও যে কত চোখে পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত জায়গায় দেখিয়াছি—মৃত পুত্রের শিয়রে বসিয়া নতনয়না জননী নিঃশব্দ-শোক বহন করিতেছেন, আর জ্ঞাতি পিসি বাড়ি বহিয়া আসিয়া বুক চাপড়াইয়া বুকে কালশিরা পড়াইতেছেন।

আবার এও দেখিয়াছি—লোকারণ্যের মাঝখানে, জামাই কুটুম্বের সামনে, মধ্য বয়সী সদ্যোবিধবা স্বামীর শবদেহটাকে ঠ্যালা দিয়া দিয়া—"ওগো তুমি যে বলেছিলে" ধুয়ার সাহায্যে, স্বামী-দেবতা দুর্বল মুহূর্তে কখন কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহারই ফিরিস্তি দাখিল করিতেছেন এবং কোন মুখে সেইসব মূল্যবান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া প্রতারক ভদ্রলোক ফাঁকি দিয়া স্বর্গলোকের উদ্দেশে রওনা হইতেছেন, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিতেছেন।

'ফাঁকি দিবার' মতলবটা যে কোনো অবস্থাতেই কাহারও বড়ো থাকে না, স্বেচ্ছায় সানন্দে কেউ যে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায় না, এটুকু বিবেচনাবোধ

কয়জনেরই বা থাকে ?

অতএব তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অভিযোগ করেন—"ও গো, তোমার মনে যদি এই ছিলো, তবে কেন—" ইত্যাদি।

ভাগ্যিস মৃত ব্যক্তির শ্রবণশক্তি লোপ পায়, তাই রক্ষা! নচেৎ—এই শোভা সম্পদময়ী পৃথিবী হইতে নিতান্ত নিরুপায় চিত্তে বিদায় লইতে বাধ্য হইবার বেদনার উপর এই নিষ্ঠুর অভিযোগ 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হইত সন্দেহ নাই।

কতো কিছু বিসদৃশ ব্যাপারই তো সংসারে অহরহ ঘটে, তবু বাঙালীর সংসারে মৃত্যুকে সামনে লইয়া যেমন বিসদৃশ কাণ্ড ঘটে, এমন বোধকরি আর কোথাও নয়।

মূর্ছার ব্যাপারেও এমন একটা কিছু হওয়া অসম্ভব নয়, কাজেকাজেই কান খাড়া করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি—মূর্ছিতা মহিলাটি কে ?

হঠাৎ নিজের ঘরেই 'ফোঁস্ ফোস্' শব্দে চমকিত হইলাম। সুরমা কাঁদিতেছে।

—কী মুস্কিল! নিজের অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া গেল—কি মুস্কিল! তুমিও কাঁদছো নাকি ?

গলার সাড়া পাইলাম না, 'ফোঁস ফোঁস' শব্দটাই আর একটু বৃদ্ধি পাইল। অগত্যা বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হইল। ভাবিতেছিলাম যতক্ষণ না ও-বাড়ি হইতে ডাক পড়ে, একটু গড়াইয়া লই, মরুকগে!

কাছে গিয়া কহিলাম, কি হলো ? তুমি অমন কান্নাকাটি শুরু করে দিলে কেন ?

এবার গলার সাড়া পাইলাম,—তোমার মতন নির্মায়িক পাষাণ নই ব'লে!

পাষাণত্বের অপবাদ বহিয়াও সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ? কান্নার কারণ যাহাই হোক, ক্রন্দনপরায়ণা পত্নীকে বিনা-সান্ত্বনায় ফেলিয়া রাখিয়া যে স্বামী উদাসীনভাবে বসিয়া থাকিতে পারে, তাহাকে 'পাষাণ' বলিলেই বা কতোটুকু বলা হয় ?

অবশ্য সান্ত্বনার ভাষাটা খুব মোলায়েম করিতে পারি না, বকুনির মতো শুনিতে লাগে. কিন্তু কি করিব ? যে কালে প্রত্যহ দাড়ি কামাইতাম, সে কালের সান্ত্বনার ভাষা একালে কি মুখে আনা যায় ?

—কি হচ্ছে কি—বলিয়া প্রায় ধমক দিলাম। হাত ধরিয়া একটু টানমারা গোছের করিয়া বলিলাম,—জানলার ধার থেকে সরে এসো দিকিন, দেখে কি হবে ? আর দিবাকরবাবু যে মরবেনই এতো জানাই ছিলো। ওর জন্যে আর—

সুরমা হাত ছাড়াইয়া লইয়া সেই হাতে জানলার গরাদেটা ভালোভাবে চাপিয়া ধরিয়া সুগম্ভীর প্রশ্ন করিল—জগতের সবাইকেই একদিন মরতে হবে এ-ও তো জানা কথা, তাই বলে কাউকে মরতে দেখলে হাসতে হবে ?

কান্না এবং হাসির মধ্যবর্তী কোনো অবস্থা আছে কি না প্রশ্ন করিব ভাবিতেছি, হঠাৎ ও-বাড়িতে "বাবা গো—" ধ্বনিতে আর একটা হৃদয়বিদারী

তীক্ষ্ন চীৎকার উঠিল। নূতন তরঙ্গ! বুঝিলাম কমলা শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়া পৌঁছাইল।

কমলা দিবাকরবাবুর বড়ো মেয়ে।

গলাটা তাহার চাঁচাছোলা, মাজা। সে ঘরের মধ্যে সপাটে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাটা ছাগলের মতো ছটফট করিতে করিতে কাঁদিতেছে—"বাবা গো, আমরা আর কার কাছে এসে দাঁড়াবো? কার কাছে 'এটা দাও, ওটা দাও' বলে আবদার করবো?…বাবা, তুমি যে এখনো আমাকে 'খুকি' বলে ডাকতে বাবা…"

নাক ঝাড়িবার জন্য বোধহয় উঠিতে হইল কমলাকে। এই সময় দিবাকরবাবুর বিধবা বড়োভাজের ভারী ভারী গলা শোনা গেলো—বাবা কানাই, তোদের মাসীকে ধরাধরি করে পাশের ঘরে নিয়ে যা দিকিন। মিনিটে মিনিটে মুচ্ছো হচ্ছে, সামলায় কে? গোলমালের বাড়িতে এ কী কেলেংকারী বাবা! শোকও কি বড়মানষি দেখানো? ছিঃ! এ সব মানুষের দশের মাঝখানে আসতে নেই, শোক নিয়ে আপনার ঘরে পড়ে থাকতে হয়। দরজার সামনে পথ বন্ধ করে—ই কি!

বুঝিলাম বিধবা ভদ্রমহিলা নিজের পোজিশনের অভাবে সধবা ছোট জায়ের বড়ো-লোক বোনের প্রতি বরাবর যে মনোভাব উহ্য রাখিতে বাধ্য থাকিতেন, গোলমালের মধ্যে এই উপলক্ষে সেটা ব্যক্ত করিয়া বাঁচলেন।

কিন্তু বাঁচা কি এতোই সোজা?

একজন এইমাত্র মারা গিয়াছে বলিয়াই যে সেই সুযোগে অপর একজন বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াও বাঁচিয়া যাইবে, এমন ঘটনা তো সংসারে ঘটিতে পারে না!

সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরবাবুর মেজ মেয়ে অমলার ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—তুমি তো বেশ বলছো বড় জ্যোঠি, মাসীমা এই দুঃসংবাদ শুনে নিশ্চিন্দি হয়ে বাড়ি বসে থাকবেন? মার মুখ চাইবার জন্যে জগতে আর কে রইলো বলো? মায়ের পেটের বোনের মতন মায়া করতে আর তো কেউ আসবে না?

অর্থাৎ মায়ের পেটের বোনের কাছে জায়েরা যে নস্যমাত্র সেটা বিধবা বড়োজ্যোঠিকে মুহূর্তে সমঝাইয়া দিল অমলা।

এতোক্ষণে বুঝিলাম, মূর্ছিতা মহিলাটি দিবাকরবাবুর স্ত্রী নয়, শ্যালিকা। অনুমানে ভুল হয় নাই।

আরো নানা কণ্ঠের কলরব ভাসিয়া আসিতেছে…সব কণ্ঠ পরিচিত নয়, সব কণ্ঠ পরিষ্কার নয়, কাজেই আগাগোড়া সব বুঝিতে পারা অসম্ভব। এমন স্তব্ধ রাত্রি না হইলে হয়তো কিছুই বোঝা যাইত না।

দিবাকরবাবুর ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীর সরু গলা, বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নাটা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। সে বলিতেছে—"ও মেজদি, মেজ বটঠাকুর যে আমার হাতের চা ছাড়া আর কারুর হাতের চা খেতে চাইতেন না! দিনের মধ্যে

দশবার যে তাঁর 'ছোট-মা'র কাছে চায়ের হুকুম পাঠাতেন !"

সত্যই বটে, মৃত্যু মানুষের মনকে কতো কোমল করিয়া আনে !

এ-বাড়ির ছোটবৌয়ের বরাবর "মুখরা" বলিয়া একটা বদনাম আছে। গৃহিণীর মারফৎ এমন রিপোর্ট বহুবার পাইয়াছি যে, 'দশবার চায়ের হুকুমের' পরিবর্তে ভাসুর হইয়াও নাকি দিবাকরবাবুকে দশ-দশে একশো কথা শুনিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ সেই হুকুমটাকেই স্মরণ করিয়া ভাসুরের স্নেহের পরিচয়ে অভিভূত হইতেছেন ছোটবৌ !

কান খাড়া করিয়া আছি, ওই বুঝি ডাক পড়ে।

দিবাকরবাবুর ছোট ভাই হিমাকরই ডাক দিবে মনে হয়।

আন্দাজ করিতেছি···ভাগ্নে বঙ্কিম এতোক্ষণে খাট আনিয়া ফেলিয়াছে। ছোকরা করিৎকর্মা আছে। ফুল, ফুলের মালা আনিতে গিয়াছেন বোধহয় শ্যালিপতি। ভদ্রলোকের গাড়ি আছে, চট করিয়া রাত-বিরেতে নিউ-মার্কেটে ছোটা তাঁর পক্ষে সহজ।

ফুল, চন্দন, ধূপ, অগুরু, নববস্ত্র ইত্যাদি সব কিছু আনিয়া ফেলার পর, নূতন করিয়া ভয়ংকর আর একটা তরঙ্গ উঠিবে, বহু বিলাপে ক্লান্ত আত্মীয়দের স্তিমিত শোকাগ্নিতে আর একবার ইন্ধন পড়িবে, তবে তো শ্মশানযাত্রীদের কাজ আরম্ভ !

তা'ছাড়া মৃত্যুর পর দাহ করার সম্পর্কে শাস্ত্রীয় একটা সময়ের মাপ তো আছেই।

এতো গোলমাল না হইলে অনায়াসে বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লওয়া যাইত।

সুরমা কহিল—তুমি তা'হলে যাবে না ?

—না যাইয়ে ছাড়বে ? ইয়ে—না গেলে ভালো দেখাবে কেন ? যাবো—ডাকুক।

—ডাকার অপেক্ষায় বসে থাকবে ? ওদের এই দুঃসময়ে তোমার মানটাই বড়ো হলো ?

—কি মুস্কিল, 'মান' কিসের ? এইসব মেয়েলি ব্যাপারগুলো খানিকটা না কমলে তো আর কিছু করা যাবে না ? গিয়ে দাঁড়াবোই বা কোথায় ?

—যেমন করে আর পঞ্চাশটা লোক দাঁড়িয়েছে ! লক্ষ্য করে দেখো, একা তুমি বাদে পাড়ার সবাই হাজির হয়েছে কি না···লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার !

নূতন করিয়া সুরমার প্রেমের পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম।

পাড়ায় আমার নিন্দা রটিবার ভয়েই এতো ব্যাকুল হইয়াছে সে ! দূর-ছাই, কেন আর পাতা বিছানাটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতেছি ? মায়া কাটাইয়া ফেলাই ভালো।

কাটানোর অভ্যাস রাখাও দরকার।

এই যে দিবাকরবাবু কেমন স্বচ্ছন্দে মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন !

বাহির হইবার তোড়জোড় করিতে করিতে খেয়াল হইল, চাকরটা আজ ছুটি

লইয়াছে। ছেলেমেয়ে দুইটার কাছে থাকিবে কে ? ওদের অবশ্য ঘুম ভাঙে নাই, কিন্তু—ঘুমন্ত দুইটাকে একা রাখিয়া যাইব ?

প্রশ্ন করিতেই সুরমা অবাক হইয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল—"ওদের কে আগলাবে মানে ? আমি কোথায় যাচ্ছি ?"

অবাক আমিও হই।

—তুমি যাবে না ?

—আমি কোথায় যাবো ?

—মানে আর কি, দিবাকরবাবুর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে--

—সান্ত্বনা দেবার সময় তো আর পালাচ্ছে না ? শোক যখন রইলো, সান্ত্বনাও থাকবে।

আমি অবহিত করাইয়া দিই, বড্ডো 'ইয়ের' সময়টাতে—মানে, তুলে নিয়ে যাবার সময়টাতে—সেই ধরাধরি কাণ্ডগুলো তো আছে ?

—ধরবার লোকও আছে। সুরমার স্বরে বিরক্তি গোপন থাকে না—মেয়েরা রয়েছে, ভাই ভাজ এসেছে, মায়ের পেটের বোন রয়েছে, এর মধ্যে 'নিষ্পব'কে ভালোই বা লাগবে কেন ?...আমি এখন এই অসময়ে গিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি করে মরি আর কি ! নাইতে হবে না ? কেশে মরছি কাল থেকে—

—হ্যাঁ সে তো জানি। আমারই কি ইচ্ছে ? তবে তোমাকেও আবার পাছে কেউ কিছু বলে--

—আমাকে আবার কে কি বলবে ! সুরমা অগ্রাহ্যভরে উত্তর দেয়—মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের এতোবড়ো সর্বনাশের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে সবাই যদি না পারে !

বুঝিলাম নিন্দাবাদকারী 'জোঁকে'দের মুখে ছিটাইয়া দিবার উপযুক্ত লবণ আগেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে সুরমা।

বলিলাম—তবে চলো, দোরটা বন্ধ করবে।

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিয়া দোর দিয়া গেলো।

রাস্তায় নামিবার পর ঊর্ধ্বপানে চাহিয়া দেখিলাম, যে-সর্বনাশের দৃশ্য মেয়েমানুষের পক্ষে দাঁড়াইয়া দেখা অসম্ভব, সেই দৃশ্যটি সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইবার আপ্রাণ চেষ্টায় সুরমা মাথাটাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া প্রায় গরাদের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে।

দিবাকরবাবুর ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

বলিবার মতো কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না।

মনে হইতেছে—বহুবার দেখা একখানি পুরনো নাটকের পুনরভিনয় দেখিতেছি।

কোথাও কোনো নূতনত্ব নাই।

না প্লটে, না দৃশ্যে, না সংলাপে।

'পৃথিবীটা একটা বিরাট নাট্যশালা'—এ আবিষ্কার যে ভদ্রলোক প্রথম

করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ন ছিলো সন্দেহ নাই, এ একটা দার্শনিক তথ্য।

কিন্তু দার্শনিকের তো আর বাড়তি দুইটা চোখ থাকে না, তেমন করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেই দার্শনিক হওয়া যায়।

নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়া সামনের দৃশ্যকে একটু উদাস চক্ষে দেখিতে পারিলেই অনেক তথ্য আবিষ্কার করা যায়।

চাহিয়া দেখিতে দেখিতে আমার চোখেও প্রত্যক্ষ বস্তুগুলো কেমন যেন আবছা লাগিতেছে, মানুষগুলোকে সাজানো পুতুল মনে হইতেছে···যেন এ সমস্তই মেক্ আপ। সব কিছুই কৃত্রিম। পুতুলগুলো নিজ নিজ অভিনয় করিয়া যাইতেছে মাত্র।

ওই যে কানাইয়ের মামা, শ্রান্ত কানাই বেচারাকে ঠায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া 'নীতি নক্ষত্রে' হিসাব লইতেছেন—ডাক্তার কখন কখন আসিয়াছিল, কোন কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল, ঠিক কি কি কথা বলিয়াছিল, ইত্যাদি। উনি কি জানেন না এসব প্রশ্ন এখন কতো অর্থহীন?

তবু ওই দস্তুর।

মৃতের সম্বন্ধে নিজের আগ্রহের পরিধি বোঝানো!

আবার ওই যে ঘরের কোণে দিবাকরবাবুর মেজ-বেহান অমলার শাশুড়ী একটা ট্রাঙ্কের গায়ে মাথাটি হেলাইয়া উদাসভঙ্গীতে বসিয়া আছেন, দেখিয়া মনে হইতেছে পৃথিবীটা যে মরীচিকা মাত্র, এ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নাই ওঁর, তিনিই কি জানেন না এই দস্তুর! জানেন এ রকম 'সীনে' ঘাড় সোজা করিয়া খাড়া বসিয়া থাকাটা দৃষ্টিকটু। মনে মনে হয়তো ভাবিতেছেন··যা বুঝছি বৌমাটিকে এখন আর চট করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। শ্রাদ্ধ-শ্রান্তি না মিটলে কি আর যেতে চাইবে? মরবো আমিই এই বর্ষায় বাতের শরীর নিয়ে দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলে।···বলতে তো পারবো না কিছু।

বধূ অমলা ভাবিতেছে...যাবার কথা একবার তুলবে বোধ হয়। আচ্ছা তুলুক না একবার, এমন শোনানো শুনিয়ে দেবো!···

ওই যে দিবাকরবাবুর বিধবা বড়ো ভাজ—'ওরে কানাই বলাই, তোরা এতদিন পর্বতের আড়ালে ছিলি—' বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, ওঁর হৃদয় হইতেই কি একটি পর্বতভার নামিয়া গেল না? ওঁর মনের কোণে কি চকিতের জন্য এই কথাটিই ঝিলিক মারিয়া উঠিতেছে না···"কি মেজগিন্নী, এইবার?···'বিধবা মাগী' বলিয়া বড়ো যে হেনস্থা করিতে—"!

আবার স্বয়ং দিবাকরবাবুর স্ত্রী, ওই যে কান্নাকাটির পর স্তব্ধ হইয়া মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছেন, উনি কি এখন পঁয়ত্রিশ বৎসরব্যাপী সুখময় দাম্পত্য জীবনের মধুর স্মৃতিমণ্ডিত দিনগুলি, অথবা সেই দীর্ঘকালের সঙ্গীটির স্নেহ-মমতা প্রেম-ভালবাসার কথা চিন্তা করিতেছেন? না ভাবিতেছেন—যে নিরামিষ হেঁসেলকে এতোদিন বাড়তি অপব্যয় ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া আসিয়াছি, অবশেষে সেই হেঁসেলেরই মেম্বার হইতে হইল তাঁহাকে! দিবাকরবাবু থাকিতেই তো

ছোট জা-দেওর সমীহ মান্য রাখিয়া চলিত না, না জানি এর পর কি করিবে!

যে যাই ভাবিতে থাকুক, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবার জো নাই। দস্তুরমাফিক সবই হইতেছে।

ভবিষ্যতে বাঁধাইয়া রাখিয়া পূজা করুক, অথবা অসাবধানে ফেলিয়া দিক, আপাততঃ ছেলেরা মৃত পিতার দুই পায়ের তলায় রক্তচন্দন মাখাইয়া কাগজে ছাপ লইল, ছেলেদের মামী কোথা হইতে একখানা পকেট-গীতা আনিয়া মৃতের বুকের উপর স্থাপন করিলেন, তুলসীপাতায় চন্দন দিয়া 'ওঁ হরি' লিখিয়া কপালে সাঁটিয়া দেওয়াও হইয়াছে। মেয়েরা পরিপাটি করিয়া চন্দন পরাইতেছে বাপকে।

'মৃত্যু' আর 'বিবাহ'—এই দুইটা ঘটনার মধ্যে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য!

সেই ফুল-মালা-চন্দন, সেই লোকজন, আত্মীয়-কুটুম্বের সমারোহ—সেই আলো, ত্রিপল, লুচি-পটলভাজা। ফাঁকের মধ্যে কান্না আর হাসি।

প্রাণটা হাঁফাইয়া আসিতেছে।

নামিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দার্শনিকের উদাস ভঙ্গী লইয়া একটা সিগারেটও ধরাইলাম।

গুঁড়ি গুঁড়ি জল পড়াটা বন্ধ হইয়াছে। মেঘমেদুর আকাশটাকে আরো স্তিমিত দেখাইতেছে। মনে হইতেছে ও যেন নীচের দিকে ম্লান-করুণ দৃষ্টি মেলিয়া ভাবিতেছে—'এতো কৃত্রিমতার ভার বহন করিয়া পৃথিবী এখনো টিঁকিয়া আছে কেমন করিয়া?'

যদিও—একবারের চেষ্টায় একটিমাত্র দেশলাই কাঠিতেই সিগারেটটা ধরাইতে পারিলাম বলিয়া মনটা একটু প্রসন্ন লাগিতেছিল, তবু এই শ্রীহীন ঘোলাটে রাত্রিতে নিঃসঙ্গ রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আমারও মনে হইল,—সত্যই তো, পৃথিবী এখনো টিঁকিয়া আছে কিসের উপর ভর করিয়া?

তার পুরনো বনেদের সবটাই তো ধসিয়া পড়িতে বসিয়াছে। স্নেহ, প্রেম, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সব কিছুই তো আজ এক একটা অন্তঃসারশূন্য শব্দ মাত্র। বহুদর্শনের চালুনিতে ফেলিয়া দেখিতে বসিলে আগাগোড়াই তলায় ঝরিয়া পড়ে!

কানে আসিল···'জয়ন্তবাবু!' জয়ন্তবাবু কোথায় গেলেন?' এই রে, আমার জন্য ডাকপড়া শুরু হইয়াছে! হওয়াই স্বাভাবিক, দিবাকরবাবু লোকটি বেশ বিশাল আকৃতির ছিলেন। আর শক্তিশালী বলিয়া একটু খ্যাতি পাড়ায় এখনো আছে আমার।

দিবাকরবাবুর জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে যবনিকাপাত করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা নটা-দশটার কম নয়, কিন্তু কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, শেলেট্-পাথরের মতো ম্লান আকাশের নীচে ছায়াচ্ছন্ন মৌন পৃথিবী যেন সময়ের জ্ঞান ভুলিয়া জবুথবু হইয়া বসিয়া আছে।

দিবাকরবাবুর দাবার আড্ডার নিত্যসঙ্গী সত্যপ্রসন্নবাবু আমাদের দলপতির পার্ট লইয়াছেন। তিনি পাড়ার মধ্যে ঢুকিয়াই 'হাঁ হাঁ' করিয়া ওঠেন—

—শুনুন, শুনুন,—কেউ নিজের বাড়ি যাবেন না একখুনি। আগে ওঁদের বাড়ির দরজায় আগুন ছোঁবেন, নিমপাতা দাঁতে কেটে—জল-মিষ্টি খাবেন, তবে বাড়ি। তারপর যে যার বাড়ি গিয়ে কষে আদা-চা খান গে। পরিশ্রমটা তো কম হয়নি—উঃ যা লাশ!

আয়োজনের ত্রুটি নাই, দরজার চৌকাঠের বাহিরে আগুন ও নিমপাতা মজুত রহিয়াছে।

দরজার কাছে আসিতেই থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

দিবাকরবাবুর সাধের 'জিম্'টা একপাশে গুটিসুটি হইয়া বসিয়া আছে। গলার বকলসে শিকলটা ঝুলিতেছে, শিকলের অপর প্রান্তটা মাটিতে পড়িয়া, কোথাও বাঁধা নাই।

এই 'জিম'টি একটি ভয়ঙ্কর জীব।

কুশ্রী একটা দেশী কুকুর মাত্র, কিন্তু দিবাকরবাবুর আদরে যেন 'ধরাখানা সরা' দেখে। ওর জন্য দিবাকরবাবুর দরজাটা অভ্যাগতের আতঙ্কস্থল। বিনা প্রতিবাদে কাহাকেও বাড়িতে ঢুকিতে দেওয়া 'জিমে'র নীতিবিরুদ্ধ। মানুষ দেখিলেই 'ঘো ঘো' রবে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিবে। বাড়ির কেহ আসিয়া শিকল টানিয়া ধরা ভিন্ন বাহিরের লোকের সাধ্য কি যে, ভিতরে ঢোকে।

আশ্চর্য! কাল কোথায় ছিলো কুকুরটা? বিনা বাধায় এতো লোক আনাগোনা করিয়াছে?

বোধ করি, বুদ্ধি করিয়া কেহ কোথাও আটকাইয়া রাখিয়াছিল।

আজ আবার দরজায় আসিয়া বসিয়াছে।

দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

না, ভয়ে নয়!

আজ অপ্রতিবাদে দুয়ারের দখল ছাড়িয়া দিয়া নিজেই চোরের মত নিতান্ত একপাশে বসিয়া আছে সে, 'ঘো ঘো' করিয়া উঠিবে, এমন আশঙ্কার হেতু নাই।

দাঁড়াইয়া পড়িয়াছি—ভয়ে নয়!

দাঁড়াইয়া পড়িয়াছি—

পৃথিবীটা যে আজো কিসের উপর টিঁকিয়া আছে, জিমের মুখের উপর তাহার উত্তর লেখা রহিয়াছে দেখিয়া।

ঘোলাটে ঘোলাটে দুইটি নিষ্প্রভ পশু-চক্ষুর কোল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছে।

রুক্ষ-কর্কশ গালের চামড়ার উপর রেখাটা সুস্পষ্ট।

না, পশু জগতে এখনো ভেজাল প্রবেশ করে নাই!

[১৩৬৩]

আগে আগে ওপর-তলার কান বাঁচিয়ে গলা খাটো করে বলতো, এখন আর গলার স্বর খাটো করে না। বরং শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। যখন-তখন কারণে-অকারণে গলা ছেড়ে স্বামীর ওপর তর্জন করে জয়ন্তী—তুমি তা'হলে ওদের ওপর নোটিশ দেবে না?

বিমান বিব্রত হয়ে বলে—আহা—যা বলো বলো, একটু আস্তে বলোনা?

—দায় পড়েছে আমার আস্তে বলতে! আচ্ছা বেশ, তুমি নোটিশ না দাও আমিই বলবো।

বিমান বলে—কি মুস্কিল! তুমি যদি কিছুতেই না বোঝ তা'হলে তো নাচার! ভাড়াটে-আইনের মূলতত্ত্ব তো সব বুঝিয়ে দিয়েছি, তবু নোটিশের কথা তোলো কেন? নিয়মিত ভাড়া দিয়ে আসছে, কোনো উপদ্রব নেই, নোটিশ দেবো কোন ছুতোয়?

জয়ন্তী ক্রুদ্ধভাবে বলে—তা'হলে তুমি বলতে চাও, ওরা বরাবর থেকেই যাবে?

—আমি কিছুই বলতে চাই না, আইন যা বলে তাই বলছি। ভাড়াটে যদি নিয়মিত ভাড়া দেয়, তা'হলে তাকে তাড়ানো যায় না।

—তা'র মানে 'ঘর থাকতে বাবুই ভিজে?' নিজের বাড়ি, নিজে জীবনে ভোগ করতে পাবো না?

—পেতে, যদি কোন দিনই ভাড়াটে না বসাতে!...নিজের দরকারের সময় আদর করে ডেকে এনে প্রতিষ্ঠা করে, দরকার ফুরোলেই বিসর্জন দিতে চাইবো, এটা তো ন্যায্য হতে পারে না?

—হয়েছে হয়েছে, আমাকে আর ন্যায্য-অন্যায্য শেখাতে এসো না!...কবে একদিন ঘর বাড়তি হ'তো বলে ভাড়া দিয়ে ফেলেছিলাম, এই অপরাধে জীবনে আর বাড়ি ভোগ করতে পাবো না? অমন আইনের পোড়া কপাল!...একেবারে 'অসম্ভব' এ আমি বিশ্বাস করি না! আসল কথা—আমার কষ্ট তুমি দেখতেই পাও না!...জীবনের সমস্ত ভালো বয়েসটা দু'খানা অন্ধ-খোপ ঘরের কোণে মাথা গুঁজে পড়ে থেকে কেটে গেলো! তবু একটু মায়া আসে না, আশ্চর্য্য! ...যাদের নেই তা'দের কথা আলাদা। থাকতে—ভোগ হলো না এই বড় দুঃখু!

সত্যি, বেচারা বলে আর না বলে!

জীবনের অর্ধেকটা কালই তো কেটে গেলো জয়ন্তীর, ঘরের অকুলান আর জায়গার টানাটানিতে! অথচ আস্ত একটা বাড়ি নিজেদের রয়েছে!

জয়ন্তীর অসহিষ্ণুতা অসঙ্গত নয়।

কথাটা এই—বিমানের রোজগারী বাপ যখন বিমানকে অকূল-পাথারে ফেলে হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন, তখন দিশেহারা বিমান এই আকস্মিক আর্থিক অনটনের প্রতিকারকল্পে বসত-বাড়ির দোতলাটা ভাড়া দিয়ে বসেছিলো, নিজেরা

নীচের তলায় নেমে এসে।

তখন জয়ন্তীর বয়েস কম।

প্রতিবাদ করবে এমন বুদ্ধি ছিলো না, সাহসও ছিলো না। তখন স্বামীর ওপর দরদ ছিলো, করুণা ছিলো। কম বয়সে যেমন থাকে! তা'ছাড়া—তখন সংসার আরো ছোটো ছিলো তো?

শাশুড়ী ছিলেন না, শ্বশুর গেলেন! 'সংসার' মানে জয়ন্তী, বিমানরা দুই ভাই, আর বছর চারেকের একটা মেয়ে! কিন্তু তারপর আরো চারটি হয়েছে, চার বছরেরটি ষোলো বছরে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধুরীরা রয়েই গেছে।

নড়ন-চড়ন নেই। স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে।

ওরা দোতলায় থাকে, অনেকে ভাবে মাধুরীই বুঝি বাড়িওলা, জয়ন্তীরাই ভাড়াটে। এমন অর্বাচীনের মতো ভাবনা যারা ভাবে, তাদের ভুল ভেঙে দিতে অবশ্য মুহূর্ত দেরী করে না জয়ন্তী, কিন্তু প্রকৃত কথা বলতেও ঘেন্না করে!

অবিশ্যি দোতলা বলতে যে মস্ত একটা কিছু তা' নয়। সেখানেও ওই দু'খানাই ঘর। তবু তার সামাজিক মর্যাদাই আলাদা।

দোতলার ঘরের সামনে রাস্তার ধারের যে 'ফালি' অংশটুকু, তা'র নাম 'বারান্দা'! সেখানে বহির্বিশ্বের আস্বাদ!...খুসি হ'লেই বেরিয়ে দাঁড়াও, বাইরের জগতকে 'চেখে' 'চেখে' দেখো! রেলিঙে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে শুকোতে দাও শাড়ি জামা, বালিশ বিছানা।...জ্যোৎস্নার সময় শুয়ে পড়ো মাদুরখানা বিছিয়ে!

নীচের তলার সেই অংশটুকুর নাম রোয়াক!

প্রকৃতপক্ষে ফুটপাতের সঙ্গে যার কোনো পার্থক্য নেই। পাড়ার যতোগুলি নিষ্কর্মা ছেলের আড্ডাস্থল! কাজেই দরজা খুলে চট করে রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া, দরজা খোলার কথাই ওঠে না।

জয়ন্তীদের বালিশ-বিছানা জীবনে কখনো রোদের মুখ দেখতে পায় না, বড়ি আচার আমসির কথা ভাবতেই পারে না জয়ন্তী!

এতো সব অসুবিধে তো আছেই, তা'ছাড়া—"নীচের তলায় পড়ে আছি" —অহরহ মনে খোঁচা দিচ্ছে এই বিরক্তি!

অথচ—দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে ওপর তলার মাধুরীদের সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেটা প্রায় আত্মীয় সম্বন্ধেরই মতো!

যদিও আগে তার মধ্যে ছিলো নিবিড় আন্তরিকতা, এখন সে জায়গায় অভ্যাসের সৌজন্য!...আগে জয়ন্তী একটা ফেরিওলা ডাকলে দোতলা থেকে মাধুরী নেমে এসে তার সঙ্গে দরদস্তুর করতে বসতো, আবার মাধুরী নিজে যদি কিছু কিনে আনতো, নীচে থেকে জয়ন্তীকে না দেখিয়ে ওপরে উঠতো না।

মাধুরীর বর সিনেমার টিকিট কিনে আনলে জয়ন্তীর সুদ্ধ আনতো, জয়ন্তীর বর ল্যাংড়া আম কিনে আনলে অর্ধেক ভাগ করে ওপরে না পাঠিয়ে

দিয়ে নিজেরা খেতো না।

সে সব ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ ধূসর হয়ে এসেছে।

অভ্যাসের বশে পুরুষেরা যেটা করতে চায়, মেয়েরা সেটা এড়ায়।

অথচ—দৃশ্যতঃ কোনোদিন কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে এমন নয়!

এখনো—কর্তারা বাজারে গেলে একসঙ্গে সহজ গল্প করতে করতে ফেরেন, অফিস যেতে—দেখে দেখে এক ট্রামে ওঠেন।

কিন্তু গিন্নীদের ধরণ বদলেছে।

আগে—বাড়িওলাদের চাইতে ওপরওয়ালাদের অবস্থাই ছিলো ভালো, এখন পাশার দান উল্টেছে!

আজকাল জয়ন্তীদের খাওয়াপরার মানটা অনেক উন্নত হয়েছে। সে পক্ষে মাধুরীদের গেছে নেমে।

বরের কাছে গল্প করতে জয়ন্তী নাক সিঁট্‌কে বলে—ছেঁড়াখোঁড়া শাড়িগুলো রাস্তার ধারের বারান্দায় ঝুলিয়ে মেলে দিতে লজ্জাও করে না! ছি!·· সেদিনে মাসীমার বাড়ী থেকে আসতে দেখি, একখানা শাড়ি ঝুলছে তা'তে এতো বড়ো এক সেলাই!

কখনো হেসে হেসে বলে—'ওপরওয়ালা'দের বাজার করা দেখেছো? এইটুকু একটু থলিতে কি যে আনেন ভদ্দরলোক বুঝিও না! মাছের পুটলীটি তো—মাইক্রশকোপ্‌ দিয়ে দেখতে হয়! কুলোয় কি করে কে জানে!

ওদের নিজেদের যে এক সময় আধ-পোয়া মাছে পাঁচজনের কুলোতো, সে কথা এখন আর মনে পড়ে না জয়ন্তীর।

মুখ আর জিভ বাড়তে বাড়তে বেড়েই চলে!

মাঝে মাঝে গলা তুলে বোধ করি আকাশকে উদ্দেশ করেই বলে—লোকে দোষ দেয়—দ্যাওরের বিয়ে দিচ্ছি না ব'লে! কেন যে দিচ্ছি না, সে আর কে বুঝবে! একা সর্বস্ব খাবো পরবো বলেই কি দিচ্ছি না? বলি, বিয়ে দিয়ে বৌকে জায়গা দেবো কোথায়? হ্যাঁ, বুঝতাম ওপর-নীচেয় মিলিয়ে আস্ত একখানা বাড়ি আছে, তা'হলেও কথা ছিলো।

আপন মনে বলে—বাবাঃ এমন সুমতি কি কিছুতেই হয় না ওদের যে উঠে যায়? সত্যি, এতো যে 'শুনিয়ে শুনিয়ে' বলি মনে একটু ধিক্কারও তো আসে না?

বৈশাখের মাঝামাঝি, জয়ন্তীর ভাইয়ের বিয়ে লাগলো।

ছেলেদের নিয়ে বাপের বাড়ি গেলো জয়ন্তী বহরমপুরে।

বহুদিনের মধ্যে এমনধারা গুছিয়ে-গাছিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়া ঘটে ওঠেনি। কারণ বিমান বিরাম দুই ভাই অফিস যায়, কে 'ভাত-জল' করে!

এবারের যাওয়াটা বাধ্যতামূলক!

এবারে ওরা দু'ভাই নিজেরাই রেঁধে বেড়ে খাবে।

এই ব্যবস্থার ছুতোয় নতুন উদ্যমে জয়ন্তী আর একবার ব্যক্ত করতে থাকে

—বাড়িতে আর একটা বৌ থাকলে তো এমন দুর্দশা ঘটতো না! কিন্তু—ওই! দোতলার ঘর!

যাবার সময় বলে গেল—'হে ভগবান, এসে যেন দেখি ওরা উঠে গেছে!'

শালার বিয়ের নেমন্তন্নয় বিমান গেলো না, গেলো বিয়ে মিটে গেলে বৌ-ছেলে আনতে।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অনেক অনুযোগ করলেন।

বললেন—একদিনের জন্যে এলে না বাবা! তুমি আমার একটা জামাই! মন কেমন তো করলোই, তারপর পাঁচজনের কাছে জবাব দিতে দিতেও অস্থির! এমন কি জরুরী কাজ পড়লো যে একটা দিনের জন্যে আসতে পারলে না?

বিমান চুপ করেই থাকলো।

নিজের সাফাই গাইলো না।

জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হ'তেই সে একেবারে ফুঁসে উঠলো! সত্যি, এই ক'দিন ধরে রাগ দুঃখ লজ্জা ঘেন্না কম হয়েছে তার? অপদস্থর একশেষ!

—একটা দিনও আসা যেতো না?

বিমান সংক্ষেপে বললো—কাজ ছিলো!

জয়ন্তী খানিক গজ্ গজ করেই যাবার জন্যে তোড়জোড় সুরু করে দিলো। ক'দিন বাপের বাড়িতে থেকেই হাঁপিয়ে উঠেছে! বাপের বাড়িটা যথেষ্ট পরিমাণে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও! মনে হচ্ছে—কলকাতার সেই আধা অন্ধকার ছোট ঘর দু'খানা যেন অনেক খোলা, অনেক প্রশস্ত!...হাত পা ছড়াবার জায়গা না থাকলেও—মনটাকে খুসিমতো ছড়িয়ে রাখা যায়!

এখানের অবস্থাটা ঠিক বিপরীত!

এখানে হাত পা ছড়ানো চলে, মনটা ক্রমশঃই গুটিয়ে আসতে চায়!

ট্রেনে উঠে সারাক্ষণ শুধু বাপের বাড়ির নিন্দেই করলো জয়ন্তী।

শেষ মন্তব্য করলো—যাই বলো, একবার যে কলকাতায় বাস করেছে, সে আর কোনো দেশে টেঁকতে পারবে না। যম-যন্ত্রণা মনে হবে!

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে জয়ন্তী অবাক হয়ে বললো—দরজায় তালা লাগানো যে?

—বিরাম অফিসে গেছে!

—ঠাকুরপো অফিস গেছে, সে আর এমন কি নতুন কথা?...ওপরের গিন্নী বুঝি আর দয়া করে নেমে এসে দোরটায় খিল দিতে পারেন নি?

বিমান নিরুত্তর।...পকেট থেকে একটা ডুপ্লিকেট চাবি বার করে দোর খুলে ফেলে জিনিষ পত্র তুলতেই ব্যস্ত!

বেশ কিছুক্ষণ পরে জয়ন্তী সন্দিগ্ধভাবে বললো—কি গো, বাড়িটা কেমন যেন নিস্তব্ধ লাগছে কেন? ওপরের ওরাও কোথাও গেছে নাকি?

বিমান বললো—গেছে!

—কোথায় যাওয়া হলো হঠাৎ? সাত জন্মে তো কোনোখানে নড়তে দেখি না!···দেখাদেখি সখ হলো বুঝি? · গেলেন কোথায়?

—যার যে দিকে পথ!

—সোজা কথা কি তোমার কইতে নেই?···অপরাধের মধ্যে তো গিয়েছিলাম ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন! তা'তেই এতো রাগ? পুরুষ জাতটাই এমন স্বার্থপর বটে!

বিমান একটু হাসির আভাসের সঙ্গে বললে—তা' বটে!

—জিগ্যেস করছি এরা গেলো কোথায়? উত্তরই নেই বাবুর!···না কি কিছু বলেও যায়নি?

এবারে বিমান স্পষ্টই হেসে উঠে উত্তর দেয়—বলে যাবার সময় কি সকলে পায়?···না নিজেই মানুষ জানতে পারে 'কোথায় যাচ্ছি!'

বিমানের এই হাসিটায় যেন গা ছম্ ছম্ করে ওঠে জয়ন্তীর!···ও প্রায় চীৎকার করে বলে ওঠে—অমন ঢং করে করে কথা বলছো কেন? কি হয়েছে তাই বলো না?

নতুন কিছুই হয়নি···আবার সেই রকম ভীতিকর হাসি হেসেই বিমান বলে—যা সকলেরই হচ্ছে, যা কালকেই তোমার হতে পারে, শুধু তাই হয়েছে শ্রীমতী মাধুরী দেবীর!···এক ঘণ্টার নোটিশে 'সংসার করার মেয়াদ' ফুরোলো, অতঃপর তিন দিনের মধ্যে চাটিবাটি তুলে পিত্রালয় গমন!···'কাটোয়া' না 'কালনা' কোথায় যেন বাপের বাড়ি?···আগে তো জানতে?···ভুলে গেছো বুঝি?

জয়ন্তী তবু যেন বুঝতে পারে না।

আড়ষ্ট হয়ে বলে—সমর বাবু মারা গেছেন না কি?

—এতোক্ষণে বুঝলে?···যাক্ ভগবান কিন্তু তোমার প্রার্থনাটা কান পেতে শুনেছিলেন, কি বলো? শুনবেন বৈকি, অনেক ঘুষের লোভ দেখিয়েছিলে বোধ হয়?

অবাক—আড়ষ্ট হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুখরা জয়ন্তী, বোধ করি এই প্রথম স্বামীর কথার প্রতিবাদের ভাষা জোগায় না তার।

হয়তো এতোবড়ো নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের উত্তর ভাষা-জগতে নেই বলেই জোগায় না!

কী এ? ব্যঙ্গ, না ঘৃণা?···এতোকাল ধরে জয়ন্তীকে কি তা'হলে ঘৃণাই করে এসেছে বিমান? করে এসেছে অবজ্ঞা? চিরদিনই কি নারীর প্রতি আসক্তি আর সোহাগ প্রাচুর্য্যের অন্তরালে পুরুষের চিত্তে আত্মগোপন ক'রে থাকে এমনি ঘৃণা আর অবজ্ঞা?

[১৩৬৩]

হাস্য-করুণ

ট্রেনের আলাপ জিনিসটা বেশ।

বেশ দায়হীন বন্ধুত্ব।

ঘণ্টাখানেক ধরে দিব্য অন্তরঙ্গতায় গল্প চালানোর পর অনায়াসেই হঠাৎ নবলব্ধ বন্ধুটিকে বেমালুম ভুলে গিয়ে মুখের সামনে তুলে ধরতে পারা যায় একখানা ডিটেকটিভ্ উপন্যাস, অথবা খুলে ধরতে পারা যায় ভাঁজকরা খবরের কাগজখানা।

কেউ কিছু মনে করবে না।

এ তো গেলো আলাপের ক্ষেত্রে! নয়তো আবার—একসঙ্গে তেরো কিংবা তেইশ ঘণ্টা পাশাপাশি বসে থেকেও পাশের লোকটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ঠেলে রাখতে পারেন আপনি—একটিও কথা না ব'লে।

'অভদ্র' বলে গাল পাড়বে না কেউ।

সামনের সহযাত্রী যখন চোয়ালের পেশী ফুলিয়ে ফুলিয়ে শুকনো আলু চচ্চড়ি দিয়ে বাসি লুচি চিবোচ্ছে, বিনা দ্বিধায় আপনি তখন 'কেল্‌নারের' ওস্তাদ রাঁধুনির রান্না মাংসের কারি মেখে মেখে গরম ভাত গলাধঃকরণ করতে পারেন, কিছু চক্ষুলজ্জা হবে না।

আসলে ট্রেন জায়গাটাই বেশ।

অনেক শিক্ষা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ঠাঁই। নিজেকে দর্শকের আসনে বসিয়ে যদি দুনিয়াটাকে দেখে নিতে চান, তো উঠে পড়ুন যে কোনো দূরপথের একখানি থার্ডক্লাশ টিকিট কিনে।

হ্যাঁ থার্ডক্লাশই ভালো।

মহামানবের মিলন ক্ষেত্র!

ট্রেনের থার্ডক্লাশ কামরাটাকে কি বিরাট পৃথিবীর একটা 'পরমাণু সংস্করণ' বলা চলে না?

কেন নয়? সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অহরহ যে মারাত্মক লীলা-খেলা চলছে, তা'র মূল চেহারাটা ভাবুন। ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা, এই নয় কি? জুৎসই একটি কোণ জোগাড় করে গুছিয়ে বসে নিরপেক্ষ দৃষ্টি মেলে দেখুন কথাটা সত্যি কিনা।

এ তথ্যটা অবশ্য ঠিক আমার নিজের আবিষ্কৃত নয়, গল্প-লিখিয়ে সাত্যকী সান্যালের আবিষ্কার। মাঝে মাঝে সে আসে···এখানে গল্পের প্লট খুঁজতে।

প্রায়শঃই পাইকারি হারে গল্প লিখতে হয় তা'কে···, প্রাণের তাগিদে নয়, পেটের তাগিদে। অতএব প্লটের দৈন্যদশা ধরা স্বাভাবিক। সেই 'দারিদ্দির দশা'য় কখনো কখনো হঠাৎ একদিন সে হাওড়া কি শেয়ালদায় গিয়ে যে কোনো ট্রেনের থার্ডক্লাশ কামরার একখানায় উঠে পড়ে, যে ক'টা টাকা পকেটে থাকে খরচা ক'রে।

তারপর ভাব জমায় এর ওর তার সঙ্গে, পরম হৃদ্যতার ভানে জেনে নেয় তা'দের বাড়ির আর হাঁড়ির খবর, আর চোখ কান খোলা রেখে তার থেকে ধরতে চেষ্টা করে কোনো অজাত গল্পের অশরীরি আত্মাকে।

আজও সে উঠেছিল বি এন আর লাইনের একখানা টিকিট কেটে, আর কিছুক্ষণ পর থেকেই কবলিত করেছিলো একটি প্রায়প্রৌঢ় শীর্ণকায় ভদ্রলোককে।

কিন্তু কেন? কি দেখেছে সাত্যকী সান্যাল ওর শীর্ণ মুখের রেখায় রেখায়? কি বিশেষত্ব?

নাঃ ভদ্রলোকের চেহারাটা যাই হোক, বাচনভঙ্গিটা ভালো। সাত্যকীর সঙ্গে আলাপও জমে উঠেছে দেখা যাচ্ছে। চলন্ত ট্রেন বলেই হয়তো সহজ হয়েছে। দু'জনেই জানে এ আলাপের দায় নেই কিছু, জীবন ভোর জের টানতে হবে না এর।

—গল্পের প্লট খুঁজছেন আপনি? ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলেন—গল্পের প্লট তো অজস্র ছড়ানো আছে আমাদের সামনে, সব সময় ধরা পড়ে না এই যা। আচ্ছা, কি ধরণের প্লট পছন্দ করেন আপনি? সীরিয়াস না হালকা?...অবিশ্যি দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখতে পারলে তো জগতের সব ঘটনাই হালকা!

সাত্যকী সান্যালও মৃদু হাসেন—হয়তো তাই! কিন্তু পাঠকরা একটু ওজনে ভারী জিনিসই পছন্দ করে। ধরুন—আপনার নিজের অথবা পরিচিত কোনো বন্ধুবান্ধবের জীবনের কোনো 'ইয়ে' কাহিনী—

তুচ্ছ 'ইয়ে' দিয়েই ভাব প্রকাশ করেন কথাশিল্পী সাত্যকী সান্যাল।

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন বিরক্ত হয়ে ওঠেন, একটু উদ্ধতভাবেই বলেন—না মশাই, সে রকম কোনো ঘটনা আমার জানা নেই—যা নিয়ে গল্প লিখলে পাঠকরা শিউরে উঠবে।...সে রকম প্লট চান তো—চলে যাননা কোনো রেফিউজি কলোনিতে। আর কিছু না হোক, রেফিউজি ভাঙিয়েই তো আপনারা—গল্পলিখিয়েরা—দশবিশবছর 'করে খাবেন'।

ভদ্রলোকের 'গোঁসার' কারণটা বুঝতে পারে না সাত্যকী সান্যাল, ঈষৎ অপ্রতিভভাবে একটা সিগারেট ধরায়।...বিরক্ত ভদ্রলোক তাকিয়ে থাকেন জানালার বাইরে, যেখানে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে মাঠ ঘাট, ঝোপ জঙ্গল, সবুজ ক্ষেত, পানাপুকুর।

—শুনুন!

সাত্যকী সান্যাল হাতের বই থেকে মুখ তোলেন, চমকে না হ'লেও স-চমক ভাবে।

—কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ বলছিলাম কি—ভদ্রলোক ইতস্ততঃ ভাবে বলেন—রাগ করলেন নাকি ?

—নাঃ রাগের কি আছে ?

—মানে আর কি, এতোক্ষণ একটা প্লট ভাবছিলাম, জানি না তা'কে করুণরসাত্মক বলা চলে, কি হাস্যরসাত্মক। শুনে আপনিই বিচার করুন। ধরুন—একটা ছেলে—নেহাৎ গরীব গেরস্থ ঘরেরই ছেলে, গ্রামের বাড়িতে থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এলো এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে কলেজে পড়তে। অবিশ্যি এমন কিছু আহামরি ছেলে নয় যে এই সুযোগটুকু পেয়ে দিন কিনে নেবে। আই, এ-টা কোন রকমে উৎরে, হোঁচট খেলো বি, এ এক্‌জামিনেশনে, ব্যস্‌ ওই পর্যন্তই লেখাপড়ায় ইতি। তা'ছাড়া, আত্মীয়ের বাড়ি থাকাটা আর পোষাচ্ছিলো না। না পোষানোর পেছনে যা ইতিহাস আছে সে থাক্‌, এ গল্পে সে অবান্তর। তবে হ্যাঁ, ওই পোষালো না। প্রাণপণে একটা চাকরী আর একটা মেসের সিট জোগাড় ক'রে উঠে এলো একদিন আত্মীয়ের আওতা থেকে। চাকরী হয়েছে—চালিয়ে নেবে।

চাকরী হয়েছে—আর ঠেকায় কে ? মা উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তুললেন বিয়ের জন্যে। হয়েও গেল বিয়ে গাঁয়েরই একটা মেয়ের সঙ্গে।···বড্ডো সাধারণ লাগছে, না ? বললামই তো ছেলেটা অতি সাধারণ, শুধু তার মনের মধ্যে ছিলো অসাধারণ একটা সখ !···পঁচানব্বই টাকা মাইনের কেরাণী, তার সাধ নিজের একটা বাড়ি করবে ! আর কোথাও নয়—খাস্‌ কলকাতায় ! বুঝুন একবার ? এ সখকে অসাধারণই বলা উচিত নয় কি ?

নিজের একটা বাড়ি, সত্যিকার ভালো বাড়ি একটা তার চাইই। 'নিজের একটা বাড়ি না থাকলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না'—এই তার মত। ···ঘটনাটা অবিশ্যি আজকের নয়, টাকার দাম তখন ষোলো আনাই ছিলো। পঁচানব্বই টাকা তখন 'মোটা মাইনে' না হ'লেও ফেল্‌না ছিলো না।

তবু সেই থেকেই তো তাকে করতে হবে মেসের খরচা, পাঠাতে হবে বাড়িতে ? অতএব সুরু হয় কৃচ্ছ্রসাধনের কেরামতি। খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে ধোবা নাপিত, লোক-লৌকিকতা, আচার-ব্যাপার, পূজা-পার্বণ —সর্বত্র চলে ছাঁটাইয়ের কাঁচি।

এমন রাজা উজিরী চাল কোনোদিনই ছিলো না যে কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রসাধনার মহিমায় মোট মোট টাকা জমবে। তবু লাগো অসাধ্য সাধনের চেষ্টায়। করো আবিষ্কার—আরো কী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথ আছে ব্যয় সংক্ষেপের। প্রখর দৃষ্টি হানো—কোথাও কোনো বেহিসেবী ব্যাপার চোখ এড়িয়ে বসে আছে কিনা, যার থেকে অধ্যবসায়ের গুণে ছেঁকে তুলে নেওয়া যায় দু'টি চারটিও তাম্রখণ্ড। ছোট ছোট সেই খণ্ডগুলিই তো একদিন অখণ্ড মূর্তি নিয়ে ঝল্‌সে উঠবে রুপোলী আলো ছড়িয়ে !

জীবনের মানকে নামিয়ে আনতে হয় ধাপে ধাপে। ··নীচু আরো নীচুতে। ভদ্রতা থেকে ইতরতায়।

'আইডিয়াল বোর্ডিং' থেকে 'মহামায়া মেস'এ।

কতো টাকা জমাতে পারলে সাধনার সিদ্ধি, সে হিসেব অবশ্য হয়নি এখনো, শুধু তার মন বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত একাত্ম হয়ে বলছে "টাকা জমাও।" প্রতিটি লোমকূপ থেকে আবেদন উঠছে "টাকা জমাও।" না হ'লে মিটবেনা তোমার জীবনের সাধ। হবে না বাড়ি।

কি দরকার প্রত্যেক শনিবারে বাড়ি যাবার ? মাসে একক্ষেপ গেলেই ঢের। কি হবে হপ্তায় তিনখানা চিঠি চালাচালি ক'রে ? একখানাই তো যথেষ্ট !

বৌ রাগ করে, দুঃখ ক'রে কাঁদে।···অবুঝ ছেলেমানুষ !

অবশ্য মনকেমন তার নিজেরই কি করে না ? কিন্তু উপায় কি ? 'একটু বুঝে না চললে'—চলবে কেন ? ব্যাটা না হওয়া পর্যন্ত এলোমেলো খরচ করা যায় কি ক'রে ? হয়ে গেলে কী সুখ সেটা ভাবো ?

বাগ মানাতে পারে না বৌকে। তার আবার স্বছাড়া যুক্তি। বলে— "দু'জনে একসঙ্গে না থাকতে পেলে বাঁচার কোনো মানে হয় না।" শোনো কথা ! দু'জনে একসঙ্গে ভালো করে থাকবে বলেই না 'বাড়ি বাড়ি' করে প্রাণপাত করা ? বৌয়ের বায়না মেটাতে তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আর একটা সংসার পাতিয়ে বসলে একটি আধলাও আর জমবে ?

বুঝবে না। রোজ সাতপাতা চিঠি লিখে কাঁদুনী গাইবে। অগত্যা বাড়িতে পাঠানোর টাকা আরো কমিয়ে ফেলতে হয়। পেটে টান না পড়লে খামের দাম বুঝবে না। কৌশলে কাজ হয়, চিঠি লেখা কমে আসে বৌয়ের। খরচ কমে।··· তা'ছাড়া ছুটিছাটায় দেশে গিয়ে ছেলেটা বাড়ির আনাচে কানাচে পুঁতে দিয়ে আসে লাউ কুমড়ো, ডুমুর সীম, সজনেডাঁটা মুখীকচু। বুঝে চললে দু'টো মেয়েমানুষের কতোই আর লাগে ?

দুনিয়ার পথের দু'পাশে কতো রং, কতো শোভা, কতো আনন্দ ! অহরহ হাতছানি দেয় তারা, মিনতি ক'রে আকর্ষণ করে। কিন্তু সে কি কোনোদিন বিচলিত হয়ে সে প্রলোভনে ভোলে ? একটা ভালো সিগারেট খেয়ে দেখেছে কখনো ? দেখেছে একটা থিয়েটার সিনেমা ? ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে ফেরে অফিস থেকে—খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে। হাঁটে—খাবারের দোকানের রাস্তাগুলো বেছে বেছে বাদ দিয়ে। কে জানে—যদি খিদের মাথায়···কথায় বলে 'মন না মতিভ্রম।'

নিজের উদাহরণ দিয়ে দিয়ে ক্রমশঃ বৌকে পোষ মানিয়ে ফেলে সে। বুঝে চলতে শেখে বৌ।

ইতিমধ্যে মা মারা গিয়েছিলেন, এমনিই কমে গিয়েছিলো একটা মোটা খরচ। বৌ আরো সুযোগ পায় গোছালোগিরি করবার। বয়েসও ততোদিনে ভারী হয়েছে কিছুটা।···লুকিয়ে চুরিয়ে পাড়াঘরে বিক্রী করে লাউটা কুমড়োটা, 'জোগান' দেয় ঘরের গাইয়ের দুধটুকু।···সকালের ভাতে জল দিয়ে

রেখে রাত্রে খায়।

জমতে থাকে বাড়ি তৈরীর টাকা।

তিল তিল করেই তাল।

এদিকেও অবিশ্যি নিশ্চেষ্ট নেই ছেলেটা। অফিসে বড়োবাবু থেকে সুরু করে মেজ, সেজ, ন', নতুন—যতো 'বাবু' আছেন সক্কলের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে দিব্যি উন্নতি করে ফেলেছে।

প্রায় 'মোটা মাইনেই' প্রায় ক্রমশঃ।

ঈশ্বর ইচ্ছেয় ছেলেমেয়েও বেশী নয়। একটা মেয়ে, বলতে গেলে প্রায় বিনিপয়সাতেই পার করেছে। অবিশ্যি পাত্র দোজবরে, কিন্তু তা'তে ক্ষতিটা কি? অবস্থা ভালো, বাপের ঘাড়ে এসে পড়বে না কখনো মেয়ে।

বড়ো ছেলেটা ম্যাট্রিক পাশ করে কাজ শিখতে ঢোকে কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপে, ছোটটা তো তার দিদিমার কাছেই থাকে।

ইতিমধ্যে 'লেকের' কাছ ঘেঁসে নতুন পাড়ায় কাঠা চারেক জমি কিনে ফেলেছে ছেলেটা।…'ছেলেটা' মানে লোকটা। 'ছেলে' বলাটা কি শোভা পায় আর?

জমি কেনার পর থেকে সাধনার একেবারে উচ্চস্তরে ওঠে তারা।…সাধ আহ্লাদ চুলোয় যাক, স্নেহ মমতা, কর্তব্য, চক্ষুলজ্জা, সব কিছু থাক্ ধামা চাপা, বাড়িটা হয়ে যাক আগে।

মেয়ে মনের দুঃখে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসতে চায় না, চিঠি লেখে না, ছেলে ছুটির সময় বন্ধুর বাড়ি কাটিয়ে আসে। এরা দুই স্বামী স্ত্রী নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে 'শাপে বর'। এলে যেমন আহ্লাদ একটু আছে, তেমনি খরচটিও তো বিলক্ষণ আছে।

না খেয়ে না প'রে এই যে টাকাটা জমাচ্ছে 'বাড়ি বাড়ি' ক'রে, সে বাড়ি কি ছেলেমেয়েদের জন্যে নয়?

অবশেষে একদিন সফল হয় আজীবনের স্বপ্ন।

সিদ্ধি হয় সুদীর্ঘ সাধনার।

বাড়ি ওঠে।

চারকাঠা জমি জুড়ে তিনতলা বাড়ি। বাড়ির মতো বাড়ি। এতোটা আরো হলো অবিশ্যি প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাগুলো পেয়ে যাওয়াতে। লোকটা তখন রিটায়ার করেছিলো কি না!

আর বাড়িটা হওয়ার পর—গিন্নী এসেছেন দেশ থেকে, এসেছে মেয়ে-ছেলেরা। গৃহপ্রবেশের গোলমাল মিটে গিয়ে বাড়িটা যখন নিঃঝুম ঠাণ্ডা মেরে গেছে, তখন—তখনই হঠাৎ লোকটা…মানে, এ গল্পের যেটা চরম ট্র্যাজেডি…

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক পকেট থেকে বার করলেন একটা বিড়ি,

দেশলাইয়ের জন্যে হাত বাড়ালেন সাত্যকী সান্যালের দিকে। সাত্যকী সান্যাল এতোক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন। যদিও খুব বেশী ইণ্টারেস্ট পাচ্ছিলেন না, এতোক্ষণে আশান্বিত চিত্তে সাগ্রহে প্রশ্ন করেন—লোকটা হার্টফেল করলো ?

—হার্টফেল ? সে কি, কে বললে ? হার্টফেল করবে কেন ?

ওঃ না। এমনি ভাবছিলাম।···গিন্নীরই কিছু হলো তা'হলে বুঝি ?

—ধেৎ ! সে সব কিছু না। স্বাস্থ্য তার খুব ভালো। সে হয়তো তখন সংসারের সব কাজ গুছিয়ে নিভে যাওয়া উনুনের পোড়া কয়লাগুলো তুলে জমা করছিলো।···তার কথা হচ্ছে না, আমি বলছি লোকটার কথা।

সেই নিঃঝুম রাত্রে লাইট নিভোনো অন্ধকার বাড়িখানার বিরাট দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করে বসলো সে !

বাড়িখানাকে সে ঘৃণা করছে !

হ্যাঁ ঘৃণা ! দস্তুরমতো ঘৃণা। শুধু ঘৃণা নয়, ঈর্ষাও।

কী করলো সে এতোদিন ? নিজের সমস্ত জীবনটাকে বাজী ধরে সংগ্রহ করলো সে এই ইঁট কাঠের বিরাট বোঝাটা ? এর দেয়ালের গায়ে ওই মোলায়েম গোলাপী রংটা ফুটিয়ে তোলার জন্যে নিজের গায়ে সে কখনো ভালো করে একখাবলা তেল মাখেনি !···একে গড়ে তুলবে বলে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছে নিজেকে ?

কেন ? কেন ? কেন তিরিশ বছর ধরে তিল তিল করে নিংড়েছে নিজেকে ?

কী করবে সে এতো বড়ো বাড়ি নিয়ে ? কী দরকার তার বাড়িতে ?

একসঙ্গে সাড়ে তিনহাতের বেশী জমি দখল করবার ক্ষমতা তার আছে ?

—হ্যাঁগো তুমি এখনো ঘুমোওনি ?

গিন্নী ওপরে এসে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন—ভূতে পাওয়ার মতো একলা একলা দালানে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন ?···কি গো, কথা কইছো না কেন ?

—বাড়িটা নিয়ে কি করবো আমরা ? এতো বড়ো বাড়ি !

প্রায় প্রেতাচ্ছন্নর মতোই প্রশ্ন করে লোকটা, হয়তো স্ত্রীকে, হয়তো নিজেকে, হয়তো সারাজীবনের ব্যর্থতাকে !

—সত্যি, আমিও তাই ভাবছিলাম—গিন্নী সরল ভাবে বলেন—দিনের বেলা পাঁচটা কাজের মধ্যে বুঝতে পারিনি ! এখন দেখছি তাকিয়ে, বাড়ি যেন হাঁ করে গিলে খেতে আসছে ! আমি বলি কি, নীচে তলার খান দুই ঘর নিজেদের রেখে বাকীটা সব ভাড়া দিয়ে দিলে হয় না ?···আজকাল তো শুনেছি বাড়ির ভাড়াটাড়া খুব বেশী ! বিশেষ করে এই অঞ্চলে। খুকী বলছিলো—ভাড়া দিলে বে-ওজরে মাস গেলে দু'শো খানি টাকা ! হ্যাঁ গো, হবে অতো ?

—হ্যাঁ কি বললে ? ভাড়া ? তা' হয়।

তেমনি প্রেতাচ্ছন্ন সুরেই জবাব আসে।

—তা'হলে আমি বলি কি—আহ্লাদে আটখানা হয়ে পরামর্শ দেন গৃহিণী—ওই যা বলেছি, দুখানা ঘর নিজেদের এক্তারে রেখে, বাকী সবটা ভাড়া বসিয়ে

দাও। আর সত্যি, কলকাতায় থাকতে তো তুমি আর ছোটখোকা। আমি কিছু আর লক্ষ্মী ষষ্ঠী, বাগান-পত্তর, গরু-বাছুর ছিষ্টি ফেলে রেখে এসে বারোমাস এখানে পড়ে থাকতে পারবো না। 'কালী গঙ্গা' করতে মাঝে মাঝে আসা! ওই দু'খানাতেই মাথা গুঁজে চলে যাবে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ভদ্রলোক হাতের বিড়িটায় মন দেন।

একটু অপেক্ষা করে সাত্যকী সান্যাল উৎসুকভাবে বলেন—তারপর?

—তারপর আবার কি? কিছু না। মেয়ে চলে গেলো শ্বশুরবাড়ি, বড়ো ছেলে কাঁচড়াপাড়ায়, ছোটটা কলকাতায় থেকে কলেজে পড়বে বলে রইলো বাপের সঙ্গে 'মহামায়া' মেসে।

—আর বাড়িটা?

—বাড়িটা? ওঃ। পুরো বাড়িটার জন্যে আড়াই শো টাকায় একটা ভাড়াটে পাওয়া গেলো, দু'খানা ঘর ছাড়তে তারা রাজী নয়। দু'খানা ঘরের জন্যে তো আর অমন ভাড়াটেটা ছাড়া যায় না?

সাত্যকী সান্যাল মাথা চুলকে বলেন—আসলে প্লটটা তা'হলে কি হলো? ঠিক করুণ-রসাত্মকও হচ্ছে না—

বেশ তো হাস্য-রসাত্মকই বলুন না! কী এসে যাচ্ছে তাতে? আর বলেছিই তো—ভয়ংকর করুণ প্লট চান তো একটা রেফিউজি কলোনিতে চলে যান! অনেক লোমহর্ষক জীবন-ইতিহাস শুনতে পারেন। ওরা এখনো অনেককাল ধরে ভাত কাপড় জোগাবে আপনাদের।

বিরক্ত ভাবে বাইরে তাকান ভদ্রলোক।

প্রথম থেকে শেষ অবধি—এতো বড়ো গল্পটা শুনেও—গোঁসার কারণটা বুঝে উঠতে পারে না সাত্যকী সান্যাল।···কে জানে লোকটার জীবনের সঙ্গে এ গল্পের যোগ আছে কি না। ওর মুখের চেহারায় কেমন যেন একটা সর্বহারা জীর্ণ বিদীর্ণ ভাব তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো, তা'তে আশা করছিলো ঘোরালো কোনো একটা কাহিনী যোগাড় করা যাবে হয়তো। শেষ পর্যন্ত সবটা এ রকম জোলো হয়ে গেলো!

মরুক গে—তবু একটা কাঠামোও পাওয়া গেলো আপাততঃ, পশু' তারিখে সেটা দেবার কথা রয়েছে 'চলতি দুনিয়ায়', সেটা হয়ে যাবে!

ওই—গৃহপ্রবেশের দিন উৎসবের গোলমালের মাঝখানে গিন্নীটাকে আচমকা সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে মেরে ফেলে, কিম্বা কর্তাকে হার্টফেল করিয়ে, নিদেনপক্ষে বড়ো ছেলেটাকে গাড়ি চাপা দিয়ে পাঠকদের মনের মতো একটা গল্প খাড়া করে ফেলা যাবে।

কলমটা নিয়ে বসলেই হলো একবার।

[১৩৬৩]

শোক

অফিস বেরোবার মুখে ফুটপাতে পা ফেলতেই সামনে পিয়ন, চিঠি আর বই হাতে। ব্যস্ত হাতে জিনিস দুটো নিয়ে ঘুরে আবার অন্দরমুখো হতে হল শক্তিপদকে। ফেলে দিয়ে যেতে হবে প্রতিভার কাছে। বইটা দেখবার দরকার নেই, বোঝাই যাচ্ছে "ছায়াছবি"। প্রতিভার প্রাণের প্রিয় সিনেমা পত্রিকা। বুধবারে বুধবারে নিয়মিত আসে।

চিঠিটাও প্রতিভারই। পোষ্টকার্ডে লাইন কয়েক লেখা।

বর্ধমানের চিঠি। প্রতিভার বাপের বাড়ির।

এত ব্যস্ততার সময় চিঠি পড়বার কথা নয় তবু চলতি পথে চোখটা আপনি বুলিয়ে গেল কালো কালো লাইন কটার উপর, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখ দুটো পাথরের হয়ে গেল শক্তিপদর। সেই নিষ্পলক পাথরের চোখ দুটো নিয়ে আরও একবার চিঠিটা পড়ল শক্তিপদ, আরও একবার! নাঃ সন্দেহের আর অবকাশ নেই। বাহুল্যকথা-বর্জিত নির্ভুল সংবাদ। প্রতিভার কাকার হাতের স্পষ্টাক্ষরে লেখা!

মা মারা গেছেন প্রতিভার।

টেলিগ্রামের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি কাকা, চিঠিতেই জানিয়েছেন—"গত রাত্রে তোমাদের মাতৃদেবী স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। সামান্য কয়েকদিনের জ্বরে তিনি যে এভাবে আমাদের মায়া কাটাইবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমরা সকলেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। দাদা নাই, বৌদিও গেলেন, এখন তুমিই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল। অতএব পত্রপাঠ চলিয়া আসিয়া আমাদের সান্ত্বনা দান করিবে।"

পরবর্তী আশীর্বাদজ্ঞাপক লাইন দুটো পড়বার ক্ষমতা আর থাকে না শক্তিপদর, শুধু মিনিট দুয়েক কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। সেই অবস্থায় সিনেমার ছবির মত পরপর অনেকগুলো ছবি তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। দেখা ছবি নয়, আনুমানিক ছবি। এই মর্মান্তিক চিঠির মর্ম এখন প্রতিভাকে জানালে, কী বিপদে পড়তে হবে শক্তিপদকে, তারই ধারাবাহিক দৃশ্য।

বলাবাহুল্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বিধবা শাশুড়ীর মৃত্যু-সংবাদে শক্তিপদ নিজে ভয়ানক একটা কিছু শক্ পায় নি, কিন্তু মা-অন্ত-প্রাণ প্রতিভা এ সংবাদে কী কাণ্ড করবে সেই ভেবেই বুক শুকিয়ে ওঠে বেচারার।

যে ভাবনাটা প্রথম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সে হচ্ছে অফিসের ভাবনা। আজকের মত অফিস যাওয়াটি তো খতম! অথচ কপালের ফেরে আজই মাসের পয়লা তারিখ। শক্তিপদদের অফিসে আবার এমন বদখত নিয়ম যে, দৈবাৎ পয়লা তারিখে কামাই হয়ে গেলে, সাত তারিখের আগে আর সে মাইনে উদ্ধার হয় না! ভাবতেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা হিমপ্রবাহ বহে যায় শক্তিপদর।

তা ছাড়া—প্রতিভাকে সামলানো!

প্রতিভার প্রকৃতি, আর তার সঙ্গে তার মাতৃশোক যোগ করে দেখতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডটাও বরফ হয়ে ওঠে বেচারার।

প্রতিভার মাতৃশোক।

তায় আবার আকস্মিক শোক!

সেই অভূতপূর্ব ঝটিকা কল্পনা করতে করতে, সহসা কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকটা কর্তব্য নির্ধারণ করে ফেলে।

নাঃ এখন নয়। এখন চেপে যাওয়া যাক!

আচমকা গিয়ে এ ভাবে বলা অসম্ভব।

তার চাইতে এখন নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে পড়াই শ্রেয়। এসে যা হয় হবে। বললেই হবে—অখন তাড়াতাড়ির সময়—ওরে বাবা। শক্তিপদ কি পাগল হয়ে গেছে। প্রতিভার মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি অফিস গিয়েছিল শক্তিপদ, এই কথা জানাতে হবে প্রতিভাকে?

ও হয় না!

তাহলে?

তবে কি পকেটে করে নিয়ে যাবে? যেন যাবার মুখে হাতে পেয়ে না পড়েই ভুলে পকেটে ভরে নিয়ে চলে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে জামা খুলতে গিয়ে—নাঃ! সেও শক্ত কথা!

বর্ধমানের চিঠি দেখেও ভুলে সেটাকে পকেটে নিয়ে সারাদিন নিশ্চিন্ত হয়ে অফিসে কাজ করাই কি মার্জনাযোগ্য অপরাধ?

আজ কদিন চিঠি আসে নি বলে ব্যস্ত হচ্ছে না প্রতিভা?

ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎ-চমকের মত—বুদ্ধির একটা দীপ্তি খেলে গেল শক্তিপদর মগজে! তাই তো! এটা তো এতোক্ষণ মাথায় আসে নি! সত্যিই তো, পিয়ন যে শক্তিপদর হাতে চিঠিটা দিয়ে গেছে, তার কি কোন প্রমাণ আছে?

এই তো প্রায়ই সে বাইরে থেকে জানলা গলিয়ে ভেতবে ফেলে দিয়ে যায়। আজও দিত, শক্তিপদকে দেখতে পেল বলেই না? হায় হায়! আর এক মিনিট আগে অফিস বেরিয়ে যায় নি কেন শক্তিপদ? তাহলে তো এত দুশ্চিন্তার কিছুই পোহাতে হত না তাকে?

যাক! শক্তিপদই বাইরের জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে যাবে।

চিন্তার অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে আর একবার ভেবে নেয় শক্তিপদ। না, সেটা ঠিক হবে না। পাড়ায় কত চেনাশুনো লোক, কে হয়তো দেখে ফেলবে। কি ভাববে? তার চাইতে ভেতর থেকেই জানলার নিচে রেখে দিয়ে যাওয়া ভাল!

যাকে বলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেইভাবে বসার ঘরেব কাছাকাছি এসে কান খাড়া করে দাঁড়াল শক্তিপদ। এই ঘরেই চিঠি ফেলে দিয়ে যায় পিয়ন।

প্রতিভা কোথায়?

অবশ্যই রান্নাঘরে। খুন্তি নাড়ার শব্দ আসছে। আসছে মাছ-ভাজার মধুর সৌরভ। চট করে এদিকে আসবে না তাহলে।

ধীরে ধীরে জানলার কোলের কাছে রাখল বইটা আর চিঠিটা। বইটার উপর দিকেই চিঠি থাক! হ্যাঁ এই ঠিক! নইলে 'ছায়াছবি' দেখা মাত্রই তো বিশ্ব-সংসার ভুলে যাবে প্রতিভা, নিচে আর কিছু পড়ে আছে কিনা দেখবে কি তাকিয়ে?

চিঠি উপরে থাক। লেখা অংশটা বুকে নিয়ে। নিজেই দুঃসংবাদটা পেয়ে যাক প্রতিভা। ভগ্নদূতের দুরূহ কর্তব্যের বোঝা হতে মুক্তি পাক শক্তিপদ! কান্নাকাটির বড় ঝড়টা, শক্তিপদর চোখের আড়ালে ঘটুক। শক্তিপদ যখন ফিরবে, অবশ্যই প্রতিভা কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠবে ততক্ষণে।

এত কথা ভাবতে কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগে নি। চিন্তা যে বাতাসের চাইতে দ্রুতগামী।

'ছায়াছবি'র প্যাকেটটার উপরে চিঠিখানা বিছিয়ে রেখে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল শক্তিপদ, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। আর বেরিয়ে গিয়েই বুকটান করে অনেকখানি মুক্ত বাতাস ভরে নিল বুকের খাঁচাটার মধ্যে।

আঃ! কী হালকা লাগছে নিজেকে!

খুব বুদ্ধিটা এসে গেল মাথায়।

অফিসে গিয়ে কিন্তু এ হালকা ভাবটা আর থাকে না! বরং একটা অপরাধ-বোধের ভার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। বারে বারেই মনে হতে থাকে, প্রতিভা যদি বড্ড কেঁদে কেটে হাত-পা ছেড়ে দেয়, খোকাটার কী দুর্গতি হবে!

হয়তো সারাদিনে দুধই জুটবে না বেচারার ভাগ্যে!

অনেকবার ভাবল সকাল করে বাড়ি ফিরে যাই, কিন্তু তারই বা জাস্টি-ফিকেশন কি? কেন ফিরল সকাল করে? অতএব চোখ কান বুজে কাটাতে হবে দিনটা।

চা করে ফেলেছে তার আর চারা নেই।

ভাজা মাছ উঁচু তাকে তুলে রেখে, রান্নাঘরের বাকী একটু-আধটু কাজ সেরে এদিকে এল প্রতিভা। মনটা চঞ্চল রয়েছে, শক্তিপদ বেরিয়ে গেছে কতক্ষণ হল, রাস্তার দোর বন্ধ করা হয়নি! তবু তো খোকাটা কাঁদছে না তাই রক্ষে! দোরটার খিল লাগিয়ে এ ঘরে এসে ঢুকতেই চোখ পড়ল জানলার নিচে চিঠি আর বইয়ের মোড়কে।...ওঃ এসে গেছে ছায়াছবি? এ সপ্তাহে বিশিষ্ট তিনজন অভিনেত্রীর সঙ্গে পত্রিকা-প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রকাশ হবার কথা আছে।

এল কখন?

শক্তিপদ যখন বেরোবার জন্যে পোশাক পরছে, তখনও তো আসে নি!

এই যে বর্ধমানের চিঠিও এসে গেছে। কিন্তু কাকার হাতের লেখা কেন? বিজয়া দশমীর চিঠি ছাড়া, কাকা তো কখনও—মা ভাল আছেন তো?

বাতাসের চাইতে চিন্তা দ্রুতগামী, সকলের ক্ষেত্রেই।

হাত বাড়াতে বাড়াতেই এত কথা ভাবা হয়ে যায়! আর হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়েই স্তব্ধ হয়ে মাটিতে ধুলোর উপরেই বসে পড়ে প্রতিভা!

এ কী! এ কী কথা!

এ কোন্ বার্তা বহন করে এসেছে তিন পয়সার এই কার্ডখানা? মা নেই? প্রতিভার মা নেই? আর সেই না থাকার খবরটা এসে পৌঁছলো নিতান্ত সাধারণ দু ছত্র চিঠির মাধ্যমে?

প্রতিভার মাতৃবিয়োগের সংবাদটা কি তুচ্ছ একটা কুশল-অকুশল-সংবাদের মত মূল্যহীন? আর এমনি অদ্ভুত একটা পরিবেশের মধ্যে সে সংবাদ জানতে হল প্রতিভাকে? একলা বসে বসে জানতে হল তার মা নেই! দশ মিনিট আগে এলো না চিঠিটা? তাহলে শক্তিপদ থাকত। থাকত প্রতিভার শোকের প্রচণ্ডতা বোঝবার দর্শক। শক্তিপদ থাকলে—এখুনি শোকাহত উদ্ভ্রান্ত প্রতিভাকে নিয়ে ছুটত হাওড়া স্টেশনে।

না, ট্রেনের সময় না থাকলে ট্রেনের জন্যও অপেক্ষা করতে রাজী হত না প্রতিভা, পাগলের মত ছুটে যেতে চাইতো ট্যাক্সিতে করে।...আর শক্তিপদ নিশ্চই তাতে প্রতিবাদ করত না।

প্রতিভার এত বড় দুঃখের সময় কৃপণতা করবে, এমন হৃদয়হীন লোক শক্তিপদ নয়! ট্যাক্সি থেকে নেমেই মায়ের বিছানাটার কাছে আছড়ে পড়ত প্রতিভা, ছুটে এসে সান্ত্বনা দিতে বসতেন কাকা খুড়ী পিসীমা! আসত পাড়ার লোক। মা হারিয়ে কত কষ্ট হয়েছে প্রতিভার, জানতে পারত সবাই!

কিন্তু এ কী হল? শোকের সমারোহের দিকটা একেবারে নিভে গেল যে! এমন কী চীৎকার করে একবার কেঁদে উঠবে, তারও যেন প্রেরণা আসছে না! একা বাড়িতে হঠাৎ ওভাবে কেঁদে উঠতে পারা যায়?

বড়রা যা পারে না, ছোটরা তা অক্লেশেই পারে। তাই সহসা উদ্দাম চীৎকার পাড়া মাথায় করে তোলে দশ মাসের খোকন! আপন মনে বসে খেলছিল ঘরের মধ্যে, হঠাৎ কি হল?

দ্বিতীয় ব্যক্তিহীন বাড়িতে, ছেলের এহেন চীৎকারে, ছুটে না গিয়ে উপায় কি? এইমাত্র মা মরার খবর পেলেও যেতে হয়।

আর কিছু নয়, বড় একটি কাঠপিঁপড়ে!

মোক্ষম করে কামড়ে ধরেছে ছোট্ট কচি একটি আঙুলের ডগায়। তা দশ মাসের ছেলের পক্ষে, এ কাঠপিঁপড়ে কাঁকড়া বিছের সামিল। ছেলে ভোলাতে মাতৃশোক ভুলে যেতে হয়। আর ছেলে একটু ভুললে, বাড়ি মাৎ-করা একটি পোড়া গন্ধে সচকিত হয়ে মনে পড়ে প্রতিভার, ওবেলার রান্নার পরিশ্রম বাঁচাতে এ বেলা নিভন্ত উনুনে একটু ছোলার ডাল চড়িয়ে এসেছিল। যাক সদ্গতি হয়ে গেল সে ডালের। নিভন্ত আগুনও সময় বুঝে প্রতিশোধ নেয়।

ডাল যাক্, কিন্তু ডাল চড়ানো ডেকচিটা পুড়ে গেলে তো চলবে না। এই সেদিন কিনেছে প্রতিভা চার-চারখানা পুরনো কাপড় দিয়ে।

ছেলে কোলে করেই ডেক্চি নামিয়ে রান্নাঘরে শিকল তুলে দিয়ে আবার এসে চিঠিখানার কাছেই বসল প্রতিভা। আবার একবার তুলে নিল হাতে। যেন আবার পড়লে অন্য কিছু আবিষ্কার করা যাবে। যেন সহসা দেখা যাবে, এতক্ষণ কি একটা ভুলই দেখেছিল প্রতিভা।

কিন্তু না, ভুলের অবকাশ কোথাও নেই।

প্রতিভার মা সত্যিই নেই। বর্ধমানের সেই বাড়িটায় ছুটে গিয়ে সর্বত্র অনুসন্ধান করে বেড়ালেও তাঁকে আর দেখতে পাবে না প্রতিভা। বাবা কোন শৈশবে মারা গেছেন, তাঁকে তো মনেই পড়ে না, মা ছিলেন তার সব।

তাহলে—এই হয়ে গেল!

প্রতিভার জীবনের সর্বপ্রথম শোক, আর সবচেয়ে প্রধান শোক, এমনি নিরুত্তাপ মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়ে গেল!

এরপর আবার এখুনি উঠতে হবে প্রতিভাকে, যখন ঝি আসবে, আর যখন ছাগল-দুধওলা আসবে। কথা কইতে হবে তাদের সঙ্গে। অন্ততঃ ঝিটাকে বলতেই হবে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে প্রতিভার জীবনে। নিজ মুখেই বলতে হবে। না বললে তো সহজ মানুষের মত ব্যবহার করতে হয়, তাহলে—পরে আবার ঝিটা বলবে কি? আর অতবড় ভয়ানক কথা শুনে নিশ্চয়ই ঝিটা আসবে প্রতিভার শোকে সহানুভূতি জানাতে। হয়তো বা সুযোগ পেয়ে অন্তরঙ্গতায় গলে গিয়ে মনিবানীর গায়ে মাথায় হাত বুলোতেই আসবে। অসহ্য। অসহ্য। তা ছাড়া—শক্তিপদ দেখবে, মা মরার খবর পাবার পরও প্রতিভা উঠেছে, হেঁটেছে ছেলেকে দুধ খাইয়েছে।

ছেলেটা কান্নার পর মায়ের কোল পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রতিভা গুম্ হয়ে বসে থাকে ঘুমন্ত ছেলে কোলে নিয়ে।

বেলা গড়িয়ে যায়···তিনটে বাজে, ছাগল-দুধওয়ালার ঘণ্টির আওয়াজ পাওয়া যায়।

স্থির সংকল্প করে উঠে পড়ে প্রতিভা।

হ্যাঁ, পিয়ন কখন এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে,—প্রতিভা জানে না! সে তো পিঁপড়ে-কামড়ানো ছেলের কান্না নিয়েই ব্যস্ত। সারাদিন কেঁদেছে ছেলে। কাজেই ঘরদোর জানলা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখবার ফুরসুতই পায় নি প্রতিভা। যার সাক্ষী—ছায়াছবির প্যাকেট খোলা হয় নি। জানলার নিচে ঠিক পিয়নের ফেলে দেওয়ার ভঙ্গিতে বইটা আর চিঠিটা রেখে দিয়ে উঠে পড়ে প্রতিভা, ছোট গ্লাসটা নিয়ে ছাগল দুধওলাকে দোর খুলে দিতে যায়। দুধ নিয়ে যথাস্থানে রেখে আবার একবার জিনিস দুটোর দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল, বইয়ের কাছে চিঠিটা নয়, তার চাইতে বইয়ের তলায় চাপা পড়ার ভঙ্গিতে থাক! আনাগোনার পথে একবারও নজরে পড়ে নি এটা কি সম্ভব? আর চিঠি দেখলেই তো ব্যস্ত হয়ে দেখা উচিত, কদিন ধরে যখন বর্ধমানের চিঠি আসে নি

বলে ভাবছে প্রতিভা ?

'ছায়াছবি ?' থাক্ না !

সেটা পড়ে আছে তো—আছেই। ছেলে যার সারাদিন কেঁদে পাগল করছে, তার কি আবার সিনেমার বই নিয়ে বসবার সময় হয় ?

প্রতিভার বাড়া ভাতটা রান্নাঘরে পড়েছিল বুঝি। ঝি এসে চেঁচাচ্ছে। তা কি করবে প্রতিভা ? সারাদিন মাথার যন্ত্রণায় যে মাথা তুলতে পারে নি সে। খাবে কি করে ? ও ভাত ঝি তার ছেলেদের জন্যে নিয়ে যাক্ !

যথারীতি উনুনে আগুন পড়ে। বিকেলের খাবার তৈরি সুরু হয় ! শক্তিপদ সাবধানে আস্ত আস্ত পটল ভাজা আর কুচো কুচো আলু ভাজা দিয়ে গরম লুচি। সেইটাই হোক। প্রতিভার তো আর কিছু হয় নি। প্রতিভা তো ঠিকই আছে।

বাড়ির দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল শক্তিপদ !

কান্নার আওয়াজ আসছে কি ?

কান খাড়া করে থাকতে থাকতে অকারণেই মনে হয় আসছে বুঝি। তারপর ভুল ভাঙে।··কি হল তবে ? উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে একা চলে যায় নি তো বর্ধমানে ? ··না, তাহলে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকবে কি করে ? কিন্তু এত নিস্তব্ধ কেন ? তবে কি মূর্ছা ?

কে জানে হয়তো—মূর্ছা হয়েই পড়ে আছে প্রতিভা, হয়তো খোকাটা পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছে। ছি ছি, সকালে কী অবিমৃষ্যকারিতাই করেছে শক্তিপদ !

আস্তে আস্তে কড়াটা একটু নাড়ল, তারপর একটু জোরে, তারপরে আরও জোরে।···এবারে দোর খুলে গেল। খোলার কর্ত্রী স্বয়ং প্রতিভা।

সহজ সাধারণ কণ্ঠে প্রশ্ন করছে—আজ এত দেরি হল যে ?

দেরি !

হ্যাঁ দেরি একটু হয়েছিল শক্তিপদর, বাড়ি ঢোকবার সাহস সঞ্চয় করতে।

কি যে উত্তর দেয় শক্তিপদ, নিজেই বুঝতে পারে না, কিন্তু ততক্ষণে প্রতিভা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

—আজ যা কাণ্ড হয়েছে জান ? তুমিও বেরোলে আমিও রান্নাঘর থেকে আসছি,—দোরটা বন্ধ করব বলে, ঠিক সেই সময় খোকনটা হঠাৎ পরিত্রাহি চীৎকার। ছুটে আসি—কি হল ? কি হল ? ওমা, দেখি না—মোক্ষম একটি কাঠপিঁপড়ে একেবারে কামড়ে ধরেছে, পায়ের আঙুলে। টেনে ছাড়াতে পারি না। একটু রক্তই বেরিয়ে গেল ! সেই থেকে কি যে কান্না ধরল ছেলে ! সারা-দিনে বিরাম নেই। অস্থির হয়ে গেলাম একেবারে। দেখ না সংসারের দিকে তাকিয়ে, ঘরে দোরে ঝাড়ু পড়ে নি, নিজের চুল বাঁধা হয় নি, নাস্তানাবুদ কাণ্ড ! —এই এতক্ষণে একটু খেলছেন বাবু !

দিশেহারা শক্তিপদর দৃষ্টি অবশ্য খোকার দিকে নেই। দালানের জানলার নিচে আঠার মত আট্‌কে আছে সে দৃষ্টি! শক্তিপদর কৌশল তাহলে ব্যর্থ?

এখনও পড়ে আছে ওটা? ঠিক একই অবস্থায়?

কিন্তু ও তো শুধু বই, চিঠি কই?

চিঠি কই, সে অনুসন্ধান এখন করা চলে না। আচমকা দেখে ফেলে কুড়িয়ে নেবার ছলেও না। এখন খোকার পিঁপড়ে-কামড়-রূপ মহা-অনর্থপাতের প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে। কাজে কাজেই খোকনকে কোলে নিতে হল, নিতে হল তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে। কারণ গরম লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছে প্রতিভা। বলেছে বেশি করে না খেলে রক্ষে রাখবে না!

তারপর অন্যমনস্কচিত্তে এসে কুড়িয়ে নিয়ে দেখা, পিয়নটা কোন্ ফাঁকে কি ফেলে গেছে। অবশ্য প্রতিভা যখন চোখের আড়ালে।

কিন্তু চিঠি কই?

চিঠির জন্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বইটা তুলতেই চিঠিটার খোঁজ মিলল।

আশ্চর্য! নিজে হাতে করে উপরে রেখে গেছে—শক্তিপদ। কারোর তো হাত পড়ে নি, তবে এটা বইয়ের তলায় আশ্রয় পেল কি করে? আর কার্ডের কোণে এটা কি?—স্পষ্ট এই দাগটা?

গবেষণা করবার জন্য আর সময় ক্ষেপণ করা চলে না।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ে স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করতে হয় শক্তিপদকে—ওগো শুনছো! এ কী ব্যাপার? কী মাথামুণ্ডু লিখেছেন তোমার কাকা?

শুনে প্রতিভা এসে দাঁড়ায়, সরল মুখ, মন্থর গতি। সাধারণ কৌতূহল প্রশ্ন—চিঠি এসেছে বর্ধমানের? কাকা লিখেছেন? হঠাৎ কাকার এত অনুগ্রহ। কই কি লিখেছেন? ওকি অমন চুপ করে রয়েছ কেন? বল না কি লিখেছেন? ওগো?

যেন প্রতিভা ভুলে গেছে, সে নিরক্ষর নয়।

মাটিতে বসে পড়ে, মাথায় হাত দিয়ে শক্তিপদ হাপ্‌সে বলে—যা লিখেছেন, তা যে বিশ্বাস করতে পারছি না! অ্যাঁ! একি সম্ভব!

প্রতিভা বিচলিতভাবে মাটিতে বসে পড়ে কাতর আর্তনাদ করে ওঠে—স্পষ্ট করে বল না গো কি হয়েছে? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! আমার মার কিছু হল নাকি গো?

শক্তিপদ বিষাদাচ্ছন্ন গলায় বলে—হ্যাঁ প্রতিভা, মা—আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন!

শিশু পাঁজরগুলো কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে শক্তিপদর।

আর বুক-ফাটানো চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে কেঁদে ওঠে প্রতিভা—ওগো, কী কথা শোনালে গো। এ তুমি কী শোনালে আমাকে? বিনা মেঘে এ কী

বজ্রাঘাত ?

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই—মূর্ছায় এলিয়ে পড়ে প্রতিভা। কিন্তু না পড়বে কেন ? সমস্তটা দিন তো মূর্ছাহত হয়েই ছিল সে। এদিকে কুঁজোর ঠাণ্ডা জল ওর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে দিতে ক্রমাগতই ভাবে. থাকে শক্তিপদ—আচ্ছা, চিঠিটার স্থান পরিবর্তন হল কি ভাবে ? আর চিঠির কোণে অত স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে কেন একটা হলুদমাখা বুড়ো আঙুলের ছাপ !

[১৩৬৩]

বয়ঃসন্ধি

সাদা রিবনের আলগা ফাঁসে জড়ানো ফাঁপানো চুল উড়িয়ে, আর পাঁচ থাকের মিল দেওয়া সাদা অর্গ্যাণ্ডির ফ্রক উড়িয়ে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল মিষ্টি। স্কুল-ফেরৎ ঘাম ঘাম মুখে সকালের রোদের ঔজ্জ্বল্য।

—মা মা, আমাদের স্কুলে আজ কি হল জান ?

মন্দিরা মেয়ের কবল মুক্ত হতে হতে হেসে ফেলে বলে—জানব আর কি করে, জানবার আগেই তো 'লৌহভীম চূর্ণ' হয়ে যাচ্ছে।

মন্দিরার পরিচ্ছদেও সাদার একাধিপত্য। তুলির আঁচড়ের মত সরু একটু কালো বর্ডারও রাখেনি মন্দিরা পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তসীমায়। নির্মম হস্তে নির্মূল করে ফেলেছে সবটুকু। মেয়ের মতই বকের পালকের মত সাদা আবরণে মণ্ডিত সে। কিন্তু মুখের হাসিতে নেই সে শুভ্রতা- সে ঔজ্জ্বল্য।

আনন্দের হাসি, তবু মলিন।

বিষাদ-ম্লান একটি ছায়া যেন ঠোঁটের গঠনভঙ্গির উপর একটি স্থায়ী রেখাপাত করে রেখেছে। সমস্ত হাসি আর কথার উপর সেই বিষণ্ণ বিধুর ছায়া। এ ছায়া দেখা অভ্যাস হয়ে গেছে মিষ্টির। সে মাকে ছেড়ে দিয়ে একটা টুলের উপর বসে পড়ে পা দোলাতে দোলাতে বলে—এক নম্বর হচ্ছে মুটকী দিদিমনি—আজ একেবারে—হি হি হি—পা পিছলে আলুর দম ! হি হি হি !

ওর বলার ধরনে মন্দিরারও যে হাসি পাচ্ছিল না তা নয়, তবু গম্ভীর মুখে বলে—মিষ্টি, ফের ? ফের তুমি দিদিমনিদের বিষয় এ ভাবে—

মিষ্টি 'বেচারী বেচারী' গলায় বলে—বাঃ আমি কি করব ? উনি শুধু শুধু জুতো স্লিপ করে পড়ে গেলেন কেন বড়দিদিমনির জলের কুঁজোর ওপর ? মেয়েরা আড়ালে ওঁকে মুটকী দিদিমনি বলে ডাকে বলে লাগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন কেন বড়দিদিমনিকে ? ঠিক হয়েছে—আচ্ছা হয়েছে !

বাঁধ ভাঙা হাসিতে নিজেই ভেঙে পড়ে মিষ্টি !

এই নিয়ে এত হাসি ! এই ওর ঘোরালো করে বলার মত কাণ্ড ! কিন্তু এত চাপল্য তো ভাল নয় !

এত ছেলেমানুষি কেন এখনও ?

কথাটা ভাবতে চেষ্টা করে মন্দিরা, সব সময় করে। কিন্তু উড়ন্ত প্রজাপতির

মত হালকা এই মেয়েটাকে শাসন করার কথা ভাবাই যায় না, এটা ভাল নয়, ওটা ভাল দেখায় না, এ বোধের বালাই মাত্র যার নাই, তাকে কিই বা বলবে? অথচ বাড়ন্ত গড়নের গুণে বয়সের চাইতে বড় বৈ ছোট দেখায় না মিষ্টিকে।

মেয়ের হাসিতে যোগ না দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে থাকবার চেষ্টা করে মন্দিরা। সেইটুকুই শাসন। অতএব একটু প্রকৃতিস্থ হতেই হয় অপরাধিনীকে।

মন্দিরা এবারে বলে—এটা তো এক নম্বর! দু নম্বরটা কি?

মিষ্টি এবারে অবহিত হয়ে বলে—ওঃ হো হো! হ্যাঁ—হয়েছে কি মা, একটা লোক কি জন্যে যেন কেরাণীবাবুর কাছে এসে বসেছিল, আর আমরা তখন মাইনে দিতে গেছি। ওমা, লোকটা বোকার মত খালি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে! আছে তো আছেই। আমার এত হাসি পাচ্ছে, কিন্তু হাসতে তো আর পারি না। খালি অন্য দিকে তাকাচ্ছি, আবার একটু একটু দেখছি চোখ পিটপিটিয়ে, আরে, ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে আছে!

মন্দিরা এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ-পরিবেশনের বাহারে একবার চমকেই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল মেয়ের মুখের দিকে। কি এ? সারল্য? না ছলনা?

নাঃ, একেবারে নির্মল সুন্দর ভোরের আলো।

এই মেয়েকে সে বড় হওয়ার অপরাধে শাসন করতে চায়? মেয়ে থামতে নিতান্ত সহজ ভঙ্গিতে বলে—ওমা! কেন? কিরকম লোক?

সহজ ভঙ্গিটা অবশ্য খুব সহজ নয়, চেষ্টাকৃত।

—লোক আবার কি রকম? মিষ্টি অগ্রাহ্য ভরে বলে—লোকের মতন, আবার কি? সাদা পাঞ্জাবি পরা সাদা ধুতি পরা।

ধুতি পাঞ্জাবি! তাহলে বুড়ো হওয়াই সম্ভব।

মন্দিরা ঈষৎ আশ্বস্ত স্বরে বলে—মানে কত বড় তাই বলছি। বুড়ো?

—ওমা বুড়ো কেন হবে? মিষ্টি আবার হাসিতে ভেঙে পড়ে—বুড়ো হতে যাবে কি দুঃখে? আহা! কি সুন্দর কালো কুচকুচে চুল! কেমন ফরসা। খুব ভাল দেখতে।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে মন্দিরার। তাড়াতাড়ি বলে—ওঃ তাই বুঝি! যাকগে এখন মুখ-টুখ ধো! খাবার দেরি হয়ে যাবে।

—যাক গে আমার খিদেই পায় নি। এত টিফিন দাও, উঃ! পেট ভরেই থাকে! আসল কথাই শুনলে না। সব মেয়ে চলে গেলে লোকটা আমাকে ডাকল—

মন্দিরা এবার ঈষৎ কঠিন সুরে বলে—সব মেয়েরা চলে গেলেও তুমি রইলে কেন?

—বাঃ আমি যে ঠেলাঠেলি করতে পারি না।

—পারা উচিত! ঠেলাঠেলি করে নিজের কাজ না পারলেই শেষ পড়ে থাকতে হয়।

—হোক গে বাবা! মিষ্টি আর একবার 'রিবনের বো' দুলিয়ে বলে—কি হল তাই শোনই না। আমাকে ডেকে বলল—তোমার নাম কি! আমি বলে

দিলাম মিষ্টি রায়, তখন ও আস্তে আস্তে বলল কি মিষ্টি! মিষ্টি! বৃষ্টি মিষ্টি !…আমার তো হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছে। কবিতা যেন। তারপর আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করল। যখন আমি বললাম স্বর্গত শ্রী—

মন্দিরা বাধা দিয়ে বলে—আচ্ছা তুমি কি বললে তা জানি। সে কী বলল শুনি ?

—সে ? সে চমকে উঠে বলল, এ্যাঁ ! মারা গেছেন ? তারপর আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল।

—বললি ?

—বলব না ? বাঃ !

—বলেছিস বেশ করেছিস ! এখন স্কুলের পোশাক-টোশাক ছাড়। এ প্রসঙ্গের উপর যবনিকা পাত করে দেয় মন্দিরা।

বেশী কৌতূহলই অপরের সন্দেহের জনক। কিন্তু মনে মনে এক অদ্ভুত অস্বস্তি। কে লোকটা ? সমরেশকে চিনত বোঝা যাচ্ছে। মিণ্টির দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল কেন ? বাপের চেহারার তো লেশমাত্র মিল নেই মেয়ের, বরং সকলেই বলে সে নাকি অবিকল মায়ের প্রতিমূর্তি। তবে কি মন্দিরারই চেনা ? কে তাহলে ? মিষ্টি বৃষ্টি ! অকারণ এ দুটো শব্দ একত্রে উচ্চারণ করেছে কেন ? একি শুধুই ছন্দের খেয়াল ? না—'বৃষ্টি' নামধারিণী এক কিশোরীকে যে চিনত সে ?…না, 'বৃষ্টি' নামের মেয়ে নয়, তার নিজেরই দেওয়া নাম ! সেই এক এলোমেলো বৃষ্টির দিনে—যে মেয়েটা—

দূর তাই কখনও হয় ? সে এখানে কোথা থেকে ? অসম্ভব !

ভাবব না মরুক গে ! বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও, ভাবনাকে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারে না মন্দিরা, সে নিজের পদ্ধতিতে বেড়েই চলে।

আর—আর বোধ করি লোকটা কে, জানবার ইচ্ছায় মন্দিরার ইচ্ছাশক্তির জোরেই লোকটা পরদিন বিকেলে মন্দিরার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায় !

আবার তেমনি করে চুল উড়িয়ে ছুটে আসে মিষ্টি—মা, মা, কালকের সেই লোকটা !

—অদ্ভুত সাদৃশ্য !

মন্দিরা কৃশমুখে ঈষৎ হেসে বলে—হ্যাঁ সবাই বলে বটে, ও ঠিক আমার মত দেখতে হয়েছে।

—সবাই বলে ? সুকান্ত ওর রোগা ফরসা মুখটার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি ফেলে বলে—কারা বলে ?

—কেন, যে দেখে ওকে আর আমাকে !

—যারা তোমায় শুধু এখন দেখছে, যারা তোমায় তখন দেখে নি তারাও ?

—তা জানি না। হেসে ফেলে বলে—কে কখন থেকে দেখা সুরু করেছে, তার সাল তারিখ তো লিখে রাখি না ?

—আমার কিন্তু লেখা আছে। সাল তারিখ ঘণ্টা মিনিট !

—ভাল ! পরীক্ষায় ফুল মার্ক পাবে।

মুখের সেই চিরস্থায়ী বিষণ্ণ বিধুর ছায়াটা কি ফিকে হয়ে গেছে মন্দিরার ? মেঘমুক্ত সূর্যের মত হাসিটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেন ?

—ওকে দেখেই আমি তোমাকে আবিষ্কার করতে পারলাম !

—খুঁজে বেড়াচ্ছিলে নাকি ?

—অতটা বললে সত্যের অপলাপ হবে, তবে আবিষ্কার করে বড় ভাল লাগল বৃষ্টি !

বৃষ্টি।

মন্দিরা ভীরু নয়, তবু বুকটা ওর একটু কেঁপে উঠল বৈ কি। আর মনে হল, মেয়েটা কী অদ্ভুত ছটপটে, কোথায় যে উধাও হয়ে গেল।

আবার আগের মত নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুকান্ত মন্দিরার আনত মুখের উপরে আঁকা সরু সিঁথির অস্বাভাবিক শুভ্রতার দিকে। যেন ও গবেষণা করছে কুমারীর সিঁথির চাইতে বিধবার সিঁথি কি বেশী সাদা ? তা নইলে এমন প্রখর হয়ে চোখে ঠেকে কেন !

—আমার মেয়ের ভাষায় বলি—মন্দিরা মৃদু হেসে বলে—বোকার মত কী দেখছ হাঁ করে ?

বিহ্বলভাব সরে যায়, আত্মস্থ হয়ে ওঠে সুকান্ত। তাই সেও মৃদু হেসে বলে—ভাবছি কি হতচ্ছাড়া দেশেই জন্মেছ। অন্য দেশে তোমার মত এমন একটি সুন্দরী, ধনী বিধবা কত লোভনীয়।

—আচ্ছা থাক যথেষ্ট হয়েছে ! বাচনভঙ্গীটি ঠিক তেমনি আছে দেখছি !—

—না থাকবে কেন ? সবাই তো তোমার মত বদলায় না !

—তা মানুষ তো আর স্টিল ফটো নয় ?

—তা বটে !

—যাক, অনেক বাজে কথা হয়েছে—এবার পারিবারিক খবরাখবর শুনি ?

—আমার কাছে ওইগুলোই বাজে।

মন্দিরা হেসে ফেলে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় আবার মিষ্টি ছুটে এল উদ্দাম ভঙ্গিতে। এসেই মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দুজনকে, যাকে বলে অবলোকন, তাই করেই বলে ওঠে—মা একটা কুকুরছানা কিনবে ?

—কুকুরছানা !

—হ্যাঁ হ্যাঁ কুকুরছানা ! সুন্দর দেখতে, কী লোম ! পুতুলের মত চোখ !

—কোথায় সে ?

—ওই তো বাইরে ! চল না মা কিনবে !

মন্দিরা সুকান্তর দিকে ফিরে বলে—দেখছ ?

সুকান্ত জবাব দেয়—শুধু দেখছি না, দেখে অবাক হচ্ছি। মনে হচ্ছে তোমার ছেলেবেলাটাই ফের দেখছি।

মিষ্টি ঈষৎ সন্দিগ্ধ ভাবে বলে—কি বলছেন ?

—কিছু না। কিন্তু কুকুরছানার বিক্রেতা কে ?

—ওই ওখানের লালবাড়িটার চাকর ! ওদের কুকুরের বাচ্ছা হয়েছে—চল

না মা!

—মিষ্টি! কী ছেলেমানুষী হচ্ছে!

সুকান্ত বলে—ছেলেমানুষ কি বুড়োমানুষি করবে? চল তো দেখি, কেমন কুকুরছানা তোমার?

ব্যাগ! খানিক পরেই সগৌরবে সদ্যক্রীত মালটি সজোরে বুকে চেপে মিষ্টির আবির্ভাব—মা, সুকান্তমামা তোমার চাইতে হাজার হাজার গুণ ভাল। বুঝলে? চিরকালের মত ভাব হয়ে গেছে আমার সঙ্গে।

—সুকান্তমামা! এটা আবাব কখন হল?

—একটু আগেই! না ডাকলে কথা কইব কি করে? সুকান্তমামা, আপনি রোজ আসবেন!

সস্নেহ দৃষ্টিতে ওর উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সুকান্ত,··· সেইদিকে তাকিয়ে দেখে মন্দিরা। হঠাৎ কেমন বিরক্তি ধরে ওর। মনে হয় ওর ওই দৃষ্টি দিয়ে যেন বড্ড বেশী গদগদ ভাব ঝরে পড়ছে। মনে হয় মিষ্টির খুকীপনা যেন মাত্রা ছাড়াচ্ছে।

মনের এই বিরক্তি ঝঙ্কার হয়ে বেজে ওঠে—হ্যাঁ! ওঁর তো কোন কাজ নেই, রোজ আসবেন তোমায় কুকুরছানা কিনে দিতে।

কিন্তু ওর এই বিরক্তির ক্ষীণমেঘ হাসির ঝড়ে উড়িয়ে দেয় সুকান্ত—ও হো হো! তোমার বুঝি এখনও সেই কুকুরে ভয় আছে? এইখানে দেখছি মেয়ের সঙ্গে তোমার বদল আছে! বুঝলে মিষ্টি তোমার এই মা'টির ছেলেবেলায় কী ভয়ই ছিল!···একদিন—আচ্ছা আর একদিন সে গল্প হবে, আজ উঠি। ···চললাম বৃষ্টি!

একটুখানি স্মিত হাসি! একটু বঙ্কগভীর দৃষ্টি!···ভুলে একবার পুরনো নামে ডেকে ফেলা! বৃষ্টি!

মিষ্টি থমকে তাকায়—মাকে আপনি 'বৃষ্টি' বললেন?

সুকান্ত বোধ করি এক সেকেণ্ডের জন্য, থতমত খায়, তারপর হেসে বলে—তবে আবার কি? মিষ্টির মা বৃষ্টি হবে না তো কি পুঁটুরাণী হবে?

মিষ্টিরই জয়!

সত্যই প্রায় প্রতিদিন আসতে সুরু করেছে সুকান্ত! এ যেন এক নতুন নেশায় পেয়েছে ওকে! ছেলেবেলায় মন্দিরার সঙ্গে সত্যই যে ভয়ানক একটা কিছু প্রেমে পড়াপড়ি হয়েছিল তা নয়, কৈশোরের চাপল্য, আর অভিভাবকদের অসাবধানতার যোগাযোগে একটু মেশামেশি। একটু মাখামাখি, তারপর কে কোনদিকে ছিটকে গেল। সেই ছিটকে যাওয়ার জন্যে বিরহে জীর্ণও হল না দুজনের কেউ! সুকান্ত যে আজও অবিবাহিত, সে শুধু সুবিধের অভাবে, আর কিছু না। তথাপি এতদিন পরে সেই বাল্যবান্ধবীকে এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে আর বেওয়ারিশ অবস্থায় আবিষ্কার করে সুকান্ত যেন স্থান কাল ভুলতে বসেছে। এক নিরভিভাবক বিধবার গৃহে প্রতিদিন হাজরে দেওয়ার মধ্যে যে

একটা শোভন অশোভনতার প্রশ্ন আছে। তাও কি মনে পড়ে না সুকান্তর ?

হয়তো পড়ে।

তাই অশোভন ব্যাপারকে শোভন করতে, মিষ্টিকে নিয়েই তার মাতামাতি। উপঢৌকনে মিষ্টির ঘর-সংসার ভরে গেল!

মন্দিরার সমস্ত আপত্তি নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মিষ্টি বড় দুর্দান্ত মেয়ে! শুধু খেলনা পুতুল হলেই চলবে না, আস্ত মানুষটাকেই ওর চাই। দুমিনিট বসে গল্প করতে দিতে রাজী নয়। "সুকান্তমামা কুকুরকে বগলস পরিয়ে দিন,…সুকান্তমামা লাটাইয়ে কষে সুতো জড়িয়ে দিন, সুকান্তমামা আসুন ট্রেড খেলি! দেখবেন কি রকম হারিয়ে দেব।"

সুকান্ত মনে মনে বিপন্ন বোধ করলেও, ভালও লাগে তার এই অবোধ সারল্য! কিন্তু একসময় তো উঠতে হয়? একসময় তো যেতে হয়? তখন মনটা হায় হায় করে ওঠে। কী এক অতৃপ্ত বাসনায় পেয়ে বসে। কত কথা বলতে ইচ্ছে থাকে, কত গল্প অসমাপ্ত থেকে যায়, সমস্ত কিছুর উপর যবনিকা পাত করে বলতে হয়—আচ্ছা যাই তাহলে? চললাম মিষ্টিবাবু!

অবিশ্যি বাসনা কি আর প্রেম-নিবেদনের? না আলাপ-আলোচনাই মারাত্মক কিছু? কিছুই না, হয়তো পুরনো কালের রোমন্থন! হয়তো শুধুই সাময়িক কথা। তবু টানটা নেশার মত।

যদি মন্দিরার সৌভাগ্যের দিনে, সমারোহের দিনে, এই জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত ছন্নছাড়া লোকটা এসে এ সংসারে দেখা দিত হয়তো তার ভাগ্যে জুটত অবজ্ঞা অবহেলা। কিন্তু এখন তার জন্য থাকে প্রত্যাশা, থাকে অভ্যর্থনা। এখন মন্দিরার সৌভাগ্যের সূর্য অস্ত গেছে, শেষ হয়ে গেছে সমস্ত সম্ভাবনা, এখন তার নিঃসঙ্গ জীবনের অগাধ অবসর-ক্ষণের জন্য বরং এমনি একটা সঙ্গীই ভাল, যার নিজের বলতে গর্ব করবার কিছু নেই। যে ব্যক্তি বলবে না "তোমার কথা রাখ, আমার কথা শোন।"

ঘুম ভাঙায় সকাল থেকেই মনটা যে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। এ কি নিজের কাছে নিজেরই ধরা পড়ে না মন্দিরার? পড়ে বৈ কি। তবু মনকে প্রবোধ দেয় সে থাকলইবা! ছেলেবেলার বন্ধু তো! ধরো যদি তার নিঃসঙ্গতার দুঃখ লাঘব করতে ছেলেবেলার কোন বান্ধবীই আসত তাহলে কি আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকত না মন্দিরা? নিশ্চয়ই থাকত। শুধু অসহনীয় অবসর কালকে একটু সহনীয় করে তোলা এই তো। এতে কি এত অপরাধ?

কিন্তু সেই গল্প করার সুখটুকু থেকে বঞ্চিত করতে চায় মিষ্টি? কেন এত প্রতিবন্ধকতা করে?

ওর ওই অর্থহীন আবদার আর আদুরেপনার বাড়াবাড়ি দেখে এক এক সময় চোখ জ্বলে ওঠে মন্দিরার, দুরন্ত এক সন্দেহ যেন ভূতের মত ঘাড়ে চেপে বসে। ও যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পায় মিষ্টি তার একান্ত অনুগত লোকটার উপর ষোলো আনা আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। যেন হিংস্র

একটা ক্ষুধায় যার কাছ থেকে কেড়ে রাখতে চায় লোকটাকে !

যখন ভাবে তখন মাথার রক্তে আগুন ধরে ওঠে। মনে আনতে চেষ্টা করে নিজের বারো বছর বয়সের কথা !

বারো বছর বয়েসটা কি নিতান্তই তুচ্ছ করবার মত ?

তার যখন 'বৃষ্টি' নামকরণ হয়েছিল, সেই এক ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায়—তখন কত বয়েস ছিল মন্দিরার ? তখনও সে ফ্রক পরে বেড়াত না ? সন্দেহের বিষ-সর্প থেকে ছোবল হানে। কিন্তু রাত্রে যখন বিছানার এক পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে থাকে মিষ্টি, একটি ছোট্ট শিশুর মত, চুলগুলো ঝুমঝুমিয়ে ছড়িয়ে থাকে কপালে গালে বালিশে, তখন এক ঘরে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে মন্দিরা। নিজের উপর নিজের ধিক্কার আসে।

কিন্তু সময় কালে আবার মন বদলে যায়।

আবার মেয়ের উপর বিবক্তিতে তিক্ত হয়ে ওঠে সে ! তখন সুকান্তকে পর্যন্ত বিষ লাগে।

কিন্তু কেন ?

শুধুই কি মেয়ের চাপল্যে বিরক্তি ? না আশাভঙ্গের জ্বালা ?

যথারীতি আজও নিচের তলায়, মিষ্টির পড়ার ঘরে হৈ চৈ উঠল !

অর্থাৎ আবির্ভাব হয়েছে সুকান্তমামার।

নিশ্চয় কোন নতুন খেলনা এসে আসর জমকেছে। তাই স্ফূর্তির ঘোষণা এমন উদ্দাম হয়ে উঠেছে ! "এই আসে এই আসে" করে অধীর হয়ে উঠল মন্দিরা।

নিজে থেকে নেমে গিয়ে দেখতেও লজ্জা করে, অথচ প্রতীক্ষা অসহনীয়। এমনি মনের অবস্থায় সহসা চাবুকের ঘায়ের মত মাথার মধ্যে চড়াৎ করে ওঠে নতুন এক সন্দেহ।

শুধু কি মিষ্টি ?

আর সুকান্ত ?

এতদিন শুধু কুটিল সন্দেহে বারো বছর বয়েসটার দিকেই ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখছিল সে, কিন্তু বত্রিশ বছর বয়েসটাকেই বা অগ্রাহ্য করেছে কোন্ বুদ্ধিতে ? কেন তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে নি এবাড়িতে সুকান্তর আকর্ষণ-রজ্জু কে ? তার বদলে কি না নিজেকে ? ছি ছি ছি ! লজ্জায় ঘৃণায় সারা দেহ মন শুধু ছি ছি করতে থাকে !

কেন নয় ?

অবিবাহিত, সংসারানভিজ্ঞ অপরিণত-মন লোকটা আজও তো মন্দিরার সেই কিশোরী মূর্তির ধ্যান করছিল বসে বসে। সে মূর্তি যদি তার আত্মজার মধ্যেই আবিষ্কার করে থাকে, কেন নয় তবে ? প্রথম দিনের ঘটনা থেকে একে

একে সমস্ত দিনগুলোর ঘটনা মনে আনতে চেষ্টা করে মন্দিরা, আর দৃঢ় প্রত্যয়ের তীব্র জ্বালায় জ্বলতে থাকে।

কিছু পরেই বীরবিক্রমে উপরে উঠে আসে মিষ্টি, প্রত্যেক সিঁড়ির ধাপে ধাপে সশব্দ পদক্ষেপ ফেলে। আর এসেই মন্দিরার গায়ে সড়াৎ করে বিরাটকায় একটা সাপ ছেড়ে দিয়ে হি হি করে হেসে ওঠে।

চমকে উঠেই গম্ভীর হয়ে যায় মন্দিরা। একটি কথা বলে না।

সুকান্ত সেই রবারের গোখরোটাকে কুড়িয়ে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সহাস্যে বলে—কি রকম? দেখে বুঝতে পারছ আসল কি নকল?

—না। পারছি না! আসল নকল বোঝবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেন নি। বলে ঘরের মধ্যে চলে যায় মন্দিরা। গিয়েই শুয়ে পড়ে খাটের উপর। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে সুকান্ত, আর মিষ্টি কাছে এসে মার খাটের একপ্রান্তে বসে করুণ বচনে বলে—মা তোমার মাথা ধরেছে? কপালে অডিকোলন দিয়ে দেব?

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুকান্তও ঘরে এসে হাজির। কি হয়েছে মন্দিরা? মাথা ধরেছে? সারিডন খাবে? নয়তো এনাসিন ট্যাবলেট? মিষ্টি তোমাদের বাড়িতে হাত পাখা নেই?

মিষ্টি নিথর বসে থেকে নীরবে ঘাড় নাড়ে।

—আহা খুঁজেই দেখ না? রান্নাঘরে-টরে?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে যায় মিষ্টি, আর মিনিট খানেক পরেই এসে স্বচ্ছন্দে বলে—কোথ্থাও নেই।

সেই মাত্র অসমসাহসিকতায় সুকান্ত মন্দিরার কপালের উপর একটা হাত রেখে পরীক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিল—শুধু মাথাধরা, না জ্বর! আর সেই মুহূর্তে সে হাত ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল মন্দিরা।

সুকান্ত উঠে যাবার পর মা মেয়েকে নিয়ে পড়লেন।

—সুকান্তমামার সঙ্গে অত হৈ হৈ কর কেন? কঠিন স্বর মন্দিরার।

—সুকান্তমামা যে ক্ষ্যাপান।

—ক্ষ্যাপালেই তুমি ক্ষেপবে? তুমি এখন বড় হচ্ছ, ওরকম করতে হয় না। বুঝলে? এখন তুমি খুব ছোট নেই মনে রাখবে একথা!

মিষ্টি ম্লানভাবে মাথা কাৎ করে।

ছলকে ওঠে মাতৃস্নেহ।

একটু নরম গলায় বলে মন্দিরা—সুকান্তমামাও এমন কিছু ভাল লোক নয়।

কেন বলে? মেয়ের মন ফিরিয়ে আনতে চায়?

মিষ্টি বিস্ফারিত নেত্রে বলে—ভাল লোক নয়?

—না! মন্দিরা নির্লিপ্ত কঠিন গলায় বলে—ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল, বাজে মার্কা ছেলে বলে আমার বাবা দেন নি বিয়ে।

হ্যাঁ মোক্ষম দাওয়াই !

নিজের বুদ্ধিতে নিজেই পুলকিত হয়ে ওঠে মন্দিরা। মায়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল শুনলে, মন আপনিই বিতৃষ্ণায় গুটিয়ে আসবে। অবশ্য অবোধ মিষ্টির মুখের চেহারায় নিজের বুদ্ধিকৌশলের প্রতিক্রিয়া দেখতে পায় না মন্দিরা। অবোধ মুখে 'ফ্যালফেলে' চাহনি মেলে মিষ্টি বলে—তবে তুমি অত গল্প কর কেন ?

আরক্তিম মুখকে সহজ করবার ভান করতে করতে মন্দিরা বলে—ওমা ! যতই হোক ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে তো ? বাড়িতে আসে তাড়িয়ে দিতে তো পারি না ?

মাতা-কন্যার কথায় ছেদ পড়ে।

আবার ফিরে এসেছে সুকান্ত। এ বাড়িতে ওর অবারিত দ্বার হয়ে গেছে এখন। চাকর-বাকর ফিরেও দেখে না।

- এনাসিন ট্যাবলেট দুটো এনেই রাখলাম, বুঝলে ? কি জানি রাত্রে যদি আবার—মিষ্টি, নিচে তোমায় কে ডাকছে।

—আমায় ? আমায় আবার কে ডাকবে ?

—আহা ওই যে তোমার সেই বান্ধবীর বাড়ির চাকর না ঠাকুর। যে বই আনে কেবল।

অগত্যাই উঠে যেতে হয় মিষ্টিকে।

অনিচ্ছা-মন্থর গতিতে।

রোগশয্যা !

এ জিনিসটা তো মন্দ নয়। সামাজিক রীতি-নীতি কিছুটা লঙ্ঘন করা চলে এতে। যে লোকটার সঙ্গে কেবলমাত্র ড্রইংরুমের গল্প ছাড়া আর কিছু সম্ভব হয় না, এখানে তাকে বলা যায়,—"বোস না বিছানার কাছে ওই চেয়ারটায়।"

এটুকুতে চোখ দেবে, এমন গার্জেন কেউ নেই মন্দিরার !

তাছাড়া এই তো সুবিধে, সন্দেহজনক ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করবার। ও ভিতরে ভিতরে ছটফট করে কি না, উঠে চলে গিয়ে খেলায় মাততে চায় কি না, অদৃশ্য কোন রজ্জুতে আর কেউ ওকে আকর্ষিত করছে কি না, এখানে থেকে দেখা সহজ !

হ্যাঁ, রোগশয্যায় শুয়ে অনেক সুবিধে হয়েছে মন্দিরার !

জ্বর জ্বালা না হোক, মাথার অসুখই কি কম অসুখ ? সুবিধে হয়েছে, এতে মিষ্টির খুকীপনাও একটু কমেছে। সুকান্তমামাকে ডাক হাঁক করা দূরে থাক, তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

মন্দিরা বোঝে সেদিনের উপদেশে কাজ হয়েছে।

রোগশয্যা ভাল। কিন্তু হায় এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন ভাল কি আছে ? সমস্ত ভালর গায়ে লাগল কালির অবলেপন ! মন্দিরার সমস্ত ক্রুর সন্দেহ দেখা দিল নিশ্চিন্ত সত্যের নিষ্ঠুর মূর্তি নিয়ে !

রোগশয্যা আরামের, কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে পাহারা দেওয়া যায় না কোথায় কি ঘটছে! তাই—বুঝি সেই অক্ষমতার সুযোগে আপন কাঠামো প্রকাশ করে ফেলেছে সুকান্ত। আরক্ত মুখ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে মায়ের বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে মিষ্টি, কিছুতেই মুখ তুলবে না।

দুবার চারবার ভাল কথায় প্রশ্ন করেই কেমন একটা আতঙ্কে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। উঠে বসে জোর করে মেয়ের মাথাটা তুলে ধরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে মন্দিরা—কী হয়েছে কি?

অনেক কষ্টে উত্তর দেয় মিষ্টি—সুকান্ত মামা!

—সুকান্তমামা? সুকান্তমামা মানে? রুদ্ধশ্বাস বক্ষের প্রশ্ন।

—জানি না। সুকান্তমামা ছাই বিচ্ছিরী অসভ্য।

মেয়ের মাথাটা সজোরে নাড়া দিয়ে বাঘিনীর মত বলে মন্দিরা—মানে কি এ কথার? কী করেছে সুকান্তমামা?

কিন্তু আর একটি কথাও বার করা যায় না বারো বছরের মেয়েটির মুখ দিয়ে।—ও শুধু কাঁদতে থাকে।

যেন অনেক দিনের জমানো অশ্রুর সাগর উথলে উঠেছে।

আর শখের রোগশয্যা ছেড়ে উঠে পিঞ্জরের বাঘিনীর মত ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায় মন্দিরা। হয়তো বা হাতড়ে বেড়ায় ভাষার রাজ্যে কত কটুকাটব্য আছে।

যাক এ বাড়ির বরাত উঠলো সুকান্তর।

রূঢ় ভাষায় তাকে দূর করে দিয়েছে মন্দিরা। স্পষ্ট করে বলেছে, তার নিজেরই আগে বোঝা উচিত ছিল, যে জাত নাই দিলে মাথায় উঠে সুকান্ত সেই জাতের জীব। বলেছিল যথেষ্ট কটু কথা।

প্রথমটা বজ্রাহতের মত অবাক হয়ে গিয়েছিল সুকান্ত, তারপর ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছিল আত্মপক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা মাত্র না করে! না, সে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবারও প্রবৃত্তি হয় নি মন্দিরার। এ অসহনীয়, এ ক্ষমার অযোগ্য। সুকান্ত যদি মন্দিরাকে অপমান করত, তাতেও বরং কখনও ক্ষমার প্রশ্ন উঠতে পারত। এ অসম্ভব।

আচ্ছন্নের মত দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মা আর মেয়ে! বামুনঠাকুর বারবার ডাকার পর 'জবাব' পেয়ে চলে গেছে বিরক্ত হয়ে। অভুক্ত দুটি প্রাণী ঘুমোচ্ছিল যেন নেশার মত।···উঠে বসে হাত বাড়িয়ে বেডসুইচটা জ্বালল মন্দিরা। দেখল ঘুমন্ত পাউডার-মাখা দুই গালে চোখের জলের দাগ।

আহা ও বেচারীই কি কম কষ্ট পেয়েছে!

ছেলেমানুষ! না জানি কী ভয়াবহ নালিশ ছিল তার, যে কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারে নি।

ধীরে ধীরে মেয়ের মাথার উপর একটু স্নেহস্পর্শ রাখে মন্দিরা, আর সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের কোলে মুখ গুঁজে উথলে কেঁদে ওঠে মিণ্টি। আশ্চর্য! ওকি তাহলে জেগেছিল? না কি ঘুম-লোকের বিস্মৃতির মধ্যেও স্পষ্ট হয়েছিল তার গ্লানির স্মৃতি?

—মা, আমায় মার।

—মারব? তোকে মারব?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। মেরে মেরে শেষ করে ফেল আমাকে।—একেবারে মরে যাই আমি!

—ছি মিণ্টি! ওকথা বলতে নেই। তোর কি দোষ?

—আমারই তো সব দোষ! সুকান্তমামা কিছু করেন নি। সুকান্তমামা খুব ভাল খু-ব ভাল! ঠাকুরের মতন ভাল। আমি মিছিমিছি করে তোমার কাছে—

সর্পদষ্টের মত কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকে মন্দিরা, যেন ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা করে, কী বলছে মিণ্টি।

—মিছি মিছি করে!···

—হ্যাঁ! সব মিছে কথা! আমায় মার মা।

ছায়াছবির মত—চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বজ্রাহতের মত একখানি মুখ!···কী ছিল সে মুখে? বিস্ময়? আতঙ্ক? না ঘৃণা? আর্তনাদ করে ওঠার মত বলে ওঠে মন্দিরা—কেন এমন করলি?

—ও কেন—মার কোলের উপর মুখ ঘষতে থাকে মিণ্টি—ও কেন, তোমার দিকে অমন বিচ্ছিরি করে তাকায়? ও কেন তোমাকে 'বৃষ্টি' বলে ডাকে?—ও কেন—?

[১৩৬৩]

তুচ্ছ

কার্ডখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ সেটার দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলো অরুণিমা।

একটা গানের জলসা হবে কোথায় যেন, তারই নিমন্ত্রণ কার্ড এটা। যথারীতি—"আগামী অমুখ তারিখে"র বিজ্ঞপ্তির পর গায়ক গায়িকাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পর পর দু'টো নামের নীচেই অরুণিমা বসুর নাম।

অরুণিমা বসু!

ছাপার অক্ষরে নামটা যে এতো সুন্দর দেখতে লাগে এ কোনোদিন জানতো না অরুণিমা। এমনি দুর্ভাগ্য তা'র যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার ঠিক আগেই হয়ে গিয়েছিলো বিয়ে, আর শ্বশুরবাড়ি থেকে আপত্তি উঠলো পরীক্ষা দেওয়ায়। কাজেই ছাপার অক্ষরে নাম দেখতে পাবার সুযোগ আর এলো না জীবনে।

আবার ভাগ্যের বিড়ম্বনায় বিয়ের চিঠি, যাতে নেহাৎ সাধারণদেরও জীবনে একবারও নাম ছাপা হবার সৌভাগ্য ঘটে, সেই চিঠি ছাপতে দেবার সময় কিনা জ্যেঠামশাই প্রেসে গিয়ে ওর ভাল নামটা মনে আনতে না পেরে, "আমার মধ্যম ভ্রাতার কনিষ্ঠা কন্যা" বলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন!

হারাণচন্দ্র মিত্রের মধ্যম ভ্রাতার কনিষ্ঠা কন্যার বিয়েতে যারা নিমন্ত্রণ খেয়ে গেলো, তা'রা অরুণিমাকে নিয়ে মাথা ঘামালো না।

শ্বশুর বাড়ির এরা চিঠি ছাপায়নি। অবস্থা নেহাৎ মোটামুটি, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই নিমন্ত্রিতের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। কাজেই পোষ্টকার্ডে লাল কালিতে লিখে লিখে কাজ সেরেছিলো। এ পক্ষ ও পক্ষ একখানা পদ্য পর্যন্ত ছাপায়নি। অরুণিমাকে এই একটা জায়গায় যেন মস্ত একটা ফাঁকি দিয়েছিলো সবাই। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখা তাই অরুণিমার এই প্রথম।

কিন্তু নামটাই তো শেষ নয়, বরং সূচনা মাত্র। এ কী অদ্ভুত সৌভাগ্যের বার্তা বহন করে এনেছে ইঞ্চি কয়েক স্কোয়ার এই কার্ডটা! প্রকাশ্য সভায় বসে গান গাইবে অরুণিমা? নামকরা গায়কদের সঙ্গে এক লাইনে বসে! নিশ্চয়ই এক লাইনে বসতে দেবে, একই সঙ্গে নাম ছেপেছে যখন!

"উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে—হামেদ আলি"।

"যন্ত্র সঙ্গীতে—আবুল হোসেন"।

"রবীন্দ্র সঙ্গীতে—অরুণিমা বসু"।

"আধুনিক গানে—মৃণাল মুখোপাধ্যায়"।··যাক্‌গে মরুকগে, মৃণাল মুখোপাধ্যায় না হয়ে মৃণাল গড়গাড়ি হলেও কিছু এসে যেতো না অরুণিমার। "রবীন্দ্র সঙ্গীতে অরুণিমা বসু"—এর পরে আর কোনো কথা আছে নাকি? আর কোনো কথার কোনও অর্থ আছে? এইটাই তো সমস্ত চিত্ত উদ্বেল করে তুলতে যথেষ্ট! এ কি সত্য? এ কি স্বপ্ন? এ কি মায়া?

বান্ধবী সুরূপা সিংহ অরুণিমার পিঠের ওপর প্রকাণ্ড একটা থাবড়া মেরে বলে—কি রে ভোম্বল হয়ে গেলি কেন? কেমন অবাক করে দিলাম? হুঁ বাবা, আগে কিছুটি ভাঙিনি!

অরুণিমা মুখ তুলে কুণ্ঠিতহাস্যে বলে—কিন্তু ভাই, এ কেন করতে গেলি? আমি কি পারবো?

—কেন পারবি না?···বন্ধু আশ্বাস দেয়—বুঝতেই পারছিস জলসার ব্যাপার, এক একজনকে কতোই আর সময় দেওয়া যাবে? তিন ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টা তো হামেদ আলির কবলে যাবে। একটা গান গেয়ে দিলেই তোর কাজ মিটে যাবে।···সত্যি, আমার মনটা প্রায়ই খচ খচ করে—এতো চমৎকার মিষ্টি গলা তোর, অথচ কখনো কোথাও চান্স পাস না! এবারে এটার মধ্যে আমার কর্তার কিছু হাত ছিলো, তাই তোর নামটা সাজেষ্ট করলাম।

—তুইই শুধু বলিস গলা মিষ্টি। মিষ্টি গলার দাম আর কে দিল বল? —অরুণিমা করুণ হাসি হাসে—জীবনে কখনো এতোটুকুও শিখবার সুযোগ পেলাম না!···এই গান শেখবার জন্যেই বোধ হয় আমাকে মরে আবার

জন্মাতে হবে।

সুরূপা চোখ বড়ো করে বলে—ও বাবা, একেবারে ফিলজফি! নে তামাসা রাখ, যা বলি শোন, ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছিবি কিন্তু? বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদের এই একটি মস্ত গুণ আছে কিনা, যথাসময়ে আসরে উপস্থিত না হওয়া! তা তুই তো বিখ্যাতদের তালিকায় উঠিসনি, তুই ঠিকই যাবি, কি বল?

—যাবো তো—অরুণিমা বলে—কিন্তু গিয়ে যে কি করবো তাই ভেবেই তো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে রে!

—তোর আবার বেশী বিনয়!—সুরূপা বলে—বলেছি তো একটার বেশী গাইবার সময়ই পাবি না। একটি খুব ভালো গান, যেটা তোর সব থেকে প্রিয় এমন গান এই তিন দিনে বেশী করে রপ্ত করে নে। দেখিস গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোর কত ভক্ত জুটে যায়!…কী ফাইন মাজা গলাটা তোর! জগতের কেউ জানতে পারছে না বলেই তো আমার আক্ষেপ। দেখিস ভাই, এর পরে যখন প্লে ব্যাকে গান গাইবার জন্যে সিনেমা কোম্পানীদের মধ্যে অরুণিমা বসুকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, তখন যেন সুরূপার রূপ বিস্মরণ হয়ে যাসনি?

হেসে গড়িয়ে পড়ে সুরূপা।

অরুণিমা কিন্তু যোগ দিতে পারে না ওর এই স্ফূর্তিতে। তার মনের মধ্যে যেন একটা উত্তাল সমুদ্রের কল্লোল! সভায় বসে গান গাইবে অরুণিমা! আজীবনের স্বপ্ন সফল হবে তার? কিন্তু সে কি পারবে? লোক হাসাবে না তো?…একটি গান, মাত্র একটি গান, বিশুদ্ধ তাল লয়ে গেয়ে দিয়ে আসা—এটুকুও যদি সে না পারে, তা'হলে বৃথাই তার আজীবনের স্বপ্ন-সাধনা।

মনে মনে গানের ভাণ্ডার হাতড়ে দেখে অরুণিমা, কোনটা? কোনটা পারবে সে সব থেকে ভালো করে গাইতে?

*　　　*　　　*

গোড়ার কথা এই।

অরুণিমা যে বাড়িতে জন্মেছিলো, সেখানে আর যাই হোক গানের চাষ কখনো ছিলো না, এখনো নেই। গানকে তা'রা 'বাজে সখের' পর্যায়ে রেখেই চলে। কিন্তু দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ সম অরুণিমা শিশুকাল থেকে গানে পাগল। কোথাও যদি গানের আওয়াজ কানে এলো, অরুণিমার চিত্ত উধাও। একটু বড়ো হ'তে অরুণিমা মায়ের কাছে বায়না ধরলো গান শিখবে। মায়ের মনটা একটু টললো, কারণ ভারী মিষ্টি গলাটি অরুণিমার, আর আশ্চর্য, যেখানে যেটুকু শোনে সুরসুদ্ধ সবটুকু আয়ত্ত করে নেয়!

মা স্বামীর কাছে আবেদন পেশ করলেন—মেয়েটাকে একটা সস্তাটস্তা যাহোক হারমোনিয়াম কিনে দাওনা? বেচারার বড্ডো সখ গান শেখার।

শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন।—হারমোনিয়াম? সমস্ত দিন প্যাঁ পোঁ করে বাড়িসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দেবার জন্যে? ও সব সখ শ্বশুরবাড়ি গিয়ে করে যেন। উঃ!

মা আর একটু যুক্তি তর্ক দেখালেন, হয়তো বা একটু ভেজালেনও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ কিছু হ'লো না। বাপ বললেন—আমি না হয় সহ্য করলাম, কিন্তু দাদা ? নারাণ ? গোবিন্দ ? না না, শেষ অবধি আমাকেই লজ্জায় পড়তে হবে, ও সখ আর করে কাজ নেই।

অভাবের সংসার নয়, স্বভাবের বশেই তাঁরা অরুণিমার এই সখটিকে অনুমোদন করলেন না।

ম্রিয়মান 'রুণির' গানের মাষ্টার হ'লো রেডিও। কিন্তু তাতেই কি স্বস্তি আছে ? রেডিওটা সেজকাকার সখের, আর সেজকাকার মতে রেডিওর প্রকৃত উপকারিতা দিনে তিন দুগুণে ছ'বার 'খবর' শোনায়, আর বাজার দর জানায়। গানের সময় খুলতে দেখলেই তিনি রেডিওকে কান মলে থামিয়ে দেন, এবং রায় দেন—'রক্ষে করো বাবা, ভালো লাগে না এই ঘ্যানঘ্যানানি।'

তবু তাঁর অনুপস্থিতিতে লুকিয়ে চুরিয়ে গান শুনেছে অরুণিমা। আর গুন্‌গুন্‌ করে গলায় তুলেছে।

সামনের বাড়ির দোতলায় একটা মেয়ে গান শিখতো, সপ্তাহে তিন দিন তার গানের মাষ্টার আসতো। সেই সময়টুকুর জন্যে 'হাঁ' করে থাকতো অরুণিমা। ভারী হিংসে হ'তো তার মেয়েটার ওপর। যেমন গলার ছিরি, তেমনি মোটা মাথা ! বারবার ভুল করে, দিনের পর দিন একই সুর শেখে, অরুণিমার যেন ছটফটানি ধরে। হায়, অরুণিমা যদি এ বাড়ির মেয়ে না হয়ে ও বাড়ির মেয়ে হ'তো !

জীবনে একবার একটু সুযোগ জুটেছিলো। পাথর বাঁধানো কপালে একছিটে সোনার আঁচড়। দিন কয়েকের জন্যে গিয়েছিলো মাসীর বাড়ি জামালপুরে, সেখানে ছিলো একটা হারমোনিয়াম, মাসতুতো ভাই নীলুদা প্রাণপণে পিটোয় সেটাকে।

অরুণিমাকে খুব সমাদর করে শেখাতে বসলো সে। বললো—ছোটমাসী, তোমার এই মেয়ে কালে একটি বিখ্যাত গায়িকা হবে। কি ফার্ষ্টক্লাশ গলা ! যেন তারের বাজনা ! অরুণিমাকে ডাকতো সে 'নাইটিঙ্গেল' ব'লে।

কিন্তু সে আর ক'দিন ? মাসীর বাড়ি বেড়ানোর পরমায়ু ফুরোলো। 'প্রিয়-বিরহ-কাতর' হৃদয় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলো অরুণিমা, আর তার পরই হয়ে গেল বিয়ে।

সেই প্রথম আর সেই শেষ হারমোনিয়াম ছোঁয়া।...কিন্তু কল্পনার আঙ্গুলে পৃথিবীর সমস্ত হারমোনিয়ামের রীডগুলি তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছে অরুণিমা, মনের কণ্ঠে গুঞ্জন তুলেছে অজস্র সুরের !

স্বামী কনক মাঝে মাঝে বলে—তোমার এতো গানের সখ, এ রকম একটা শুধু কেরাণীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি কোনো গাইয়ে-বাজিয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'তো, বেশ হ'তো !

অরুণিমা বলে—যা হ'লে বেশ হ'তো, তা যখন হয়নি, ভেবে লাভ নেই।

এখনও যা হলে বেশ হয়, তাই করোনা মশাই। দাওনা একটা হারমোনিয়াম কিনে!

কনক প্রথমটায় শুনে বলেছিলো—তা' হলেই হয়েছে! বৌ সা-রে-গা-মা সাধতে বসলে মা আর সংসারে টি'কেছেন! কাশীর টিকিট কিনতে চাইবেন।

মা আর ছেলের সংসারে অরুণিমা এসেছে। কনকের মার মনের ভাবে মনে হয় এ আসাটাকে তিনি যেন অনধিকার প্রবেশের দলেই ফেলেন। কাজেই কনকের সবতাতেই ভয়। তবু অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে কনকের সে ভয়কে কিছুটা কমিয়ে এনেছে অরুণিমা। এখন কনক মাঝে মাঝে কাছে পিঠে গানের জলসা হ'লে সঙ্গে করে নিয়ে যায় অরুণিমাকে। নিয়ে যায় সঙ্গীতবহুল সিনেমার ছবি দেখাতে।

কিন্তু হারমোনিয়াম কেনা আর হয়ে ওঠেনি। অবস্থা তেমন নয়। তবু এখনও কনক কখনো কখনো আশ্বাস দেয় একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজনা কেনার তালে আছে সে। অরুণিমা তার 'কাটা বাক্সয়' জমানো সাতাশ টাকা দশ আনার ভরসায় অদূর ভবিষ্যতে একটা লোক্যাল সেট রেডিও কেনার স্বপ্ন দেখে। আর স্বপ্ন দেখে একটি গানের আসরের···যে আসরে অরুণিমা শ্রোতার দলে চেয়ারে বসে নয়, গায়কের দলে ষ্টেজে বসে।

সত্যি, জীবনে এমন দিন কি কখনো আসতে পারে না, যে দিন অরুণিমা শ্রোতাদের সামনে বসতে পারে?···চোখের সামনে যখন একটির পর একটি গায়িকা এসে বসে গান গায়, নমস্কার করে উঠে পড়ে, অরুণিমা যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে সম্পূর্ণ ভঙ্গীটিকে গ্রাস করে নেয়। গান শুনে মুগ্ধ হ'তে হ'তেও ও ভাবে—কী অসভ্যর মত ঝট্ করে উঠে গেলো গায়িকা পদ্মা সেন!···অরুণিমা হ'লে অমন করতো না, ধীরভাবে নমস্কার করে মুখে স্মিত হাসির আভাস এঁকে উঠতো।···কী গুরুগম্ভীর চালে, খানিকটা সময় নিয়ে ষ্টেজে এসে বসছে শ্যামলী মজুমদার!··অরুণিমা হ'লে হালকা হাওয়ার মতো ভেসে এসে বসতো।

কণ্ঠস্বরের বিচারও করে।···সুর জ্ঞান আছে মেয়েটার, কিন্তু গলাটা বড্ডো পুরুষালি! এর গলাটা মিহি, কিন্তু চড়াতে পারে না!

প্রত্যেকটি গায়িকার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে বসিয়ে কল্পনা করে অরুণিমা। অবিশ্যি সত্যিকার উঁচুদরের আসরে যাবার সৌভাগ্য তার কখনো হয়নি। যেখানে যেতে পায়, সেখানে নিজের কল্পনাকে পৌঁছে দেওয়া চলে। বরাবর ওদের রূপ গুণের বিচার ক'রে আর সৌভাগ্যের হিংসা ক'রে এসেছে অরুণিমা। সেই সৌভাগ্য আজ অরুণিমার হাতের মুঠোয়।

অরুণিমা এবার শ্রোতাদের সামনে বসবে!

* * *

সুরূপা চলে যাবার পরও অরুণিমা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। সুরূপা ঠাট্টা করে গেলো, কিন্তু কে বলতে পারে ওর ঠাট্টা একদিন সত্যি হয়ে উঠবে কি না? এমনি আকস্মিক কোনো একটা উপলক্ষ থেকেই কি মানুষের ভাগ্য ফিরে যায় না?

একটু পরে যেন চৈতন্য পেয়ে উঠে পড়লো অরুণিমা। হাতে মাত্র তিনটি দিন, "একটা গান ভালো করে রপ্ত" করে নিতে হবে। কিন্তু কেমন করে? না, হতাশ হ'লে চলবে না, যেমন করে হোক হওয়াতেই হবে। কনকের কোনো বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি থেকে একটা হারমোনিয়াম ধার করে আনা ছাড়া মুখ রক্ষার আর উপায় নেই।

কনক আসতেই অরুণিমা কথাটা উত্থাপন করলো।

প্রথমে তো কনক বিশ্বাসই করতে চায় না। ভাবে কার্ডটার নামের মিল দেখে অরুণিমা কৌতুক করছে। তারপর বিশ্বাসের পর্যায়ে এসে পৌঁছলে স্বচ্ছন্দে বলে কিনা—তোমার বন্ধু যেমন পাগল! সভার মাঝখানে অপদস্থ হ'তে হবে না কি?

রাগ ধরে গেলো অরুণিমার। বললো—অপদস্থ যাতে না হই সেই আবেদনই তো করা হচ্ছে। দাও না একটা বাজনা জোগাড় করে, দেখো ঠিক চালিয়ে দিয়ে আসবো।

—অতো সোজা নয়!

নিতান্ত সহজ ভাবেই বলে চলে কনক, বোঝেও না এই নেহাৎ সহজ কথাগুলো শ্রোতার প্রাণে গিয়ে বাণের মতো বিঁধছে! তাই বলে চলে—জলসায় যারা গাইতে আসে, তারা তো তোমার মতো ধান চাল দিয়ে গান শেখেনি, দস্তুরমতো স্কুলে পড়ে ওস্তাদ রেখে অনেক খেটে খুটে শিখেছে। রেডিওর গান শুনে গান শিখে যদি আসর জমানো যেতো, তা'হলে জগতের সব ওস্তাদের দল বেকার হয়ে যেতো।…ও কী? ওটা কি হলো? চোখে জল এসে গেলো মানে? ভালো! বললামটা কি রে বাবা! নাঃ! তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলো না। …ভালো মতো শিক্ষা না পেয়ে সভায় যাওয়াটা কি ঠিক? তোমার বান্ধবীর তো সেন্স বলে কিছু নেই, তাই যা হয় একটা করে বসলেন!

অরুণিমা চোখ মুছে স্থির স্বরে বললো—ভালো মতো শিক্ষা পাবার সুযোগ আমার এ জীবনে আসবে তোমার বিশ্বাস? যদি সে বিশ্বাস থাকে, সুরূপাকে বলে পাঠাচ্ছি—এখন হ'লো না, ভবিষ্যতে হবে।

কনক এ হালে পানি পায় না। অগত্যা সন্ধির সুরে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলে—বেশ, বাজনা আমি জোগাড় করে এনে দেবো, মেডেল পাওয়া চাই কিন্তু!

—ওই সর্তে যদি জোগাড় হয়, তা'হলে থাক।—বলে উঠে যায় অরুণিমা।

অগত্যাই সন্ধ্যার পর কনক রিক্সা করে কোথা থেকে যেন একটা কর্কশ-সুর বক্স হারমোনিয়াম এনে হাজির করে। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে—মাকে একটু ব'লে তবে সুরসাধনা কোরো, নইলে মা হঠাৎ তাজ্জব বনে যাবেন।

মনটা ভারী খিঁচড়ে যায় অরুণিমার—কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই সংকল্পটাও প্রবল হয়ে ওঠে।…আচ্ছা, অসাধ্য সাধন পণ করেই দেখবে সে। দেখিয়ে দেবে কনককে, সত্যিই তার ভেতরে কতোটা গুণ ছিলো, যে গুণ কেবলমাত্র অভিভাবকের অবহেলায় মাঠে মারা গেল!

নীলুদার যত্নে শেখানো গানটি "আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও" —এটি বড়ো প্রিয় গান অরুণিমার। এই গানটিই আবার ঘসে মেজে ঠিক করে নেবে অরুণিমা।...দরজা বন্ধ করে, ভাঙা বাজনার কর্কশতাকে যতোটা সম্ভব খাদে নামিয়ে চলে লুপ্তোদ্ধার সাধনা।...তিনটি দিন, হয়তো বা বিনিদ্র রাত্রি ধরেও তা'র মনের মধ্যে গুঞ্জন চলতে থাকে..."আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধুলোর ঢাকা ধুইয়ে দাও! আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও।"

কী অপূর্ব এই ভাষা! "আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধুলোর ঢাকা ধুইয়ে দাও।" আহা! যেন অরুণিমারই বন্দী আত্মার মুক্তি কামনা!

এসে গেলো সেই প্রতীক্ষিত দিন।

সুরূপা বলে দিয়েছিলো—দুপুরবেলা তুই আমার বাড়ি চলে আসিস, একসঙ্গে যাবো। আমাকে অবিশ্যি একটু আগেই যেতে হবে, অনেক যোগাড়-যন্তর। গাইয়েদের চা জলখাবারের ভার আমার ঘাড়ে।...তা হোক, তুই যদি ঠিক সময় সেখানে গিয়ে উঠতে না পারিস! যতোই হোক কনকবাবু পরের চাকর। তোর চাকরগিরির টাইমটা ঠিক রাখতে নাও পারেন। বরং ভদ্রলোককে কার্ডটা দিয়ে রাখিস, অফিস ফেরৎ সরাসর ওই "বংশীধর কলেজেই" চলে যাবেন। তুই যাবি আমার সঙ্গে।

চমৎকার ব্যবস্থা!

প্রায়ই এমন দুপুরবেলা সুরূপার বাড়ি যায় অরুণিমা, ঠিকে ঝিটার সঙ্গে।

সকাল থেকে কি মন নিয়ে যে কাজ করছে, সে অরুণিমাই জানে। ডালে নুন দিতে ভুলেছে, পানে খয়ের দিতে ভুলেছে। কনক ঠাট্টা করে বলে গেলো— "ভাগ্যিস ওস্তাদ গায়িকার বর হইনি, হ'লে আলুনি খেতে খেতেই প্রাণ যেতো।" থাক্‌গে কনকের ঠাট্টায় কিছু এসে যায় না: খুব রক্ষে যে আজ শাশুড়ী খাবেন না। তাঁর আজ একাদশী।

কিন্তু যা রক্ষে মনে হচ্ছিলো তাই দেখা দিলো বিপদের মূর্তি নিয়ে। সাড়ে-বারোটা একটা নাগাদ অরুণিমা যখন কি শাড়ি পরে যাবে তাই হিসেব করছে, শাশুড়ী ডাক দিলেন—দোরটা দিয়ে যাও বৌমা, আমি একবার "মায়ের-বাড়ি" ঘুরে আসি।

মায়ের বাড়ি অর্থে অবশ্য কালীঘাট। মানে ঘণ্টা চারেকের মতো। মাটি করেছে! বুকটা ধড়াস করে উঠলো অরুণিমার। ঝিটা এলেই তার সঙ্গে সুরূপার বাড়ি যাবার কথা যে! কে তখন দোর দেবে? অথচ শাশুড়ীকে বলতেও সাহস হ'লো না।...নিঃশব্দে দোর দিয়ে এলো।

যাক্‌গে, কি আর হবে! একাই যাবে অরুণিমা! খোকার মাকে বলবে একটা রিক্সা ডেকে দিতে, আর যতোক্ষণ না শাশুড়ী ফেরেন, বাড়িটা একটু আগলে বসে থাকতে। আনা দুই পয়সার লোভ দেখালেই হবে।

দেখো, পাঁজীতে একাদশী পড়বার আর দিন পেলো না!

আড়াইটের আগে খোকার মা আসে না। তবু দু'টোর সময় থেকে ঘরবার

করতে থাকে অরুণিমা। অরুণিমা নিজে জানতো না সে এতো নার্ভাস! হাতে পায়ে কী এক অকারণ চাঞ্চল্য, বুকের মধ্যে যেন ঢিপঢিপ করছে!

আড়াইটে বেজে গেলো। খোকার মার দেখা নেই।

শাড়ি জামা পরে প্রস্তুত অরুণিমা মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখতে থাকে। পৌনে তিনটে! তিনটে! সওয়া তিনটে! নাঃ আর কোনো সন্দেহ নেই! কামাই করলো খোকার মা! নতুন কিছুই নয়, নিত্য পরিচিত ঘটনা।

কিন্তু আজই?

অরুণিমা কি দেয়ালে মাথা ঠুকবে? না কি যত্নে বাঁধা চুলগুলো টেনে টেনে ছিঁড়বে? সাড়ে তিনটে বেজে গেলো, কলে জল এসে গেছে। হঠাৎ মনে হ'লো, দেরী দেখে সুরূপাও তো কাউকে পাঠাতে পারে! তা' হলে? মোটামুটি কিছু কাজ সেরে নেবে? বাসনগুলো সব মাজা না হোক, রান্নাঘর ধুয়ে উনুন ঠিক করে যেতে হবে! শাশুড়ী সারাদিনের পর কালীঘাট থেকে ফিরে যদি দেখেন, বাড়ির এই ভূতুড়ে অবস্থা, আর বৌ হাওয়া, তাহলে?··ওরে বাবা!

সিল্কের শাড়ি জামা ছেড়ে ফেলে চট করে একটা ময়লা শাড়ি জড়িয়ে কাজে নেমে পড়লো অরুণিমা। চারটের সময় যাবে বলেছিলো সুরূপা, তার মধ্যে যদি অরুণিমা সেরে নিতে পারে, আর শাশুড়ী এসে পড়েন, তা'হলেই সব দিক রক্ষে হয়। সুরূপা যাবার মুখে নিশ্চয় একটা 'তল্লাস' করবেই। দরজাটা বরং খুলেই রাখি।

অরুণিমার আশাটা সফল হ'লোনা, অনুমানটা সফল হ'লো। ঝকঝকে শাড়ি পরা সুরূপা হাঁসফাঁস করতে করতে ট্যাক্সী থেকে নেমেই দরজা ঠেলে ঢুকলো। আর ঢুকেই গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো উঠোনে অবস্থিত অরুণিমাকে দেখে।

—এর মানে?

—মানে অনুমান সাপেক্ষ!—গম্ভীর ভাবে বললো অরুণিমা।

—এখন উপায়?

অরুণিমা হতাশ ভাবে বললো—তুই এক্ষুনি এসে পড়লি? আমি হাত চালিয়ে নিচ্ছিলাম! অনেকক্ষণ আগেই সেজেগুজে রেডি হয়েছিলাম তো, হঠাৎ এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

সুরূপা সত্যিই রেগে যায়। ওদিকে ট্যাক্সীর মিটার উঠছে, কর্তাও কোন না ক্রুদ্ধ! তত্ত্বাবধানের ভার অনেকটা তাদেরই হাতে। রেগে উঠে বলে—তা এ সব কী এমন রাজকার্য যে, এই দণ্ডে না হ'লে চলতো না? রাতে এসে হ'তে পারতো। উঠে আয় হাত ধুয়ে! শীগগির তৈরি হয়ে নে। মিটার উঠুক না হয় আর একটা টাকা···ব'লে আসি ওঁকে।

বিশ্বসংসার যেন দুলতে থাকে অরুণিমার চোখে। সত্যিই বটে! কী এই তুচ্ছ কাজের বন্ধনে নিজেকে আটকালো অরুণিমা? উনুন নিকোনো? রান্নাঘর ধোওয়া? যে অরুণিমার জন্য অপেক্ষা করছে জলসার স্টেজ! যে জায়গা অরুণিমার সারা জীবনের আকাঙ্খার স্বর্গ! জীবনের চরম

চরিতার্থতা! অরুণিমা কি পাগল!

তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে উঠে গিয়েই মনে পড়ে গেলো প্রধান সমস্যার কথা।

—কিন্তু বাড়িতে যে কেউ নেই ভাই?

—কেন তোর শাশুড়ী?

—কালীঘাটে গেছেন।

—বটে! ..দাঁতে দাঁত পিষে বলে সুরূপা—আজই আর তাঁর কালীঘাটে না গেলে চলছিলো না? ধন্যি বটে! কনকবাবু? তিনি আসেন কখন?

—উনি তো সকাল করে অফিস থেকে বেরিয়ে ওখানেই যাবেন কথা আছে।

ওদিকে মুহুর্মুহু হর্ণের আওয়াজ আসে।

সুরূপা দ্রুতভঙ্গীতে বলে—তবে নয় তাঁকেই খোঁজ করে পাঠিয়ে দেবো। এসে যেন নিয়ে যান। ততোক্ষণে বুড়ি এসে পড়বে তো? তোর গানটাই সব শেষে পড়বে আর কি! শেষের দিকে অনেকে উঠে যায়।···চললাম ভাই। তোর ওপর কিন্তু ভীষণ রেগে গেছি আজ। আর তোর শাশুড়ী বুড়িকেও বলিহারী!······কতো চেষ্টা করলাম তোর জন্যে—

আবার হাঁসফাঁস করতে করতে চলে যায় সুরূপা।

সত্যিই বটে চেষ্টা করেছে সুরূপা। কিন্তু বিধাতা যার বাদী, মানুষের সাধ্য কি তার সহায় হয়?

অরুণিমা একবার ভাবলো—চাবি দিয়ে চলে গেলেও তো হ'তো, কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়? উপবাসক্লিষ্ট শাশুড়ী সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে দরজায় তালা লাগানো দেখলে ব্যাপারটা কেমন হবে?···নাঃ 'মরিয়া' হয়েও অতো সাহস নেই অরুণিমার। অগত্যা সংকল্প করলো তিনি এসে পড়লে ও নিজেই চলে যাবে বাসে করে। একা চলাফেরা তো সকলেই করে আজকাল। সকলের শেষে গান গেয়ে লাভ কি? অনেকে যখন উঠে যায়?

কিন্তু আজই যে ওর শাশুড়ীর সন্ধ্যা আরতি দেখবার ইচ্ছে হবে এ কথা কে জানতো? অথচ তাঁরই বা দোষ কি? খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা নেই, নির্দায় চিত্তে বসে আছেন।

না, কনককেও ভীড়ের মধ্যে খুঁজে পায়নি সুরূপা। তা' ছাড়া তার অনেক কাজ।

লাউডস্পীকারে ঘোষণা হ'তে থাকে···"বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—অনিবার্য কারণে শ্রীমতি অরুণিমা বসু আসতে পারলেন না!"···একবার, দু'বার।

শ্রোতার আসনে পিছনের সারিতে বসে কনক মনে মনে হাসে···যতো তড়পানি আমার সামনে! শেষ পর্যন্ত আর সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলেন না মহারানী! বাড়ি গিয়ে বেশ একচোট নেওয়া যাবে!

শীতের বিকেল চট করে রাত্রিতে পর্যবসিত হয়।

সমস্ত কাজ সেরে ছাতে এসে দাঁড়ায় অরুণিমা। হু হু করে হিমেল হাওয়া বইতে থাকে···আলসে ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···দুঃখবোধটাও যেন আর নেই! অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলো কনকের, আর অভিমানে খান্‌খান্‌ হয়ে যাচ্ছিলো, সে অভিমানও হারিয়ে গেছে।

কোন গানটা গাইবে ঠিক করেছিলো মনে করতে পারছে না। শুধু যেন একটা অব্যক্ত ভার চেপে বসে রয়েছে বুকের ওপরে!···

ভয়ানক একটা অ্যাকসিডেণ্ট কেন হ'লোনা আজ অরুণিমার? ভীষণ অসুখ করলো না কেন কনকের? যা হোক একটা শক্ত কিছু বিপদ হ'লো না কেন? ভাগ্যের সেই কঠোর নিষ্ঠুরতা তবু সহ্য হতো, কিন্তু ভাগ্যের এই নির্লজ্জ ব্যঙ্গ সহ্য হবে কি করে? অরুণিমা এমনই তুচ্ছ যে তার জন্যে একটা ভব্য রসিকতাও জুটলো না বিধাতার? জীবনের চরম সার্থকতা হাতের মুঠোয় এসে পিছলে গেলো, কি না ঠিকে ঝিটা কামাই করলো ব'লে।

[১৩৬৩]

স্বার্থপর

—দাদা!

কাঁচের গ্লাশ ভাঙ্গিয়া খান্‌খান হওয়ার মতোই খান্‌খান্‌ হইয়া যেন সারা ঘরে ছড়াইয়া পড়ে তীব্র তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বরটা।···আচমকা এ রকম আক্রমণাত্মক আহ্বানে বোধ করি নিরঞ্জন ব্যতীত যে কোন ব্যক্তিই চমকিয়া উঠিত। কিন্তু নিরঞ্জন আশ্চর্য শান্ত ভাবে চুলের উপর চিরুণী চালাইতেই থাকে, মুখটা ফিরাইয়া আহ্বানকারিণীকে দেখার প্রয়োজনও অনুভব করে না।

তা' ললিতা যে খুব বেশী অপমানিত হয় এতে, এমনও নয়, বরং নিরঞ্জনদার অগ্রাহ্য ভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া আরো তাল ঠুকিয়া অগ্রসর হয়।

—দাদা, তোমার লজ্জা করে না?

ভিজা চিরুণীটা একখানা ছেঁড়া আর আধময়লা তোয়ালে দিয়া মুছিতে মুছিতে নিরঞ্জন অমায়িক মুখে বলে—লজ্জা? কেন বল তো ললিতা?

—কেন? 'কেন'—জিগ্যেস করতেও হায়া হলো না তোমার?

—প্রথম দফা 'লজ্জা', দ্বিতীয় দফা 'হায়া', কেমন? আমার নামে দু'টো চার্জশিট্‌ তৈরী করেছিস তা' হলে?

ললিতার মুখ কুৎসিত নয়—কিন্তু তীব্র ঘৃণা প্রকাশের প্রকৃষ্টতম পন্থা হিসাবে আশ্চর্য রকমের কুৎসিৎ করিয়া তুলিতে পারে মুখখানাকে। তেমনি বিকৃত মুখ হইতে যে মন্তব্যটি বাহির হইয়া আসে, সেটা সেই অপূর্ব মুখশ্রীর উপযুক্ত হইলেও নিতান্তই বয়সের অনুপযুক্ত।

—ওই তো—জানো শুধু ওই কথার মারপ্যাঁচ! আর তো কিছু নেই! তোমার লজ্জা নেই—দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করছে গলায় দড়ি দিই!

—শুধু ইচ্ছেই তো ? তবু ভালো, দেখিস যেন দিয়ে ফেলিসনে ভুলে ভুলে।

দিব্য হাসি মুখে নিরঞ্জন এবার গেঞ্জির উপর শার্ট চড়ায়।

বোধকরি ললিতার এই 'যুদ্ধং দেহি' ভাবটার সঙ্গে নিতান্তই পরিচয় আছে তার, তাই এমন নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে বাহিরে যাইবার সাজগোজগুলা সম্পূর্ণ করিতে থাকে সে।

—দিই যদি তো অমনি যাবো না দাদা, তোমাদের হাতেও দড়ি দিয়ে যাবো বুঝলে ?

আরো ভীষণ হইয়া ওঠে ললিতা।

কিন্তু নিরঞ্জন হেলে দোলে না। যেন শিশুর আস্ফালন দেখিতেছে এমনি সহাস্য মুখে বলে—হাতে দড়ি ? পাগল হয়েছিস ? কিছু ঘুস দিলেই সব ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু সে না হয় "রাধা নাচলে তেলের অর্ডার"—এখন হলো কি বল তো ? নেহাৎ অন্ধকারে পড়ে রয়েছি যে !

—কি হয়েছে জানো না ? ন্যাকা ! সেই কানপুরের চাকরীটা ঠিক করে ফেলোনি তুমি ?

রাগে যেন হাঁফাইতে থাকে ললিতা।

নিরঞ্জন যে বিস্ময়ের ভাবটা দেখায় সেটা অবশ্যই কৃত্রিম, কিন্তু সহজে ধরা যায় না। এই চোখে অকপট বিস্ময় মাখাইয়া বলে—ও নিশ্চয় ! এমন ভালো চাকরীটা পেয়ে যাচ্ছি, ঠিক করে ফেলবো না ? যেটুকু তদারকীর বাকী রয়েছে, তার জন্যেই তো আবার ছুটছি কলকাতায়। কিন্তু সেটা এমন কি মহা অপরাধ হচ্ছে বুঝছি না তো ! ভালো চাকরীর জন্যে সত্যনারায়ণের শিন্নি মানত করে লোকে—

—করবে না কেন, তেমন অবস্থা হ'লেই করে।···কিন্তু তুমি এই যে স্বার্থ-পরের মতো ভালো চাকরীটি বাগাবার চেষ্টায় লাফাচ্ছো, বলি সংসারের কথা ভেবেছো একবারও ? এতো বড়ো দায়িত্বটি কার ঘাড়ে দিয়ে যাবে শুনি ?

নিরঞ্জন এবার ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বলে—কার সংসারের দায়িত্ব ?

ললিতা এক মুহূর্তের জন্য থতমত খায়, কিন্তু সেটা নিতান্তই মুহূর্তের ব্যাপার। 'মুখ ছোপ' খাইবার মেয়ে সে নয়। আরো কাছে সরিয়া আসিয়া ঠাকুমা পিসিমার ভঙ্গীতে দুই হাত নাড়িয়া বলে—তা' বলবে বৈকি, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছো। কিন্তু দায়িত্ব নেবার বয়েস হ'লে বাপের সংসারের দায়িত্ব মানুষেই নেয় দাদা ! জন্তুজানোয়ারের কথা আলাদা। কিন্তু ওই খোঁড়া বাপ, রুগ্ন মা, অপোগণ্ড দু'টো ভাই, আর কুড়ি বছরের আইবুড়ো বোনকে কার গলায় দিয়ে বিদেশে যাবে সেটা ভাল করে বলে যেও। একখানা মাঠ পেরোলেই ওদিকে পাকিস্থান সেটাও ভুলে যেওনা।

নিরঞ্জন একটু ক্রুদ্ধ হাসির সঙ্গে বলে—সেটা তুমিই একটু ভালো করে মনে রাখতে চেষ্টা কোরো। কিন্তু কথা হচ্ছে—আমি বাড়ি বসে থাকলে মার হাঁপানী সারবে এমন কোনো ভরসা আছে ? গ্যারাণ্টি আছে বাবার ভাঙা হাঁটু আস্ত হবার ? বসে বসে মার মাথায় বাতাস করলে আর বাবার পায়ে হাত বুলোলে

কড়িকাঠ থেকে ঝরঝর করে টাকা ঝরবে, এমন আশ্বাস দিতে পারে কেউ ?

ললিতা ঠোঁট উল্টাইয়া বলে—টাকা! কেন এখানে হাইস্কুলের হেড মাষ্টারীটা কি দোষ করলো ?

—ওঃ সেই একশো টাকার পোষ্টটা ?

ললিতার নিজের কথায় যদিও প্রমাণিত হয় বয়েসটা তা'র কুড়ির বেশী নয়, কথা কয় কুড়ি দ্বিগুণে চল্লিশের মতো। কিম্বা তা'ও নয় হয়তো—যাহাদের জন্য "কুড়ি পেরোলেই বুড়ি" কথাটার সৃষ্টি হইয়াছে, ললিতা তাহাদেরই একজন। ···বুড়ির মতোই বিজ্ঞ সুরে বলে—ঘরের ভাত, উঠোনের শাক খেয়ে রোজগার করতে পারলে একশোই পাঁচশো! বিদেশের 'চাল চেলে' থাকতে তোমার চারশো টাকার তিনশোই একলার জন্যে বেরিয়ে যাবে না ? হরে দরে সেই হাঁটু জল!

—অবিশ্যি 'ভবিষ্যৎ' বলে যে শব্দটা আছে বাঙলা ভাষায়, সেটা না ভাবলে সেই হাঁটু জলই বটে।

—ওঃ ভবিষ্যৎ ? তার মানে নিজের আখেরটাই শুধু ভাববে তুমি ?

—তা' তোর আখের ভাবতে ভাবতে তো কাহিল হয়ে গেলাম—নিরঞ্জন হাসিয়া ওঠে—কিছু করে উঠতে পারলাম কই ?

—আমার জন্যে আর মাথা ঘামাতে হবে না তোমায়, থাক্। দীঘির এখনও জল শুকোয় নি। কিন্তু তোমায় এই বলে রাখছি দাদা, তোমার রুগ্ন মা বাপের দায়িত্বটি যে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়বে সে আশা কোরো না। আমি পারবো না, ব্যস্ সোজা কথা।· মাস মাস কিছু টাকা পাঠিয়ে মাথা কিনলেই হয় না বুঝলে ?

নিরঞ্জন আবার একবার গম্ভীর হয়। নাঃ কথাগুলা আর 'অমৃতং বালভাষিতং' বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। তাই বাঁকা সুরে বলে—মা বাপ নিশ্চয়ই একলা আমার নয় ?

—নয় তো কি ? মেয়ে সন্তান তো পর। বাবার বিষয় থাকলে তার ভাগ দিতে আসতে আমায় ?

—হুঁ! শুধু তত্ত্বজ্ঞান নয়, আইনের জ্ঞানও টনটনে হয়েছে দেখছি। ঠিক বলতে পারিস ললিতা, সপরিবারে একযোগে পাঁকে পুঁতে হাবুডুবু খেলেই বা কার কি লাভ ? টাকায় কি না হয় ? বাইরে গিয়ে আমি যদি বেশী করে টাকা পাঠাতে পারি, দেখবি আমার অভাব টেরও পাবি না তোরা।

—ঈস্! 'যদি পারি'! ক'দিন পারবে ? তোমার সুরেশবাবুর মেয়ের কথা শুনতে আর বাকী নেই আমাদের।

এতক্ষণে চমকাইতে দেখা যায় নিরঞ্জনকে। চমকাইয়া বলে—কি হলো ? কার মেয়ে ? কি শুনতে বাকী নেই ?

—আহা হা ন্যাকা! তোমাদের সুরেশবাবু প্রফেসর, যিনি তোমার চাকরীর জন্যে খাটছেন। বিনি স্বার্থে কেউ কারুর জন্যে কিছু করে না দাদা, বুঝলে ? নালুদার মুখে সব শুনেছি আমরা। তাঁর সেই গাইয়ে বাজিয়ে তিনটে পাশ করা মেয়েটির জন্যে টোপ্ ফেলে বসে আছেন, আর তোমারও মুণ্ডু ঘুরতে

বাকী নেই।

—নালুদা? সে আজকাল রিপোর্টারের কাজ নিয়েছে বুঝি?

—কাজ নেওয়ানিয়ি আবার কি? কলকাতায় যায় আসে, খবর পায়।

—সত্যি, বিঘে দশ বারো জমি নিয়ে তো কলকাতা সহর, ষ্টেশনে পা দিলেই সকলের হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়, কি বলিস?

—তোমার কাছে বসে বসে কথার ম্যাজিক দেখবার সময় আমার নেই। একাধারে দাসী বাঁদী, রাঁধুনী, নার্স—সবই এই একজন তো? একটা বিষতিক্ত হাসির সঙ্গে কথাটা শেষ করিয়া বাহির হইয়া যায় ললিতা।

নিরঞ্জন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে সেই দিকে।

না, রাগ করিবার কিছু নাই।

ললিতার কাছ হইতে এর বেশী আশা করাই বা চলিবে কেন? ললিতা কি পাইয়াছে? দিনদিন যে উগ্র অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে সে, সেটা কি নিতান্তই অকারণ?

চারটের গাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার পর বিমলাচরণ কোন রকমে ভাঙা পা খানা টানিয়া টানিয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিয়া ললিতাকে ডাক দেন—ললি, তোর দাদা গেল না কলকাতায়?

—কি জানি! রেগে ঠরঠর করে তো বেরিয়ে গেলো তখন, হাতে কিছু নিতে দেখলাম না।

—বলি, রাগ কেন বাবুর?

—হক্ কথা বললে সবাইয়ের রাগ হয়—বলিয়া ললিতা হাতের ঘড়াটা লইয়া কুয়োতলায় নামিয়া যায়।...খোঁড়া বাপের জন্য এইমাত্র ওকালতি করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই যে নিজে ললিতা পিতৃভক্তিতে আদর্শস্থানীয় এমন মনে করিবার হেতু নাই। হক্ কথা সে আজকাল সকলকেই শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

—ব্যাটা বেটিরা যেন কেউটে সাপ! ফণা তুলেই আছে। উঃ কী বলবো ভগবান মেরেছে, নইলে—

'নইলে' কি করিতেন সেটা বোধহয় আপাততঃ ভাবিয়া পান না বলিয়াই অস্ফুট ওই মন্তব্যটুকু করিয়া বিমলাচরণ ট্যাঁক হইতে বিড়ি ও দেশলাই বার করেন।

ঘরের ভিতর হইতে কাতরোক্তি শোনা যায় সুবাসিনীর—অ ললি, ললি! পোড়ারমুখো মেয়ের আঠারো মাসে বছর! বলি, কখন থেকে যে বলছি একটু আদার রস করে দে—

—দিচ্ছি! পাঁচ মিনিটে আর হার্টফেল হয়ে যাবে না তোমার—বলিয়া ভিজা কাপড়ে ভারী ঘড়াটা ভরিয়া সপ সপ্ করিয়া দাওয়ায় উঠিয়া আসে ললিতা।

—হা ভগবান, কবে যে এ কাঠ প্রাণ বেরোবে! উঃ অহরহ এ অপমান আর সহ্য হয় না বাবা!

সুবাসিনীর ফোঁস্ ফোঁসানির আওয়াজ ঘরের বাহির হইতে শোনা যায়।

—ওই তো! ভালো জিনিস শিখে রেখেছো—কারুর আর টুঁ শব্দ করবার জো নেই—বলিয়া ললিতা ভিজা কাপড়েই দুম্ দুম্ করিয়া আদা ছেঁচিতে বসে। অবশ্য নীরবে নয়, স্বগতোক্তি এবং অর্ধোক্তির সাহায্যে অনেক কিছুই শোনায়।

—ললিতা বলিয়াই তাই এতোটা জুলুম খাটিয়া গেল, তোমাদের বিদুষী বৌ আসিয়া কতো করিবে দেখা যাইবে।···ইত্যাদি। আরও একটা কথা শোনায় না বটে, তবে মনের ভিতর আগুনের মতো জ্বলিতে থাকে।··

কেন? এতো সহ্য করিবে কেন ললিতা? গলায় দড়িই বা দিবে কোন দুঃখে? ললিতার বয়সের মেয়ের কি আর কোনো পথ নাই?

নিরঞ্জনের কলিকাতা যাওয়া বন্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া যখন বিমলাচরণ আহারে বসিয়াছেন, তখন উঠানে ছায়া পড়ে।

—কে? কে ওখানে?

নিরঞ্জন উত্তর দেয় না, এমনিই উঠিয়া আসে।

—তুমি? ওঃ উত্তর দিলে না যে বড়ো?

—উত্তর দেবার কি আছে? দেখ্‌তেই তো পেলেন।

—হুঁ!···বলিতে যাইতেছিলেন—"কথার আগে এক ঘা করে জুতো বসিয়ে দিলেই পারো!"—বলেন না। তিক্তস্বরে বলেন—কই কলকাতায় গেলে না?

—না।

বিমলাচরণ প্রত্যেক সময় ভাবেন কোন সময়েই আর প্রশ্ন করিবেন না, ছেলের বিষয়ে আর কিছুতেই কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন না। এখনও তাই এক মুহূর্ত চুপ থাকিয়া আবার বলেন—এতোক্ষণ তবে ছিলে কোথায়?

গায়ের শার্টটা খুলিয়া সামনের দড়িতে মেলিয়া দিতে দিতে নিরঞ্জন সহজ ভাবে বলে—স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে গিয়েছিলাম সেই দরখাস্তটা দিতে।

—দরখাস্ত? কেন, তুমি নেবে নাকি ওটা?

—যদি দেয়।

—'যদি দেয়' মানে?···অকস্মাৎ পুত্রগৌরবে যেন স্ফীত হইয়া ওঠেন বিমলাচরণ—পেলে বর্তে যাবে! কিন্তু তোমার সেই কানপুরের চাকরীর কি হলো?

—সেটা হলো না।

—খবর পেলে নাকি? অ্যাঁ? চিঠি এসেছে?

ততক্ষণে নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে, উত্তরটা আর শোনা যায় না।

আহারান্তে খোঁড়া পা টানিয়া বিমলাচরণ সুবাসিনীর বিছানায় আসিয়া

বসেন। অভ্যস্ত নিয়মে—রোগ বৃদ্ধি অথবা ঔষধ খাওয়া সম্বন্ধে দু' একটা মামুলি প্রশ্নের পরিবর্তে মুচকি হাসির সঙ্গে দুই চোখ টিপিয়া বলেন—শুনলে ?

সুবাসিনী স্বামীর এহেন সরস মুখ ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলেন—কি হলো ? কি শুনবো ?

—বাবাজীর খবর ?···চারশো টাকা মাইনের চাকরী অমনি রাস্তায় পড়ে আছে ? হুঁ ! সেই সুরেশবাবুর কারসাজি, ভেবেছিল চাকরীর লোভ দেখিয়ে মেয়েটাকে গছাবে। বাবা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। চাকরী আর গাছের ফল নয়। ··গিয়েছিলেন এখন থোঁতা মুখ ভোঁতা করে সেক্রেটারী মহাশয়ের কাছে ! মনে করেছিলি—'খোঁড়া ন্যাংড়া বাপ, হেঁপো রুগী মা, দস্যি আইবুড়ো বোন, সবাইয়ের দায় এড়িয়ে বিদেশে গিয়ে সুখ করবো'—হলো ? ভগবান কি আর একেবারে মরেছে ?

সুবাসিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলেন—আমি অষ্ট প্রহর মা কালীর কাছে মানত করেছি, কানে শুনেছেন মা।·

অনেকক্ষণ পরে নিরঞ্জনের ঘরে আসিয়া দাঁড়ায় ললিতা।

-দাদা, ভাত খাবে এসো।

—ভাত ? ওঃ খাইনি বুঝি আজ ? আমি যে খেয়েছি ভেবে শুয়ে পড়েছি রে ?

নিরঞ্জন হাসিয়া ওঠে।

—দাদা ! আমায় মাপ করো।

—মাপ ? কেন বলতো ? রাত দুপুরে হঠাৎ কী ব্রহ্মহত্যার পাতক করে বসলি ?

—দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলে ললিতা—আমি মুখ্যু, স্বার্থপর, আমার কথায় নিজের আখের নষ্ট কোরো না দাদা !

নিরঞ্জন হাসিয়া বলে—তাই রাত দুপুরে অনুতাপ উথলে উঠলো ? কিন্তু কেই বা স্বার্থপর নয় বল তো ?

—সবাই ! সবাই দাদা ! তবে তুমিই বা কেন—

—হ্যাঁ আমিই বা কেন ! এতোক্ষণ ধরে তাই ভাবছিলাম ললিতা, আমিই বা 'কেন' ? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম কিম্ভূত কিমাকার যে সব টুকরোগুলো জুড়ে জুড়ে 'সংসার' নামক একটা যন্ত্র তৈরি করা হয়, তার জন্য কিছু নাট্ বোল্টু স্ক্রুরও দরকার আছে তো ? তা' নইলে টুকরোগুলো আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে যে ?

—দাদা, আমি যে জীবনে তোমায় মুখ দেখাতে পারবো না—

—সর্বনাশ ! তা'হলে যে বাস করাই দায় রে—তোর বকুনি না খেলে যে ভাতই হজম হয় না। নে এখন চল খেতে দিবি। হঠাৎ মনে হচ্ছে খিদে পেয়েছে ভীষণ।···দূর, কেঁদে মরছিস কেন ? তুইও খাসনি বুঝি এখনো ? নির্ঘাৎ

খিদে পেয়েছে, তাই কান্না পাচ্ছে।

সস্নেহ মমতায় ছোট বোনের মাথায় একটা চাঁটি মারে নিরঞ্জন।

হয়তো—কাল সকালেই আর আজকের এই স্নেহ সকাতর আর মমতামধুর চিত্তের সন্ধানও মিলিবে না। স্বার্থের সংঘাতে আবার প্রখর হইয়া উঠিবে দুইজনে।...প্রতিযোগিতা চলিবে তীক্ষ্ন অস্ত্রের, পরস্পরকে বিঁধিবার জন্য। নিরঞ্জন নিজের বোকামীর জন্য গালি দিবে নিজেকে...হয়তো বা স্কুলের সেক্রেটারীকে জবাব দিয়া আসিয়া আবার চিঠি লিখিতে বসিবে সুরেশবাবুকে, আজকের চিঠির জন্য ক্ষমা চাহিয়া।...সবই হইতে পারে।

মানুষ যে বহুরূপী।

অথচ সত্যই যদি তাই হয়, দোষ দেওয়া যায় কি নিরঞ্জনকে ?

আচ্ছা, কাকেই বা দোষ দেওয়া যায় ?

সুবাসিনী ? বিমলাচরণ ? ললিতা ?

ওদের অবস্থায় ওর চাইতে কম স্বার্থপর হইবার ক্ষমতা কার আছে ?

[১৩৬৩]

ফলিত জ্যোতিষ

করকোষ্ঠী বিশ্বাস করেন আপনারা ? করকোষ্ঠী বিচার ? বিশ্বাস করেন, ভালো কথা ! না করেন—আজ থেকে করবেন। কারণ—আমি করি।

অবিশ্যি করি বললে খুব ঠিক বলা হয় না, এই কিছুক্ষণ আগে থেকে করছি ! ভীষণভাবে করছি।

সত্যি বলতে—এযাবৎ হেসেই উড়িয়েছি ওসব। বারো তেরো বছর আগে, বোধ হয় উনিশশো চল্লিশের অক্টোবরে, যেবারে পুজোর বন্ধের সময় নিতাইমামা এসে বাড়িতে হাত দেখার ঢেউ তুলেছিলেন, সবাই চোখকান বুজে বিশ্বাস করতে সুরু করেছিলো, শুধু আমি করিনি।

জন্মকালে মুঠো পাকিয়ে থাকার বদভ্যাসের দরুণ স্বাভাবিক নিয়মে কাঁচ হাতের চেটোয় যে আঁকিবুঁকিগুলো দেগে যায়, সেই ক'টা হিজিবিজি দাগই যে মানুষের ভবিষ্যৎ সারাজীবনের নির্ভুল ফটো, এমন হাস্যকর কথা আর যে বিশ্বাস করে করুক, আমি করতাম না।

যদিও বয়েসটা আমার খুব বেশী ছিলো না তখন, তবু মন্দই বা কি ? সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছি, আর নিখিল বিশ্বকে একান্ত কৃপাকটাক্ষে দেখতে সুরু করেছি। গুরু লঘু সকলের থেকে নিজেকে নিতান্ত বিজ্ঞ মনে হচ্ছে।

কাজেই বাড়িসুদ্ধ, মায় পাড়াসুদ্ধ দোহাত্তা সবাই যখন নিতাইমামার কাছে এসে হাত দেখাতে লেগেছিলো, আমি 'যতোসব বোগাস' বলে চুপচাপ বসেছিলাম।

হ'লে হবে কি, শেষ পর্যন্ত একদিন আবার দেখালামও।

বিশ্বাস করে নয়, বুজরুকি ধরে ফেলবার সাধু সংকল্প নিয়ে। যতোদূর মনে আছে, নিতাইমামা দিদির বাড়ি—অর্থাৎ আমাদের বাড়ি—বেড়াতে এসে দিব্যি জমিয়ে বসেছেন। যখনি দেখি, তখনই চোখে পড়ে কারুর না কারুর হাত বাগিয়ে ধরে বিদ্যার পুঁজি হাতড়াচ্ছেন। আমরা আড়ালে নাম দিয়েছি 'মাছিবেষ্টিত কাঁঠাল'!

বাড়ির লোকেরা একবার দু'বার দেখিয়েছে, আবারও দেখাচ্ছে, বারবার দেখাতে চাইছে। এ-পাড়ার ও-পাড়ার লোকেরাও ক্রমশই ভীড় বাড়াচ্ছে।

আসছেন—মার তাসের আড্ডার সঙ্গিনীরা, পিসিমার পশমবোনা সভার বান্ধবীরা, কাকাদের বন্ধুরা, এমন কি বাবার অফিসের সহকর্মীরা পর্যন্ত।

ফলে সবসময়েই বাড়িতে একটা রম্‌রমা ভাব চলছে।

যখন তখন উনুনে চায়ের কেটলি চাপছে, ঠাকুর 'বাপরে মারে' করছে, বোনেরা পান সাজতে সাজতে কাহিল হয়ে যাচ্ছে, বাড়ির গৃহিণীকুল সকাল থেকেই সাজ সাজ রবে কাজ সারছেন, যাতে রঙ্গস্থলে এসে বসবার টাইমটা বেশী বেশী পান।

শুনতে পাচ্ছি, নিতাইমামার গণনায় সবাইয়ের সবকিছু নাকি মিলে যাচ্ছে, ক্রমশই পশার বাড়ছে নিতাইমামার।

ভাবলাম—নাঃ, আর সহ্য করা যায় না। দেখি—ভাঁওতা ধরে ফেলতে পারি কি না। আমার সঙ্গে আর চালাকি চালাতে হবে না!

বললাম গিয়ে—কই নিতাইমামা, আমার হাতটা দেখো দিকিনি আজ।

সেইমাত্র পাড়ার ক'টি গিন্নী প্রসন্নবদনে বিদায় নিয়েছেন। মামা তাদের কাউকে তীর্থবাস করিয়ে, কাউকে এয়োস্ত্রী বেলায় মেরে ফেলে, কারুর ছেলের জন্যে ভালো চাকরি, আর কারুর মেয়ের জন্যে সুপাত্রের আশ্বাস দিয়ে সবে হাঁফ ফেলে বসেছেন।

আমায় দেখে বললেন—নো নো! এখন ভীষণ টায়ার্ড!

রেগে গিয়ে বলি—তাতো হবেই, এ নিজের ভাগ্নে কি না, এর বেলায় তো ছুতো দেখাবেই। হ'তো পাড়ার একপাল মুট্‌কী গিন্নী, মনের আনন্দে দেখতে বসতে!

মামা গম্ভীরভাবে বললেন—অবিশ্বাসীর হাত আমি দেখি না।

আমি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলি—কে বললে আমি অবিশ্বাসী?

—বলছে তোমার মুখ চোখ। আমি তো বাপু পরীক্ষা দিতে আসি নি?

আমি নরম হয়ে বলি—বেশ তো, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মানো সেও তো একটা পুণ্য কাজ। মহাপুরুষরা করেন। তাই করো।

নিতাইমামা হেসে বলেন—তোর ভূত আর বর্তমানের কোন্ বিশেষ ঘটনাটা আমার অজানা তাই বল? বলতে পারলে নিশ্চয় বাহাদুরির প্রশংসাপত্র দিবি না? বাকী থাকে ভবিষ্যৎ। সে কিছু আর সদ্য সদ্য প্রমাণ করানো যাবে না। অতএব বিশ্বাস উদ্রেকের অস্ত্র আমার হাতে নেই বৎস, সরে পড়ো।

চটেমটে বলি—মামা, ভূতের কাছে মামদোবাজী চলে না—কেমন ? কিন্তু আমি শুনছিনা, বলতেই হবে তোমায়। আচ্ছা কি বলো শুনি ? ভবিষ্যতেই না হয় মিলিয়ে দেখবো।

ভেতরের কথা খুলে বলতে গেলে বলতে হয়—একেবারে ভেতরে ভেতরে একটু সখও হচ্ছিলো। সবাই দিব্যি যখন তখন আসর জমাচ্ছে, আমিই হয়ে রয়েছি একঘরে। মান খুইয়ে তো আর বলতে পারি না সে কথা !

ইত্যবসরে দেখি—

দরজার কাছে চারখানি মুখ উঁকি মারছে।

মুখগুলি অবশ্য আমার অচেনা নয়, আমারই দলভুক্ত প্রজা। বড় পিসিমার ছেলে নন্তুদা, তার খুড়তুতো বোন কমলা, পাশের বাড়ির অজিত, আর তার ভাগ্নী অন্নপূর্ণা।

বড় পিসিমার শ্বশুরবাড়ি আমাদের পাড়াতেই। সেই সুবিধেয় আমাদের এই পঞ্চরত্নের দলটি। আশৈশব সঙ্গী বলেই বোধহয় মেয়ে দু'টো এখনো আমাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয়নি, তবে 'বুড়ো ধিঙ্গি মেয়ে, এখনো ওদের সঙ্গে কেন ?'—তলে তলে এই অন্তরটিপুনী খাচ্ছে, তার আভাস পাই।

আমি ক'দিন বাড়ির গোলমালে দলে নিয়মিত যোগ দিতে পারিনি।

ওদের উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে মুরুব্বিয়ানা চালে বলি—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? আয়না এখানে ?

হঠাৎ মাতুলগৌরবে নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করি।

ওরা অবশ্য হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে দেরী করে না আর। এই ডাকটুকুর অপেক্ষাতেই ছিলো।

প্রশ্ন করি—এত লোক হাত দেখায়, তোরা কোনোদিন আসিস না কেন রে ?

কমলা গালভরা হাস্যে বলে—রোজ আসি, পালিয়ে যাই।

—কেন ? ভয় কিসের ?

নিতাইমামাও সহাস্যে প্রশ্ন করেন।

কেউ অবশ্য উত্তর দেয় না। ঠেলাঠেলি করে আর হাসে।

আমি অমায়িক উদারতায় বলি—ভয় কি ? আয় না ? দেখা হাত। আগে কে ? কমলা ? অন্ন ?

মামা একবার সব ক'টাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন—এখন হাত দেখতে নেই। তোমরা এখনো ছেলেমানুষ, হাতের রেখা কাঁচা আছে।

ভাঁওতা আর কাকে বলে !

মনে ভাবি, হুঁ বাবা বেশ বুঝেছো শক্ত পাল্লায় পড়েছো।

প্রায় ধমক দিয়ে বলি—বাজে বোকো না মামা, পনেরো ষোলো বছর বয়েস হয়ে গেলো সব, এখনো নাকি হাতের রেখা কাঁচা আছে ! বেশ তো, দু' দশ বছর পরে কে কি হবো তাই বলো না ? মরে তো আর যাচ্ছি না এক্ষুনি ?

কথাটা বেশ জোর গলাতেই বলি। মৃত্যু নামক ব্যক্তিটিকে বেশ বিচক্ষণ আইনজ্ঞ পুরুষ বলেই মনে করতাম তখন। কাজেই ঘোষণার মধ্যে অতোটা গলায় জোর প্রকাশ পেলো।

কমলা অন্নপূর্ণাকে 'মহিলা প্রথম' হিসেবে সকৃপা আহ্বান জানালেও ফস্ করে আগে হাত বাড়িয়ে দিলো অজিত।

—নিতান্তই দেখতে হবে?—বলে নিতাইমামা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওর হাতটি দেখে নিয়ে একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন—তোমার তো দেখছি 'রাজচক্রবর্তী-যোগ'!

অজিত ওঁর প্রসন্ন হাস্যের অভয় লাভে উৎসাহিত হয়ে বলে—তা'হলে বড়ো হয়ে আমি কি করবো মামা?

—কিছু করতে হবে না বাপু,—নিতাইমামা আর একবার হাতটা লক্ষ্য করে বলেন—খেটে খাবার জন্যে ঈশ্বর তোমাকে পাঠাননি হে! সারা জীবন তাকিয়া ঠেশ্ দিয়ে বসে খাবে তুমি! চক্রবর্তী-যোগ হচ্ছে একেবারে সেরা যোগ!

যদিও বিশ্বাস করি না, তবু ঈর্ষা-কণ্টকিত হৃদয়ে ভাবি—ঈস্! নিশ্চয় মোটা মোটা লটারির টিকিট! তা' ছাড়া আর কি!

অজিত তখনি এমনভাবে তাকাতে থাকে আমাদের দিকে, যেন তাকিয়া ঠেশ্ দিয়ে গড়গড়ার নল হাতে বসেছে, আর করুণা বিলোচ্ছে আমাদের।

অতঃপর নন্তুদা।

নন্তুদাকে দেখেন, আর দিব্যি এক রাজযোগের সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন। বলেন—তোমার হাতের এই যে চিহ্নটি দেখছো না? এটিও হচ্ছে রাজচিহ্ন। হরদম গাড়ি চড়ে বেড়াবে তুমি! মাটিতে দৈবাৎ পা পড়বে।

নন্তুদা বুক ফুলিয়ে জুত করে বসে। যেন এখনি গাড়ি কিনে ফেললো!

মেয়ে দু'টোকে যদিও দু'বার ভোগালেন—"বিয়ের আগে মেয়েদের হাত দেখা নিষেধ" ব'লে, তবু দেখতেও ছাড়লেন না।

কমলার হাত দেখেই পরম পুলকে বলে ওঠেন—আরে বাঃ তোমার হাতটিও তো চমৎকা—র! রাজরাণীতুল্য! তুমি তো বাছা রাতদিন খাটে শুয়ে আয়েস খাবে, আর দাসীতে বাতাস করবে।

কমলা চাপা আনন্দে ফিক্ করে হেসে ফেলে। আমিও মনে মনে হাসি।

ওঃ বোঝা গেছে, ছেলেমানুষ দেখে মামা মনোরঞ্জনের ব্রত নিয়েছেন। একধার থেকে রাজা রাণী করে ছেড়ে দিচ্ছেন সকলকে।

ঠিক তাই।

অন্নরও নাকি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাযোগ!

সে নাকি ক্ষুধিত দরিদ্রদের অন্নবিতরণ করবে! দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন মামা।

হাতের মাঝখানের একটি তিনকোণা দাগই নাকি তাকে এই অশেষ সৌভাগ্যের অধিকারিণী করে ছাড়বে।

শুনে মদগর্ব চালে গম্ভীর মুখে বসে থাকে অন্ন। বোধহয় অন্নদায়িনী

অন্নপূর্ণার পক্ষে একটু গম্ভীর ভাবই শোভন ভেবে।

আমি ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলি—যাক সবাইকে তো সব বললে, রাজা-মহারাজা রাণীমহারাণী করতে বাকী রাখলে না কাউকে, এবারে বলো তো আমি কি হবো?

নিতাইমামা গম্ভীরভাবে বলেন—তুই কিছু হবি না। না সাপ, না ব্যাঙ্।

রাগে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

ওঁর বুজরুকি বিশ্বাস করি না বলে বন্ধুবান্ধবীদের সামনে এভাবে অপদস্থ করা?

শুনে কমলি আর অন্ন লুকিয়ে খুক্ খুক্ করে হাসছে!

রাগে আগুন হয়ে যা মুখে আসে তাই বলে কটুকাটব্য করি নিতাইমামাকে।

নিতাইমামা নির্বিকার! রাগ নেই শরীরে।

হাসেন আর বলেন—আচ্ছা ঠিক বলেছি কিনা দেখিস পরে। যাকে যা বলেছি ঠিক হতেই হবে। এর নাম হলো ফলিত জ্যোতিষ! না ফলে উপায় আছে? অনেক মেহনত করে, অনেক খেটে খুটে বিধাতা পুরুষের কলমের কারসাজিটি ধরে ফেলতে শিখেছি, বুঝেছিস? আসলে অন্য কিছুই নয়, এ হচ্ছে এক রকমের শর্টহ্যান্ড—ইয়ে—সাঙ্কেতিক ভাষা! বিধাতা ব্যাটা ভেবে রেখেছিলো, এমন একটা কিম্ভূত ভাষায় মানুষের ভাগ্যলিপি লিখে রাখবো, মানুষ হতভাগারা ধরতে পারবে না। মানুষ জাতটা আবার তেমনি চালাক বাবা, হুঁ হুঁ! সে ভাষারও পাঠোদ্ধার করে ছেড়েছে।

মনে পড়ে—তারপর বেশ কিছুদিন যাবৎ কমলা, অন্ন, অজিত, নন্তুদা, ভবিষ্যৎ রাজ্যপদের মহিমা ঘোষণা ক'রে ক'রে খুব চাল ফলিয়ে বেড়িয়েছিলো। মুখে মুখে চরতে চরতে সকলেরই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো কথাগুলো।

তা' সে হ'লো গিয়ে ঊনিশ শো চল্লিশের কথা!

তারপর তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সারা পৃথিবী তচ্‌নচ্ হয়ে গেছে। ছেলেবেলাকার বন্ধুগোষ্ঠী কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে! কেউ কারুর খোঁজ রাখি না।

যাদের সঙ্গে একটা বেলা দেখা না হ'লে দিনটা মিথ্যে মনে হ'তো, তাঁদের বছরে একদিনও মনে করি না।

সুবিধেও নেই মনে রাখবার। অজিতরা তো কোনকালে পাড়া ছেড়ে উঠে গেছে। বড়োপিসিমা মারা গিয়ে পর্যন্ত ওঁদের সংসারটাও ছন্নছাড়া হয়ে গেছে—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই!

অবিশ্যি পুরনো বন্ধুদের ভুলে গিয়েছি বলেই যে খুব একটা আত্মধিক্কার আসে তা'ও নয়। দুনিয়াখানাই তো এই। আজ যার মুখ না দেখতে পেলে জগৎ অন্ধকার দেখি, কাল তার মুখখানা মনে করতে অন্ধকারে হাতড়ে মরি;

তবু হঠাৎ এই তিপ্পান্ন সালে একদিন মনটা ধাক্কা খেলো অকস্মাৎ নিতাই-মামার মৃত্যু সংবাদে! যদিও জ্ঞাতিমামা মাত্র, তবু ভারী ভালোবাসতাম তাঁকে।

সারাদিন নানাভাবে মনে পড়তে লাগলো। আহা, কতোকাল একখানা চিঠি লিখেও খোঁজ নিইনি! কী চমৎকার লোকই ছিলেন!

সেই—যেবারে এখানে এসে কিছুদিন থেকে গেলেন। নিতাইমামাকে কেন্দ্র করে বাড়িতে সর্বদাই যেন কী একটা উৎসব চলতো! মাতিয়ে রাখতেন সবাইকে।

আর সেই হাতদেখা!

মনের গতি নদীর জলের মতোই—থেমে থাকে না, এগিয়ে চলে।...হাতদেখা থেকে মনে পড়ে অজিত নন্তুদা'দের কথা।...আচ্ছা সত্যি ওরা এখন কোথায় আছে? কী ভাবে আছে?

পুরনো দিনের ছবি যদি কখনো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তো সে এমনি অলস-বিষণ্ণ মুহূর্তে। সেই দুর্বল মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম একবার খবর নেবো সক্কলের!

'নেবো নেবো' করেও ক'দিন কেটে গেলো, অবশেষে এই আজ সাঙ্গ করলাম খোঁজ নেওয়া।

খোঁজ নিয়েছি, সকলেরই নিয়েছি।

নিয়ে এসেই করকোষ্ঠীতে বিশ্বাস করতে সুরু করেছি। বুঝে ফেলেছি, কেন বলে 'ফলিত জ্যোতিষ'!

হায়! নিতাইমামা আজ নেই! কা'কে গিয়ে বাহবা দিয়ে আসবো? কার 'খুরে' দণ্ডবৎ করবো?

বারো বছর আগের সেই নিতান্ত অবহেলার গণনা যে এমন বর্ণে বর্ণে মিলে যেতে দেখবো, একথা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম?

দেখে এলাম নন্তুদা'কে—

গাড়িচড়া অবস্থাতেই দেখলাম! হরদম গাড়ি চড়ে বেড়ায়, মাটিতে পা ফেলবার ফুরসৎই নেই। কর্মক্ষেত্রের সব ক্ষেত্রে মার খেয়ে খেয়ে অবশেষে বাস্ কন্‌ডাক্‌টারের কাজ নিয়েছে।

চক্ষুলজ্জায় কলকাতার বুকের ওপর পারেনি বলেই বোধহয় হাওড়ার ওপারের বাসে আছে।

আমায় দেখে অপ্রতিভ হাসি হাসলো। ভাড়ার পয়সা নিলো না।

অজিতকে দেখে এসেছি।

মোটর এ্যাক্‌সিডেণ্টে দু'খানা পা-ই কাটা গেছে। হাঁটুর নীচে থেকে নির্মূল। তাকিয়া ঠেশ দিয়েই বসে থাকতে হয়, তা' ভিন্ন বসতে পারে না।

গিয়ে দেখলাম খাচ্ছে! তাকিয়া ঠেশান দিয়ে বসেই খাচ্ছে।

অন্নকেও বার করেছি অনেক তল্লাস করে।

মাতাল বদমায়েস স্বামীর হাত এড়াতে বাড়ি থেকে নাকি পালিয়েছিলো, অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষ পর্যন্ত রাঁধুনিবৃত্তি ধরেছে।

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! চাকরী করছে এক ধনী মাড়োয়ারীর নিত্যসেবার অন্নসত্রে।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম—ক্ষুধার্ত হতভাগ্যদের প্রচণ্ড হুঙ্কারে দিশে-হারা অন্নপূর্ণা দু'হাতে অন্ন বিতরণ করেও পেরে উঠছে না। বোধ করি চারখানা হাত থাকলেই ভালো হ'তো!

কমলার সঙ্গে দেখা করে এইমাত্র ফিরছি—কাঁচড়াপাড়া হাসপাতাল থেকে! আমায় দেখে খুসি ধরে না। বললো—'প্রথম প্রথম সবাই খুব আসতো, এখন আর কেউ তেমন পারে না। কি করেই বা পারবে? কাজ তো আছে সকলেরই?'

খাটে শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়েই কথা কইলো। উঠে বসবার হুকুম নেই। মাথার ওপর ফুল ফোর্সে পাখা ঘুরছে, তবু স্পেশাল ঝি মাথার কাছে বসে বাতাস করছে। বড্ডো শ্বাসকষ্ট! তা' ছাড়া আলাদা লোক রাখবার অবস্থা যখন রয়েছে ওর বরের, রাখবে না কেন?

ওঃ আমার কথাটা জিজ্ঞেস করছেন?

সে গণনাও নির্ভুল হয়ে আছে। সাপও হইনি ব্যাঙও হইনি, হয়েছি বাঙলা দেশের সাহিত্যিক! ফোঁস করি, কামড়াতে জানি না—লাফ্ মারি, এগোতে পারি না।

অতি চালাক মানুষ-জাতি বিধাতাপুরুষের কলমের কারসাজিটা ধরে ফেলতে শিখেছে সন্দেহ নেই, তাঁর অনেক জারি-জুরিই ধরে ফেলেছে। শুধু আজ পর্যন্ত ধরে ফেলতে পারেনি, লোকটা কতো বড়ো রসিক ব্যক্তি!

[১৩৬৩]

গোলক ধাঁধা

মামার বাড়িতে ঢুকতেই প্রথম দেখা মেজমামীর সঙ্গে। মামী সহর্ষ আহ্বান জানালেন—ওমা একি, সতু যে? কবে এলে?

সত্যজিৎ মোটা মাইনের চাকরী করে, বিদেশে থাকে, কদাচিৎ আসে। কাজেই সর্বত্র তা'র আদর আছে।

সত্যজিত টাইট্ পোষাক পরা দেহটাকে কোনো রকমে নীচু করে মামীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—এই তো আজ সকালেই এসে পৌঁছলাম? তারপর, সব ভালো তো?

—কেটে যাচ্ছে একরকম! তুমি?

—দেখছোই তো!—সত্যজিৎ হাসলো।

সত্যি চেহারাটি দেখবার মতো।

—বসবে চলো।

নিজের ঘরেই আগে নিয়ে গিয়ে বসাতে চান মেজ-গিন্নী। লোককে আদর

আপ্যায়ন করতে জানার খ্যাতি আছে তাঁর।

সত্যজিৎ বলে—ভালো কথা, বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখলাম কার যেন গাড়ি বেরিয়ে গেলো ?

—ও মা দেখেছো বুঝি ? তোমার সেজমাসী এসেছিলেন যে নতুন জামাই মেয়ে নিয়ে ? এই গেলেন। দু'মিনিট আগে এলে দেখা হ'তো। বেশ জামাই হয়েছে! বিয়ের খবর তুমি পেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ! সত্যজিৎ একটু থেমে ঈষৎ বিষাদের সুরে বললে—মেসোমশাই দেখতে পেলেন না!

—নাঃ! বিয়ের কাজ শুভকাজ, কিন্তু চোখের জল না ফেলে আর কেউ কিছু করতে পারলো না।…আর দেখোনা—বাপ গেলেই মামাদের দায়িত্ব।

সত্যজিৎ একটু অবহিত হয়ে বলে—তা' বটে!…মেসোমশাই তো আর কিছু রেখে যেতে পারেননি ?…খরচে লোক ছিলেন।

—সেই তো কথা! সেজঠাকুরঝি তো কিছুই বার করতে পারলো না, সবই মামাদের ওপর!…কথাটা বলে একটু থেমে একরকম রহস্যযুক্ত হাসি হেসে মামী বললেন—একান্নবর্তী সংসার, তাই মামা"দের" বলা! তা নইলে—প্রকৃত পক্ষে একজনেরই। যে ঘাড় পাতে, তা'র ঘাড়েই সব পড়ে।…অবিশ্যি 'তুমি' বলেই তাই এ কথা বললাম। তুমি কাউকে কিছু বলবে না জানি।

সভ্য ভব্যা মার্জিতভাষিণী মহিলা আর কিছু বলেন না। ওতেই যে যা বোঝে।

এরপর এটা ওটা কথা হয়। কানপুরের কথা ওঠে। সতু বিয়ে করছে না, এজন্যে আক্ষেপ করেন মামী, বলেন—বিয়ে করে সংসার পাতো-তো, আমাদের একটা বেড়াতে যাবার জায়গা হয়!

চা খাওয়ান, নিজের ঘরের আলমারি থেকে বিস্কুটের টিন বার করে বিস্কুট দেন।

এক সময় সত্যজিৎ চকিত হয়ে বলে—আরে, এক জায়গায় শেকড় গেড়ে বসে আছি, আর সব খবর কি ? বড়োমামী, ছোটামামীকে দেখছি না যে!

—আছেন—নিজের নিজের এলাকায়।

অগত্যা সত্যজিৎকেই যেতে হয় তাঁদের এলাকায়।

বড়োমামী অবশ্য সত্যজিতের আগমন-সংবাদ টের পেয়েছিলেন অনেকক্ষণ, কিন্তু পেয়েছিলেন সেটা টের পাওয়াতে দেন না। যেন আকাশ থেকে পড়েন—

—সতু যে ? তুই কতোক্ষণ ? এলি কবে ?

—আজই! অনেকক্ষণ এসেছি যে গো, আমার এই দরাজ গলা কানে যায়নি ?

অন্য কেউ এলে, যদি আগে মেজ ছোটর এলাকায় ঢোকে, বড়ো তাঁর সঙ্গে আর সহজে কথা ক'ন না, কিন্তু সত্যজিতের কথা সকলের থেকে আলাদা। ওকে অবহেলা করা চলে না।

বলেন—কি জানি বাবা, রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরেই তো দিন কাটে, কে কোথায় আসছে. বসছে, টেরই পাই না। আয় বোস।

বসার পর সতুর বিয়ের কথা তুলে অনেক কথা বলেন। বলেন, আজ যদি সতুর মা থাকতো, তা'হলে কি আর এমন ছন্নছাড়া হয়ে বেড়াতে পারতো সতু? অতঃপর সতুর বিয়ের কথা থেকে এসে পড়ে সতুর মাসতুতো বোনের বিয়ের কথা। বড়োমামী বলেন—কি আর বলবো বাবা, রোজগার তো নেহাৎ কম করতেন না ঠাকুরজামাই, কিন্তু কিছু রেখে যাননি! মেয়ের বিয়ের সব দায়িত্বই ঘাড়ে পড়লো মামাদের!

কিছু একটা উত্তর দেওয়া উচিত বিবেচনায় সতু বলে—হ্যাঁ, মেজমামীও তাই বলেছিলেন!

বড়মামী সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করেন—কি বলছিলো মেজবৌ?

সত্যজিৎ সচকিত হয়ে বলে—ওই যে, মেসোমশাই কিছু রেখে যাননি, তাই আর কি!

—আর কিছু বললো নাকি?

—কই? আর কি বলবেন?

—হুঁ! বলবার কিছু থাকলে তো! একটি পয়সা বার করতে হ'লেই তো মেজকর্তার মাথায় বজ্রাঘাত! ছোটোও তাই—চোরদায়ে ধরা পড়েছে শুধু বড়ো! চক্ষুলজ্জাই বলো, আর উচিত কর্তব্যই বলো, বড়োর যতোটা হবে তেমন আর কার হবে? সবাই 'পারবো না' বলে ঝাড়া জবাব দিতে পারে, বড়োয় পারবে?…এই তোমার বড়োমামার কথাই বলছি—নিজেই সেদিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছেন, আবার ধরো এই বিয়েটি দিতে হলো! 'হলো' বৈ আর কি? আর তো কেউ উপুড়হস্তটি করলো না!…কাউকে যেন বলিসনি কিছু! একটু কিছু করে, বলে বেড়ানো, তোর বড়োমামার দু'চক্ষের বিষ। তুই বলেই তাই চুপিচুপি বলছি!

মামারা কেউ বাড়ি নেই।

সময়টাও থাকবার মতো নয়। মামাতো ভাই'বোনদের সঙ্গে কথাবার্তা এটা সেটার পর সত্যজিৎ ওঠে। বড়োমামী বলেন—কাল এখানে খাস বাবা! মামাদের সঙ্গে দেখাই হলো না! তোর ঠাকুমাবুড়ি বেঁচে আছে এখনো? বাবাঃ! বুড়িরা যেন অমর বর নিয়ে আসে। মা কবে মরে গেলো, রইলো ঠাকুমা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে সামনেই ছোটমামীর সঙ্গে দেখা।

ছোটমামী মৃদু হেসে বললেন—সবটুকু সময় আসল মামীদের কাছে খরচ করে আসা হলো তো?

—আসল মামী মানে?

—তা'ছাড়া আর কি? সেই থেকে গলা পাচ্ছি, ভাবলাম কানপুরের গল্প শুনবো একটু। কানপুরে আমার পিসিমা রয়েছেন এখন!

—তাই নাকি ? কে বলো তো ?

—সতীশচন্দ্র রায় হচ্ছেন আমার পিসেমশাই, উনি অবিশ্যি বুড়ো হয়েছেন। কাজ করেন আসলে পিসতুতো দাদা শ্যামলচন্দ্র রায়! আমাকে একবার ওখানে যাবার জন্যে কতো বলেন—

—বেশ তো চলো না ! আমি তো ফিরছি ক'দিন পরেই—

—আর যাওয়া !···ছোটমামী একটু হতাশ ভঙ্গী করেন—যাও বা হ'তো, এখন আর সে কথা মুখে আনা যাবে না। সম্প্রতি অনেক খরচ তো হয়ে গেল !

সত্যজিৎকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাতে দেখে ছোটমামী একটু মুখটেপা হাসি হাসেন।···বলেন—দৈবক্রমে যে বেচারা দু'টো পয়সা বেশী রোজগার করতে পেরেছে, সেই তো চোরদায়ে ধরা পড়েছে !···এই যে—সেজঠাকুরঝির মেয়ের বিয়ে হলো। এই একজনের মাথার ওপর দিয়েই তো ? যাকগে এ নিয়ে আর কথা না তোলাই ভালো। কাউকে যেন বোলোনা বাপু।

সত্যজিৎকে সকলেই একটা কেওকেটা ভাবে, তার কাছে মনের কথা বলতে পেলে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যায় !

ননদের মেয়ের বিয়ের কথা ছাড়া অন্য কথাও দু'চারটি হয় অবশ্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতোটা হওয়া সম্ভব।

শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎ পথে বেরোতে ছোটমামী দরজা বন্ধ করতে এসেও কথার জের টানেন—এখন সোজা বাড়িই যাচ্ছো তো ?

—না, ভাবছি—একবার সেজমাসীর বাড়ি ঘুরে যাবো।

—ওমা তাই বুঝি ? এই তো এসেছিলেন সেজঠাকুরঝি, মেয়ে জামাই নিয়ে কালীঘাট ফেরত ! একটু আগে এলে এখানেই দেখা হতো !···আচ্ছা কিছু যেন বোলো টোলো না ওঁকে ?

সত্যজিৎ বিস্মিত হয়ে বলে—কি বলবো না ?

—না, আর কিছু নয় ! ওই মেয়ের বিয়ের খরচ পত্তরের কথা ! কে দিলে না দিলে, এই সব—মানী মানুষটা দুঃখিত হবেন।

সেজমাসী, বোনপোকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠেন। বলেন—এ মুখ দেখতে কেন আর এলি বাবা ?···বলেন—এতোগুলো অপোগণ্ড যদি আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে না যেতেন, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চিতায় উঠতাম। ···বলেন এমনি অনেক কিছু

ক্রমশঃ শান্ত হন।

স্বভাবতঃই মেয়ের বিয়ের কথা ওঠে, যেটা সাম্প্রতিক ঘটনা। কেমন বিয়ে হলো, জামাই কি করে, ইত্যাদি।

তা'রপর ঈষৎ কৌতূহলের স্বরে বলেন—হ্যাঁরে টাকার কথা কাউকে বলতে বারণ করেছিলি কেন ?

সত্যজিৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলে—ভারী তো দিতে পারলাম ! সামান্য কিছু যৌতুকের মতো—তোমার যা স্বভাব হয়তো বলে ফেলবে একে ওকে। তাই

আগে ভাগেই বারণ করে দিয়েছিলাম।

'সামান্য কিছু' কেন বাবা? বারো শো' খানি টাকা কি কম? কে দিচ্ছে? দিদি কবে গেছেন—তুই বোনপো—তুই মনে করে অতোগুলি দিলি, আর অমন কেষ্ট বিষ্টু দাদারা আমার, কি করলেন? বলতে ঘেন্না। এখানে আমার জা ভাসুরের কাছে মুখ দেখাতে পারিনে লজ্জায়। শুনবি লজ্জার কথা? তিন ভাইয়ে মিলে মেয়ের বিয়ের বেনারসীখানা আর কুল্লে দু'শোটি টাকা নগদ! আর কিছু না। জামাইকে আশীর্বাদ করলেন কর্তাগিন্নীরা দু'টো করে টাকা দিয়ে। একটু সোনা দিতে জুটলো না। নিজের যা যথা-সর্বস্ব ছিলো ঘুচিয়ে গয়নাগুলো হলো মেয়ের, তোর টাকাটায় ফুলশয্যা বরাভরণ সব কিছুই সারলাম।

সতু ব্যস্ত হয়ে বলে—তাই আমার হয় না কি? কি যে বলো?

—গরীবের মতই হয় বাবা, হওয়াতে হয়। তারা নগদ নিলে না তাই হলো। তোর কাছে তাই বললাম। যা ভগে বলিসনে কাউকে কিছু? বলবেন—বোনের কিছুতেই আর মন ওঠে না!

ধাঁধাঁ-গ্রস্ত সত্যজিৎ মাসীর বাড়ি থেকে বেরোতেই মাসীর বৃদ্ধ ভাসুরের সঙ্গে দেখা।

সতুকে সবাই চেনে।

মা-মরা ছেলে—আগে মাসীর বাড়ি কতো এসেছে—থেকেছে। তখন কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করতো না, এখন করে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে চেনার ভান করে বলেন কে সতু না?

আজ্ঞে হ্যাঁ!

হেঁট হয়ে জুতোর ধুলো নেয়।

—থাক্ বাবা থাক, দীর্ঘজীবি হও। কবে এলে? চলে যাচ্ছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকক্ষণ এসেছি। কেমন আছেন?

—আর থাকা! হতাশ নিঃশ্বাস ফেলেন বৃদ্ধ—এই তো ভালো থাকবার ব্যবস্থা ভগবান করে দিয়েছেন! এই বয়সে দু'টো সংসারের দায় মাথায় চাপিয়ে দিলেন। যাক্—করবার ক্ষমতাটুকু যেন রাখেন! এই তো একটা মেয়েকে পার করলাম, আর একটার আজকালই দিলে হয়। ছেলে দুটোর পড়ার খরচ! তোমার মামারা ছাপোষা মানুষ, তাঁদের ওপর কিছু ভরসা করা তো চলে না। ··আচ্ছা এসো বাবা! ক'দিন আছো কলকাতায়?

—দিন চারেক। আবার আসবো একবার···আচ্ছা জ্যেঠামশাই চলি।

—বাড়িই ফিরছো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখন আর কোথাও যাবে না সতু, বাড়ি গিয়ে কিছু বিশ্রাম করবে।

যে গোলোক ধাঁধায় ঢুকে পড়েছে, ঠাণ্ডা মাথায় তা'র থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে হবে।

কিন্তু কোথায় পথ ? অনেকগুলো মুখ !

যে মুখটাই দেখছে, মনে হচ্ছে নিতান্ত সরল, অথচ শেষ পর্যন্ত দিশে পাচ্ছে না।

[১৩৬৩]

হুঁশিয়ার

নিতান্ত 'লেট' না হইলে প্রায় প্রত্যহই অফিস যাইবার পথে বিশুদার দরজায় হানা দিয়া যাই। গন্তব্য স্থলটা এক না হইলেও পথটা এক, এবং পথের সঙ্গী হিসাবে বিশুদা লোকটা নিন্দার নহে। পান, সিগারেট সম্বন্ধে তো মুক্ত হস্ত।

তা'ছাড়া এখানকার এই সদা দুর্ঘটনাময়ী নগরীর পথে পথসঙ্গী একজন থাকাই ভাল। মরি তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু বাড়ির লোক খবরটাও পাইবে না ? গাদার মড়া হইয়া মর্গে যাইব ?

"বিশুদা" বলিয়া হাঁক দিয়া দরজাটা ঠেলিয়া খুলিতেই বৌদির তারস্বর কানে আসিল। মৌলিক বিশেষণালঙ্কৃত জ্বালাময়ী বক্তৃতাভঙ্গী শুনিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না ভদ্রমহিলা রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন।

যত দূর মনে হয়—উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আমাদের গোবেচারা বিশুদা নহেন, বোধ করি চাকর কিম্বা ঠাকুর। ঘি, তেল, অথবা বাজারের পয়সার ঘাটতির পথ ধরিয়া প্রাতঃকালেই এই দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিতভাবে গলার স্বর খাটো ও মাথার কাপড় দীর্ঘ করিয়া তিনি কহিলেন—"ঠাকুরপো যে ! একেবারে রেডি ? তোমার দাদার তো এখনো কিছুই হয়নি—"

দোতলার বারান্দা হইতে দাদা দরাজ গলায় কহিলেন—"কিছুই হয়নি মানে ? এই তো সব কমপ্লিট, আধ মিনিট—তুমি এগোও হে—আমি ধরছি গিয়ে।"

অবশ্য ধরাধরির প্রয়োজন যে খুব বেশী আছে, এমন নয়। পৌনে ন'টা হইতে নটা চল্লিশের মধ্যে যে কোন সময়েই বাড়ি হইতে বাহির হই, সদর রাস্তায় পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই যে, চোখের উপর দিয়া একখানি বাস ছাড়িয়া যাইবেই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

তাহার পরে ঈপ্সিত নম্বরের বাসখানি ছাড়া অজস্র বাস আসিবে, যাইবে, দাঁড়াইবে, এবং আমি অনিশ্চিত দীর্ঘকালের জন্য শুধু দাঁড়াইয়াই থাকিব। এই আমার বিধিলিপি ! বুঝিলাম বাড়ির গৃহিণীর গলাবাজিটা, পাড়ার লোককে শুনাইবার ইচ্ছা দাদার তেমন নাই, তাই অগ্রসর হইবার উপদেশ। কিন্তু বৌদি নিজেই আমাকে ডাকিয়া সালিশ মানিয়া বসিলেন—

—"কাণ্ডটা শুনেছ ঠাকুরপো ? একেবারে ডাকাত নিয়ে বাস করা ! ঠাকুরটা আসেনি বলে ঝিকে পাঠিয়েছিলাম খোঁজ নিতে। এসে বললো—হতভাগার 'জ্বর হয়েছে' ! আর শুনেছো—আমাদের একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে দিব্যি আরাম

কোরে শুয়ে আছে! এ্যাঁ, দিনে ডাকাতি আর কাকে বলে? ওই কম্বল আজ ক'দিন হ'ল হারিয়ে গেছে, খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ভাবলাম রেলিং থেকে রাস্তাতেই পড়ে মরেছে বুঝি বা। কি না ঠাকুর মুখপোড়ার কীর্তি! এ রকম লোক বাড়িতে রাখলে রক্ষে আছে?

বলিলাম—"ওদের কথা আর বলবেন না, আমার চাকর ব্যাটা তো বাড়ির যত শিশিবোতল আর পুরনো বইয়ের গাদা লুকিয়ে বেচে বেচে বড়লোক হয়ে গেল। সেদিন কি যেন দরকারে একটা দু' আউন্স শিশি খুঁজে পেলাম না বাড়িতে—"

বৌদি গালে হাত দিয়া কহিলেন—"সেই লোককে এখনো রেখেছ বাড়িতে?"

—"কি করি, লোক পাওয়াও তো দুষ্কর।"

—"তাই বলে বাড়িতে চোর পুষে রাখবে? সুবিধে পেলে যে গেরস্থর গলায় ছুরি দেবে না তার প্রমাণ কি?

প্রমাণ অবশ্য কিছুই নাই, তবে তর্ক তুলিবার মত যুক্তি নয় বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলাম।

—"হাসছ? পরে টের পাবে। আমি কিন্তু ও হতচ্ছাড়া ঠাকুরকে আর রাখছি না।"

প্রমাদ গণিলাম।

অন্নপূর্ণার হাতে হাঁড়ি পড়িলে বিশ্বনাথের দুর্গতির ইতিহাস আমার অবিদিত নাই। জ্বলন্ত ভাত এবং দুরন্ত মুখনাড়া হজম করিতে করিতে কখন যে অফিসে পৌঁছিবেন ঈশ্বরই জানেন। মোটের মাথায় আমি বেচারা পথের মাঝখানে বেঘোরে মারা পড়িলে, বাড়িতে খবর দিবার লোক পাইব না।

তাড়াতাড়ি ওকালতীর সুরে বলিলাম—"ঠিক আপনার কম্বলটাই কি ঝি চিনতে পেরেছে? হয়তো এক ধরনের জিনিস—"

"বললে শুনবো কেন?" বৌদি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—"হয় নয়' নিশ্চয় জানতে মাধাইকে পাঠাইনি আমি? ও চেনে না? তোমার দাদার অফিসের ছাপ মারা কম্বল—ভুল হ'লেই হ'ল?"

অফিসের ছাপ মারা যখন, তখন আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কম্বলে অফিসের ছাপ থাকায় আশ্চর্যের কিছুই নাই, বিশুদা "মিলিটারি" নামক কল্প-বৃক্ষের সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন।

লোকটার সাহস বটে, নিত্য যেখানে তত্ত্বতল্লাসের সম্ভাবনা, কোন ভরসায় সেখানে ছাপমারা জিনিস চুরি করে? তবু সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"একবার করে ফেলেছে, খুব ক'রে ধমকে দেবেন। এই শীতকালে ছাড়িয়ে দেবেন? আপনার শরীরটাও তো বিশেষ ভালো নয়।"

—"হুঁ আমার আবার শরীর! বলে—ভূতের আবার জন্মদিন। সব সহ্য হয়, চুরি চামারি সহ্য হয় না বাপু।"

বুঝিলাম ঠাকুরের অন্ন উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশুদারও।

বাসের প্রতীক্ষায় মিনিট পনের দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দেখি বিশুদা কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে হাঁসফাঁস করিতে করিতে আসিতেছেন।

বলিলাম—"কি বিশুদা, আধ মিনিট হ'ল ?"

—"কেন কেন খুব দেরী হ'ল নাকি ? নাকের সামনে দিয়ে গিয়েছে তো একখানা ?···যায়নি ? তবু ভালো, বেরুবার কি জো আছে রে দাদা—দেখ'র তো গিন্নির মেজাজ ? শান্ত ক'রে না এলে সারাদিনে স্বস্তি পাবো ?"

উত্তর দিবার পূর্বেই অনাবৃষ্টির আকাশে আকস্মিক মেঘোদয়ের ন্যায় একখানি পাঁচ নম্বর বাসের ললাটরেখা দৃষ্টিগোচর হইল।

—"এসে গেছে !"

—"এলেন ? খুব কপাল জোর আজ দেখছি যে···ওহে ভাল কথা মনে পড়েছে—তোমার বৌদির সিঁদুরের কি করলে ?"

—"ও গড্। বড্ড ভুলে গেছি, আনবো—আজই আনবো।"

কেমিক্যাল ফার্মেসীতে কাজ করি। যুদ্ধের বাজারে চীনের সিঁদুর দুর্লভ হওয়া পর্যন্ত পাড়ায় বৌদিদের ভেজালবর্জিত সিঁদুর সরবরাহের ভার আমিই লইয়াছি।

না, হাসির কিছু নাই, শুধু বৌদিদের নয়, পাড়ার দাদাদেরও আইডিন, গ্লিসারিণ, স্পিরিট, অ্যালকোহল প্রভৃতি জোগাইতে কার্পণ্য করি না।" "কোম্পানীকা মাল দরিয়া মে ডাল্"—এ তো পাড়ার লোক !

ফিরিবার পথে অবশ্য প্রায় একলাই আসিতে হয়, বিশুদার সঙ্গে এক বাসে আসিবার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই, সেদিন দৈবাৎ ঘটিয়া গেল। সিঁদুরের প্যাকেটটা পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলাম—"দিয়ে দেবেন বৌদিকে।···কি ওটা ? কাগজ নাকি ? পেলেন কোথায় ?"

খবরের কাগজ মোড়া রোল করা বাণ্ডিলটা ঈষৎ নাড়িয়া চাড়িয়া দাদা গলার স্বর খাটো করিয়া উত্তর দিলেন—"কাগজ নয়, এক পিস রবার ক্লথ। কনিষ্ঠ পুত্রটির এখনও রোগ সারেনি—এ দিকে তো আবার নোটিশ এসেছে—"

দাদা মুচকি হাসিলেন।

অয়েল ক্লথ, রবার ক্লথের প্রয়োজন অবশ্য নাই, তবু বর্তমান বাজার দর লইয়া একটা মুখরোচক আলোচনার আশায় এমনিই প্রশ্ন করিলাম—"কত ক'রে নিলো ?"

—"কত ক'রে ? ফোঃ। কিনছে কে ? গৌরীসেনের জিনিস, বুঝলে না ভায়া ? 'গ্যাঁড়াফাই' করা গেল খানিকটা। ব্যাটারা ভাবে, 'হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না' হুঁঃ ! তাই তো বোঝাচ্ছিলাম তোমার বৌদিকে, সামান্য একখানা কম্বলের জন্য মাথা গরম করা কেন, কয়েকটা দিন সবুর করো একেবারে খান চারেক পেয়ে যাবো ! তা' কে শোনে ? তাঁর আর কি, ঠাকুর তাড়িয়ে এক বেলা করে পাঁউরুটির বরাদ্দ করে রেখে দেবেন। আমারই মৃত্যু। দু'বেলা দু'টি ভাত না পেলে—তা সেই এক বাঙ্গালে গোঁ ধরে বসে আছেন—'বাড়িতে চোর পুষে রাখতে পারবো না।"

[১৩৬৩]

বীণার মা কলকাতা শহরে ঝি-গিরি ক'রছে আজ বছর বারো চোদ্দ, কিন্তু বীণা কখনো কলকাতা দেখেনি! অল্প বয়সে স্বামী মরতে বীণার মা তিন বছরের মেয়েটাকে নিঃসন্তান ননদের কাছে সঁপে দিয়ে, লোকনিন্দে তুচ্ছ ক'রে নিজে বেরিয়েছিল জীবিকার সন্ধানে।

অবিশ্যি নেহাৎ একা বেরোয়নি, কতোই বা বয়েস তখন বীণার মার? বড় জোর কুড়ি। এ পথের পথপ্রদর্শিকা ওর এক দূর সম্পর্কের দিদিমা মানদা।

নিজে মানদা ওই কর্ম ক'রে চুল পাকিয়েছে, আর বছরে—দু'বছরে যখনি একবার ক'রে দেশে এসেছে, দু'একটি দুঃখিনী বিধবাকে কর্মক্ষেত্র দেখাতে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে আর যত কিছুরই অভাব থাক, দুঃখিনী বিধবার তো অভাব নেই?

কাজে কাজেই জায়গা বুঝে টোপ ফেলতে পারলেই দু'একটা শিকার বঁড়শি গিলবে নিশ্চিত। মানদা বুড়িকে ঝিয়েদের আড়কাঠি বললেই ঠিক বলা হয়। কলকাতা শহরে যে কি প্রচুর পরিমাণে ভাত কাপড় ছড়ানো আছে, শুধু কুড়ানোর ওয়াস্তা--এটা বুঝিয়ে দেবার মত বুদ্ধি আর ভাষা মানদার যথেষ্ট আছে।

সে ভাষায় আতিশয্য নেই, নিজের আগ্রহের নিরাবরণ প্রকাশ নেই। সে ভাষা স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমার। ভুলিয়ে ভালিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না তো সে?

প্রথম ইতিহাস এই—

লোকনিন্দার ভয়ে মুহ্যমান নাতনীকে পিছনে ঘোমটা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে মানদা বীণার মার জ্ঞাতি ভাসুর আর ননদাইকে ডেকে সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রল—তোমরা তো বাছা পাড়ার মাতব্বর, তোমাদের কাছে হক্ কথা পাব। এখন বল দিকি কাজটা কি নিন্দের হচ্ছে?···নাতনী তো আমার সেই ভয়ে কাঁটা হ'য়ে রয়েছে।

শুনে ননদাই বসে বসে ঘাড় চুলকোতে লাগলো, কারণ কাজটা যে নিন্দের তা'তে তার তিলমাত্র সন্দেহ না থাকলেও সে কথা স্পষ্ট বললে উল্টো দিকে বিপদ। বীণাকে নিয়ে বীণার মা স্বামী মরা অবধি তার আশ্রয়েই রয়েছে। মুক্তিদায়িনী রূপে যদি বা মানদা এসেছে, কোন্ কথায় পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবে কে জানে!

কাজেই সে বসে বসে ঘাড় চুলকোতে লাগলো।

জ্ঞাতি ভাসুরের বুক তাজা, সে তাজা বুক টান করে দরাজ গলায় বললো—তা' আজ্ঞে, গাঁ ঘরের বৌ ঝি, বয়েসটা ভাল নয়, শহরে বেরোলে নিন্দেমান্দা হবে বৈ কি! কে কার মুখে হাত চাপা দেবে আপনিই বল?

মানদা গম্ভীরভাবে বললে—খুব ঠিক কথা। আমিও এ কথা অস্বীকার করিনে। বরং একশোবার বলব এমন আর করিলে শ্বশুর ভাসুরের উঁচু মাথাটা হেঁট হবে।

অনেকদিন কলকাতায় আছে মানদা, কথার সৌষ্ঠব শিখেছে।

পিছনে দণ্ডায়মানা বীণার মা বিস্ময় স্পন্দিত বক্ষে ভাবতে থাকে···আরে, এ আবার কি উল্টো সুর! এই তো কাল থেকে বুড়ি আমাকে যাবার জন্যেই জপাচ্ছে! এখন এদের সামনে অন্য মূর্তি কেন?

ভাসুর ভাবলো···বুঝেছি, বৌ ছুঁড়িই বুড়িকে ধরে পড়েছে, এখন বুড়ি তার হাত এড়াতে তাদের সালিশ মানতে এসেছে। অতএব সে সোৎসাহে মানদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—এই দেখ, আপনি প্রাচীন লোক আজ্ঞে ঠিক বুঝেছো। 'হ্যাঁট' বলে 'হ্যাঁট'! উঁচু মাথাটা আজ্ঞে মাটিতে নুটিয়ে পড়বে না আমাদের, ঘরের বৌ শহরে বেরোলে?···কি বোনাই, তুমি মুখে রা কাড়ছ না যে? বল, হক কথা কইছি কি না?

মানদা আরো গম্ভীর হ'য়ে বললো—ও আর কি বলবে, জামাই মানুষ! শালাজ বৌর নিন্দে রটলে তো আর ওর গালে চুনকালি পড়বে না! সে পড়লে তোমাদেরই পড়বে! কথায় বলে এক ঝাড়ের বাঁশ। বংশ মর্য্যেদার থেকে তো উঁচু কিছু নেই?

ভাসুর উৎফুল্ল বদনে অবগুণ্ঠনবতী ভাদ্রবধূর পানে চেয়ে মনে মনে ভাবে · হুঁ এখন জব্দ হ'লে তো? এখনকার বৌ-ঝিয়ের যেমন দশা! কাল সোয়ামী মরেছে, আজ নাচতে নাচতে শহরে ছুটতে চাইছেন। গুষ্ঠির মুখে চুনকালি দেবার মতলব আর কি!

মানদা একটু দম নিয়ে বলে—কাল এস্তক আমি তাই বোঝাচ্ছিলাম ছুঁড়িকে! বলি—যতই হোক্ তোর শ্বশুরকুলের ওরা একটা মান্যমান লোক, এতে রাজী হবে কেন?···তবে আর কথা কি বাছা, তুমি তা'লে ছুঁড়িটাকে আর ওই দুধের বাচ্ছাটাকে তোমার সংসারেই এক চিল্‌তে ঠাঁই দিয়ে রাখ। দেখে আমি স্বস্তি হয়ে চলে যাই।

বলা বাহুল্য, আচমকা এ হেন লাঠির ঘায়ে ভাসুরের উৎফুল্ল মুখ 'কড়ি' হয়ে যায়। সে বিরস স্বরে বলে—আমি কোথায় ঠাঁই দেব? বলে আপনি খেতে ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে! নিজের বাচ্ছাকাচ্চা কডাকেই পাল্‌তে পাচ্ছিনে, আবার গেঁয়াতি ভেয়ের সংসার!

মানদা ঈষৎ অসন্তোষ সুরে বলে—তবেই তো বাছা! কেষ্টর জীব দু'টো, অনাহারে ঘরে পড়ে হত্যে হবে, এও তো সত্যি নেয্য নয়? গাঁয়ের নোক নিন্দে করতে পারবে, অথচ এক মুঠো ভাত দিতে পারবে না, তা'হলে 'অবীরে বেধবা' যায় কোথা? বেশ, তুমি সমাজ ডেকে শুধোও, যারা যারা নিন্দেমান্দা করবে তারা সব্বাই চাঁদা তুলে ওই জীব দু'টোর ভাত কাপড়ের ব্যেবস্থা করতে রাজী আছে কি না?

ভাসুর 'অসম্ভব'-সূচক মাথা নাড়ে।

অর্থাৎ কেউ রাজী হবে না।

মানদা সদর্পে একবার 'উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর' মুখের দিকে বিদ্রূপহাস্য-মণ্ডিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—তা' যখন রাজী নও, তখন তোমরা ওকে দুষতেও পার না বাছা! আমি ওকে নে যাব, আমার হেফাজতে রাখব, দেখে শুনে ভাল বাড়িতে ঢুকিয়ে দেব। কচি মেয়েটা থাকবে তার পিসির কাছে, মা মাসোহারা পাঠাবে মাসে মাসে। এই ব্যবস্থা। একটি কথা তোমরা কইতে পাবে না। দেশে ঘরে আসবে যাবে, মান্যের ওপর ব্যাভার করবে তোমরা ওর সঙ্গে। এই আমার পষ্ট কথা।

দেখা গেল, মানদার স্পষ্ট কথার পর সত্যিই বীণার মার ওপর আর তেমন অছেদ্দা ভাব দেখাতে সাহস পেল না কেউ। বরং জনে জনে দেখা করতে এল, সে বিদেশযাত্রা করছে ব'লে। দু'একটি অভিভাবক-নিপীড়িতা তরুণী বিধবা বীণার মার নিতান্ত নিরভিভাবক অবস্থাটাকে ঈর্ষা ক'রে গোপনে নিঃশ্বাস ফেললো।

ভাত দেবার লোক না থাকলেও কিল মারবার লোকের অভাব সমাজে বড় একটা হয় না কি না!

অতঃপর বীণার মা কলকাতায় গিয়ে মানদার বাসায় ভর্তি হ'ল। তা সে তো আজ বছর বারো চোদ্দর কথা।

প্রথম প্রথম মানদার সঙ্গ ছাড়া দেশে আসবার সাহস হ'ত না বীণার মার, এখন একাই আসা যাওয়া করে। বছরে-দেড় বছরে একবার করে আসে। মেয়ের জন্যে আনে সস্তা সাটিনের বাহারি জামা, ফুটপাথে-ছড়িয়ে-বসা ফেরিওলার রঙিন জুতো, শহুরে খেলনা পুতুল। অতএব বীণাকে গ্রামের আর পাঁচটা মেয়ে 'বড়মানুষের মেয়ে' বলেই গণ্য করে।

অবিশ্যি ননদ ননদাইকেও বঞ্চিত করে না বীণার মা। ননদের জন্যে আনে খাটো বহরের ফুলপাড় শাড়ি, ফেরিওলার কাঁধের রঙিন সায়া, ননদায়ের জন্যে কাগজের বাক্সে ভরা রাঙতা মোড়া সন্দেশ।

কাজেই বীণার মা যে একা ট্রেনে যাওয়া আসা করে, নরুন পাড়ের ফর্সা মিহি ধুতি পরে, শেমিজ গায়ে ভিন্ন থাকে না, গোলাপ ফুল আঁকা টিনের সুটকেসটা হাতে দুলিয়ে গটগট করে গাঁয়ের পথে হেঁটে আসে—এর জন্যে আর নিন্দে ওঠে না বীণার মার।

ননদ ননদাই উঠতে দেয় না।

ধরো, বীণার নাম ক'রে মাস মাস যে টাকাটা পাঠায় তা'র মা, সে টাকার কতটুকুই বা বীণার বাবদে খরচ হয়? সেই নিয়মিত আফিঙের মাদকতা এবং কৃতজ্ঞতা একটা থাকবে বৈকি! থাকাই তো উচিত!

যাই হোক শহুরে মায়ের মেয়ে বীণা, বরাবর অজ পাড়াগাঁয়ে পিসির কাছে মানুষ। বছর দুই হ'ল পিসি তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে পাশের গ্রামের একটা

মাঠে-ঘুরে-বেড়ানো ছেলেকে ধরে। বীণার মা আপত্তি করেনি। কে জানে কোন কানে কথা হাঁটে, কোন পথে বদনাম বেরোয়, মেয়ে বেশী বড় হয়ে গেলে তখন বিয়ে দেওয়া দায় হবে! ও সকাল সকালই ভাল।

প্রথমে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে একবার দিন কুড়ি থেকেও এসেছে বীণা, তবে তাদের ঘরে অন্নের এবং পিসির মনে ইচ্ছের অভাবে, আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

তার জন্যে বিশেষ কোনো বিরহ ভাব দেখা যায় না বীণার মধ্যে। ওর একান্ত বাসনা কলকাতায় যাবার।

বিয়ের সময় মা এসেছিল বিয়ের খরচ-পত্তর নিয়ে।

তার বড়লোক মনিবরা মেয়ের বিয়ে শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ফ্যাসান-উঠে-যাওয়া আধানতুন খানকতক ভাল ভাল শাড়ি জামার সঙ্গে, গোটাপাঁচেক টাকা আর একখানা কম দামের ডুরে শাড়ি উপহার দিয়েছিল।

সেই দুর্লভ পোষাকের গরবে গরবিনী বীণা নিজেকে পাড়ার আর সব মেয়েদের চাইতে বেশ একটু উচ্চস্তরের জীবই মনে ক'রত। আর মনে ক'রতে চেষ্টা ক'রতো তাদের কথা, যারা এমন জিনিস অবহেলায় ফেলে দিতে পারে।

কে জানে তারা কেমন!

বীণা কি এ জীবনে তাদের দেখতে পাবে?

পুজোর আগে ভাদ্রের মাঝামাঝি যথারীতি বীণার মা দেশে এলো। আনলো জামাইয়ের ধুতি চাদর, ননদের আর মেয়ের জন্যে শাড়ি সিঁদুর। ক'দিন খুব বেড়ালো, খুব গল্প ক'রলো, তা'রপর যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। আর এই সময় বীণা বাধালো গোল। ও এবার যাবেই যাবে মার সঙ্গে। জন্মে কখনো কলকাতা দেখেনি ও।

শত যুক্তি তর্কে'ও বীণার মা মেয়েকে টলাতে পারে না।

না নিয়ে গেলে, পুকুরের জলে ডুবে মরবে বীণা। বেশ, ওর মায়ের যদি তাই ইচ্ছে হয় তো হোক! পিসি বললো—নিয়ে যা বৌ, এবারে ও ছাড়বে না। ছ'মাস আগে থেকে 'খোঁট্' ধরে বসে আছে।

বীণার মা বললো—বেয়াই বাড়ির ওরা মত করবে না ঠাকুরঝি! রাগ করবে।

বীণা স্বচ্ছন্দে বললো—রাগ করে তো—হিংসে ক'রে করবে।…ওদের রাগ হলো তো বড় বয়েই গেল আমার! আমি যাবই।

পিসি বললো—তার চেয়ে বরং এখন থাক্ বীণি, মাঘ মাসে মস্ত না কি 'যোগ' আছে। সেই ত্যাখন তোতে আমাতে তোর পিসের সঙ্গে গিয়ে গঙ্গাছ্যান করে আসবো।

বীণা ঘাড় দুলিয়ে বললো—ত্যাতো দিনে আমি মরে ভূত হয়ে যাব।

মা বললো—'ষাট্' 'ষাট্'।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হ'তে হলো। যতই দূরে সরে থাকুক, তবু মা! আর একটামাত্র সন্তান!

কলকাতা থেকে বীণার মা সুজি, চিনি, কিসমিস্, কাঁচাপাঁপর, ফুলকপি, সাদা ময়দা ইত্যাদি গ্রামদুর্লভ জিনিস কিনে এনেছিল, জামাই নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবে বলে।

নেমন্তন্নে এসে অভিভূত জামাই পাত চেটে চেটে তো খেলোই, শেষ পর্যন্ত আঙুল চাটতে লাগলো বসে বসে। ঘরের মধ্যে থেকে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে যায় বীণার। সে তাকাতাকির তাক খুঁজছিল, হঠাৎ বর কেষ্টগোপালের সঙ্গে একবার চোখোচোখি হয়ে যেতেই জিভ ভেঙিয়ে চাপা গর্জনে ব'লে উঠলো—হ্যাংলা অসভ্য!

বর ঘাড় হেঁট করলো তাড়াতাড়ি।

মা পিসি বুদ্ধি করে মেয়ে-জামাইকে একবার আড়ালে দেখা করবার সুযোগ ক'রে দিলো।···বীণা ঘরবসতের পর এই প্রথম বরের সঙ্গে কথা কইলো। বললো—হাত চাটছিলে কেন আদেখলের মতন?

কেষ্টগোপাল অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো—হাত চাটবো কেন, বাঃ! পিসি হাতে জল দেবে তবে তো?

—ঈঃ! ভারী নবাব এসেছেন! 'হাতে জল দেবে তবে তো!'·· আমি মায়ের সঙ্গে কলকেতা যাচ্ছি, বুঝলে?

কেষ্টগোপাল চমকে হাঁ হয়ে বললে—অ্যাঁ!

—অ্যাঁ নয়। হ্যাঁ। বুঝলে?

মাথা দুলিয়ে হি হি করে হাসতে থাকে বীণা। পিসির আদরে আদরে মানুষ, সভ্যতার ধার একটু কম ধারে।

গেঁয়ো ভূত হোক আর যাই হোক, যোল বছরের বৌকে উনিশ বছরের বর একটু ভয় খাতির করবেই।

কেষ্টগোপাল ভয়ে ভয়ে বললো—যাঃ! কলকেতা গেলে মা রাগ করবে না?

—তোমার মায়ের রাগে আমার কলাটি!

কেষ্টগোপালের সুপ্ত স্বামীত্ব কিঞ্চিৎ চাড়া দিয়ে উঠলো। বললে—আচ্ছা দেখা যাবে! কলকেতা গেলে মেয়েলোক খারাপ হয়ে যায় তা জানিস?

—ঈস তাই বইকি!

—ভাল চাস তো যাসনে।

—'ভাল' চাইছে কে! ভাল চাই মা আমি!

—তবু কলকেতা যাবি?

—যাবই তো! মা গঙ্গার দেশে গেলে নাকি খারাপ হয়ে যায়? যাতো সব কিম্ভুতি কথা!

মা শেষ চেষ্টা করতে বললো—যাচ্ছিস যে, তা' আসবি কার সঙ্গে?

—কেন পিসে?

—পিসের দায়!

—ঈস! দায় নয় বৈ কি! পিসি কেঁদে কেঁদে মরবে না?

বুকের বলের কারণটা বোঝা গেল।

অতএব 'মা গঙ্গা'র দেশে রওনা হ'ল বীণা।

অনভিজ্ঞা গ্রাম্য ষোড়শী!

চোখে অগাধ বিস্ময়, মনে অফুরন্ত কৌতূহল। আর আনন্দ? সে বোধ করি, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত থই থই! গ্রাম থেকে স্টেশন যেতে কমখানি রাস্তা নয়। তবু বীণার যেন ক্লান্তি নেই। অনর্গল কথা কইতে কইতে চলেছে সে।

বীণার মা হাঁটে আর হাঁপায়।

গজ গজ করতে করতে বলে—পোড়ারমুখো দেশ! না আছে 'টেরাম' না আছে বাস্ একখান 'রিস্কো' পর্যন্ত পাবার জো নেই। ওখেনে বাবা চারটে ছ'টা পয়সা ফেললেই আমিই বা কে, আর মেমসায়েবই বা কে? সব সমান। বাসে টেরামে চড়ার মজা কতো! ঠাকুরজামাই তো দেখলে না কখনো?

বীণার পিসে সঙ্গে যাচ্ছিল, স্টেশনে তুলে দিতে। সে বীণার মার বাক্যচ্ছটায় অপ্রতিভভাবে বলে—কই আর গেলাম! সেবারে আমার মাসতুতো ভাই খগেন গেছলো, এসে হেসে কুটিকুটি! বলে—ওখেনে মেয়েলোকেরই জয় জয়কার।

বীণার মা মেয়েকে উদ্দেশ করে বলে—এই চলুক না বীণি, দেখবে। যতই কেন কোট পেণ্টুল পরা লম্বা চওড়া বাবু হোক না, যেই তুই গে' উঠবি, অমনি তোকে গদি ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াবে!

বীণা বললে—ধেৎ!

—আচ্ছা চল! দেখবি সত্যি মিথ্যে। একগাড়ি বাবু বাদুড় ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে, তুই একলা একখান বেঞ্চি জোড়া ক'রে বসে থাকবি, কেউ তাতে বসতে সাহস পাবে না। সায়েব-সাজা বাবুই বল, আর 'বাবু'-সাজা বাবুই বল। মেড়ো, মোছলমান, খোট্টা, যাই হোক না কেন, সব ওই চোরটি!··· বাবুগনো যখন মুখ চুন করে উঠে দাঁড়ায়, এতো ফুর্তি লাগে আমার! আগে গা ছমছম ক'রত, মনে হ'ত—কি অপকম্ম করছি। এখন আর করে না। এখন দেখে দেখে ইচ্ছে ক'রে ভীড়ের গাড়িতেই উঠি আমি।

বীণার মনে হয় কলকাতা আর কত দূর?

হাতের নাগালে এসেও যে দুর্লভ মনে হচ্ছে!···সত্যি কি সে ইস্টিশন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে? সত্যিই টিকিট কিনে ট্রেনে চাপবে? সত্যিই পা দেবে কলকাতার মাটিতে?

যে দেশে তাকে দেখলেই বড় বড় বীরপুরুষরা সসম্ভ্রমে গদি ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াবে?

কিন্তু গল্প ক'রে আর কতটুকুই বা বোঝাতে পারে বীণার মা? যতবড় চিত্রকরই হোক, তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে পারে কতটুকু আকাশ?

দেব মহিমার কতটুকু ধরা যায় মাটির প্রতিমায়?

এত অবিশ্বাস্য বিস্ময়ও তোলা ছিল বীণার জন্যে ?

এই কলকাতা !

মায়ের মুখে শুনে শুনে কলকাতা সম্বন্ধে অস্পষ্ট যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, সে আর পালাতে পথ পায় না।

কিন্তু একি ধারণা করার বস্তু ?

এ যে দেখে দেখেও ধারণা করা যায় না। ধারক যন্ত্রটায় কুলোয় না।

অবাক ! অবাক ! আরো অবাক মায়ের মনিব বাড়ি !

এই বাড়িতে তার মা বারোমাস বাস করে ?

এই মা দুগগার সিঁদুরের মতন ডগডগে লাল মেজেয় গা গড়ায় ? এই সগ্গের মতন উঁচু তিনতলার ওপর চলে ফিরে বেড়ায় ? ইচ্ছে মতন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে পায়, যেখান থেকে রাস্তায় মানুষগুলোকে এতটুকু ছোট দেখায় ?···

এই কাঁচে আর কাঠে ঝিলিকমারা চকচকে ঝকঝকে নাম-না-জানা জিনিসগুলো মা অনায়াসে নাড়ে চাড়ে, ঝাড়ে মোছে ?···ওই সদ্য গাইদোয়া দুধের ফেনার মতন বিছানাগুনো নির্ভয়ে হাত বুলিয়ে পাতে ?

বীণার নিজের মা ?

তারপর—আর্শি ?

এ কী ! কী ভয়ানক সুন্দর ! কী সাংঘাতিক সুন্দর !

আয়না যে এত বড় হ'তে পারে, একথা বীণা জীবনে কোনো দিন ভারতে পারতো ?

এ কি ইন্দ্রজাল ? এ কি যাদুমন্ত্র ?

ওই সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চুল থেকে নখ অবধি দেখা যাচ্ছে যার, ওর নাম না কি বীণা ? ওকে চেনা যায় !

পিসির বাড়ি সেই ঝাপসা ঝাপসা একটুখানি আয়নাতে মুখ দেখতে দেখতেই যদি জন্ম কেটে যেতো বীণার, কখনো এই ইন্দিরপুরীতে না আসতো, তাহ'লে কি জানতে পারতো সে, সত্যিকার বীণা কি বস্তু ? সত্যিকার আস্ত বীণা ?

মাকে বরাবর খুব স্নেহময়ী বলে মনে হ'ত বীণার, আজ হঠাৎ মনে হ'ল ভারী নিষ্ঠুর মা তার, ভারী স্বার্থপর ! কলকাতায় নিয়ে এসেছে বলে মায়ের ওপর কৃতজ্ঞতার বদলে রাগে আক্রোশে শরীরটা যেন ঝিনঝিন করে আসে বেচারার।

এই বাড়িতে বারোমাস বাস করে বুণার মা ?

কল টিপে আলো জ্বালে, কল টিপে বাতাস খায়, কল টিপে গনগনে উনুন জ্বালে ?

অহরহ এই স্বর্গসুখ ভোগ করছে, বীণার নিজের মা ?

'স্বর্গ' ভিন্ন আর কোন তুলনা জানা নেই বীণার। তাই এ বাড়ির গিন্নীদের

স্বর্গের দেব-দেবীর সঙ্গে তুলনা না ক'রে পারে না। গিন্নীমা, বড়মা, ছোটমা ইত্যাদি সকলকেই।

তার নিজস্ব হিসেবে নামকরণও হয়ে গেছে—'মা দুগগা' 'জগদ্ধাত্রী' 'লক্ষ্মী ঠাকরুণ' 'সরস্বতী' 'রাধারাণী' ইত্যাদি।

আর দিদিমণি?

তার কথা বীণা বলতে পারবে না।

তার সঙ্গে তুলনা করবার উপযুক্ত দেবীমূর্তিও বুঝি নেই। সে যেন শুধু খানিকটা আলো খানিকটা গান!

বীণার মা বলে—দিদিমণির রূপেরও তুলনা নেই, গুণেরও তুলনা নেই। সে নাকি সায়েবের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কয়, কলের গানের মধ্যে গান গায়, হাওয়াগাড়ি হাঁকিয়ে এদেশ ওদেশ করে।

দিদিমণিকে দেখলে বীণার আনন্দে বুক টনটন করে ওঠে।

প্রথম যেদিন তাকে দেখে হেসে উঠে বললে—ও বীণার মা, এই তোমার বীণা? বেশ মেয়েটি তো! কখনো আনো না কেন? তখন বীণার মনে হ'ল সে যেন এ পৃথিবীতে নেই ভাবলে 'বীণা' নামটাই ধন্য হয়ে গেল! সেই থেকে সে দিদিমণির অন্ধ ভক্ত।

তবু, তবু আশ্চর্য!

দেহহীন, রূপহীন কি এক সূক্ষ্ম ঈর্ষা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, সেই ভক্তির আড়ালে! ঈর্ষা আর অনুরাগ দু'জনে গলাগলি ক'রে বাস করে কি ক'রে? ···বীণা কেন ওর পায়ের নখের যুগ্যিও নয়?

বীণার মা ওপরের ঝি।

বাসন-মাজা ঝিয়েদের চাইতে তার সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশী।

তার মেয়েকে সকলেই একবার ডেকে কথা কয়, কেউ কেউ তাকিয়ে দেখে।

গিন্নী কর্তাকে উদ্দেশ করে বলেন—পল্লীগ্রামের ভাত জলের গুণ দেখ? কি বা খায় ওরা, তবু স্বাস্থ্যটি দেখেছ?

বড় মা বামুন ঠাকুরকে ডেকে বলেন—ঠাকুর, বীণার মার মেয়েকে একটু দেখে শুনে খাইও। ছেলেমানুষ দেশ থেকে নতুন এসেছে।

অর্থাৎ···আহা জন্মে কখন তো ভাল খাবারদাবারের মুখ দেখে নি!

ছোট মা বলেন—অ বীণার মা, তোমার মেয়েকে একদিন সিনেমা দেখিয়ে আনো-না, আমি তোমাদের দু'জনের টিকিটের দাম দেব।

বৌদিদি ওরা আসতে মাত্রই দু'খানা পুরনো শাড়ি দিয়েছেন, ছাপা ছিটের! সেই ছিটের শাড়ি পরা নিজের চেহারা আর্শিতে দেখেই তো বীণা সেদিন—

সে যাক, এদের যদি স্বর্গের দেবীর সঙ্গে তুলনা না করবে তো স্বর্গের দেবী আবার কি রকম হয়?

সকাল বেলা বড় মা দেরাজ থেকে একগোছা রুপোর বাসন বার করে বললেন—অ বীণার মা, এগুলো একটু সাফ ক'রে রাখো, জামাই আসছেন স্বাতীকে নিতে।

নিতে!

বীণার বুক ধক্ করে ওঠে।···দিদিমণি চলে যাবে মা?

—হ্যাঁ পুজোর আগেই যাবার কথা। দিদিমণির শ্বশুরবাড়ি পুজো হয় কি না। যাবে তার কি, এ পাড়া ওপাড়া বৈ তো নয়। নিজেই তো গাড়ি হাঁকিয়ে যখন তখন আসে।

দিদিমণি তো এক বিস্ময়!

জামাই বাবু, সে আরো কি অপূর্ব বিস্ময়!

টেবিলের ওপর ঝকঝকে রুপোর বাসনে ক'রে খেতে দেওয়া হয়েছে তাঁকে, চেয়ারে বসে খাচ্ছেন।···জোর বিজুলীর আলো জ্বলছে ঘরে, মাথার ওপর 'ফ্যান্' না কি সৃষ্টিছাড়া নামের ওই পাখাটা ঘুরছে বন্‌বনিয়ে। হীরের আঙটি পরা লম্বাছাঁদের আঙুলগুলি নড়ছে চড়ছে।

সবটা মিলিয়ে এক অলৌকিক মহিমা!

একে কি খাওয়া বলে? এ যেন স্বপ্ন!

চকিতে মনে পড়ে গেল পিসির বাড়ির মেটে দাওয়ার ছবি। উঁচু পীঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসে গোগ্রাসে গিলছে কেষ্টগোপাল, সব শেষ করে পাত চাটছে···শেষে আঙুল চাটছে বসে বসে।

ছি ছি ছি! জীবনে ধিক্!

—দিদিমণি, আমাকে তোমার সঙ্গে নে যাও!

এই অভূতপূর্ব আবদারে হেসে উঠল স্বাতী। বললো—সেই ভাল, তোর মতন একটা লোক পেলে আমি তো বাঁচি।

মস্করা নয় দিদিমণি, আমি তোমার কাছে থাকব।

স্বাতী হাসলো—তোর মা ছেড়ে দেয় তো চল। বেশ তো!···বরকে ডেকে বললো—আমার একটি অন্ধ ভক্ত দেখেছ?···নিয়ে যাব? তা' ওর মা কি আর ছেড়ে দেবে? নইলে পেলে মন্দ হ'ত না! ঠিক নিজের ব'লে আলাদা একটা লোক এ রকম ভবিষ্যভক্ত হ'লেই বেশ হয়।···সত্যি দেখ, একটু ভাল শাড়ি জামা পরলে ছোটলোক বলে মনেই হয় না। তা' সে খরচ তোমার লাগবেও না। আমার পুরনোতেই চলে যাবে।

বর বললো—ওর বিয়ে হয়েছে মনে হ'ল? যাবে কেন?

—আহা! যেমন না ওদের বিয়ের শ্রী! রাস্তায় ঘুরে বেড়ান একটা ছেলেকে ধরে ওর পিসি না কে যেন বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

অর্থাৎ সে বিয়ে ধর্তব্যই নয়।

দেখতে সুশ্রী, চালচলন কিঞ্চিৎ সভ্য, বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে মনে হয়, এমন একটি ঝি সঙ্গে সঙ্গে থাকলেই যেন স্বাতীকে ঠিক মানায়। শ্বশুরবাড়িতে আপাততঃ ওর খাসদখলে যে বুড়ি ঝিটা আছে সেটা স্বাতীর দু'চক্ষের বিষ! যেমন অশোকবনের চেড়ির মতো চেহারা, তেমনি পাজী। একে নিয়ে যেতে পারলে, গিয়েই সেটাকে দূর ক'রে দেবে স্বাতী।

স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে, কি ক'রে প্রস্তাবটা পাকা ক'রে নেওয়া যায়।

আর সত্যিই তো, বীণার মতো মেয়েদের জীবনে আর বেশী কি সার্থকতা আসতে পারে, স্বাতীর মতো মেয়েদের কাছে চাকরাণীগিরি করা ছাড়া?

অনেক উঁচু তলার জীব ওরা! বীণার বয়েসটা বিপদজনক, এমন নীচু কথা মনেও আনে না।

বীণার মা মেয়ের নিভৃত আবেদনে 'ষাঠ্ ষাঠ্' করে উঠল। বললো—বালাই ষাঠ্। তুই কিসের দুঃখে চাকরাণী হতে যাবি। জন্ম জন্ম রাজরাণী হয়ে থাক।

—রাজরাণী! বীণা মুখ বাঁকিয়ে বললো—বাদাবনের রাজরাণী! যেমন না হনুমানের মত রাজা!

বীণার মা গম্ভীর হয়ে বললো—ছি বিণি, অমন পাপ কথা মুখে আনিসনে। যেমনই হোক, সেই তোর পরম গুরু।

বীণা স্বচ্ছন্দে অনুপস্থিত পরম গুরুর উদ্দেশে ভেঙচি কাটলো। আর তারপর আপন মনে বসে ভাবতে লাগল···জামাইবাবুর মত ওই রকম সাবান-টাবান মেখে, কোট পেণ্টুল ঘড়ি চশমা পরলে কেমন দেখায় কেষ্টগোপালকে! কেমন দেখায় চেয়ারে বসে টেবিলে খেলে!

বাড়ির আর একটা ঝি এসে ওর ধ্যান ভাঙালো।

—অ বীণা, তোমার মা ডাকছে! দেশ থেকে তোমায় নিতে লোক এসেছে।

নিতে এসেছে!

বুকটা ধড়াস করে উঠলো বীণার।

বীণার খাতিরে বীণার পিসে এই প্রথম কলকাতায় এলো!

সঙ্গে কেষ্টগোপাল।

পিসেকে পিসি পাঠিয়েছে কেঁদেকেটে। কেষ্টগোপাল অনেক কাকুতিমিনতি ক'রে সঙ্গে এসেছে। সত্যি, বীণা কলকাতা দেখে যাবে, আর সে বোকা হয়ে থাকবে?

এসেছে দু'দিন থাক।···কলকাতা দেখুক।

বড়লোকের বাড়ি দু'টো লোক বাড়তি খেলে কেউ ধরে না।

তা' ছাড়া বীণার মার দেশের লোক!

বাড়ির সবচেয়ে প্রতিপত্তিওলা ঝি যে!

বীণা মাকে ডেকে সতর্জনে বললো—খবরদার কাউকে বলবি না, ওই হনুমানটা তোর জামাই।

বীণার মা অবাক হয়ে গালে হাত দিলো। মুখে কথা ফুটলো না তা'র।

এমন কথা সে সাত জন্মে শোনেনি।

স্বাতী বললো—খুব তো যাচ্ছিস আমার সঙ্গে? দেশ থেকে নিতে এসেছে শুনলাম না?

বীণা নিশ্চিন্তভাবে বললো—দেশে যাচ্ছে কে?

—এসেছে কে? তোর বর নাকি?

এটা স্বাতীর কৌতুক।

বীণা স্বচ্ছন্দে বলে—ধ্যেৎ! পিসে আর গাঁয়ের একটা হাঁদা উজবুক ছেলে। কলকাতা দেখেনি কখনো, তাই। আমি তোমার সঙ্গে ঠিক যাব।

স্বাতী রহস্য ক'রে বললো—আর তোর বর যদি এরপর নালিশ করে?

—ইস! আমি যাব আমার খুশি। ওর কিসের এক্তার?

কলকাতায় হাতের কাছে পুকুর নেই। বীণা 'টেরামের' তলায় কাটা পড়ে মরবার ভয় দেখিয়ে মায়ের অনুমতি আদায় করলো।

বাড়িসুদ্ধ সকলেই বুঝলো প্রস্তাবটা অযৌক্তিক, তবু তেমন বারণ কেউ করলো না। স্বার্থ নিয়ে কথা!

স্বাতীর ইচ্ছে হয়েছে, স্বাতীর সুবিধে হবে। তাছাড়া ওর কাছে থাকলে মানুষ 'গতরে' যাবে মেয়েটা। মস্ত একটা হিল্লে তো বটে! গাঁয়ে থাকলে তো সেই ধানসেদ্ধ ক'রে আর খুদের ভাত খেয়ে জীবন যেতো।

সিঁড়ির তলায় বীণার মার নিজস্ব কুঠুরিতে মেয়ে জামাইকে বোঝাপড়া করবার সুবিধে ক'রে দিয়ে সরে আসে বীণার মা। চুপি চুপি জামাইকে ব'লে এলো—দ্যাখো বাবা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। তুমি সোয়ামী, জোর ক'রে আটকাও।

বীণার পিসে বললো—কাজটা কি রকম হচ্ছে বৌঠাকরুণ? ওর পিসির কাছে আমি মুখ দেখাব কি ক'রে? বীণা ঝিবৃত্তি করতে গেল শুনলে মানুষটা আত্মঘাতী হবে।

বীণার মা বিরসকণ্ঠে বললো—আমি কি ক'রব বলো! আবার জোর করে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে বীণাই শেষটা আপ্তঘাতী হবে। যেমনতর ধিঙ্গি অবতার মেয়ে তৈরী করেছে ঠাকুরঝি!

সুদীর্ঘকালের কৃতজ্ঞতার শোধ দিলে বীণার মা।

কেষ্টগোপাল শহুরে ছোপলাগা ষোড়শী স্ত্রীর দিকে একবার সমীহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললো—দেখলি তো? বলিনি কলকেতায় এলেই মেয়েলোক খারাপ হয়ে যায়? আমার কথা খাটলো কিনা?

বীণা অম্লানচিত্তে উত্তর দিলো—যেমন হাঁদাগোবিন্দ তুমি, তেমনি বুদ্ধি! চাকরি করলে বুঝি খারাপ হওয়া বলে?

—দশে ধম্মে তাই বলে। তোর বয়েসটা যে খারাপ! পিসে শুনে বলছে—'ককখনো ভাল থাকবে না!'

বীণা অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বললো—পিসে সবজান্তা! আসুক না কেউ খারাপ করতে, ঢিট্ করে দেব না? হতচ্ছাড়া গাঁয়ে আমার মন নেই তাই এখেনে চাকরী করবো।

কেষ্টগোপাল শেষ চেষ্টায় সকরুণ সুরে বলে—আর আমার লেগে বুঝি মন কেমন ক'রবে না তোর?

মনকেমন!

হঠাৎ যেন ছলাৎ ক'রে উঠলো মনটা।

অগ্রাহ্যের নিষ্ঠুর কঠিন ভাবটা কোমল হয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে স্বামীর গায়ে একটু 'পিঠ চাপড়ান গোছ' স্পর্শ দিয়ে বীণা সহৃদয় মুরুব্বিয়ানা সুরে আশ্বাস দিলো—আচ্ছা আচ্ছা, তুই মন খারাপ করিসনি। অনেক চাকরবাকর রাখে ওদের বাড়িতে, তোর জন্যে একটা চাকরির কথা বলে দেবো! তুই আসা ইস্তক কাল থেকে তাই ভাবছি—

কেষ্টগোপাল কিছুটা অনমনীয়ভাবে বলে—এঃ চাকর! চাকর হ'তে যাব কি দুঃখে?

—না লাটসাহেব হবি! অপরূপ ভঙ্গীতে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ওঠে বীণা—বাবুদের জুতো ঝাড়লেও বর্তে যাবি বুঝলি? বলি কলকাতায় থাকতে পাবি তো তার বদলে?

[১৩৬৩]

জীবনের আইন

—জীবনটাকে নিয়ে যা খুশি করা যায় না, বুঝলে সতীকান্ত! জীবনের একটা 'রুল' আছে সেটা মেনে চলতে হয়! ধরে নিতে হয়—তোমার জীবনটা একটা লাইন টানা শ্লেট, তার এক একটি লাইনের নীচে তোমার এক একটি দিনকে সাজিয়ে রাখবে—সোজা পরিষ্কার অক্ষরের মতো। কোনো অক্ষর লাইন ছেড়ে এদিক ওদিক হবে না—একেবার নীট্ অ্যান্ড ক্লীন্!

বলতে বলতে হেসে উঠলেন সুরেশ মাষ্টার প্রাক্তন ছাত্র সতীকান্তর দিকে তাকিয়ে।

সতীকান্ত মাথা নীচু ক'রে চৌকির এক কোণে বসে অকারণে চৌকীতে পাতা চাদরটার ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পালিশ ক'রছিলো, হাসিটা শুনে হাতটা শুধু থেমে গেলো।

সুরেশ মাষ্টার আবার সুরু ক'রলেন—তুমি যদি ভাবো যেহেতু তোমার মা

বাপ ভাই বন্ধু তিনকুলে কেউ নেই, কাজেই তোমার জীবনকে তুমি যে ভাবে ইচ্ছে নষ্ট ক'রতে পারো, তাহ'লে—সেটা ভুল ভাবা হবে। সেটা হবে—সমাজকে আঘাত করা। 'রুল' মেনে চলা চাই।

সতীকান্ত এবার মুখ তুলে বললো—আমি তো কিছু অন্যায় করিনি স্যার।

—তুমি মনে ক'রছো অন্যায় করোনি, সমাজ মনে ক'রছে অন্যায় ক'রছো, এর তুমি কি উত্তর দেবে বলো? বলো তোমার কি উত্তর আছে?

উত্তরের আশায় তাকিয়ে থাকলেন সুরেশ মাষ্টার।

সতীকান্ত ক্ষুব্ধভাবে বললো—এর আর উত্তর কি দেবো বলুন?

—দেবে কোথা থেকে? উত্তর যে নেই। সুরেশ মাষ্টার গম্ভীর মুখে বললেন—মেয়েটিকে তোমার বাড়িতে রাখা চলবে না বাপু। সর্বদিক বিবেচনা—

সতীকান্ত বাধা দিয়ে বলে উঠলো—ও তো আমার বাড়িতে থাকে না মাষ্টারমশাই। ও ওর নিজের জায়গায় থাকে, আমি আমার নিজের জায়গায় থাকি। বাড়িটা এক, বাড়িওলা এক, এই যা। নীরেনবাবু আর আমি সমান ভাগে ভাড়া দিয়ে এসেছি এতদিন।

সুরেশ মাষ্টার গম্ভীর হাস্যে বললেন—নাঃ, মাষ্টারী আমি ভালোই ক'রেছিলাম দেখছি, ন্যায়ের ফাঁকিটা দিতে শিখেছিস মন্দ নয়। সে যাক, নীরেনবাবু তো মারা গেলেন, ওঁর ভাগের ভাড়াটা কে দেবে?

সতীকান্ত ফস ক'রে ব'লে বসলো—আমাকেই দিতে হবে।

—হুঁ, এই উত্তরই তুই দিবি তা জানতাম। কিন্তু জগতে এত লোক থাকতে তোকেই দিতে হবে কেন, সেটাই মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখ্‌গে যা!··· যদি বলিস—দয়া, মনুষ্যত্ব, তা'হলে বলি—বাড়িওলাও তো সে মনুষ্যত্ব দেখাতে পারতো! ভাড়াটা না নিতে পারতো! পারতো না?

—সে কথা আমি কি ক'রে জানবো বলুন? ম্লানভাবে বললে সতীকান্ত।

সুরেশ মাষ্টার বললেন—বলবার মতো কথা যে তোমার দিকে কিছুই নেই হে, বলবে কি? যাই হোক—এ ব্যবস্থাটা যে পারমানেণ্ট হতে পারে না সেটা মানো তো? পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক আমাকে ধরেছেন এর একটা বিহিতের জন্যে। বিহিত আর আমি কি ক'রবো বলো? তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, এখন যা বোঝো! এইজন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। শুধু বোঝাতে চাইছিলাম—মনে রাখতে হবে—অক্ষরগুলি সোজা হওয়া চাই, লাইনের এদিক ওদিক না যায়।

সতীকান্ত বোধ করি এবার মরিয়া হয়েই বলে ওঠে—পাড়ার লোকের এতে কি?

—পাড়ার লোকের কি? সুরেশ মাষ্টার গম্ভীরভাবে বল্লেন—হুঁ, তোমার অবস্থাটা যতদূর খারাপ ভেবেছিলাম সতীকান্ত, দেখছি তার চেয়েও খারাপ। পাড়ার লোকের কি মানে? পাড়ার লোক তবে আছে কেন? তুমি যে রুল

মানছো না, তুমি যে লাইনের বাইরে চলে যাচ্ছো, এই চেক করবে কে? হ্যাঁ, অবিশ্যি বলবো—শহরে এ সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কিন্তু আমাদের এখানে এখনো সমাজ রয়েছে।

কথাটা শুনে ভারী আশ্চর্য লাগলো সতীকান্তর।

এখান থেকে পনেরো আনা তিন পয়সা রেলভাড়া অথবা একটাকা দশ পয়সা বাস ভাড়া দিলেই তো শহরে পৌঁছে যাওয়া যায়, যেমন তেমন নয় একেবারে খাস কলকাতা শহরে।

সেখানে সমাজ নেই, আর এখানে সমাজ এখনো টিকে আছে?

ওঃ তাই!

তাই এই সব খোলামেলা জায়গা ছেড়ে, সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে, গাছের ফুল ফল ছেড়ে, কলকাতার ঘিঞ্জি গলিতে গিয়ে বাস করবার জন্যে এত আকুতি লোকের।

শহরে অন্ততঃ আমার জীবনে আমি রুল মানবো কি মানবো না, এ নিয়ে প্রাক্তন শিক্ষকের কাছে সদুপদেশের রুল পেটা খেতে হয় না মাথা হেঁট করে।

মাথা হেঁট ক'রেই উঠে দাঁড়ালো সতীকান্ত। যাবার আগে মাথাটা আর একবারের জন্যে আরো কিছু বেশী হেঁট ক'রলো।

সুরেশ মাষ্টার বললেন—থাক্ থাক্! রাগ করিস নে বাবা! কথা হচ্ছে—তোমার দয়ার পাত্রীটী যদি নীরেন বাবুর বিধবা বোন না হয়ে বুড়ি মা হ'তো—তাহ'লে কি ক'রতে, সেইটা নিজের মনকে প্রশ্ন করোগে, তারপর কর্তব্য স্থির করা সহজ হবে।

সতীকান্ত আর কিছু বললো না, চলে গেলো।

সুরেশ মাষ্টার ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অলক্ষ্যে একটা নিঃশ্বাস পড়লো। বেচারী ভালো ছেলেটা! কে জানে কার কবলে গিয়ে পড়েছে! সৎকথা কি আর শুনতে ভালো লাগবে এখন?

—খুব খানিক উপদেশের ঠেঙানি খেয়ে এলে তো?

উমা বললো সতীকান্তর দিকে তাকিয়ে।

অনেকটা পথ রোদে হেঁটে এসেছে সতীকান্ত, বসে পড়ে বললো—আগে জল চাই এক গ্লাস, তারপর কথা।

তাড়াতাড়ি জল এনে দিলো উমা।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সতীকান্ত বললো—ঠেঙানি নয়, ভালো কথাই বললেন। তাই ভাবছি—

—কি ভাবছো?

—ভাবছি কলকাতায় চলে গেলে হ'তো?

—কেন, কলকাতায় কি হবে?

—মাষ্টার মশাই বলেছেন—ওখানে সমাজ নেই, যা খুশি করা যায়।

উমা হেসে ফেলে বললে—'যা খুশি করবো' এ মতলবটা তো ভালো নয়?

মনের কোণেও আসতে দিও না ওকে।...যাক্ আমি যা বলেছিলাম তার কি হ'লো ?

সতীকান্ত চোখ কুঁচকে বললো—কি কথা ?

—ওই যে, মেয়ে স্কুলের টিচারীব কথাটা ? এই বিদ্যে নিয়ে তো আর কলকাতায় গিয়ে মাষ্টারী ক'রে, 'ক'রে খেতে' হবে না ?

—তোমাকে 'ক'রে খেতে' কে বলেছে ?

উমা গম্ভীর হয়ে বললো—বার বার একই কথা বলো কেন ? তুমি যদি না পারো তো বলো, আমি নিজেই গিয়ে সুরেশ বাবুর কাছে 'হত্যে' দিইগে।—

—সুরেশবাবু ? মানে মাষ্টারমশাই ?...সতীকান্ত কৌতুকতরল সুরে ব'লে ওঠে—আর যা করো ক'রো উমা, ও চেষ্টাটি করতে যেও না। এমনিতেই মাষ্টার মশাইয়ের তোমার প্রতি যা মনোভাব সেটা বিশেষ সুবিধের নয়। এর পর যদি আবার তোমার মূর্তিখানা দেখেন, তাহ'লে তোমাকে জ্যান্ত গোর দেবার ব্যবস্থা দেবেন। মনে রেখো, এটা কলকাতা নয়, এখানে এখনো সমাজ আছে। তোমার মতো ভয়ংকরী নারী যে সে সমাজের কি না ক'রতে পারে কে জানে !

উমা দুই চোখ কপালে তুলে বললে—এই সব কথা বলেছেন তিনি ?

সতীকান্ত গ্লাসের বাকী জলটা আর একবার চুমুক দিয়ে বলে—ঠিক স্পষ্ট ক'রে যে বলেছেন তা অবিশ্যি নয়, মুখ দেখে বুঝলাম মনে মনে বলছেন।

—বটে ! মুখ দেখে মনের কথা বোঝবার ক্ষমতাও হয়েছে নাকি আজকাল ?

—চিরকালই ছিলো। নমুনা চাও ? বলবো ?

—রক্ষে করো। উচ্ছেচচ্চড়ি চড়িয়ে এসেছি, পুড়ে মরবে। চান করোগে। কিন্তু মনে রেখো, ওই কাজটা যদি আমাকে পাইয়ে দিতে না পারো, আমারও ওই উচ্ছেচচ্চড়ির গতি।

উমা চলে যাচ্ছিল, সতীকান্ত ফের ডাক দিলো—উমা শুনে যাও।

—আবার কি ?

—কথা আছে।

—বাঃ আমার চচ্চড়ি যে—

—পুড়ে মরুক সে। বলছি তাহ'লে আমার পয়সায় কেনা চালের ভাত খেতে তোমার আপত্তি ?

—নিশ্চয় ! শুধু ভাত খেতে ? তোমার ভাড়া দেওয়া বাড়িতে থাকতে, তোমার—

—হয়েছে, বুঝতে পেরেছি। যাক্ আমার আজকের ভাত চড়ানো হয়েছে ?

—চড়ানো ? ঠাণ্ডা জল হয়ে গেলো এতক্ষণে। বেলাটা কি কম—

—থাক্, বেলার কথা শুনতে চাই না। ও ভাত ফেলে দাও গে, আমি খাবো না।

উমা শঙ্কিতভাবে বলে—কেন, কি হলো আবার ? মাথা ধরলো না কি ?

—মাথা শত্রুর ধরুক ! মাথা তোমার ধরুক ! আমার মাথা ঠিক আছে। ভাত খাবো না এটা হচ্ছে সঙ্কল্প।

—এমন সাধু সঙ্কল্পের কারণ কি ?

—তুমি যদি আমার পয়সার ভাত খেতে না পারো, আমিই বা তোমার রাঁধা ভাত খেতে যাবো কি সুবাদে ?

উমা এক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে বলে—এই কথা ? তা বেশ, রাঁধুনী হিসেবে মাইনে ব'লে কিছু ধরে দিও।

—রাঁধুনী রাখবার বাবুয়ানা করি, এত বড়লোক আমি নই। কাল থেকে নিজেই রেঁধে খাবো।

উমা হেসে ফেলে বলে—বেশ তাই ক'রো। আজকের দিনটা যখন আমিও দয়া ক'রে তোমার ভাত খাচ্ছি, তুমিও অনুগ্রহ করে আমার রান্নাটা খাবে চলো।

রান্নাঘরটা ধুয়ে মুছে সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি সেরে রান্নাঘরের পিছনের দাওয়ায় বসে পড়লো উমা। আর যেন খাটতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় সংসারের ভারটা যদি দু'চারদিনের জন্যে কেউ নেয় তো উমা প্রাণভরে শুধু ঘুমিয়ে নেয়। একটানা পাঁচ দিন রাতদিন শুধু ঘুম।

এ ক্লান্তি শুধুই কি শরীরের ক্লান্তি ? সমস্ত মনটাও যে ক্লান্তির ভারে ভেঙ্গে পড়ছে।

নীরেন বাবুকে ডাক্তারে বলেছিলো—"শহরের ধুলো ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে আপনি কিন্তু ফের রোগে পড়বেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেরেছেন, এখন খোলা ফাঁকা হাওয়ায় বিশ্রামের জীবনে থাকুন গে, আর অ্যাট্যাকের ভয় থাকবে না।"

তাই সদ্য রোগমুক্ত দাদাকে নিয়ে এখানে এসে বাস করছিলো উমা। গরীবের সুইজারল্যাণ্ড! খোলা হাওয়ার দেশে—কলকাতা থেকে যার ট্রেন ভাড়া পনেরো আনা তিন পয়সা !

তবে এ অঞ্চলটা সত্যিই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গাছপালায় ভরতি, বাড়িটাতেও আলো হাওয়া প্রচুর। এই যে উমা বসে আছে, বাতাস যেন হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতেই কি ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'লো ?

আর বড় ক'রে রোগের আক্রমণ হ'লো না সত্যি, কিন্তু সামান্য একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরেই হঠাৎ মারা পড়লেন নীরেনবাবু।

সতীকান্তরা এ বাড়িতে আগে থাকতেই থাকতো—কোন দেশ থেকে যেন এসে বসত করেছিলেন। বুড়ো বাপ ছিলেন, 'বরে না নেওয়া' আধা বিধবা এক দিদি ছিলেন, কিন্তু দু'টিই খসলেন আস্তে আস্তে।

উমারা যখন এল, দিদি তখনও আছেন।

তিনি প্রথমটা বাড়ির অর্ধাংশে সহসা একটি তরুণী বিধবা আর একটি রুগ্ন ভদ্রলোকের আমদানি দেখে ভেতরে ভেতরে খুব আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু দৃশ্যতঃ তেমন জোর করেনই বা কি ক'রে ? বাপ গিয়েছেন, পেন্সনের টাকা ক'টা বন্ধ হয়ে গেছে, বাড়িওলা দু'মাসের ভাড়া পায়নি বলেই না অর্ধাংশে নতুন ভাড়াটের প্রস্তাব ক'রেছিলো ? অথচ কিই বা ভাড়া এখানকার ?

কলকাতার লোকের শ্নুলে হাসিই পাবে। তা' সতীকান্ত তখনো বেকার! তার পর তো চাকরিটা পেয়ে গেলো। ডেলিপ্যাসেঞ্জারীর সুবিধে রয়েছে, তাই আর এ বাড়ি থেকে নড়নচড়নের কথা ওঠেনি।

সতীকান্তর রাঁধুনীর চাকরি উমা প্রথম পেয়েছিলো, সেবারে দিদি যখন তীর্থে গেলেন।...কম পয়সার মানুষ, প্রায় পাড়ার পাঁচজনের দয়ায় যাওয়া, সুযোগ পেয়ে আর ছাড়লেন না, বললেন—উমা, তুমি যদি ভাই ক'দিনের জন্যে সতীর ভাত ক'টার ভার নাও তো আমি ঘুরে আসি।

প্রথম দিন খেতে বসে সতীকান্ত মুখ নীচু ক'রে বলেছিলো—দিদির এ ভারী অন্যায়! আপনার তো যখন ইচ্ছে রান্না ক'রলে চলে, আর আমার জন্যে এই ভোরে উঠে—না না, এ ভাবে আপনাকে ইয়ে করা!...আমি টিফিনের সময় কোনো 'ক্যান্টিনে' খেয়ে নেবার ব্যবস্থা ক'রবো।

এর আগে কোনো দিন কথা বলেনি, ভালো ক'রে তাকিয়েও দেখেনি, হঠাৎ উত্তর শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলো।

উমা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে উত্তর দিলো—তারপর আবার বার্লি রাঁধতে হবে আমাকেই, এই আর কি!

সহজের সুর সহজেই অন্তরঙ্গ ক'রে নেয়। সতীকান্ত ব'লে উঠলো—সেইরকম স্বাস্থ্য ভেবেছেন? লোহা খেয়ে হজম ক'রতে পারি, বুঝলেন?

—লোহা হয়তো করতে পারেন, কিন্তু ক্যান্টিনের ভাত? অতটা বোধহয় পেরে উঠবেন না।

সেই থেকে আলাপের সুরু।

মাসের পর মাস এক দেয়ালে বাস করেও হৃদয়রাজ্যের যেখানে পেঁছানো যায় না, দু-চারদিনের জন্যে হেঁসেলের অতিথি হ'লে সহজেই সেখানে পেঁছানোর ছাড়পত্র মেলে।

দিদি তীর্থ থেকে ফিরে এসে দেখলেন দু'জনে দু'জনকে 'তুমি' বলছে। হাসি গল্পেরও কামাই নেই। বলা বাহুল্য দেখে ভুরু কোঁচকালেন, কিন্তু বেশী কিছু বলতে সাহস করলেন না, কারণ তীর্থফেরত নিজেই তিনি একটি রুগী হয়ে এসেছেন। তাঁর সাবু বার্লির ভারও স্বেছায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছে উমা। আর সতীকান্তর 'টাইমের ভাত', সে তো উমার ঘাড়েই রয়ে গেছে আজ পর্যন্ত।

আগে আগে উচিত মতো কিছু টাকা সতীকান্ত নীরেন বাবুর হাতে তুলে দিতো, এখন সমস্ত বাজার দোকান এনে উমার জিম্মায় তুলে দিচ্ছে, ব্যস!

আর সম্পূর্ণ বাড়িভাড়াটা—সেই বা আর কে দেবে?

আজ রবিবার। সতীকান্ত দুপুরে একচোট ঘুমিয়ে বেলায় উঠে বসতেই উমা এসে ওর ঘরের দরজায় উঁকি মেরে বললো—আমি তাহ'লে নিজেই যাচ্ছি।

—কোথায় ? সতীকান্ত আশ্চর্য হয়ে গেল।

—ইস্কুলে সেই কাজটার খোঁজে সেক্রেটারির কাছে।

—সেক্রেটারির কাছে।

—সেক্রেটারি তো আমাদের মাষ্টারমশাই।

—তা জানি।

—তবে ?

—কেন, ভয় কি ? বাঘ ভালুক তো নয় যে সামনে যাওয়া যাবে না ? নিজে অনুরোধ করলে বরং—

সতীকান্ত গম্ভীরভাবে বলে—কিছু হবে না। উনি তোমার ওপর চটা।

—আমার ওপর কেউ চটে থাকতে পারে না।

—ওই আনন্দেই থাকো। তোমায় দেখলে আরো চটবেন।

—কেন শুনি ?

—স্পষ্ট করে শুনতে চাও বুঝি ?

—আচ্ছা শুনতে চাই না, থাক্। কিন্তু তুমিও কোনও চেষ্টা করবে না, আমাকেও কিছু করতে দেবে না, তাহ'লে আমার গতিটা কি হবে বলো তো ?

সতীকান্ত এক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে রুক্ষ ভাষায় বললো—প্রেতের আবার গতি ? তা হ'লে গয়ায় পিণ্ড দিতে হয়।

উমা রাগ ক'রে বলে—বেশ, তাই ভালো। পিণ্ড দেবার ব্যবস্থাই করিগে ! যার তিন কুলে কেউ থাকে না, সে নিজের পিণ্ড নিজে দিয়ে রাখে জানো তো ? তার আগে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখিগে—

সহসা সতীকান্ত উঠে আসে, উমার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলে—বৃথা চেষ্টা তুমি ক'রতে যাচ্ছো উমা, মেয়ে স্কুলের মাষ্টারী তোমার হবে না।

উমা ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে কেমন ভয় পায়, এত কাছাকাছি তো কখনো আসে না সতীকান্ত ! কিন্তু সরে যেতেও লজ্জা করে। সেটা যেন সতীকান্তকে অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেবার মতো হবে। আবার ওর কথাটাও যেন কেমন রহস্যাচ্ছন্ন, তবু শঙ্কিত ভাবকে চাপা দিয়ে সহজ হবার ভানে বলে —কেন, কি একেবারে হাইস্কুল যে, আমার চাইতে বিদ্বান চাই। প্রাইমারী স্কুল তো !

বুঝতে পেরেও কথা চাপা দিও না উমা, আজ একটা হেস্তনেস্তই হোক ! চাকরি তোমার এখানে হবে না, কারণ তুমি খারাপ, আমি খারাপ। দেশসুদ্ধ লোক জানে একথা। বাইরে বেরোও না ব'লে তুমি জানতে পারো না তুমি কতো খারাপ ! নীরেনবাবুর মৃত্যুর পিছনে বিধাতার কারসাজিটাই সব—না আমারও কিছু কারসাজি আছে, এটাও পাড়ার লোকের কাছে একটা গবেষণার বস্তু হয়েছে। আরও শুনতে চাও ?

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো উমা ওর মুখের দিকে, তেমনি করেই

তাকিয়ে থেকে বলে—হ্যাঁ চাই। শুনতে চাই, তুমি তা'হলে কি ঠিক করেছো?

—আমি? আমি ঠিক করেছি···দাঁড়াও সরে যেও না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে। আমি ঠিক করেছি, শুধু শুধু যদি অপবাদ হয়, কেন মিথ্যে এত কষ্ট পাওয়া? চলে যাবো তোমাকে নিয়ে যেখানে সমাজ নেই। যেখানে অপবাদের ধার ধারতে হয় না!

উমার ওই তন্বী দেহখানির মধ্যে মনটা কি লোহার? ও কি ক'রে অমন সোজা দাঁড়িয়ে থাকলো? ভয় পেলো না, ভেঙে পড়লো না?

দিব্যি বললো—খুব কষ্ট পাও নাকি?

—পাই কিনা বুঝতে পারো না? হেসো না উমা, সব সময় হাসি ভালো লাগে না।

—সব সময় মানে?—উমা এবার ভালো ক'রে হেসে উঠে বলে—এটা কি সোজা সময় হ'লো? আমার জন্যে একজন কষ্টে মরে যাচ্ছে, এ শুনেও একটু আনন্দ ক'রবো না?···তা কবে যাওয়া হবে?

সতীকান্ত ক্রুদ্ধভাবে বলে—'যাওয়া হবে' মানে? কোথায়?

—ওই যেখানে "সমাজ নেই" না কি বললে—সেই ভালো জায়গাটায়? বাক্সটাক্স গুছিয়ে নিই তা' হলে?—খিলখিল করে হাসছে উমা।

কোনোদিন যা না করেছে, অকস্মাৎ সতীকান্ত তেমনি একটা কাজ ক'রে বসে। দু'হাতে উমার দু'টো কাঁধ চেপে ধরে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে তীব্রকণ্ঠে ব'লে ওঠে—তুমি হাসি থামাবে?

সতীকান্তর ধমকে হাসি থামতো কি না কে জানে, তবে হাসি উমার থেমে গেলো। সতীকান্তর ধমকও থেমে গেলো।

—কই হে সতীকান্ত—ব'লে একটা ডাক দিয়ে উঠোনের খোলা দরজাটা দিয়ে ঢুকেই পিছিয়ে দোরের ওদিকে সরে গেলেন সুরেশ মাষ্টার।

সতীকান্ত এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করেই তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে সবলকণ্ঠে বললে—আসতে গিয়ে ফিরে যাচ্ছেন যে মাষ্টারমশাই?

সুরেশ মাষ্টার হনহন করে এগোতে এগোতে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—ঢুকবো কি? বাড়িতে ভদ্রলোকের ঢোকবার আদায় রেখেছিস? একেবারে উচ্ছন্ন গেছিস হতভাগা?

সতীকান্ত দাঁড়িয়ে পড়ে।

কি ভেবে সুরেশ মাষ্টারও দাঁড়িয়ে পড়েন। এবার স্বর নামিয়ে ক্ষুব্ধভাবে বলেন—বল তোর কি বলবার আছে?

—আমার দিক থেকে বলবার বিশেষ কিছু নেই মাষ্টার মশাই—সতীকান্ত গম্ভীর হাসি হেসে বলে,—শুধু বলছিলাম উচ্ছন্ন যাওয়া সহজ নয়! যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না।

—বটে! সুরেশমাষ্টার একবার ছাত্রের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হঠাৎ বললেন—চ' তবে!

—কোথায়?

—তোর বাড়িতে, আবার কোথায় !

সতীকান্ত মাষ্টারের পিছন পিছন যাওয়া পর্যন্ত উমা তেমনি আড়ষ্ট হয়েই দাঁড়িয়েছিলো দালানের জানলার একটা গরাদ ধরে। দু'জনকে একসঙ্গে ফিরে আসতে দেখে চমকে দু'এক পা ক'রে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো।

কিন্তু সুরেশ মাষ্টার একটা অবাক কাণ্ড করলেন! উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন--পালিয়ে যাচ্ছিস যে বেটি, একগেলাস জল চাই !

—এই যে আমি দিচ্ছি মাষ্টার মশাই !

ব্যস্ত হয়ে সতীকান্ত এগোচ্ছিলো, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো উমা এক গ্লাস জল হাতে ক'রে।

যাবার সময় দাঁড়িয়ে উঠে সুরেশমাষ্টার দরাজ গলায় বললেন—তা' হলে ওই কথাই ঠিক রইলো সতীকান্ত, উমা মাকে নিয়ে আমি সামনের সোমবারে রওনা দিচ্ছি, তুই চাটি-বাটি তুলে চলে যাবি মঙ্গল-বুধবারে।···তারপর পাঁজী পুঁথি দেখে—ইয়ে···কন্যা সম্প্রদান কিন্তু আমি ক'রবো! তা' বলে রাখছি। সংসারধর্ম করলাম না—ফাঁকতালে একটা কন্যাদানের পুণ্য সঞ্চয় হয়ে যায় তো মন্দ কি ?

হা হা করে হেসে উঠলেন সুরেশ মাষ্টার।

কথায় কথায় অর্থাৎ বহু কথায় রাত হয়ে গিয়েছিলো, বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঝোপে ঝাপে আরও অন্ধকার দেখাচ্ছে।

—সঙ্গে যাই মাষ্টার মশাই ?

ব্যগ্রভাবে বললে সতীকান্ত।

—সঙ্গে যাবি মানে ? কচি ছেলে পেয়েছিস ?

হন হন করে চলে যান মাষ্টার।

কিছুক্ষণের জন্য অভিভূতের মতো চুপ করে বসে থেকে সতীকান্ত বিচলিতভাবে বলে ওঠে—মানুষকে আজীবন দেখেও চেনা যায় না! কি আশ্চর্য বল তো উমা ?

সন্ধ্যার আলো জ্বালা হয়নি, সামনাসামনি দু'টো মানুষের আবছা আভাস ছাড়া আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মুখ দেখা গেলো না উমার, শুধু কথা শোনা গেলো—অনেকে একটু দেরীতে বোঝে। আমি তো ওঁকে জীবনে একবার দেখেই চিনে ফেলেছি।

সতীকান্ত বোধ হয় কথার সুরের দিকে লক্ষ্য করেনি, একভাবেই বলে—সত্যি বরাবরই মাষ্টার মশাইকে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, উনিও খুবই স্নেহ করেছেন, কিন্তু ওঁর ভেতরে যে এতো বড়ো একটা মহৎ প্রাণ লুকোনো ছিল, তা কোনদিন বুঝিনি।

—বললামই তো অনেকে একটু দেরীতে বোঝে। আমি তো একদণ্ডেই বুঝেছি, অতশত কিছু না ব'লে এক কথায় বলা যায় ভদ্রলোক স্রেফ্ পাগল।

এর চাইতে উমা যদি সতীকান্তর মাথায় একটা লোহার ডাণ্ডা বসিয়ে দিতো, সতীকান্ত বোধকরি একটু কম আহত হ'তো।

অনেকক্ষণ হতচেতনের মতো বসে থেকে ব'লে ওঠে—তা' হলে তুমি যে ওঁর কোনো কথার প্রতিবাদ না ক'রে আগাগোড়া সায় দিয়ে এলে, সেটা তা' হলে ঠাট্টা ক'রে?

—ওমা কী কাণ্ড! তবে? তুমি কি সত্যি ক'রে সায় দিচ্ছিলে না কি? বুড়ো ভদ্দরলোক, আধপাগল মানুষ, আমাদের ভালো করবেন সংকল্প ক'রে দুটো আবোলতাবোল বকছিলেন, চুপচাপ শুনবো না? একটু সায় দেবো না?

—উমা!

—কি?

—শ্মশানটাই তোমার কাম্য? জীবনের ওপর তোমার কোন লোভ নেই?

হঠাৎ উমা স্বচ্ছন্দে হেসে ওঠে—ও মা বলো কি? লোভ নেই মানে? ভয়ঙ্কর আছে। কিন্তু জীবনের একটা রুল আছে তো? সেটা মেনে চলা চাই তো? শেলেটে লেখা অক্ষরগুলো লাইনের এদিক ওদিক না যায় দেখতে হবে না?

সতীকান্তর কাছে শোনা কথাটাই পাল্টে তাকে শোনায় উমা।

দু'হাত দূরে বসে আছে উমা, তবু সতীকান্তর মনে হয় যেন কোন দূর দূরান্তরে নাগালের বাইরে বসে কে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলো!...একে আর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ধমক দেওয়া যাবে না—"তোমার হাসি থামাবে"?

[১৩৬৩]

—

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পসমগ্র

প্রথম খণ্ড

পত্নী ও প্রেয়সী, রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা, রাজুর মা, পূর্বরাগে রসনার স্থান, ক্ষণ-গোধূলি, মেকী টাকা, বিস্ফোরণ, বিচিত্র, অঘটন, শিশু, জ্বালাতন, সমাধান, জল আর আগুন, ধাঁধার উত্তর, পুণ্যভূমি, তাসের ঘর, ব্যবধান, বিচারক, ফল্গুধারা, বেশ ছিলাম, ভাঙ্গন, অমর (?), "যে নদী মরুপথে—", তুমি আর আমি, বিড়ম্বনা, নিগড়, মাটির পৃথিবী, মনের গহনে, রুদ্ধ কপাট, দেবাঃ ন জানন্তি, ধূলি ধূসর, পাগল ?, কারও পৌষমাস, সংস্কার, শকুন্তলার পরাজয়, অপদার্থ, বীরাঙ্গনা, সিঁধকাঠি, হাসির গল্প, উৎসব, কঙ্কাবতীর ইতিকথা, পূরবী, নব কথামালা, ইনোসেণ্ট, নির্লজ্জ, জীবন নাট্য, প্রগলভা, ছুটির একবেলা, কপালে নেইকো ঘি, মধু ও হুল, না।

দ্বিতীয় খণ্ড

উপসংহার, বিপদ আর কাকে বলে, তাজমহল, মোহমুক্তি, গলায় দড়ি, জর্জেট শাড়ি, কার্য-কারণ, দুপুর রোদে, লাল শাড়ী, হোমশিখা, আমায় ক্ষমা করো, না দিলে খুলে দ্বার, জনমত, ধ্বংসের মুখে নারী, সত্যাসত্য, অঙ্গার, রাহু, পদ্মলতার স্বপ্ন, নিরুপমা, দুই নারী, স্বপ্নভঙ্গ, অভিশপ্ত, দুই আর দু'য়ে, কঙ্কণ, একাঙ্কিকা, আফিং, যথাপূর্বং, লড়াই, আদিম, অনুপমার ঘর, নবাগতা, বহুরূপী, আসামী, ছেঁড়া তার, অপচয়, ছিন্নমস্তা, সাগর শুকায়ে যায়, অবলা, অপদস্থ, মুস্কিল আসান, এক্সপেরিমেণ্ট, প্রস্তাব, সভ্যতার সংকট, একরাত্রি, বাজে খরচ, দৃষ্টি, অভাব, দ্বন্দ্ব, সর্পশিশু, আত্মহত্যা।

তৃতীয় খণ্ড

বন্দিনী, অভিমত, ক্ষমতা হস্তান্তর, কালের হাওয়া, দাসত্ব, ডিরেক্টর রাসুদা, উদ্বাস্তু, সর্ষে ও ভূত, ডেলি প্যাসেঞ্জার, অপরাধ, সামনের বাড়ি, আকস্মিক, কামধেনু, সিঁড়ি, সম্ভ্রম, বেহুঁশ, চৌরঙ্গী, এখনও নেভেনি হোমের আগুন, শুনে পুণ্যবান, মলাট, পদাতিক, মৃত্যুবাণ, একটু কথোপকথন, অন্তর্তর্ক, একটি করুণ কাহিনী, কাপুরুষ, লোকরহস্য, দেশত্যাগী, ব্যাঙ্ক ফেল, বাকী খাজনা, পাকা ঘর, স্খালন, নেশা, দুজনে একলা, লোকসান, একটি ভাঙাচোরা গল্প, মহাগদ্য, শাড়ী মাহাত্ম্য, স্বাধীনতার সুখ, নীলকণ্ঠ, অভিনেত্রী, ইস্পাতের পাত, একটি ফুটো পয়সার জের, অনাচার, ঐশ্বর্য, ভয়।